বিশ্বায়ন

ভাবনা-দুর্ভাবনা

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদকমণ্ডলী

ঈশিতা মুখার্জী □ দেবু দত্তগুপ্ত □ সোমনাথ ভট্টাচার্য

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

বিশ্বায়ন : ভাবনা-দুর্ভাবনা (দ্বিতীয় খণ্ড)
Viswayan : Bhabna-Durbhabna (Vol. II)
(A Collection of Essays on Globalisation in Bangla)

প্রথম প্রকাশ
৭ নভেম্বর, ২০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ

প্রকাশক □ সলিলকুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক □ সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ
১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

বিশ্বায়নের ভাবনা

সাম্রাজ্যবাদ ও বৈষয়িক বিশ্বায়ন

খাদ্য-শিল্প-শ্রম

ভাবাদর্শ ও সংবাদমাধ্যম

বিশ্বায়ন ও নারী

ধর্ম সংস্কৃতি মৌলবাদ

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

পরিষেবা ও মহাজনী মূলধন

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ওষুধশিল্প

পরিচয়ের রাজনীতি, গণতন্ত্র ও বিশ্বায়ন

সম্পাদনা সহযোগী

জয়ন্ত আচার্য ● বিদিশা ঘোষদস্তিদার ● বিপুল ভট্টাচার্য

বিশেষ সহযোগী

আশিস গুহ ● প্রদোষ বাগচী ● বিশ্বজিৎ মণ্ডল ● বাসব কুমার সাহু ● স্বপ্নাংশু লোধ

যাঁদের পরামর্শ, উৎসাহদান ও সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের পাথেয় হয়েছে

সুকুমারী ভট্টাচার্য ● প্রভাত পট্টনায়ক ● সব্যসাচী ভট্টাচার্য ● ভি. কে. রামচন্দ্রন
তড়িৎবরণ তোপদার ● মইনুল হাসান ● শমীক লাহিড়ী ● এন. রাম ● রাজেন্দ্রপ্রসাদ

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই

মান্থলি রিভিউ পত্রিকার অন্যতম সহ-সম্পাদক **ক্লদ মিসুকিউইজ (Claude Misukiwicz)**-কে
যিনি চাওয়ামাত্রই মান্থলি রিভিউয়ে প্রকাশিত লেখাগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন

যেসব প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ

মান্থলি রিভিউ ● গণশক্তি ● সমন্বয় ● জেড ম্যাগাজিন ● জননাট্য মঞ্চ, নতুন দিল্লী
নিউ পলিটিক্স ● ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতা ● দি টেলিগ্রাফ
রিসার্চ ফাউণ্ডেশন ফর সার্ভিস, টেকনোলজি এণ্ড ইকোলজি, নতুন দিল্লী
ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্র, কলকাতা
ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, সর্বভারতীয় কেন্দ্র, নতুন দিল্লী
সত্যযুগ শিল্প সমবায় প্রেস

যেসব ব্যক্তি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন

মুরারীমোহন মিত্র ● দেবাশিস চক্রবর্তী ● প্রসেনজিৎ বোস ● অনুভূতি মৌর্য
জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ● আলবিনা সাকিল ● বিজু কৃষ্ণাণ ● অভয় কুমার ● পি কে বাগচী
প্রদীপ মাইতি ● পার্থ রায় ● তীর্থঙ্কর বিশ্বাস ● অজয় দাশগুপ্ত ● বিভাস পাঠক
অমর বন্দ্যোপাধ্যায় ● সৌমেন চট্টোপাধ্যায় ● কমলেন্দু চক্রবর্তী ● রোশনী দত্তগুপ্ত
প্রীতি গুহ মজুমদার ● চিত্ত দেবনাথ ● নন্দলাল চ্যাটার্জী ● বাদল দাশগুপ্ত
শেখর রায়গুপ্ত ● অশোক কমল বসু ● দিলীপ ভঞ্জ

মুখবন্ধ

ধনীর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুধু যে ক্রমাগত গরিবকে পদানত করে রাখার চেষ্টা করে তাই-ই নয়, তার মধ্যে এই ধারণাও প্রবেশ করিয়ে দিতে চেষ্টা করে যে এ ছাড়া তার অন্য গতি নেই এবং এই পদানত অবস্থাতেই তার আত্মা শান্তি খুঁজে পাবে। আজকের পৃথিবীতে রূপার্ট মার্ডক বা এ. ও. এল-টাইম ওয়ার্নার-এর মত সংবাদ ও বিনোদন মাধ্যমের কর্তাব্যক্তি বা সংস্থা সারা পৃথিবী জুড়ে এই ধরনের মানুষ ভোলানো মতাদর্শ সারাক্ষণ নানাভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই খণ্ডে সেইজন্যে সংবাদমাধ্যম, মতাদর্শ এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী উত্তরআধুনিকতা গোছের তত্ত্বের ওপরে বেশ কয়েকটি প্রামাণ্য প্রবন্ধ উপস্থিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রবার্ট ম্যাকচেসনি বা নোয়াম চমস্কির লেখায় বাজার-স্তাবকদের আসল চেহারার উদ্‌ঘাটন যেমন আছে তেমনই আছে এলেন মেইকসিন্স উডের উত্তর আধুনিকতাবাদ সম্পর্কিত তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, রয়েছে প্রভাত পট্টনায়কের মননশীল রচনা।

এই খণ্ডে অমর্ত্য সেনের রচনাটি আত্মপরিচয় ও তার বহুমাত্রিক বিকাশ সম্পর্কিত। তাঁর অননুকরণীয় শৈলীতে অমর্ত্য আত্মপরিচয় সম্পর্কিত নানা তত্ত্বের দুর্বলতা উন্মোচিত করেছেন এবং সবার উপরে, বহুমাত্রিক আত্মপরিচয় নির্মাণে যুক্তির প্রয়োজনীয়তার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। যুক্তিবিবর্জিত আত্মপরিচয়বাদ সাম্প্রতিককালে বা অতীতে সব সময়েই হানাহানি, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বা জাতিগত দাঙ্গার কীভাবে জন্ম দিয়েছে তাও এই রচনায় বিশ্লেষিত হয়েছে।

ধনীর বিশ্বায়ন এবং সাম্রাজ্যবাদ প্রায় সমার্থক শব্দ বলা যায়। তফাৎ যদি করতে হয় তবে এটুকুই বলা যেতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদ বহুক্ষেত্রে শুধু বহিঃশক্তি ব্যবহার করে কোনো দেশের ওপরে প্রভুত্ব স্থাপন করে। কিন্তু ধনীর বিশ্বায়ন যে দেশেই প্রবল ধনতন্ত্রী বা আধা-সামন্ততন্ত্রী শ্রেণী আছে, সেই শ্রেণী বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। সেইজন্য এই খণ্ডে রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদের ওপরে প্রত্যক্ষ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। লিখেছেন সামির আমিন ও সুকোমল সেন প্রমুখ প্রতিবাদী লেখক।

সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদিকে ব্যবহার করে তা বোঝানোর জন্য জোসেফ স্টিগলিৎস, মোগেন্‌স্ বুখ হানসেনের নিবন্ধ এই খণ্ডে বিধৃত হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যেও চীন কিভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মোকাবিলা করে নিজেদের সামাজিক অগ্রগতির স্বাক্ষর রাখছে তা পাওয়া যাবে নির্মলকুমার চন্দ্রের লেখায়।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া নতুনভাবে মানুষের মধ্যেকার অযৌক্তিক হিংসাকে উস্কে দিয়ে ধনীর প্রতাপ বজায় রাখার কাজে সর্বদা ব্যাপৃত। এই প্রক্রিয়ার আরো বিস্তারিত উদাহরণ পাওয়া

যায় কীভাবে বিশ্বায়নের সাথে সাথে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সেই প্রসঙ্গ কে এন পানিক্কর, মইনুল হাসানের প্রবন্ধে। সেইসঙ্গে রয়েছে সংস্কৃতির প্রশ্নে এজাজ আহমেদের ক্ষুরধার বক্তব্য।

কিন্তু বিশ্বায়ন তো শুধু একটা বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরের প্রক্রিয়া নয়; ব্যাঙ্ক, শেয়ার বাজার, বীমা, ওষুধ শিল্প, পরিষেবা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের অশুভ প্রভাব লক্ষিত হয়। এই সমস্ত বিষয়ের ওপর নীলোৎপল বসু, জয়তী ঘোষ সহ আরও কয়েকজনের বিশ্লেষণী নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

বিশ্বায়ন সমগ্র জনসমষ্টির শতকরা নব্বই ভাগের ওপরেই অশুভ ছায়া ফেলে, হ্যারি ম্যাগডফ তাঁর শাণিত যুক্তি এবং তথ্যসহকারে তার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যেও বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় শিকার বলা যেতে পারে শ্রমিকশ্রেণী এবং নারী। যদিও শ্রমিকশ্রেণী ও নারীর অবস্থা চিলি, আর্জেন্টিনার সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণে বা সাম্প্রদায়িকতার ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হয়েছে তবুও বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এই শোষিত শ্রেণীর সর্ববৃহৎ প্রতিভূদের ওপর বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন এম কে পান্ধে, যশোধরা বাগচী এবং শুভ গুপ্ত।

মানুষের ইতিহাস চিরকাল শোষণ এবং প্রতিরোধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এগিয়ে চলে। মানুষকে কোনোদিনই শোষকশ্রেণী নিষ্ক্রিয়যন্ত্রে পর্যবসিত করতে পারেনি। এবং সেইভাবে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিকেও শোষকশ্রেণী শুধুমাত্র তাদের নিজেদের কাজে লাগাতে পারেনি। শোষণের বিরুদ্ধে নরনারীর নিরন্তর প্রতিরোধের কাহিনী আগের প্রবন্ধগুলোয় খানিকটা পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ করে সেই অভিজ্ঞান দেখতে পাবো লোকসংস্কৃতির বেঁচে থাকা ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যে। লিখেছেন অরুণ চৌধুরী ও মালিনী ভট্টাচার্য। বিশ্বায়নের আওতায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি, তার অপব্যবহার ও তা প্রতিরোধের রোজনামচা উপস্থিত করেছেন কঙ্কন ভট্টাচার্য এবং শ্যামল চক্রবর্তী।

আবার আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের ভাবাদর্শগত বিচ্ছুরণ ও তাকে বিকৃত করার প্রয়াসকে বিশ্লেষণের জন্য পৃথক প্রবন্ধ উপস্থাপিত করা হয়েছে। গণতন্ত্রী বিশ্বায়নের যুগে সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম আগের চেয়েও অনেক বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সপক্ষে জোরালো যুক্তি হাজির করতে কলম ধরেছেন সীতারাম ইয়েচুরি।

বিশ্বায়নের সর্বব্যাপী প্রভাব ভাষাকেও স্পর্শ করেছে। বিশ্বায়ন শব্দটি যত বেশি ব্যবহৃত হয়েছে তার বেশির ভাগটা আবার অ-যথাযথ কিম্বা অপব্যবহার— এ প্রসঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে পিটার মারকিউজের রচনা। খুব সংগত কারণেই চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে অভিজিৎ চৌধুরী এবং ওষুধশিল্প নিয়ে অমিতাভ গুহ-র লেখা দু'টি উপস্থিত করা হয়েছে।

'বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা'র প্রথম খণ্ডের সঙ্গে যাঁদের পরিচিতি ঘটেছে তাঁরা জানেন যে ইতিমধ্যেই বিশ্বায়নের অন্তর্লীন ভাবাদর্শ থেকে বৈষয়িক বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি থেকে সংস্কৃতি ইত্যাকার বহুধা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে সেই গ্রন্থের বিবিধ নিবন্ধে। দ্বিতীয় খণ্ডেও সেই প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করা হয়েছে আরো একগুচ্ছ মনোজ্ঞ রচনার মাধ্যমে। লেখকদের কাছে লেখার আবেদন জানানোর সময় বলা হয়েছিল যাঁরা নতুন লেখা দিতে পারবেন না তাঁরা বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা বুঝে অন্যত্র পঠিত বা প্রকাশিত লেখাও দিতে পারেন। কয়েকজন সে ধরনের লেখা দিয়েছেন। আমরা সেইসব লেখার মূল উৎস এখানে উল্লেখ করেছি। অধিকাংশ লেখকই সম্পাদকমণ্ডলীর পরিকল্পনা এবং অনুরোধ অনুযায়ী লিখলেও তার মধ্যে অনেকগুলি রচনা খুব স্বাভাবিক কারণেই ইংরেজীতে লেখা। সেইসব ক্ষেত্রে মূল প্রবন্ধটির লেখক প্রদত্ত শিরোনাম পাঠকদের অবগতির জন্য যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

একটি কথা বলা এখানে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই সংকলনের প্রত্যেকটি লেখার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলী একমত; তথাপি প্রতিটি লেখার প্রতিটি বক্তব্যের সঙ্গেই সহমত নিশ্চয়ই নয়। এক্ষেত্রে সম্পাদকমণ্ডলীর গৃহীত নীতি হল প্রত্যুৎপন্নমতি পাঠকের প্রতি আস্থা রেখে অবিকৃত অবস্থায় আমন্ত্রিত লেখাগুলিকে যথাযথভাবে পরিবেশন করা।

দুই খণ্ড 'বিশ্বায়ন' প্রণয়নের প্রাথমিক প্রস্তাব এসেছিল শ্রী শ্যামল চক্রবর্তীর কাছ থেকে। এই দুই খণ্ডের পরিকল্পনায় এবং সেই পরিকল্পনা রূপায়িত করার কাজে তাঁর সতত সহায়তার জন্য আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

সহযোগী সম্পাদকদের মধ্যে দেবু দত্তগুপ্ত ও সোমনাথ ভট্টাচার্যর তন্নিষ্ঠ, প্রায় অমানুষিক পরিশ্রম আমাকে মুগ্ধ করেছে।

যেসব লেখক তাঁদের লেখা প্রথম প্রকাশের জন্য আমাদের দিয়েছেন এবং যাঁরা তাঁদের পূর্বপ্রকাশিত লেখা ছাপার জন্য আমাদের অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি এবং আমার সহযোগী সম্পাদকরা কৃতজ্ঞ। তার সঙ্গে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই সেইসব অনুবাদকদের এবং সংগঠকদের যাঁরা প্রভূত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজে আমাদের সহযোগী হয়েছেন। পরিশেষে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ও সত্যযুগ প্রেসের কর্মীবৃন্দের প্রতি আমাদের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

চিন্তাশীল মানুষ যে যে বিষয়ে আগ্রহী, বর্তমানে তারমধ্যে একটি বহুল চর্চিত বিষয় বিশ্বায়ন। আর এই চর্চা কেবলমাত্র মনন ও চিন্তাজগৎকে পরিপুষ্ট করবার জন্য নয় বরং তা অনেক বেশি প্রয়োজন কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হবার জন্য। এই সংকলন যদি সেই ভাবনাকে উস্কে দিয়ে করণীয় এবং বর্জনীয় সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত মতামত গড়ে তুলতে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে তাহলেই এই প্রয়াসের সার্থকতা।

অমিয়কুমার বাগচী

এই বইয়ে ব্যবহৃত মিলিয়ন, বিলিয়ন এবং ট্রিলিয়নের হিসাব

১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ; ১ বিলিয়ন = ১০০০ মিলিয়ন; ১ ট্রিলিয়ন = ১০০০ বিলিয়ন

বিশ্বায়নের ভাবনা

হ্যারি ম্যাগডফ

ইস্তভান মেজারোস

এডওয়ার্ড হারমান

পিটার মারকিউজ

বর্তমান সময়ে কমিউনিস্ট ইস্তেহারের প্রাসঙ্গিকতা

হ্যারি ম্যাগডফ

কমিউনিস্ট ইস্তেহারের সম্ভবত যে অংশটি এই সময় প্রায়ই উল্লেখ করা হয় সে'টি হল ধনতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী প্রসারের চিত্র।

পুরনো দিনের জাতীয় শিল্পগুলি হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে অথবা ধ্বংস হতে চলেছে। তাদের স্থানচ্যুত করেছে এমন নতুন নতুন শিল্প যার প্রবর্তন সকল জাতির পক্ষে জীবন-মরণ প্রশ্নেরই সামিল। এমন শিল্প যা শুধু আর দেশজ কাঁচামাল নিয়ে নয়, দূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করছে; এমন শিল্প যার উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয় পৃথিবীর সর্বাঞ্চলেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের উৎপন্ন বস্তুতে যা মিটত এমন সব পুরনো চাহিদার বদলে দেখছি নতুন নতুন চাহিদা, যা মেটাতে দরকার দূরবর্তী দেশগুলির উৎপাদিত দ্রব্য। আমরা দেখছি জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া পরস্পর নির্ভরতা। সকল জাতিগুলি ধ্বংস হয়ে যাবার ভয়ে (বাধ্য হয়ে) বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতিকে গ্রহণ করে। এটি বাধ্য করে নিজেদের মধ্যে সেই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে যাকে সে বলে সভ্যতা, যাতে কিনা তারা নিজেরাই বুর্জোয়া বনে যায়। এক কথায় বুর্জোয়াশ্রেণী নিজের ছাঁচে জগৎটাকে গড়ে তোলে।

বিগত অর্ধ শতকের ইতিহাস নিশ্চিতভাবেই স্বীকার করে নিয়েছে যে দেড়শ' বছর পূর্বে যে ধারা বর্ণিত হয়েছে তা এখনও কার্যকরী। যাইহোক এই বর্ণনায় ধনতান্ত্রিক অনুপ্রবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ইস্তেহারে অনুপস্থিত। ধনতন্ত্র যখন তার প্রকৃতি অনুযায়ী সঞ্চয় ও ভৌগোলিক বিস্তারের মধ্যে বেঁচে থাকে তখন এটি ঘটে অত্যন্ত অসমভাবে। এমনকি যদিও অর্থনীতির কোনো কিছুই গাণিতিক বিধি অনুসরণ করে না তাহলেও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ রসদ দ্বারা সৃষ্ট। কয়েকটি ধনীদেশের সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্বের স্পষ্ট ও চোখে পড়ার মত ক্রমবর্ধমান তফাতের মধ্যে এই প্রবণতার এক বড় উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের সময়ে বিশ্বায়নের গতি এই মেরুভবনকে অবধারিতভাবেই প্রকাশ করছে।

১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত বিশ্বের আয়ের বণ্টন বিষয়ে সাম্প্রতিক সমীক্ষা এই সঙ্গে এক সারণীতে দেওয়া হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে আমাদের সময়ে বিশ্বের জনসংখ্যার ২০ শতাংশ যেখানে বাস করে সেই দেশগুলি বিশ্বের মোট উৎপাদিত দ্রব্য ও পরিষেবার শতকরা ৮৩ ভাগ নিজেদের উৎপাদন ও লাভের ক্ষেত্রে কাজে লাগায় (বিশ্ব জনসংখ্যার প্রথম ১০ শতাংশের ভাগ এখন ৫৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে)। জনসংখ্যার দরিদ্রতম ২০ শতাংশ

মানুষের জন্য বিশ্বের মোট উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ হচ্ছে ১.৪ শতাংশ। ধনী দেশগুলির শতকরা ২০ ভাগ এবং অবশিষ্ট বিশ্বের আয় বন্টনের প্রবণতার মধ্যে তফাৎ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চারটি নিম্নতম (আয়) গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির প্রতিটির বিশ্বের মোট আয়ের প্রাপ্য ভাগ ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সমানতালে কমে গেছে।-অন্যদিকে ধনী ২০ শতাংশের প্রাপ্য ভাগ ৭০ থেকে ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত সমান গতিতে বেড়েছে। এই সমস্ত ঘটনাই ঘটছে যখন বেশির ভাগ সময় ধনী দেশগুলি বিকাশহীন নিশ্চল অবস্থায় ছিল এবং যখন নতুন শিল্প, আর্থিক ও অন্যান্য পরিষেবা বিকাশের কথা বলে আরো পুঁজি ধনীদেশগুলি থেকে দরিদ্র দেশগুলিতে প্রবাহিত হচ্ছিল। পরবর্তী বছরগুলি সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টে একই ধরনের তথ্য (data) পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে মেরুভবন ১৯৯০ এর দশকে পুরোদমে চলছে।

কয়েক শতাব্দীব্যাপী ধনতন্ত্রের বিস্তারের শেষে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এইরকম : বিশ্ব জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ মানুষ বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্য ও আয়ের মাত্র ৫.৩ শতাংশ পায়, যেখানে শতকরা ৮৩ ভাগ থাকে শতকরা ২০ ভাগ উচ্চতম ধনী ব্যক্তিদের হাতে (নিচে দেওয়া সারণীর শেষ কলাম দ্রষ্টব্য)।

এই বক্তব্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ইস্তেহারের আর একটি বহুল ব্যবহৃত পদ : 'বুর্জোয়ারা মোটামুটি ১০০ বছরের বুর্জোয়া শাসনে পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় আরো বিশাল, আরো অতিকায় উৎপাদন শক্তির সৃষ্টি করেছিল।' ইস্তেহারে অনেক বিষয় উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু দেড়শো বছর পরেও এই বিষয়টিকে বাড়তি গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। পুনরায় আমাদের স্বীকার করা প্রয়োজন যে অঞ্চলভেদে উৎপাদন শক্তির কি রকম অস্বাভাবিক অসম বন্টন অব্যাহত রয়েছে। একদিকে ইলেকট্রনিক্সের বিস্ময়কর যাদুস্পর্শ, অন্যদিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট (Human Development Report) জানাচ্ছে বিশ্বের একশ' কোটিরও বেশি মানুষ নিরাপদ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। বিশ্ব জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ দরিদ্র মানুষের চাহিদা মেটানোর উপযোগী উৎপাদন সামগ্রী ও সহায়ক ব্যবস্থা অনুপস্থিত।

বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন সম্পর্কে র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠীর মধ্যে প্রভূত কথাবার্তা হয়। প্রায়শই উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পার্থিব কৃতিত্ব এবং সুবিধাভোগী অংশের জীবনযাত্রার মান এই স্বপ্নকে প্রভাবিত করে। যাইহোক, যেভাবে ধনতন্ত্র সারা বিশ্বে এবং বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতে বিস্তার লাভ করেছে, এ'কথা মনে রেখেও বলা যায় যে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন সমাজ পরিবর্তনের উপরই জোর দেয়, যার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ; দরিদ্রতম চরম শোষিত এবং অবহেলিত মানুষগুলির প্রাথমিক মানবিক চাহিদা মেটাতে পারার মত ক্ষমতা অর্জন।

সারণী

১৯৬৫ — ১৯৯০ : বিশ্ব আয়ের অংশ				
জনসংখ্যা	মোট বিশ্ব আয়ের শতকরা ভাগ			
	১৯৬৫	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯০
দরিদ্রতম ২০%	২.৩	২.২	১.৭	১.৪
দ্বিতীয় স্তরের ২০%	২.৯	২.৮	২.২	১.৮

তৃতীয় স্তরের ২০%	৪.২	৩.৯	৩.৫	২.১
চতুর্থ স্তরের ২০%	২১.২	২১.৩	১৮.৩	১১.৩
ধনীতম ২০%	৬৯.৫	৭০.০	৭৫.৪	৮৩.৪

সূত্র ঃ রবার্তো প্যাট্রিশিও কোর্জেনিউইক্জ্ ও টিমোথি প্যাট্রিক মোরানের "ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ট্রেন্ডস ইন্ ডিস্ট্রিবিউশন অব ইনকাম, ১৯৬৫-১৯৯২' ; আমেরিকান জার্নাল অব সোসিওলজি খণ্ড - ১০২, সংখ্যা - ৪, ১৯৯৭-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত।

ভাষান্তর ঃ দিব্যেন্দু হোতা

মান্থলি রিভিউয়ের সৌজন্যে পাওয়া, লেখকের সম্মতিক্রমে প্রকাশিত।
মূল রচনাটির শিরোনাম ***'A Note on the Communist Manifesto'*** *।*

লাগামছাড়া লগ্নিপুঁজি এবং তার বিধ্বংসী প্রভাব

ইস্তভান মেজারোস

এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক সংকটের যুগে আমরা বাস করছি। ধনতন্ত্রের সংকটের দীর্ঘায়িত চক্র সম্পর্কে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান সংকটের কোনও মিল নেই; বরং এই সংকট হচ্ছে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোরই এক গভীর সংকট—এতেই বোঝা যায় এই সংকটের তীব্রতা কত। ফলে ইতিহাসে এই প্রথম সমগ্র মানবজাতিই এই সংকটের আঘাতে বিপন্ন। তার ফলে মানবসভ্যতাকে টিকে থাকতে হলে সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের এ যাবৎ অনুসৃত পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ধনতন্ত্রের কাঠামোর উপাদানগুলির (যেমন, আর্থিক ও বাণিজ্যিক পুঁজি এবং বিক্ষিপ্ত পণ্য উৎপাদন) ইতিহাস হাজার বছরেরও পুরনো। এই হাজার বছর ধরেই এই উপাদানগুলি প্রচলিত সামাজিক রূপান্তরের বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীন ছিল। দাস ব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্র সহ সব ধরনের ঐতিহাসিক পর্বেই এটা সত্যি। গত কয়েক শতকেই দেখা গেল বুর্জোয়া ধনবাদী ব্যবস্থায় পুঁজি একটি সর্বব্যাপক জৈব কাঠামো হিসাবে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। মার্কসের ভাষায় ঃ

'একথা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন, উৎপাদনের নতুন শক্তি ও সম্পর্ক শূন্য হতে উদ্ভূত হয় না আকাশ থেকেও পড়ে না, স্বপ্রকাশিত কোনও ধারণার গর্ভ থেকেও জন্মায় না—বরং তার উদ্ভব ঘটে প্রচলিত উৎপাদন শক্তির বিকাশ ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত চিরাচরিত উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্য থেকে বিরোধী প্রতিবাদী শক্তি হিসাবে। একটি পূর্ণাঙ্গ বুর্জোয়া ব্যবস্থায় প্রতিটি অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে অন্য সম্পর্কগুলিও বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ধরণের এবং এই ব্যবস্থা যা কিছু আমাদের সামনে উপস্থিত করে, সব ক্ষেত্রেই এরকম পূর্বানুমান করা যায়। আসলে প্রত্যেক জৈব ব্যবস্থাতেই এরকম হয়ে থাকে। আলোচ্য জৈব ব্যবস্থাটিরও একটি সমগ্র ব্যবস্থা হিসেবে নিজস্ব পূর্বানুমান আছে—পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে ওঠার পথে সমাজের নানা উপাদানগুলিকে তা নিজের অধীনে নিয়ে আসে এবং এর মধ্য দিয়ে এমন সব প্রত্যঙ্গ নির্মাণ করে, যা তার মধ্যে ছিল না। একটি ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপে বিকশিত হওয়ার এই হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।' [1]

এভাবেই পূর্বতন জৈব ব্যবস্থার শৃঙ্খল থেকে সুপ্রাচীন উপাদানগুলিকে মুক্ত করে এবং নতুন উপাদানগুলির বিকাশের পথে সবরকম প্রতিবন্ধকতা ধ্বংস করে[2], গত তিনশো বছর ধরে পুঁজির সর্বব্যাপী জৈব ব্যবস্থা একটি সার্বিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে তার কর্তৃত্ব

কায়েম করেছে। প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তিকে শুধুমাত্র উৎপাদনব্যয়ের স্তরে পর্যবসিত করে পুঁজি জীবন্ত শ্রমিককে বিক্রয়যোগ্য পণ্য ব্যতীত অন্য কোনও মর্যাদা দেয় না এবং অন্য অনেক কিছুর মতই শ্রমিককে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার অমানবিক প্রভাবের অধীনস্থ করে তোলে।

মানুষের নিজেদের মধ্যে এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে উৎপাদনশীল যে বিনিময় ব্যবস্থা পূর্বতন সমাজে চালু ছিল, তা মূলত 'প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন'—এই লক্ষ্যে চালিত হত এবং বহুল পরিমাণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই ছিল এই ধরণের ব্যবস্থার নির্ধারক শক্তি। এর ফলে পুরোনো ব্যবস্থার পরিসীমার মধ্যে—অল্প মাত্রায় ক্রিয়াশীল হলেও, পুঁজির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী পুনরুৎপাদনমূলক প্রক্রিয়ার আঘাতের মুখোমুখি হয়ে পড়ল। কারণ ক্রমশ উত্থানশীল গতিময় পুঁজি ব্যবস্থার কোনও উপাদানের পক্ষেই স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাঠামোগত সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ থাকা সম্ভব ছিল না এবং তার প্রয়োজনও ছিল না। অপরিমাপযোগ্য প্রয়োজন-মূল্যের সীমিত পরিসরে আবদ্ধ মানুষের চাহিদা-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে বর্জন করে এবং তার উপর পরিমাপযোগ্য ও ক্রমবিস্তারশীল বিনিময়মূল্যের জাদুকরী শক্তিকে স্থান দিয়েই সামাজিক রূপান্তরের নির্ধারক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজির উত্থান ও ঐতিহাসিক পূর্বসূরী ব্যবস্থাগুলির উপর তার জয়লাভ সম্ভব ছিল।

এভাবেই পুঁজি ব্যবস্থার বিশেষ ঐতিহাসিক রূপ—বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। উদ্বৃত্ত মূল্য নিষ্কাশনের প্রধানত অর্থনৈতিক পদ্ধতিটি একে গ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক এবং সোভিয়েত ধরনের উত্তর-ধনতান্ত্রিক—উভয় ব্যবস্থাতেই উদ্বৃত্তমূল্য নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি ছিল মূলত একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া—এর বিপরীতে পরিমাপযোগ্য উদ্বৃত্তমূল্য আদায়ের ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল ঐ সময়ে বিজয়ী ব্যবস্থার ক্রমবিস্তারের প্রয়োজন মেটানোর সবচেয়ে কার্যকরী প্রাণবস্ত কৌশল। পুঁজির পূর্ণাঙ্গ জৈব ব্যবস্থার প্রসঙ্গে আসা যাক— যে ব্যবস্থার প্রতিটি অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে অন্য সম্পর্কগুলি বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ধরণের এবং যা কিছু আমাদের সামনে উপস্থিত তাও এ ধরণের একটি পূর্ব অনুমিত সম্পর্কের বিষয়। এই ব্যবস্থায় পুঁজির দুষ্ট চক্রের কল্যাণে পুঁজির জগত নিজেকে মরচে-না-পড়া একটি লৌহ-পিঞ্জর বলে দাবী করতে পারে—যার থেকে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয় এবং বস্তুত তা উচিতও নয়।

পুঁজির অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতির রহস্যের চাবিকাঠি হল তার বাধাবন্ধহীন বিস্তারের প্রয়োজনীয় শর্ত সাফল্যের সাথে পূরণ করা। অবশ্য এর সাথে সাথেই এসেছে এক অনতিক্রম্য ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা। এটা যে বিশেষ করে সামাজিক-ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই নয়, সামগ্রিকভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই এই শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। সামাজিক রূপান্তর নিয়ন্ত্রণ করার একটি ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজি-কে তার অন্তহীন আধিপত্য বিস্তারের নির্মম ও যুক্তিহীন অনুশাসন সমগ্র সমাজের উপর সফলভাবে চাপাতেই হবে, তা এর ফলাফল যতই বিধ্বংসী হোক না কেন—অথবা, পুঁজিকে কিছু যুক্তিগ্রাহ্য বিধিনিষেধ মান্য করে চলতে হবে তা তার অন্তর্নিহিত সম্প্রসারণবাদী প্রবণতার যতই পরিপন্থী হোক না কেন। কেইন্‌সীয় প্রতিকার থেকে সোভিয়েত ধরণের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ—বিংশ শতাব্দী জুড়ে ধনতন্ত্রের অন্তর্লীন সীমাবদ্ধতা জয় করার এরকম অনেক ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং সেই সঙ্গে উদ্ভূত রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘর্ষের আগুন ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাগুলি লক্ষ্য করা যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও এইসব প্রচেষ্টার ফল যা হয়েছে তা হল ঃ পুঁজি ব্যবস্থার সংকারয়ন বা মিশ্র রূপ—পুঁজির ক্লাসিকাল অর্থনৈতিক চেহারার তুলনায় যা আলাদা। ভবিষ্যত ইতিহাসের পক্ষে এর সমস্যাসঙ্কুল তাৎপর্য সীমাহীন অথচ টিকে থাকার মত কোনও কাঠামোগত সমাধান তার অজানা।

এ প্রসঙ্গে এটা খুবই উল্লেখযোগ্য এক ঘটনা যে, বস্তুত পুঁজি-ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক আকারে একটি বিশ্বজনীন পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়নি। সাম্প্রতিককালে, আদর্শ 'বাজার ভিত্তিক সমাজ' (কেউ কেউ কিছুটা পিছু হঠে এর পরিবর্তে উদ্ভট ও কাল্পনিক 'সামাজিক বাজার'—শব্দটি প্রয়োগ করেছেন—অবশ্য তাদের কথা বাদ দেওয়া যাক) এবং ধনতান্ত্রিক উদার রীতিনীতির অবাধ রাজত্বে 'ইতিহাসের অবসান' যদিও উভয় ঘটনার মহৎ গুণাবলী কীর্তন করে জয়োল্লাসে মেতেছেন অনেকে—তা সত্ত্বেও পুঁজির পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে ওঠার এই ব্যর্থতা বেশ অস্বস্তিকর। অন্যভাবে বলতে হয়, বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের বিকাশ উদ্বৃত্তমূল্য নিষ্কাশন ও আত্মসাৎ করার একান্তভাবে অর্থনৈতিক উপায় ও পদ্ধতিটি সর্বতোভাবে সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পুঁজির সংকারয়ন মেনে নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্র আরও ব্যাপকতর সংকটগুলির (যার ফলশ্রুতি হিসেবে ঘটে গেল দুটি অকল্পিতপূর্ব মহাযুদ্ধ) মোকাবিলা করতে বাধ্য হয়েছিল। সংকট থেকে বেরিয়ে আসার আশু সমাধান হিসেবে এবং সংকট সমাধানের এই নিদান যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে পরবর্তীকালে ভয়ানক বিপদ ডেকে আনতে পারে সে কথা মনে না রেখে পুঁজির সংকরায়ন মেনে নেওয়া হল সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনরুৎপাদনমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে আরও বেশি করে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দিয়ে। বিশেষ করে ঘড়ির কাঁটা উলটো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা (এমনকী ভয়ানক ভুল ব্যাখ্যার শিকার এ্যাডাম স্মিথের যুগেও তা হয়েছে) করতে দেখা যায় তাঁদেরই যাঁরা পুজি-ব্যবস্থার প্রশ্নহীন সমর্থক। ফলে 'র‍্যাডিক্যাল' দক্ষিণপন্থীদের মুখপাত্ররা রাষ্ট্রের সীমানা সংকোচনের কথার ফানুস ওড়ালেও, বাস্তবে কিন্তু বিপরীতটাই ঘটছে। প্রয়োজনীয় মাত্রায় পুঁজির বিস্তার ঘটাতে ব্যর্থকাম হয়ে কোনও না কোনও ভাবে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আরও বেশি পরিমাণে ব্যবস্থা-বর্হিভূত বাহ্যিক সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইওরোপে ধনতন্ত্র এখন হয়ত কর্তৃত্ব পেয়েছে; যদিও ধনতন্ত্রের শাসন অবশ্যই চলছে, তবুও পৃথিবীর সর্বত্রই ধনতন্ত্রের কর্তৃত্ব কায়েম আছে ভাবা ভুল হবে। যেমন চীনের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়— যেখানে কেবলমাত্র সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে ধনতন্ত্র জোর করে প্রতিষ্ঠিত করা হলেও দেশের জনগণের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই (তার মানে প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ) ধনতন্ত্রের আওতার বাইরে থেকে গেছেন। এবং চীনের এইসব সীমিত কিছু অঞ্চলেও যেখানে ধনতান্ত্রিক রীতিনীতি চালু আছে, উদ্বৃত্তমূল্যের নিষ্কাশনের অর্থনৈতিক কাজটি সম্পন্ন করতে বড় ধরনের রাজনৈতিক উপাদানের প্রয়োগের প্রয়োজন হয় যাতে শ্রমের খাতে ব্যয় কৃত্রিমভাবে কম রাখা যায়। অনুরূপভাবে ভারতেও (আর একটি মস্ত জনবহুল দেশ) অংশত ধনতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে যদিও সেখানে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অসুবিধার মধ্যে বাস করছেন[৩]। এমনকী বারো বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর আন্তরিক নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সেখানে যে সর্বত্র ধনতন্ত্রের সফল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে এ কথা বলা ঠিক হবে না। তাছাড়া অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বিগত কয়েক দশক ধরে যে পরামর্শ দিয়ে আসছে, সে অনুসারে কাজ করলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে— এ কথা প্রমাণ করে শুধু এশিয়ায় নয়, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকাতেও জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে উদার ধনতান্ত্রিক বিশ্বের বহু প্রতিশ্রুত নতুন সহস্রাব্দের ভূখণ্ডে ক্রমে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এইভাবে দেখা যায় যে তার ঐতিহাসিক

উত্থানের দাবীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পুঁজিকে নিজের প্রগতিশীল বিকাশের পথ রুদ্ধ করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হয়েছে; আত্মস্বার্থ রক্ষার জন্য আদর্শের মোহজাল বিস্তার করলেও বাস্তবে উদারনৈতিক ধনতন্ত্রী ভাবনা চিন্তার পথ পরিত্যাগ করে উলটো পথে হাঁটতে হয়েছে। এ কারণে এ কথা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট হওয়া দরকার যে শুধুমাত্র ধনতন্ত্রকে সামনে রেখে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কাজ পরিচালনা করলেই চলবে না, সমগ্র পুঁজি ব্যবস্থাকেই তার লক্ষ্য হিসেবে রেখে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ চালিত হওয়া উচিত।

ধনতান্ত্রিক অথবা উত্তর-ধনতান্ত্রিক সব পর্যায়েই পুঁজি-ব্যবস্থার প্রকৃতি হচ্ছে (এবং এরকমই তা থেকে যাবে) সম্প্রসারণবাদী এবং মূলধন গঠনের তাড়নায় চালিত[৪]। স্বাভাবিকভাবেই, এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন এটা নয় যে মানুষের চাহিদা আরও বেশি করে কীভাবে পূরণ করা যায় তার কৌশল নির্ধারণ করা। বরং একটি ব্যবস্থাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পুঁজির বিস্তার ঘটানোই একমাত্র কাজ—বিস্তৃত পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় পুঁজির কর্তৃত্ব ক্রমান্বয়ে জারি করে যাওয়া ছাড়া যে ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। পুঁজির অধীনস্থ হয়ে থাকা শ্রম—এই অসম স্তরবিন্যস্ত কাঠামোর সুবাদে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পুঁজি সম্পূর্ণভাবে ছিনিয়ে নেয় এবং সব সময় তা নেবেও—এর ফলে পুঁজি ব্যবস্থার সঙ্গে তার নিজের সত্তার বিরোধ শত্রুতামূলক। এই কাঠামোগত দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—ক্ষুদ্রতম জৈব উপাদান থেকে সর্বাপেক্ষা সুসংহত পুনরুৎপাদনমূলক উৎপাদন কাঠামো ও সম্পর্কের বৃহদাকার জৈব গঠন পর্যন্ত। এবং যেহেতু এই দ্বন্দ্ব কাঠামো বা গঠনগত, সেহেতু পুঁজি ব্যবস্থার কোনও সংস্কার বা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়—এবং চিরকালই তা এমনই থেকে যাবে। সংস্কারবাদী সমাজ গণতন্ত্রীদের ঐতিহাসিক ব্যর্থতা এই ব্যবস্থার সংস্কার-অযোগ্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ দেয়; এবং ক্রমশ ঘনীভূত কাঠামোগত সংকট ও তার থেকে উদ্ভূত মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্নকারী সমস্যা এই ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ-অযোগ্যতারও ছবি স্পষ্ট রেখায় উপস্থিত করে। সামাজিক রূপান্তরের একটি সর্বব্যাপক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজি-ব্যবস্থার পুনরুৎপাদনমূলক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় ধরনের জৈব উপাদানের মধ্যে যে ধ্বংসাত্মক কাঠামোগত বিরোধ ক্রিয়াশীল—তার সমাধান না করে এই সংকটের প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সংস্কার চালু করার কথা ভাবাও যায় না। এবং তা করা সম্ভব একমাত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক সামাজিক রূপান্তরের পুনরুৎপাদনমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে—যার লক্ষ্য হবে মানুষের চাহিদার গুণগত পুনর্বিন্যাস ও ক্রমবর্ধমান পূর্তি। প্রতিষ্ঠা করতে হবে মানুষে মানুষে এমন বিনিময় ব্যবস্থা—যা পণ্যগত মোহবদ্ধতার প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পরস্পরযুক্ত উৎপাদকদের ইচ্ছায় চালিত হবে।

পুঁজি ব্যবস্থার মধ্যে তিনটি স্তরে ফাটল লক্ষ্য করা যায় ঃ

(১) উৎপাদন ও তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে;

(২) উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে; এবং

(৩) উৎপাদন ও উৎপন্ন পণ্যের চলাচল (আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয়ত)-এর মধ্যে।

ফলে, পুঁজি ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায় এক দুরারোগ্য রকমের কেন্দ্রাতিগ ব্যবস্থা যার মধ্যে বিরোধমূলক ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে নিরত অংশগুলি এই ব্যবস্থাকে পরস্পর বিরোধী দিকে টেনে নিয়ে চলে।

অতীতে পুঁজির দিক থেকে যেসব তত্ত্ব প্রণীত হয়েছে, তাতে পুঁজি-ব্যবস্থাকে দৃঢ়বদ্ধ রাখার উপাদানের অভাবের সমাধান খোঁজা হয়েছে মোটের উপর এক ধরনের ইচ্ছাপূরণের ভাবনার মাধ্যমে। প্রথমে অ্যাডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হাত'-এর কথায় আসা যাক। 'অদৃশ্য হাত'-এর ধারণা রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ—যাকে অ্যাডাম স্মিথ অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে মনে

পুঁজির কাঠামোগত সংকট তার অন্তর্নিহিত আপন সীমাবদ্ধতার সঙ্গে বিরোধের বহিঃপ্রকাশ। সামাজিক রূপান্তর নিয়ন্ত্রণ করার একটি ব্যবস্থা হিসেবে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খায় এমন বাহ্যিক কিছু সাহায্যও যতদূর সম্ভব নেওয়া যেতে পারে। পুরো বিশ শতক ধরে বিপরীত ধরণের গল্পগাথা এর সম্পর্কে চালু থাকলেও পুঁজি-ব্যবস্থাকে যে এ ধরণের ব্যবস্থা-বহির্ভূত সাহায্য নিতে হচ্ছে, তা সবসময়েই এই ইঙ্গিত দেয় যে এই ব্যবস্থার চরম অকার্যকারিতা দূর করতে হলে পুঁজির অর্থনৈতিক নিষ্কাশন ও উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎ করার স্বাভাবিক পদ্ধতি থেকে আলাদা কিছু কৌশল চালু করতে হবে। ফলে যা হয়েছে, ক্রমবর্ধমান সংকট থেকে উদ্ভূত ভবিষ্যত পরিণতির বিপরীতে গিয়েও বিংশ শতাব্দীর প্রায় বেশিরভাগ সময়েই পুঁজিকে সংকট মোচনের প্রশাসনিক দাওয়াই হজম করতে হয়েছে। বস্তুত, কিছু সমুন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে এবং কেবলমাত্র সেই দেশগুলিতেই—পুঁজির সবচেয়ে স্পষ্ট ও সফল আধিপত্য বিস্তারের পর্ব জয়োল্লাসের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে যুদ্ধ পরবর্তী কেইনসীয় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দশকগুলিতে।

পুঁজি ব্যবস্থার কাঠামোগত সংকটের তীব্রতা সমাজতন্ত্রীদের এক বড় ধরণের রণকৌশলগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং একই সঙ্গে সে চ্যালেঞ্জের সমাধানের কয়েকটি নতুন সম্ভাবনাও তৈরি করেছে। এখানে অবশ্য এ কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা দরকার যে বিকাশের প্রথম যুগে পুঁজি ব্যবস্থার স্বাভাবিক ও সুস্থ চলনশীলতা বজায় রাখতে চূড়ান্ত 'রাজনৈতিক বাহ্যিক সাহায্যে'র ভূমিকা কার্যকরী শুধু নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও ছিল (অষ্টম হেনরী ও অন্যান্যদের প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস যার উল্লেখ করেছেন)। বিশ শতকে এই 'বাহ্যিক সাহায্যে'র ধরণটা এরকম থাকেনি, কিন্তু তা যতই বহুল পরিমাণে এবং বিচিত্র পথে আসুক না কেন, তা আমাদের এ কালে এই ব্যবস্থার স্থায়ী দৃঢ়তা ও অবিনাশী জীবনশক্তি সুনিশ্চিত করার কাজে এই ধরণের সমস্ত সাহায্যই যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়নি। বাস্তবে যা ঘটেছে তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশ শতকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সামাজিক পুনরুৎপাদনের ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজির সংকরায়নকে আরও ঘনীভূত করেছে এবং তার ফলে ভবিষ্যতের গর্ভে আরও অনেক সমস্যা জমা করেছে। আগামী দিনগুলিতে পুঁজির কাঠামোগত সংকট—যা এখন বাহ্যিক সাহায্যের অপ্রতুলতা হিসেবে বার বার নিজেকে জাহির করছে—গভীর থেকে গভীরতর হতে বাধ্য। এই সংকটের অভিঘাতে সারা পৃথিবী জুড়ে কম্পন উঠতে বাধ্য, এমনকী বিশ্বের প্রত্যন্ত কোণেও তার আলোড়ন উঠবে; বস্তুগত পুনরুৎপাদন সংক্রান্ত বিষয় থেকে শুরু করে সর্বাধিক চর্চিত বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনা—জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকেই এই সংকট নাড়া দিয়ে যেতে বাধ্য।

একথা নিশ্চয়ই সত্য যে ইতিহাসের নিরিখে কোনও পরিবর্তনকে স্থায়ী হয়ে থাকতে হলে তাকে প্রকৃতই একটি যুগান্তকারী রূপান্তর হতে হবে—তার অর্থ এই যে আমাদের দায়িত্ব হল সামাজিক রূপান্তরের ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজির সীমা অতিক্রম করে যেতে হবে। সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে পুঁজির নিজস্ব যে ভূমিকা ছিল এটা তার থেকেও অনেক বৃহত্তর ও কঠিন দায়িত্ব। কোনও অজ্ঞাত নিয়ন্ত্রক শক্তির অধীনে নানা সাংগঠনিক স্তরে বিন্যস্ত শ্রমের অধীনতাকে বিলুপ্ত না করে পুঁজির সীমা অতিক্রম করা অসম্ভব। উদ্বৃত্ত শ্রম নিষ্কাশন ও আত্মসাৎ করার কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বদলে দিলেই এ কাজ সম্পন্ন হবে না—যদিও অতীতে এরকমই সবসময় ঘটেছে।

পুঁজির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে নানা রূপে—কখনও ব্যক্তি পুঁজিপতি হিসেবে, কখনও বা এ যুগের নৈতিকতার অনুশাসনে; উগ্র দক্ষিণপন্থী তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে

উত্তর-ধনতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র পর্যন্ত। পুঁজির শাসন আরও মসৃণভাবে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে তা কখনও শ্রমদরদীর পোষাকে সজ্জিত হয়ে রাজনৈতিক কপটচারের আশ্রয় নিতে পারে— যেমন ইংল্যান্ডে চলছে নয়া শ্রমিক দলের শাসন। এ ধরনের কোনও কৌশলেই পুঁজি ব্যবস্থার সাংগঠনিক সংকট দূরীভূত করতে পারে না এবং সামাজিক রূপান্তরের ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজির বিপরীতে শ্রমের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাকে বাতিল করতে পারে না। এর ফলেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে পুনর্বিন্যস্ত করে একটি আপোষহীন গণসংগ্রাম হিসাবে গড়ে তোলার কাজ এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব হিসেবে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। আগামী দিনে নিকট ভবিষ্যতে পুনরুজ্জীবিত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রায়োজনীয় লক্ষ্য ও অন্তবর্তীকালীন দায়িত্ব হচ্ছে ঃ শ্রমের শিল্প সংশ্লিষ্ট বাহু (ট্রেড ইউনিয়ন) এবং রাষ্ট্র সংক্রান্ত বাহু (ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজনৈতিক দল) এ দুয়ের মধ্যে যে দুঃখজনক ব্যবধান শ্রমকে নিরস্ত্র ও দুর্বল করছে তার অবসান ঘটানো; এবং পার্লামেন্টারীয় খেলার ভণ্ড গণতান্ত্রিক শাসনের সুবাদে উৎপাদকশ্রেণীর উপর ক্রমশ যে ক্ষতিকর শর্তগুলি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়ার চেয়ে রাজনৈতিক সচেতনতায় উদ্দীপ্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা। বিশ্বায়িত পুঁজির বিশ্বজনীন ধ্বংসাত্মক শক্তির কাছে আবহমানকাল নতজানু হয়ে থাকা বস্তুত কোনও বিকল্প পথই নয়।

সহায়কপঞ্জী

১। Marx, Grundrisse, পৃঃ ২৭৮।

২। সবকিছুর উপর, জমি এবং শ্রম উভয় ক্ষেত্রে কেনা বেচার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে এভাবেই সব ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার জয়যাত্রাকে সুনিশ্চিত করা হল।

৩। পশ্চাদপদ অর্থনীতিতে বিরাট সংখ্যক মানুষ কোনও মতে টিকে আছে (যদি সত্যিই টিকে থাকা বলা যায়) কোনও মতে গ্রাসাচ্ছাদন করে এবং যারা সর্বতোভাবে প্রান্তিক বিন্দুতে পৌঁছে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনওরকম কাজ পাওয়ার আশায় — বেশিরভাগটাই বৃথা আশা — বসে থেকে কিছুই উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে না। '১৯৯৩ সালে যখন কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিবদ্ধ বেকারের সংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ, প্ল্যানিং কমিশনের মতে ঐ একই বছর কর্মনিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা হল ৩০ কোটি ৭৬ লক্ষ। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির শতকরা হার খুবই নগণ্য।' — সুকোমল সেন, Working Class of India, History of Emergence and Movement : 1830-1990, K.P. Bagchi & Co., Calcutta, 1997, পৃঃ ৫৫৪।

৪। Paul Sweezy and Harry Magdoff অনেকবার মূলধন গঠনের স্থায়ী সংকটকে একটি গভীর কাঠামোগত সমস্যা হিসেবে দেখিয়েছেন।

৫। Hegel, The Philosophy of History, পৃঃ ৩৯।

৬। Hegel, The Philosophy of Right, পৃঃ ২২৩।

৭। Hegel, The Philosophy of Right, পৃঃ ২১৪।

ভাষান্তর ঃ জয়ন্ত আচার্য এবং আশিস গুহ

---

*লেখকের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত মূল নিবন্ধটির শিরোনাম **'The Uncontrollability and Destructiveness of Globalizing Capital'**।*

বিশ্বায়নের বিপদ

এডোয়ার্ড এস. হারমান

বিশ্বায়ন হল আসলে দেশীয় সীমানার উর্ধ্বে শিল্প কর্পোরেশনের প্রসারতা এবং আন্তঃসীমাভিত্তিক অর্থনৈতিক সুবিধা ও সম্পর্কের এক সংযুক্ত প্রক্রিয়া যা ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দ্রুত পরিণতি লাভ করছে। সমস্ত বিশ্বজুড়ে মতাদর্শ হিসেবে একে গ্রহণযোগ্য করে তোলার যে প্রচেষ্টা তার পেছনে ক্রিয়াশীল মুক্তবাণিজ্যের দর্শন। এই মুক্তবাণিজ্যের অশ্বমেধ ঘোড়াকে বাধামুক্ত করতে এর অনুসারি কিছু দর্শনকেও বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছে যেকোনো রকম প্রতিরোধ-শক্তিকে প্রশমিত করার জন্য। জোর প্রচেষ্টা চলছে এক জনহিতকর অর্থনীতি হিসেবে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতিকে জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠা দেবার।

যখন বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাণিজ্য (free trade) তত্ত্বদ্বয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক বলে মনে হয় এবং এই উভয় প্রক্রিয়াই যে ধরনের রাজনৈতিক অর্থনীতির সহায়ক হয়ে ওঠে, সেখানে প্রগতিশীলতাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি এই প্রক্রিয়ার দ্বারা লাভবান এবং গতি লাভ করে চলেছে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কিন্তু আবার এর পাশাপাশি এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার স্পর্শকাতরতাকে নিশানা করে তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জাতীয় রাজনৈতিক স্তরে এবং আঞ্চলিকস্তরে এর বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত করার পরিকল্পনা করতে পারলে উন্নততর পারস্পরিক বোঝাপড়া সাপেক্ষে বৃহত্তর বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে।

বিশ্বায়ন হলো বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট-কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত যাবতীয় তত্ত্বসমূহের অন্যতম। অন্য প্রাসঙ্গিক তত্ত্বগুলি হল মূলত দেশীয় সরকারের ক্ষমতা খর্ব, যে কোনো প্রকার অ-নিয়ম, বাজেটের ভারসাম্য, সামাজিক স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং মুক্ত বাণিজ্য।

মুক্ত বাণিজ্যের মতো বিশ্বায়ন শব্দটির মধ্যেও এক ধরনের উৎকর্ষের সুগন্ধ পাওয়া যায়। যেমন 'স্বাধীনতা' সবার কাছেই প্রিয়, তেমনই বিশ্বায়ন যেন আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং বিশ্বব্যাপী দেশগুলির মধ্যে বেশ একটা সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের ইঙ্গিত করে, যাকে নিতান্তই নঞর্থক জাতীয়বাদের বিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু মূলধারার পণ্ডিত এবং অর্থনীতিবিদরা এই সম্ভাবনাটি ভেবে দেখেননি যে আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য (Cross-border trade) এবং বিনিয়োগ

প্রক্রিয়া কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক হতে পারে অথবা সবল বা দুর্বল যে কোনো দেশের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ধ্বংস করতে পারে।[১] এটাও মূলধারার তত্ত্বে কেউ ভাবেননি যে একদিকে মুক্তবাণিজ্য ও বিশ্বায়নের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অন্যদিকে Protectionism বা রক্ষণবাদ আসলে অধিজাতিক শিল্প সংস্থার (Transnational Corporation) অস্তিত্ব ও অধিকার বনাম গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক সামাজিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার লড়াই।

মতাদর্শের নিরিখে বিশ্বায়ন শুধুমাত্র স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিকতাবাদকেই বোঝায় না, এছাড়া মুক্ত বাণিজ্যের সুফল অর্জনে সাহায্য করে এবং সেই লক্ষ্যে দেশের তুলনামূলক সুবিধা (Comparative Advantage), উৎপাদন এবং সামগ্রিক ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। এইসব আদর্শগত উৎকর্ষের কারণে এবং পাশাপাশি দেশীয় সরকারগুলির সামগ্রিক প্রগতি অর্জনে অক্ষমতার অভিযোগক্রমে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে সবাই মানব নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে বলে মনে করছেন, যা এর বিরুদ্ধে যে কোনো প্রতিরোধকে আরও দুর্বল করে দিচ্ছে।

বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ব্যর্থতা

যেহেতু বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে কর্পোরেট এলিটদের এবং তাদের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, সেইজন্য তারা প্রথম থেকেই অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পৃথিবীতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অনিবার্যতা এবং প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের কথাই প্রচার করে এসেছেন। এটাই সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর। যদি সাময়িকভাবে এই বণ্টন ব্যবস্থার কথা বাদও দেওয়া যায়, তা সত্ত্বেও অর্থনীতির সামগ্রিক ফলাফলের নিম্নমুখী উৎপাদন হার, উৎপাদনশীলতা এবং বিনিয়োগের নিম্নগামিতা এই সবই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা সূচিত। পুঁজির বাজারের ক্রমবর্ধমান উদ্বায়ী চরিত্র, অনিশ্চয়তা এবং বর্ধিত ঝুঁকির পাশাপাশি এই নতুন আর্থিক গতিময়তা এবং অর্থ শক্তির যুগে প্রকৃত সুদের হার (real rate of interest) অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

G-7 দেশগুলির গড় সুদের হার ১৯৭১-৮২ সালে ০.৪ শতাংশ থেকে ১৯৮৩-৯৪ সালে ৪.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[২] এই ঘটনা যে কোনো ক্ষেত্রেই নতুন কারখানা, মেশিন, যন্ত্রপাতি এবং পুরনো যন্ত্রের বদলে নতুন অত্যাধুনিক যন্ত্রের জন্য দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে; পক্ষান্তরে সব রকমের ফাটকা কার্যক্রম, আর্থিক অরাজকতা, অনিয়ম প্রভৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ফলে দেশীয় উৎপাদনের সামগ্রিক হার লক্ষণীয়ভাবে নিম্নগামী হয়ে পড়ছে। যেমন Organization for Economic Co-operation and Development বা OECD সংস্থাভুক্ত সদস্য দেশগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উৎপাদনের হার ১৯৬০-৭৩ সালের ৩.৩ শতাংশ থেকে ১৯৭৩-৯৫ সালে ০.৮ শতাংশে নেমে এসেছে এবং সেই সঙ্গে মোট স্থায়ী বিনিয়োগের হারও ১৯৫৯-৭০ সালে ৬.১ শতাংশ থেকে ৩.১ শতাংশে নেমে গেছে।[৩] মোট দেশীয় উৎপাদনের হার ১৯৫৯-৭০ সালে ৪.৮ শতাংশ থেকে নেমে গিয়ে ১৯৭১-৯৪ সালে ২.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কর্পোরেট এলিট বা অভিজাতরা উৎপাদনের উন্নয়নের এই নিম্নগামিতা এবং মন্দা সত্ত্বেও ফল ভালই করল, বিশ্বায়নের দ্বারা কর্মীবেতন হ্রাস, আবার সুদের হার বৃদ্ধি এবং সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদের শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতির সুফল পৌঁছলো তাদের হাতে। কিন্তু বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে এর ব্যাখ্যা কিন্তু অন্যরকম। দেশীয় এবং আন্তর্দেশীয় ক্ষেত্রে আয়ের

অসাম্য বৃদ্ধি পেল লক্ষণীয়ভাবে। খোদ আমেরিকাতেই উৎপাদনের হার ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তী বছরগুলিতে ব্যক্তি আয়ের গড় হার অনেকটাই নেমে গেছে। সঙ্গে ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বেকারি, চাকরির নিরাপত্তাহীনতা, সুযোগ সুবিধা হ্রাস এবং একপেশে উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রচুর শ্রমিক বাড়ানোর উদ্যোগ।[৪] যেমন ১৯৯৭ সালে জনপ্রতিনিধি সভায় অ্যালান গ্রিনস্প্যান তাঁর আত্মতুষ্ট ভাষণে বলেন যে এখানে কর্মীবেতন হার বদ্ধজলায় আটকে আছে, কর্মীদের নিরাপত্তাহীনতাও যথেষ্ট।[৫] কিন্তু সত্যিই যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত কর্মী তাদের গ্রিনস্প্যান বা জনপ্রতিনিধি সভা বা মূলধারার গণমাধ্যমের বক্তব্য কোনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

বিশ্বে সবচেয়ে ধনী ও দরিদ্র দেশে বসবাসকারী পৃথিবীর ২০ শতাংশ জনগণের আয়ের ফারাক ১৯৬০ সালে '৩০ ঃ ১' থেকে ১৯৯৫ সালে '৮২ ঃ ১' তে বেড়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে তৃতীয় বিশ্বই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশে গত কুড়ি বছরে মাথা পিছু আয় হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। প্রায় ৩০০ কোটির বেশি লোক, সংখ্যাতত্ত্বে পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ দিনে দুই ডলারের মধ্যে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং প্রায় ৮ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভোগেন।[৬] তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বেকারি, কর্মহীনতা, দারিদ্র্য, এসবই আকাশছোঁয়া এলিটদের সঙ্গে সহাবস্থানে রয়েছে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বছরে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ কাজের আশায় উত্তরে পাড়ি দেয় বা পাগলাগারদে ভর্তি হয়, আর এখানকার সরকারগুলি এতৎসত্ত্বেও বিদেশী বিনিয়োগের বেপরোয়া পথ ধরে চলেছে, কারণ তাদের কোন বিকল্প পথ নেই।[৭]

দুনিয়াজুড়ে এই নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য বিশ্ব অর্থনীতির অধুনা উদ্বায়ী অবস্থা এবং তৃতীয় বিশ্বের আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে ঘনিয়ে ওঠা সামগ্রিক ঋণগ্রস্ততার সংকটকে দায়ি করা হয়, কারণ তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট তখন থেকে ক্রমাগতভাবে খারাপের দিকে যাচ্ছে। ধারাবাহিক বেসরকারিকরণ, অসংগঠিত আর্থিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, ক্রমাগত বিশ্বজুড়ে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক ধ্বংসের পথকে সুগম করেছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিশ্বের অর্থনৈতিক এলিট বা অভিজাতরাই একে অর্থনৈতিক সাফল্য বলে বর্ণনা করছেন।

বিশ্বায়ন ঃ গণতন্ত্রের উপর আঘাত

গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বের মানুষ কখনই একে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক চাহিদা বলে মেনে নেয় নি। কারণ গোটা প্রক্রিয়াটাই আসলে ব্যবসা-ভিত্তিক বাণিজ্যিক-পরিকল্পনা এবং পরিচালন ব্যবস্থা প্রসূত একটা বিশেষ ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রয়োজনে নির্মিত। সরকারগুলি ক্রমান্বয়ে কার্যনীতি এবং কার্যপ্রণালী প্রণয়নের মাধ্যমে, প্রায়শই গোপনে বড় বড় কার্যনীতি গ্রহণ করে এবং জাতীয়ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনা প্রভৃতি ব্যতিরেকে গোটা প্রক্রিয়াটির কাঠামো সমাজের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এই পর্যায়ে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগমনের পথে যে সব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে NAFTA (North American Free Trade Agreement) এবং EMU (European Monetary Union) প্রভৃতি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠার দ্বারা জনগণের কাছে বিপুল প্রচার কর্মসূচীর মাধ্যমে অভিজাত শিল্প মহল বিশ্বায়নকে জোর করে উপস্থাপন করেছে।

যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃত জনমত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সাধারণ জনগণ NAFTA এবং সমগোত্রীয় এই মুক্তবাণিজ্য গোষ্ঠীগুলির প্রকৃত অবস্থানের বিপক্ষে মতপ্রকাশ করেছে,

যদিও গণমাধ্যমগুলি এই প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ সমর্থন জানিয়েছে[৮] এবং সেই কারণে এটা জনসমর্থন ব্যতিরেকেই পাশ হয়ে যায়। যেমন ইউরোপেও অধিকাংশ জনমতই ইউরো (Euro) প্রবর্তনের বিপক্ষে মতপ্রকাশ করলেও শুধুমাত্র শক্তিশালী এলিটদের সমর্থনের জোরে এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ফলে শুধুমাত্র এলিটদের স্বার্থরক্ষার কাজে একে ব্যবহার করার জন্য গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সংঘটিত করানো হচ্ছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এইভাবে গোটা গণতান্ত্রিক কাঠামোকেই দুর্বল করে তুলেছে, কিছুটা পরিকল্পনার অভাবজনিত কারণে এবং কিছুটা শ্রমমূল্য ও জনকল্যাণ সূচকের নিম্নগামিতাকে হাতিয়ার করে, যাতে ব্যবসায়ী সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে এবং আপামর জনসাধারণের চাহিদাকে গ্রহণ করার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে বা সদিচ্ছাকে নির্মূল করতে পারে। এইরকম উদ্দেশ্য প্রণোদিত, পরিকল্পনা বহির্ভূত কার্যপ্রণালীর সংমিশ্রণ সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি আক্রমণাত্মক কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যায়।

অধিজাতিক সংস্থাগুলির (Transnational Corporation বা TNC) কার্যকলাপের মধ্যে যে উদ্দেশ্যগুলি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল তৃতীয় বিশ্বের সস্তা শ্রমের উৎসগুলিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা। এখানকার শ্রম সাধারণত খুবই সস্তা হয় এবং মালিকদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াই করে সমস্যা সৃষ্টি করবার সুযোগ কম থাকে। কোনো কোনো ক্ষমতাশালী দেশ আবার বিদেশী পুঁজির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই ব্যবসায় অনুপ্রবেশ করে এবং যথারীতি শ্রমিক সংঘের কার্যকলাপকে নিষিদ্ধ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ সুহার্তোর ইন্দোনেশিয়া আর তৎকালীন মেক্সিকোর নাম করা যেতে পারে। এইভাবে বিশ্বের পুঁজি দামি থেকে কমদামি অঞ্চলে ইচ্ছেমতো বিনিযুক্ত হয়ে চলে উপরোক্ত দেশগুলিতে আর এভাবেই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া গণতন্ত্রকে দুর্বল করে, তাকে প্রাণদণ্ড দেয়।

বহির্বিশ্বে পুঁজির এই স্থান পরিবর্তন এবং দেশীয় প্রেক্ষাপটে এই কঠিন দর, আসলে শ্রম এবং শ্রমের মূল্যকেই দুর্বল করে দিচ্ছে। এছাড়াও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কঠোর সরকারি নীতিসমূহ এবং কঠোর বাজেটনীতিও মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলেও শ্রমের মূল্য যেমন কমে যাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে এর ফলে বাড়ছে ভয়াবহ বেকারি। এর সমাধানকল্পে শ্রম বাজারকে (labour market) আরও উদার করে দেওয়া হলেও মূলত কর্পোরেট বা শিল্প সংস্থাগুলির শ্রমবিরোধী নীতিই আসলে প্রতিফলিত হল। সংগঠিত শ্রমের ক্ষেত্রে আঘাত বা আক্রমণটা অনেক বেশি তীব্র এবং প্রত্যক্ষ। রেগান এবং মার্গারেট থ্যাচার ইউনিয়ন বা সংগঠনের অস্তিত্বকেই বিনাশ করার কাজে যুক্ত ছিলেন এবং বিশেষ করে দ্বিতীয়জন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে শ্রমশক্তিকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে অনেকবেশী সক্রিয় ছিলেন।[৯] বহুত্ববাদী তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রম সংগঠনের মতো মধ্যমবর্গীয় (intermediate) গোষ্ঠীর অস্তিত্বই কিন্তু গণতন্ত্রের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। ফলে এই গোষ্ঠীগুলিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দুর্বল করে তোলার এই প্রক্রিয়ায় আসলে গণতন্ত্রই আক্রান্ত হল।

শুধু তৃতীয় বিশ্বে নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা এবং অন্যান্য উন্নত দেশেও এই ব্যবসায়িক সম্প্রদায় তাদের মতবাদকে কেন্দ্র করে প্রচার অভিযান শুরু করেছে। তাদের পছন্দের প্রকল্পগুলিকে সমগ্র বিশ্ববাসীর পছন্দের বিষয় করে তোলার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের মতবাদের স্রোত। মানুষের সামনে তারা তাদের নয়া উদারনীতির তত্ত্বকে প্রায় ঠেলে হাজির করছে, যাদের বক্তব্য হল বাজার এবং একমাত্র বাজারই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। বাজারই সব কিছু করতে পারে। দেশের সরকার একটা বোঝা

ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বেসরকারিকরণ তথা অনিয়ন্ত্রণ সহজাত ভাবেই শ্রেয় এবং অনিবার্য। এই মতবাদ একটা চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রতি জোর দেয়। বিষয়টি বহুজাতিক শক্তির কাছে খুবই সুবিধাজনক কারণ এই মতবাদ বড় বড় উৎপাদন সংস্থা আর একা হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর মধ্যে দরকষাকষির জন্ম দেয়। যথেচ্ছ ব্যবসাবৃদ্ধি এবং মুক্তবাজারের অস্থিতিশীলতার কারণে বিভিন্ন ধরনের উপজাত বস্তুর সৃষ্টি হয়। যৌথসম্প্রদায়গত মূল্যবোধ, বহিরাগত চাপ, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি হল সেই উপজাত বস্তু যাদের নিয়ে চিন্তাভাবনা আপাতত স্থগিত রয়েছে। এই মতবাদ বহুলভাবে প্রচারিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত একটা মোটা অঙ্কের টাকা কিছু বুদ্ধিজীবী এবং জাতীয় ও বাণিজ্যিক বিষয়ক পরামর্শ দান তথা নতুন ভাবধারা যোগানের প্রতিষ্ঠানগুলোকে (Think Tanks) খাওয়ানো হচ্ছে। তারা স্বভাবতই বিভিন্ন গণ-মাধ্যমগুলির মাধ্যমে এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষে অকৃপণ ভাবে মত প্রকাশ করেছে। হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের নেতা এডউইন ফালনার এই বিষয়ে বলেছেন যে, বিশ্বজুড়ে জাতীয় ও বাণিজ্যিক বিষয়ে পরামর্শ দানের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগাযোগ এবং তাদের অর্থনৈতিক বহুজাতিক কৌশল অনেকটা 'প্রকটর অ্যান্ড গ্যাম্বেল' কোম্পানির সাবান বিক্রির বিজ্ঞাপনের মত। বিজ্ঞাপনের মত সমস্ত বাজার ছেয়ে ফেলে একটাই বার্তায় যা আর্থিকভাবে অসহায় ও দুর্বল মানুষের সমস্ত বিষয়কেই চাপা দিয়ে দেয়।[১০]

বিশ্বায়ন গণতন্ত্রের মধ্যে চূড়ান্ত দুর্নীতির সূচনা করেছে। মুক্ত বাজারের দোহাই দিয়ে সমস্ত রকম চিন্তাভাবনা ও ধারণাকে কিনে ফেলেছে অর্থাৎ ধারণার ক্ষেত্রে মুক্তবাজারের বিষয়টিও অর্থহীন হয়ে পড়ছে।

বিশ্বায়নের মদতপুষ্ট এই ব্যবসায়িক সম্প্রদায় সরকারগুলির উপর আধিপত্য করার জন্য বিভিন্ন রকম জোরালো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারগুলির জনসেবা করার ক্ষমতার সীমারেখা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষমতার নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে মুনাফা বৃদ্ধি করা এবং শ্রমশক্তিকে দুর্বল করাই এদের প্রচেষ্টার মুখ্য বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে। আর নির্বাচনের সময় এদের ব্যবসার টাকার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা। বিল ক্লিন্টন নির্বাচনের সময় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে যে প্রচুর অর্থ পেয়েছেন এটা সর্বজনবিদিত এবং একচেটিয়া ভাবে তাঁদেরই স্বার্থসিদ্ধি করেছেন। আর অব্যবসায়িক নির্বাচন কেন্দ্রগুলির জন্য নামমাত্র ব্যবস্থা নিয়েছেন। বহুজাতিক গণমাধ্যমগুলি তাদের বর্ধিত শক্তিকে ব্যবহার করে নয়া উদারনীতির মতবাদ প্রসার ঘটানোর কাজ করছে। ব্রিটেনের গত সাধারণ নির্বাচনে 'মার্ডক এফেক্ট' এবং বর্তমানে টনি ব্লেয়ার ও রূপার্ট মার্ডক বোঝাপড়া তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসাবে প্রতীয়মান।[১১]

ফলে বিশ্বায়িত গণমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (IMF) প্রভৃতির সাহচর্যে বিশ্বের বৃহৎ শিল্প কর্পোরেশনগুলি বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পিছু হটিয়েছে[১২] এবং সেখানকার গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দলগুলিকে বাধ্য করেছে এই নয়া উদারনীতিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকার প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করতে। ফলত এই দেশগুলিতে সাধারণ নাগরিক অধিকার, সাধারণ নির্বাচন এবং সার্বিকভাবে গণতন্ত্র ক্রমশ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।[১৩]

বিশ্বায়নের প্রবক্তরা দাবি করেন যে মুক্তবাণিজ্যই হল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একমাত্র রাস্তা। কিন্তু আলোচনায় এর আগেই এসেছে যে এটি উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে অসফলই শুধু নয় এ সমাজকে ধ্বংস করার এক হাতিয়ার। কোনো বড় রকম সরকারি ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে

ক্ষুদ্রশিল্প বা চাষে সরকারি সংরক্ষণ ছাড়া অতীত বা বর্তমানে কোনো দেশই সমৃদ্ধির মুখ দেখেনি। এই বিশ্বায়নের সমস্ত প্রচার প্রবক্তরাই প্রকৃত অর্থে ভ্রান্ত ও মিথ্যা। পৃথিবীর ক্ষমতাশালী দেশগুলির মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান; প্রত্যেকেরই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে সরকারি সুরক্ষা ছিল প্রধান হাতিয়ার। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং নাফটা (NAFTA)-কে ব্যবহার করে বহুজাতিক সংস্থাগুলো এই সুরক্ষার বেষ্টনী থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে চাইছে। এই মুক্তবাজার আসলে সেই নিরাপত্তা ও উন্নয়নের সুরক্ষা কবচকে ধ্বংস করা। এই দেশগুলিতে এখন সবথেকে বেশি জরুরি সরকারি নির্ভরতা ও সংরক্ষণ, সংখ্যাগুরু জনগণের সুরক্ষা, নতুন মুক্ত বাজার ব্যবস্থার আক্রমণ থেকে মানুষকে বাঁচানো।

পরিশেষ

পরিশেষে এ কথা বললে নিশ্চয়ই অতিকথন হবে না যে সাম্প্রতিককালে জনগণ এক গণতন্ত্র-বিরোধী প্রবল প্রতিবিপ্লবের মধ্যে বাস করছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি সুকৌশলে উচ্চ শ্রেণীর নাগরিকদের আধিপত্যবাদের পক্ষেই সক্রিয়। এই প্রক্রিয়া যেহেতু সংখ্যাগুরু মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে ফেলেছে তাই এই পদ্ধতির গর্ভেই অবস্থান করছে তার ধ্বংসের বীজ। শুধু তাই-ই নয়, অনিয়ন্ত্রিত, দ্রুত মুনাফার লিপ্সা নষ্ট করছে পরিবেশগত ভারসাম্য। প্রকৃত গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করবার মাধ্যমে অচিরেই রোধ করা প্রয়োজন এই ধ্বংসাত্মক বিশ্বায়নের বাণিজ্যযাত্রা ।

সহায়কপঞ্জী

১) বিশদ জানার জন্য এলেন উডে'র (Ellen Wood) 'Globalization or Globaloney?', Monthly Review, Feb 1997-এ প্রকাশিত; উইলিয়ম ট্যাবের (Willam Tabb) 'Globalization is An Issue, the Power of the Capital is the Issue' (Monthly Review, June 1997 তে প্রকাশিত); লিন্ডা ওয়েসের (Linda Waiss) 'The Myth of the Powerless State' (Cornell, 1998 তে প্রকাশিত)। এছাড়া Richard DuBoff এবং Edward Herman এর 'A Critique of Tabb on Globalization' (Monthly Review, Nov. 1997 তে প্রকাশিত) দ্রষ্টব্য।

২) এই পরিচ্ছেদের তথ্যাবলী Dean Baker সম্পাদিত 'Globalization and Economic Policy' (Cambridge University Press থেকে 1998 তে প্রকাশিত) পুস্তকের David Felix এর নিবন্ধ 'Asia and the Crisis of Financial Globalization' থেকে নেওয়া হয়েছে।

৩) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি মূলত শ্রমের বৃদ্ধি এবং মূলধনের উৎপাদনশীলতার ভারপ্রাপ্ত গড় (Weighted Average)।

৪) Kim Moody র লেখা 'Workers in A Lean World' (Verso-1997) এর অধ্যায়-৫ দেখুন।

৫) ২২শে জুলাই ১৯৯৭ এর কংগ্রেসে আর্থিকনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রিনস্প্যানের বিবৃতি।

৬) Ignacio Ramonet এর 'The Politics of Hunger', দ্রষ্টব্য।

৭) লাতিন আমেরিকার অনিয়ন্ত্রিত মূলধনী স্রোতের বিষয়ে David Felix এর 'Debt Crisis Adjustment in Latin America : Have the Hardships been Necessary?' (Washington University), এবং Edward Herman এর 'Mexican Meltdown", Z Magazine, দ্রষ্টব্য।

৮) মার্গারেট থাচারের 'The Downing Street Years' (Harper/Collins, 1993, page 676) দেখুন।

৯) এই অংশের জন্য Alex Carey রচিত 'Taking the Risk Out of Democracy' (University of New South Wales, 1995), Page 106-7 দ্রষ্টব্য।

১০) লেবার পার্টির প্রধান টনি ব্লেয়ারকে কানাডাবাসী পিটার কুর্ক (যিনি বিভিন্ন ব্যবসা সংক্রান্ত লেখালেখি করেন) 'থ্যাচার তত্ত্বের রক্ষাকর্তা' বলে ডিসেম্বর ১৯৯৭-তে বিবৃত করেছেন। টনি ব্লেয়ার অস্ট্রেলিয়ায় রুপার্ট মার্ডককে (Rupart Murdoch) তাঁর সমর্থন পুনর্বিবেচনার জন্য বলেন। রুপার্ট মার্ডক হলেন ব্রিটেনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সংবাদ মাধ্যমের নিয়ন্ত্রক। ব্লেয়ারের তদ্বিরের ফলে ১৯৯৭ এর নির্বাচনে মার্ডক লেবার পার্টির সমর্থনে প্রচার চালান।

১১) সিটিকর্প-এর (Citycorp) প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO) ওয়াল্টার রিস্টন (Walter Wriston) এর লেখা 'Decline of the Central Bankers' (New York Times, Sep, 20, 1992) দ্রষ্টব্য।

১২) William Robinson এর লেখা 'Promoting Poliarchy, U.S Intervention and Hegemony, Cambridge, England', (Cambridge University Press 1996); Jochen Hippler সম্পাদিত 'The Democratisation of Disempowerment', London (Pluto, 1995) এবং Edward Herman-এর 'The End of Democracy?' Z Magazine, Sept.,1993 দেখুন।

১৩) Alice Amsden এর 'Asia's Next Giant' (Oxford, 1989) এবং Robert Wade এর Governing the Market (Princeton, 1990) দ্রষ্টব্য।

ভাষান্তর ঃ আবীর চট্টোপাধ্যায় এবং অনুপমা ঘোষ

'New Politics'-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত মূল রচনাটির শিরোনাম 'The Threat of Globalization।

বিশ্বায়নের ভাষা

পিটার মারকিউজ

'বিশ্বায়নের ভাষা', এই বিষয়টি গভীর মনোযোগ দাবি রাখে। শুরুতেই বলে নেওয়া ভালো যে, 'বিশ্বায়ন' শব্দটি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যথার্থ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ১৯৭০ সালের পরবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া নতুন ধরনের কিছু ঘটনাকে একসাথে, খুব সাদাসিধে ভাবে 'বিশ্বায়ন' নামক একটি তালিকার অন্তর্গত করে দেওয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি, বিমানপথে মাল পরিবহণের বহুল প্রচলন, টাকার বাজারে ফাটকাবাজি, দেশগুলির সীমান্ত পেরিয়ে ক্রমবর্ধমান পুঁজি-প্রবাহ, ডিজনি (কার্টুন) সংস্কৃতির প্রসার, গণ-বিপণন, বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বহুজাতিক কর্পোরেটের শক্তি বৃদ্ধি, নতুন আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমের অবাধ চলাচল, জাতি-রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হ্রাস, উত্তর-আধুনিকতা, ফোর্ড-পরবর্তী উৎপাদন ব্যবস্থা (অ্যাসেম্বলি লাইন প্রোডাকশনের অবসান) — এ সবই 'বিশ্বায়ন' নামক তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

বিষয়টা হল এই যে, একাধিকবার, অসতর্কভাবে কোনো শব্দ ব্যবহৃত হলে, অত্যন্ত চতুরতার সাথে, কারণ থেকে ফলাফলকে পৃথক করার মধ্য দিয়ে এক ধোঁয়াশা তৈরি করা হয়। কি করা হয়েছে, তাকে বিশ্লেষণ করা, কে ঐ কাজ করেছে তা জানা, তদুপরি কেন এবং কি ভাবে সে ঐ কাজ করল, এ সবগুলিকেই গুলিয়ে দেবার চেষ্টায় শব্দের ঐ অসতর্ক ব্যবহারকে চিহ্নিত করা হয়। রাজনৈতিক ভাবে 'বিশ্বায়ন' শব্দটিকে অস্পষ্ট, ভুতুড়ে ব্যাখ্যায় এটা যেন জীবন্ত কোনো শক্তি, মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য, এরকম অযৌক্তিক ভাবে সমীহ করার মত মাহাত্ম্য দেওয়া হয়। ব্যবহারের অস্বচ্ছতা বিশ্বায়ন সম্পর্কিত আলোচনার অন্যান্য উপকরণগুলিকেও ক্লিষ্ট করে তোলে। একথা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কয়েকটি সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমের কথা আলোচনা করা যাক।

বিশ্বায়নের ধারণা সম্পর্কিত আলোচনায় একথা বলবার কোনো অপেক্ষা রাখে না যে এটি পৃথিবীতে একেবারে আনকোরা নতুন কোনো জিনিস নয় বরং তা পুঁজিবাদেরই একটি বিশেষ রূপ। এটা হল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি প্রসারিত রূপ, যা ভৌগোলিক ভাবে সুবিস্তৃত আর মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম। কিন্তু ১৯৭০ সালের পর থেকে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় ঘটেছে, যাদের হামেশাই একসাথে বিশ্বায়নের শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে, এই দুটি বিষয় হল প্রযুক্তির অগ্রগতি ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের

নতুন বিন্যাস। প্রযুক্তির অগ্রগতিকে বিশ্বের কেন্দ্রীভূত আর্থিক ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজটি কিভাবে শ্রেণী সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পেরেছে, তা অনুধাবন করা হল রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও রণকৌশলের বিষয়।

প্রযুক্তির অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন — এই দুটির সংযুক্তি, অনিবার্য নয়। কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার, সংযোগসাধনে গতি এনে দিয়েছে, এবং তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির ফলেই এটি ঘটেছে। এতে একটি কেন্দ্র থেকে বহুসংখ্যক রাষ্ট্রের ওপর খবরদারি, মানুষ ও পণ্যের পরিবহনে দ্রুততা ও দক্ষতা, উৎপাদনের বহুরকম উপকরণ সৃষ্টি এবং প্রাত্যহিক কাজে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সবগুলি উপাদানই কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের জন্য এবং তাকে ক্রমশ বাড়িয়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— এটা আমরা স্বচক্ষে দেখছি।

কিন্তু প্রযুক্তির এই অগ্রগতিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা যেত। অবশ্য সেই উদ্দেশ্যে তৈরি হলে এগুলির ধরনও ভিন্ন হত। প্রযুক্তির অগ্রগতি কথাটির অর্থ হলো, হয় অনেক কম শ্রমে সমান পরিষেবা বা পণ্য উৎপাদন অথবা শ্রমের পরিমাণ বাড়িয়ে, পরিষেবা ও পণ্য উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করা। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ লাভবান হবে, কেননা, তাদের কম পরিশ্রম করতে হবে, অথবা তারা অনেক বেশি সংখ্যক পণ্যের মালিক হবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা এই অবস্থার প্রতিফলন দেখতে পাই না। তার কারণ এটা নয় যে প্রযুক্তিকে ঠিক ওভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না, বরং নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটানো হচ্ছে এবং তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে শুধুমাত্র ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি ও সংহত করার কাজে। শ্রেণীগুলির মধ্যে বর্তমান ক্ষমতায় ভারসাম্য বিনষ্ট করার জন্যই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। ঠিক এই বিষয়টিতেই মনযোগ দেওয়া প্রয়োজন, প্রযুক্তির অগ্রগতির ওপর নয়।

প্রযুক্তির বিশ্বায়ন এবং বিশ্বায়নের প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্যটা খুবই জটিল। শুধু বিশ্লেষণাত্মক ভাবে নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও এই জটিলতা রয়েছে। এর ফলে যে প্রশ্নটা উঠছে তা হল 'যদি এই দুটিকে একেবারে পৃথক করে ফেলা হয়, তাহলে অন্যান্য বিষয়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি হবে?' প্রযুক্তির বিশ্বায়ন এবং ক্ষমতার বিশ্বায়নের সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্তমানে বিশ্বায়নের যে অস্তিত্ব বজায় রয়েছে তার প্রকৃত স্বরূপ যথাযথভাবে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই বিকল্প বিশ্বায়নের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হতে পারে।

বাস্তব ঘটনার বৌদ্ধিক বিশ্লেষণকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে তুলতে ক্ষমতাহীন রাষ্ট্রের অলীক ভাবনাকেও একটা ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। রাষ্ট্রের কার্যপদ্ধতির গুরুত্ব হ'ল এই যে, শিল্পোন্নত দুনিয়ার পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কাজ করতে তা উৎসাহ প্রদান করে এবং ঐ ব্যবস্থা এর ফলেই আন্তর্জাতিক বিস্তার পায়। যদি এরকম দেখা যায় যে কোনো রাষ্ট্র, পুঁজি বা পণ্যের চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করছে না, তবে মনে রাখতে হবে যে সে এটা করতে সক্ষম নয় তা নয়, সে এটা করতে আগ্রহী নয়, এ ধরনের ঘটনা ক্ষমতা ত্যাগের উদাহরণ, ক্ষমতা না থাকার উদাহরণ নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমহল যেভাবে বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা, তার মাশুল চুক্তিসমূহ, সরকারি হস্তক্ষেপে চুক্তিবদ্ধ অধিকারগুলি বলবৎ করা এবং মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণ করার বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে, তার মধ্যে দিয়ে জাতিরাষ্ট্রের অবিরাম এবং ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব প্রতিভাত হচ্ছে।

তার উপরে কেউ কেউ খুব সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শব্দটির প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি-শ্রদ্ধা আরোপ করে থাকেন। তারফলে রাষ্ট্রের সমমাত্রিকতা সম্বন্ধীয় এক ভ্রমাত্মক ধারণা দেখা দেয়। তারই পরিচয় মেলে 'প্রতিযোগিতামূলক

রাষ্ট্র', (অথবা আমার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে 'শহরগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব') বা উত্তর কিংবা দক্ষিণের 'রাষ্ট্রগুলির' কিসে লাভ কিসে ক্ষতি, ইত্যাদি রাষ্ট্রবিষয়ক বাক্যবন্ধ প্রয়োগের মধ্যে। রাষ্ট্র কিংবা শহর সবসময় আভ্যন্তরীণভাবে বহুধাবিভক্ত থাকে। একই রাষ্ট্রভুক্ত কোনো একটি শ্রেণী, গোষ্ঠী বা মহলের পক্ষে যা ভালো তাই অপরাপর অংশের পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। একথা ঠিক যে প্রতিটি সরকারেরই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকে এবং এই নির্দিষ্ট অর্থে রাষ্ট্র বা নগরগুলিকে নিজস্ব স্বার্থের অধিকারী স্বতন্ত্রসত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক নেতা বা আমলাতন্ত্র বা আরো সম্প্রসারিত অর্থে একটি ক্ষমতাসীন সরকারের স্বাতন্ত্র বোঝায়। কিন্তু তার চেয়েও বড় বাস্তবটা হল এই যে সরকারকে বহুমুখী স্বার্থের প্রতি নজর দিতে হয়। এবং বেশিরভাগ সরকারই নির্দিষ্ট কিছু স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই 'জাতীয় স্বার্থ' কথাটি বললে এই স্বার্থের নির্দিষ্টতার বিষয়টি ঢেকে রাখা হয়। আর যদি রাষ্ট্রকে তার অভ্যন্তরে বসবাসকারী সব মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তবে তা হবে বাস্তবকে অস্বীকার করার নামান্তর।

এই অর্থে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর মার্কিন আধিপত্যের কথা বললে— যদিও তা এক অর্থে খুবই গুরুত্বপূর্ণ— আগে খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন কারা এই নীতিসমূহ নির্ধারণ করে এবং কারা এই নির্ধারণ প্রক্রিয়ার বাইরেই থেকে যায়। সিয়াটেল বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে একই কথা প্রযোজ্য। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দক্ষিণ দেশগুলির ব্যক্তিবর্গ অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সরকারের থেকে আশ্চর্যরকম আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। রাষ্ট্র এবং তার জনগণের মধ্যে পার্থকনির্দেশ শুধু রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে আরো বেশি জরুরি। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ক আলোচনায় যাঁরা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন, তারা কোনো সমমাত্রিক সার্বিক রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী নয়, বরং বলা যেতে পারে সব আলোচনাকারীদের স্বার্থের মধ্যেই একটা সমমাত্রিকতা থেকে যায়। এর অর্থ হল আলোচনার টেবিলে উপস্থিত থাকেন বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যমহল ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। তাদের ক্ষেত্রগত পার্থক্য থাকলেও শ্রেণী চরিত্রে তারা অভিন্ন। তাই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভাজন নেই, বিভাজন আছে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। সমমাত্রিকতাও তাই রাষ্ট্রভিত্তিক ধারণা নয়, একটি শ্রেণীভিত্তিক বিষয়।

এই ভাবে বিশ্বায়নের ভাষা, উদ্ভাবকদের হাতে পড়ে, সত্যিকারের যা ঘটছে, তাকে অন্ধকারে মুড়ে দিতে প্রয়াসী। যেমন 'মানব পুঁজি'— কথাটির মধ্যে একটা প্যাঁচ আছে, এর বদলে যদি 'শ্রমিক দক্ষতা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় তবে যথাযথ অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। 'গভর্নেন্স'— শব্দটি যতই মোলায়েম করে বলা হোক না কেন, এটা স্পষ্ট যে এর দ্বারা সরকারের ক্রমহ্রাসমান ক্ষমতা নির্দেশিত হয়। 'ইনভেস্টমেন্ট'— শব্দটি উৎপাদনের প্রসারতা বোঝাতে পারে, অথবা শুধুমাত্র 'স্পেকুলেশন' কে বোঝায়। 'মুক্ত' বাজার মানে এই নয় যে, সেখানে বিনিপয়সায় জিনিস পাওয়া যায়, শব্দটা হওয়া উচিত 'ব্যক্তিগত বাজার' এবং এরা মানুষের যাবতীয় স্বাধীনতা খর্ব করতে উদ্যত। 'রিফর্ম' শব্দটি ব্যক্তিমালিকানার প্রসারতাকে বোঝায়; 'প্রোডিউসার সার্ভিসেস'— শব্দটি 'উৎপাদক' শব্দটি যে সামাজিক অর্থ বহন করে তার সাথে খাপ খায় না। কারণ প্রিন্টার এবং শ্রমিক— যারা মেশিন চালায় তারা উৎপাদক নয় এবং স্টক এক্সচেঞ্জের দালাল মানেও উৎপাদক নয়।

এগুলো শুধু পরিভাষার বিষয় নয়। এবং যাঁরা বিশ্বায়নের বিরোধিতা করছেন তাঁরাও

সর্ববিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন না। এঁদের সব চেয়ে সহজ লক্ষ্য হওয়া উচিত স্বচ্ছতা ও বিশ্বায়ন বিরোধিতায় প্রত্যেকের অংশ নেবার আহ্বান। প্রবলতর উদার মতাবলম্বীরা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাদের বিধি ব্যবস্থার পুনর্গঠন দাবি করছেন। চরমপন্থীরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মৌলিকভাবে চাইছেন হয় এই সংস্থাগুলির সামগ্রিক অবলুপ্তি নয়তো এগুলির পরিবর্তে জাতি-রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে বা পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিক থেকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থা। সিয়াটেলের আলোচনা এখনও জাতীয় স্তরে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে কোনো আন্দোলন পরিকল্পনার সাথে অঙ্গীভূত হতে পারেনি, যেমন, এই কর্মসূচীর অঙ্গীভূত হতে পারত আমেরিকান কংগ্রেসের কাজ সম্পর্কে দাবি, আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে কোনো কথা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধিত্ব বা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর অধীন যে সংস্থাগুলি আছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা। এর বদলে যা হল, তা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপদল, বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কর্মসূচী বিষয়ে নিজেদের মধ্যে চূড়ান্ত মতানৈক্য প্রদর্শন। প্রযুক্তির বিশ্বায়ন এবং ক্ষমতার বিশ্বায়ন সম্পর্কে অতি সতর্ক হয়ে এবং বিকল্প বিশ্বায়নের ধারণা সামনে রেখে, ক্ষমতা বিহীন রাষ্ট্রশক্তির ধারণাকে প্রয়োজনীয় ধরে নিয়ে এবং সমসত্ত্ব রাষ্ট্রের ভুল ধারণাকে বর্জন করে, সকলে যদি একমত হয়ে একটি বোঝাপড়ায় আসেন, তবে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে এবং তার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য কি হবে সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

ভাষান্তর ঃ বিদিশা ঘোষদস্তিদার

লেখকের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত মূল রচনাটির শিরোনাম ***'The Language of Globalization'*** *।*

সাম্রাজ্যবাদ ও বৈষয়িক বিশ্বায়ন

যোসেফ স্টিগলিৎস

সামির আমিন

সুকোমল সেন

মোগেনস বুখ হানসেন

সমুদ্র গুহ

শান্তনু দে

নির্মলকুমার চন্দ্র

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট
অন্দরমহলের অভিজ্ঞতা
যোসেফ স্টিগলিৎস

আমি ১৯৯৬ থেকে প্রায় পাঁচবছর 'বিশ্ব ব্যাঙ্ক' এর প্রধান অর্থনীতিবিদ পদে কর্মরত ছিলাম। ওই সময় আমি দেখেছি বিগত পঞ্চাশ বছরের সবচেয়ে গভীর অর্থনৈতিক সংকটের স্বরূপ। আমি প্রত্যক্ষ করেছি, কিভাবে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আই এম এফ) মার্কিন সরকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কাজ করে। এই সব দেখে আমি সত্যিই বিস্মিত। গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আই এম এফ সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে তাতে মনে করা হচ্ছে যে, এই সংস্থা নিজের ইচ্ছানুসারেই যেন কাজ করে, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থ দেখে — যা তাদের দেখা কর্তব্য। এই সংস্থার কাজকর্ম গোপনে পরিচালিত হয় এবং সেই কারণে তা গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতা থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই আই এম এফ সম্পর্কে যা মনে করা হয়, তাঁরা উন্নয়নের জন্য যে অর্থনৈতিক দাওয়াইয়ের কথা মুখে বলে তাতে প্রতিকার তো হয়ই না, উপরন্তু ক্ষতিই হয়। এর থেকেই সূচিত হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুগভীর বিপর্যয়।

আমার মতে, জাগতিক স্তরে অর্থনৈতিক সংকট ২ জুলাই , ১৯৯৭তে থাইল্যান্ডে শুরু হয়। এর আগে প্রায় তিন দশক ধরে গোটা পূর্ব এশিয়ায় অর্থনৈতিক উত্থান ছিল সত্যিই নজরকাড়া। মানুষের আয় বেড়েছে, স্বাস্থ্যের দিকগুলি উন্নত হয়েছে এবং সর্বোপরি দারিদ্র উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল। পূর্ব এশিয়ার এই সমস্ত দেশে শিক্ষা কেবল সর্বজনীনই হয়নি, বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের মত অন্তত বেশ কয়েকটি বিষয়ে এই সমস্ত দেশের ছেলেমেয়েরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও পেছনে ফেলে দিতে শুরু করেছিল। সবচেয়ে বড় কথা, এই অঞ্চলের একটি দেশও বিগত ৩০ বছরে অর্থনৈতিক মন্দার মুখ দেখেনি।

নয়ের দশকের গোড়া থেকে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে উদারীকরণের সূচনা ঘটে। তাঁদের 'ফিনান্সিয়াল' ও 'ক্যাপিটাল মার্কেট'-এ এই যে উদারীকরণ শুরু হয় তার কারণ কিন্তু মোটেই বেশি বেশি করে পুঁজি আহ্বান করা নয়। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, ওই সময় সেভিংস রেট -এর পরিমাণ ৩০ শতাংশেরও বেশি ছিল। বস্তুতপক্ষে, এই উদারিকরণ ঘটানোর মূল কারণ হলো মার্কিন সরকারের চাপ। এর ফলে, দেশ জুড়ে স্বল্পমেয়াদী পুঁজির আহ্বান শুরু হয়ে গেল, যাতে লগ্নীকৃত পুঁজি, লগ্নীর পরের দিনই, অথবা পরের সপ্তাহ বা নিদেনপক্ষে পরের মাসেই যথাসম্ভব বেশি মুনাফা দিতে পারে। তুলনায় একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে তার

থেকে মুনাফা অর্জন করা যথেষ্টই দীর্ঘমেয়াদী কাজ। তাতে দেখা গেল যে, থাইল্যান্ডে গৃহ নির্মাণ শিল্প হঠাৎ করে ফুলে ফেঁপে উঠল। কিন্তু এই যে বাড়-বাড়ন্ত তা সবাই জানে যে (মার্কিনীরাও এর থেকে বাদ নয়) তা কেবল ক্ষণস্থায়ী নয়, তার পরিণতি হয় মারাত্মক। মনে রাখা দরকার, এই ধরণের পুঁজির আগমন যত বেশি দ্রুততার সঙ্গে ঘটে, এর প্রস্থানও ঘটে তেমনি আকস্মিকভাবে। তাই এই ধরণের স্বল্পকালীন পুঁজির চলাচল সাংঘাতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে।

লাতিন আমেরিকার শেষ দফায় অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল আটের দশকে। সেই সময়, দেশের সরকার যে ধরণের অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে তাতে ব্যাপকহারে মুদ্রাস্ফীতি হয়। সেখানে অবশ্য আই এম এফ সঠিকভাবেই অর্থনৈতিক কৃচ্ছসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। বলা হয়, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশকে যদি আই এম এফ থেকে সাহায্য নিতে হয় তাহলে তার আগে দরকার প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ। এর ফলে, ১৯৯৭তে আই এম এফ থাইল্যাণ্ড-এর উপর একই শর্ত চাপালো। বলা হলো, এই দেশের অর্থনীতির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে সবচয়ে আগে দরকার মিতব্যয়িতা। কিন্তু তাতে কাজ তো হ'লোই না, উপরন্তু সমস্যা পূর্ব এশিয়ার আরও অন্য অনেক দেশেও ছড়িয়ে পড়লো। অথচ, এই সমস্ত দেশে অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পেতে থাকা সত্ত্বেও, আই এম এফ সেই একই নীতি অবলম্বন করে চলতে থাকলো।

আমার মনে হয়, আই এম এফ-এর তরফে এই ধরণের নীতি গ্রহণ করা একটা বড় ভুল। কারণ, লাতিন আমেরিকার দেশগুলির তুলনায় পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে কিন্তু সেই ধরণের বাজেট ঘাটতি ছিল না। যেমন, থাইল্যাণ্ড-এর সরকারের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে উদ্বৃত্ত অর্থ ছিল, যা দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিস্তার ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে প্রয়োজনমত অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশের সরকার যথেষ্ট সুদৃঢ় অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তিতে সরকার পবিচালনা করতে পারছিল, মুদ্রাস্ফীতির হারও ছিল যথেষ্ট কম এবং তা ক্রমনিম্নমুখী। যেমন, দক্ষিণ কোরিয়ায় মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল মাত্র চার শতাংশের মতো। লাতিন আমেরিকার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিল সরকারের অদূরদর্শিতা। কিন্তু পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকটের প্রধান কারণ হ'লো দেশের বেসরকারী ক্ষেত্রের অদূরদর্শীতা। কারণ, এই সমস্ত দেশের অধিকাংশ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মনে করেছিল, মুনাফার মতো সুযোগ যেন কেবল গৃহনির্মাণ শিল্পেই রয়েছে!

আমি মনে করি, পূর্ব এশিয়ায় এই ধরণের এক পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কৃচ্ছ সাধনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার সুযোগ নেই। কারণ, এই ধরণের এক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তাতে অর্থনৈতিক বিকাশে শ্লথতা এবং তার থেকে নানান ধরণের বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। উঁচু হারে সুদের হার, ঋণগ্রস্ত পূর্ব এশীয় কোম্পানিগুলিকে একেবারে শেষ করে দিতে পারে। তার ফলে, এই সমস্ত কোম্পানি কপর্দকশূন্য হয়ে পড়তে পারে, জড়িয়ে পড়তে পারে ভয়াবহ আকারের ঋণগ্রস্ততার জালে। সরকারী পর্যায়ে মিতব্যয়িতা দেশের অর্থনীতিকে আরও পঙ্গু করে তুলতে পারে।

এই কারণে আমি চেষ্টা করতে থাকি, আই এম এফ-এর নীতির পরিবর্তন ঘটাতে। আমি কথা বলি আই এম এফ-এর প্রধান সহকারী পরিচালন অধিকর্তা স্ট্যান্‌লে ফিশার-এর সঙ্গে। আমি বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর উচ্চপদস্থ অর্থনীতিবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের মাধ্যমে আই এম এফ-এর নীতি পরিবর্তনের চেষ্টা করি। কারণ এঁদের মধ্যে অনেকেরই আই এম এফ-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। আমার সেই সময় মনে হয় যে, বিশ্বব্যাঙ্ক-এর এই সমস্ত কর্তা ব্যক্তির

মন পরিবর্তন হয়ত করা সম্ভব। কিন্তু আই এম এফ-এর কর্তাদের নীতি পরিবর্তন করা প্রায় অসম্ভব। যখন আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বোঝাতে চাইছিলাম যে, উঁচু হারে সুদের ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই সুনিশ্চিত হবে এবং তা পূর্ব এশীয় কোম্পানিগুলিতে আরো উদ্বেগ তৈরি করবে, তাঁরা আমার কথা কিছুতেই গ্রহণ করলেন না। তারপর, কোনও যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দেবার পথে না গিয়ে তাঁরা আমাকে বোঝাতে শুরু করলেন এই বলে যে, তাঁদের এই ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছেন খোদ আই এম এফ-এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তাদের পর্ষদ। এই পর্ষদে পৃথিবীর উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থমন্ত্রীরা তাঁদের সদস্য মনোনীত করে পাঠান। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত দেশের টাকাতেই এই সংস্থা চলে এবং এই পর্ষদই বিভিন্ন দেশের আবেদনকৃত ঋণ মঞ্জুর করে। কার্যনির্বাহী অধিকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার বন্ধু। তাঁরা বলেন, আমরা চাপের মুখে পড়ে এই ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতাম। তাই আই এম এফ-এর এই পথভ্রষ্ট নীতি শেষ পর্যন্ত কার নির্দেশে গৃহীত হতে শুরু হয় তা খুঁজে বের করা এক দুরূহ কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে আই এম এফ-এর কর্মীদের ভূমিকা বড়, নাকি কার্যনির্বাহী অধিকর্তাদের — তা সত্যিই আজও আমার আর জানা হয়নি।

অবশ্য মুখে সকলেই অন্য কথাই বলেছেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, আমাদের গৃহীত নীতিতে যদি দেখা যায় যে. পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অর্থনীতি সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে তাহলে তা পরিবর্তন করতে অসুবিধা নেই। কিন্তু এই কথা শুনে আমিও খানিকটা শঙ্কিত হয়ে পড়ি। কারণ, অর্থনীতিবিদরা স্নাতক স্তরের ছাত্রদের যে পাঠদান করেন তাতে বলা হয়, যে-কোনও গৃহীত অর্থনৈতিক নীতির ফলাফল অনুধাবন করতে অন্তত ১২ থেকে ১৮ মাস সময় লেগে যায়। আমি নিজে যখন 'হোয়াইট হাউস'-এ 'কাউন্সিল অফ ইকোনমিক অ্যাডভাইসার্স'-এর চেয়ারম্যান পদে কর্মরত ছিলাম তখন ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা আমাদের অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করতাম। কারণ, আমরা জানতাম যে, আজ যে নীতি আমরা গ্রহণ করছি তা সেই অনুযায়ী ভবিষ্যতে ফলদান করবে। এইভাবে একটা গৃহীত নীতি ভবিষ্যতে কী ফল দেবে তা সম্পর্কে ভবিষ্যবাণী বা 'ফোরকাস্টিং' করা সম্ভব।

অবশ্য, আই এম এফ-এর কাণ্ড-কারখানা দেখে আমার আশ্চর্য হওয়া উচিত ছিল না। কারণ, আই এম এফ-এর কর্মধারা নিয়ে কেউ খুব বেশি প্রশ্ন তুলুক তা তাঁরা চান না। তাঁরা চান, তাঁরা যেন নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী নিরুপদ্রবে কাজ করে যেতে পারেন, কোনওরকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই। তত্ত্বগতভাবে, তাঁরা যে দেশকে সাহায্য করেন সেখানকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁদের সহায়তা করারই কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের নীতি বলপূর্বকভাবে চাপিয়ে দিয়ে ওই সমস্ত দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার খর্ব করেন। সরকারীভাবে অবশ্য, তাঁরা কোনও কিছুই (জোর করে) চাপিয়ে দেন না। তাঁরা যেটা করে থাকেন তা হলো, তাঁদের কাছ থেকে সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের তরফে তাঁদের সঙ্গে যে আলোচনা চালানো হয় সেই সময় কিছু বিশেষ বিশেষ শর্তের কথা আলোচনা করা হয়। কিন্তু সেই সময় আলোচনার নামে যে বিরামহীন দর কষাকষি করা হয় তাতে তাঁদের কথাই শিরোধার্য বলে গ্রহণ করা আবশ্যক। শুধু তাই নয়, দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সহমত তৈরি হতে যে ন্যূনতম সময় প্রয়োজন হয় তা-ও তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবেই দেননা। এর ফলে, ঠিক কোন শর্তের বিনিময়ে একটি দেশ তাঁদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করলো, তা সংশ্লিষ্ট দেশের সংসদ বা আধুনিক সভ্য সমাজের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে আলোচনা করে তবে ঋণ গ্রহণ করা আর সম্ভবপর হয় না। আবার অনেক সময় তাঁরা তাঁদের তথাকথিত স্বচ্ছতার অছিলা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে গোপন সমস্ত শর্তকে সামনে রেখেই আলোচনা শুরু করেন।

আই এম এফ যখন কোনও দেশকে সাহায্য করবে বলে বিবেচনা করে তখন তাঁরা সে

দেশে একদল অর্থনীতিবিদ পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই সকল বিশেষজ্ঞের সংশ্লিষ্ট দেশ সম্পর্কে তেমন কোনও অভিজ্ঞতা থাকে না। তাঁদের অধিকাংশ অভিজ্ঞতা সীমিত থাকে তাঁরা যে পাঁচ-তারা হোটেলে থাকেন তারমধ্যে দেশের গ্রামের সামাজিক জীবন সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকেন। তাঁরা যে কদিন বা বড় জোর কয়েক সপ্তাহ যে দেশে থাকেন তাতে দিন-রাত উজাড় করে কাজ চালান। কিন্তু হলে হবে কী? যে গাণিতিক কাঠামো ব্যবহার করে তাঁদের কোনও একটি দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম অনুধাবন করতে হয় তা বহু সময়ই ভুলে ভরা বা সর্বৈব অচল। শুধু তাই নয়, এই সকল বিশেষজ্ঞদল অনেক সময় আবার সংশ্লিষ্ট দেশে পৌঁছানোর আগেই একটা খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করে নিয়ে আসেন। আমি একবার এমনও শুনেছিলাম যে, প্রতিনিধিদলের সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট দেশের জন্য তৈরি করা রিপোর্ট হুবহু কপি করে তা অন্য দেশের ক্ষেত্রে চালিয়ে দেয়। তাতে দেখা যায় যে, যে দেশের রিপোর্ট থেকে তা কপি করা হয়েছে, সেই দেশের নামও বেশ কিছু জায়গায় রয়ে গেছে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, তাঁদের 'ওয়ার্ড প্রসেসার'-এর 'সার্চ অ্যান্ড রিপ্লেস' বোতামটি ঠিকমতো কাজ করেনি বলেই হয়ত এই বিপত্তি!

আমার এমন কথা বলার অবকাশ নেই যে, আই এম এফ-এর অর্থনীতিবিদদের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মানুষদের জন্য যেন কোনও দরদ নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের পুরনো লোকজন এমন একটা ভাব করেন যেন রুডিয়ার্ড কিপলিং কথিত শ্বেতাঙ্গ মানুষদের বোঝা তাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ধরণের পুরনো লোকেরাই সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আইএমএফ অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, তাঁরা যে-সমস্ত দেশে যান, সেই সমস্ত দেশের অর্থনীতিবিদদের তুলনায় তাঁরা বেশি শিক্ষিত, বেশি উজ্জ্বল এবং রাজনৈতিকভাবে কম প্রভাবিত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কিন্তু তাঁরা যাই মনে করুন না কেন, বাস্তবে মোটেই এমনটি নয়। আমি নিজে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, এম আই টি, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি। সেই সুবাদে জানি যে, আই এম এফ যাঁদের নিযুক্ত করেন তাঁরা প্রায় সবাই প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। কিছুদিন আগে, আমি চীনে একটি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। বিষয় ছিল ঃ 'দূরসঞ্চারের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার নীতি'। তাতে সে দেশের অন্তত তিনজন অর্থনীতিবিদ আমাকে এমন এমন প্রশ্ন করেন, যা কিনা পশ্চিমের সবচেয়ে ভাল ছাত্রের সমতুল বলেই আমার মনে হয়েছে।

আই এম এফ-এর বক্তব্য হলো, আমরা পূর্ব এশিয়ায় দেশগুলির কাছ থেকে যা চাইছি তা মোটেই এমন কিছু নয়। তাঁদের কেবল বলছি, দেশের অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে নিজেদের বাজেটে ভারসাম্য আনুন। কিন্তু এই দাবি কি সত্যি? কিন্তু মার্কিন প্রশাসন কি চায়না যে, দেশে মন্দার সময়ে প্রয়োজন হলো ঘাটতি বাজেট পেশ করা। আমরা স্নাতক স্তরেও তো অর্থনীতির ছাত্র-ছাত্রীদের বিগত ৬০ বছর ধরে সম্ভবত এই কথাই পড়িয়ে আসছি।

অর্থনৈতিক সংকট যখন ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে ছড়িয়ে পড়ে তখন আমি আরও শঙ্কিত হয়ে পড়ি। যেহেতু এই দেশে বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে, তাই এখানে অর্থনৈতিক সংকট সূচীত হলে তা সামাজিক ও রাজনৈতিক হানাহানিতে পরিণত হতে পারে। ১৯৯৭-র শেষ দিকে কোয়ালালামপুর-এ একটি বৈঠকে ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে অত্যাধিক পরিমাণে কঠোর অর্থনৈতিক বিধি-নিষেধ যদি প্রবর্তন ঘটানো হয় তাহলে এই ধরণের সমস্যা তৈরি করতে পারে বলে আমি জানাই। কিন্তু আই এম এফ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিশেল ক্যামডেসাস জানান, না, এই ধরণের কোনও ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। তাই স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ইন্দোনেশীয় অর্থনীতির সংস্কারসাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তুলে ধরেন — বাস্তব পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা না করেই।

কিন্তু কে কাকে বোঝাবে যে এটি একটি আজগুবি কথা। ক্যামডেসাস যে মেক্সিকোর কথা

বলে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন, তা ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মেক্সিকোর অর্থনীতি একটা সময় মাথা তুলে এই কারণেই কিছুটা দাঁড়াতে পেরেছিল যেহেতু মার্কিন অর্থনীতির ঝাড়-বাড়ন্তর জেরে সে দেশে রপ্তানি বৃদ্ধির সামান্য কিছু সুযোগ ছিল। অন্যদিকে, ইন্দোনেশিয়ার প্রধান বাণিজ্য-সহযোগী দেশ হলো জাপান। কিন্তু জাপানের তো নিজেদেরই এখন খানিকটা টালমাটাল অবস্থা। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে মেক্সিকোর তুলনায় ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা অনেক বেশি বিস্ফোরক। এই দেশে, ইতিহাসের প্রবাহের বিভিন্ন পর্যায়ে জাতিগত দাঙ্গা ঘটেছে বারংবার। তাই দেশের এই বৈশিষ্ট্যের জেরে আরও একবার যদি এই ধরণের দাঙ্গা ঘটে যায় তাহলে তাতে বৈদেশিক সম্পদ দেশ থেকে অন্যত্র চলে যাবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এই ধরণের কোনও বক্তব্যই তাঁদের বিচারে প্রণিধানযোগ্য নয়। তাই তাঁরা যেভাবেই হোক না কেন, সরকারী খরচ কম করার জন্য চাপাচাপি করতে শুরু করে। তাতে দেশে খাদ্য ও জ্বালানী তেলের উপর যে অতীব প্রয়োজনীয় ভর্তুকির ব্যবস্থা ছিল তা তুলে নেওয়া হয়।

১৯৯৮-এর জানুয়ারিতে বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর পূর্ব এশিয় শাখার সহ-সভাপতি জ্যঁ মিশেল সেভেরিনো সমগ্র এশিয়ায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা বিবরণদান করতে গিয়ে 'রিসেশন' এবং 'ডিপ্রেশন' শব্দ দুটির ব্যবহার করেন। এই বক্তব্যের বিরোধীতা করে লরেন্স সামার্স নামে সেই সময়কার সহকারী ট্রেজারি সচিব জানান, সেভেরিনো পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অর্থনীতি সম্পর্কে যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা হয়ত বাস্তবের অতিরঞ্জন। কিন্তু তা বলে অবস্থাও যে ভাল ছিল তা বলার উপায় নেই। যেমন, পূর্ব এশিয়ায় বেশ কিছু দেশে উৎপাদনশীলতার পরিমাণ ১৬ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে ৫০ শতাংশেরও বেশি ব্যবসায়ী প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। এর ফলে, দেশের পক্ষে রপ্তানির সুযোগ গ্রহণ করা তাদের সম্ভব হয়নি। বেকারত্বের হার শুধু যে বেড়েছিল তা-ই নয়। বেড়ে প্রায় দশগুণ হয়েছিল। মানুষের প্রকৃত আয়ের পরিমাণও যথেষ্ট নেমে যায়, দেশে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বলে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তাতে দেখা যায় যে, আই এম এফ যে কেবল পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থারই ক্ষতি করছে তা নয়। ওই অঞ্চলের সামগ্রিক ব্যবস্থারও প্রভূত ক্ষতিসাধন করতে শুরু করেছে। এরপর, ১৯৯৮-এর বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের সময় এই ধরণের এক সংকটের আবর্ত পূর্ব এশিয়া ছাড়িয়ে তা রাশিয়ায় অনুপ্রবেশ করলো। তবে সে দেশে সমস্যা সৃষ্টির পেছনে যে আই এম এফ-ই একমাত্র দায়ী এমন কথা বলার অবকাশ নেই।

জার্মানিতে 'বার্লিন ওয়াল'-এর পতনের পর সে দেশের উন্নয়নের জন্য দুই পৃথক ঘরানায় চিন্তা ব্যপ্তিলাভ করতে দেখা যায়। একটি ঘরানায় নেতৃত্ব দেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ কেনেথ অ্যারো এবং তাঁর সহযোগীরা। এই সকল অর্থনীতিবিদের বক্তব্য ছিল, কোনও একটি দেশে বাজার অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে গেলে সে দেশের প্রতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিতে হবে। যেমন ধরা যাক, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে দেশের আইনি কাঠামোকে মজবুত করতে হবে। যার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের শ্রমচুক্তি বলবৎ করা যাবে, যা কিনা আবার দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঠিকমতো পরিচালিত হতে সাহায্য করবে। অ্যারো এবং আমি 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স গ্রুপ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এবং চীনে যখন বাজার অর্থনীতির প্রসার ঘটতে শুরু করেছে তখন তাঁদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। আমরা সেই সময় দেশে কেবলমাত্র বল্গাহীনভাবে বেসরকারীকরণ ও বিলগ্নীকরণের পরিবর্তে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর উপর জোর দিই। যদিও, একথা হয়ত ঠিক যে কোনও কোনও সময় কড়া দাওয়াইও প্রয়োজন হয়। তবে মনে রাখা দরকার যে, তা নির্ণয় করতে হবে সময় বিশেষে।

অন্য ঘরানার অর্থনীতিবিদরা অবশ্য বাজার অর্থনীতির অন্ধ সমর্থক। রাশিয়ার সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রেও এঁদের একই ধরনের মনোভাব কাজ করতে দেখা যায়। যদিও সে দেশের

ইতিহাস অথবা সে দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা আদৌ তাঁদের মধ্যে ছিল না। তাঁদের যে ধারণা তাঁরা সযত্নে লালন করেন তাতে তাঁরা মনে করেন, কোনও একটি নির্দিষ্ট দেশের অর্থনীতি অনুধাবন করতে গেলে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রতিষ্ঠান, ইতিহাস এমনকি ওই দেশের মানুষের আয়ের বন্টন জানা বা বোঝার কোনও প্রয়োজন নেই। উন্নত মানের অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতির যে মৌলিক নিয়ম তা জানেন এবং তার ভিত্তিতে একটি দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে কোন্ ধরনের ওষুধ কতোটা পরিমাণে প্রয়োজন, তা তাঁরা নির্ণয় করে দেন। তাঁরা মনে করেন, একটা দেশের অর্থনীতি যতো বেশি দুর্বল হবে, সে দেশের বেহাল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ততো কড়া ওষুধ প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

কিন্তু রাশিয়ার অর্থনীতির হাল ফেরাতে দ্বিতীয় ঘরানায় আশ্রয় গৃহীত হয়। ওই দেশের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতাদের পরিষদে পিটার অর্স্জ্যাগ (Peter Orszag) নামে একজন অত্যন্ত কৃতী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি রুশ সরকারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এরকমই একজন বিশেষজ্ঞের সহায়তা আই এম এফ এবং রুশ সরকারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁর পরামর্শ কখনোই গ্রহণ করা হয়নি। সম্ভবত, তাঁর একটা অপরাধ যে তিনি বড্ডো বেশি জানেন এবং বোঝেন।

এরপর কি হলো, তা আমরা সম্ভবত সবাই জানি। ১৯৯৩-র ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ার ভোটে সংস্কারপন্থীরা এক বড় ধাক্কা খেল। সেই ধাক্কা যে এখনো তারা সামলে উঠতে পারেনি তা বিবেচনা করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এতো সমস্ত সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেও অবস্থা যে ভাল হয়েছে তা বলার সুযোগ কোথায়? আই এম এফ-এর পক্ষ থেকে যে দ্রুত হারে বেসরকারীকরণের জন্য দাবী তোলা হয়েছে তার ফলাফল হয়েছে মারাত্মক। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, গোটা দেশের মধ্যে সামান্য কয়েকজন সমগ্র রাষ্ট্রীয় মালিকানার এক বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। আই এম এফ এবং তাঁদের নির্দেশে সে দেশের সরকার প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নজর না দিয়ে দেশে ইচ্ছামতো সম্পদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এবং বাইরে চালান করে—দেশের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের সামনে যথেচ্ছ লুঠতরাজের সুযোগ করে দিয়েছে। অন্যদিকে, যখন সরকারের পেনশনভোগীদেরও পেনশন দেবারই ক্ষমতা নেই এবং গোটা দেশে এক অপরিসীম অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তখন দেশের কিছু সংখ্যক সুবিধাভোগী মানুষ দেশের মূল্যবান সম্পদ অবাধে লুট করে বিভিন্ন বিদেশী ব্যাঙ্কে অপরিসীম অর্থ আমানত করছে বল্গাহীনভাবেই।

এই অবস্থাতেও আই এম এফ প্রমাণ করতে চেষ্টা করতে থাকে যে, রাশিয়ায় যে সমস্যা তার প্রধান কারণ হলো, সংস্কারের স্বপক্ষে তেমন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। কিন্তু কে কাকে বোঝাবে যে সোভিয়েতে সমাজতন্ত্রের পতনের ঠিক আগেও যখন দেশে দারিদ্রসীমার নিচে মাত্র দুই শতাংশ মানুষ বসবাস করতো তখন সংস্কারের সময়ে এর পরিমাণ পঞ্চাশ শতাংশও ছাড়িয়ে গেছে। দেশের মোট শিশুর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। খুব সম্প্রতি আই এম এফ এবং রুশ সরকার একযোগে বলছে যে, সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের পাশাপাশি তাঁদের কিছু সামাজিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করা উচিত ছিল। অবশ্য এমনটি এখন বলার পাশাপাশি তাঁরা একথাও বলছেন যে, তাঁরা নাকি একথা আগেও বলেছিল। কি জানি, আমার তো সেরকমটি জানা নেই।

এখন রাশিয়ার অবস্থা খুবই উদ্বেগের। একদিকে, তেলের দাম বাড়িয়ে এবং অন্যদিকে মুদ্রার দর হ্রাস করে অবস্থা খানিকটা সামাল দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মান দারুণ নেমে গেছে। দেশে দেখা দিয়েছে মানুষে-মানুষে তীব্র বৈষম্য — যা অতীতে ছিলই না। এর ফলে, দেশের মানুষের মধ্যে এক বড় অংশ এখন আর বাজার

অর্থনীতির প্রতি ভরসা রাখতে পারছে না। তেলের দাম যদি খানিকটা কমে যায় তাহলে দেশের অর্থনীতির অবস্থা এখন আরও বেহাল হয়ে পড়বে।

তুলনায়, পূর্ব এশিয়ার অবস্থা একটু ভাল। যদিও, একটু ভাল বলার অর্থ এই নয় যে তাঁরা সমস্যামুক্ত। যেমন, থাইল্যাণ্ড-এর মোট বরাদ্দকৃত ঋণের মধ্যে প্রায় চল্লিশ শতাংশ এখন 'নন পারফরমিং', ইন্দোনেশিয়া এখনো গভীর অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বেকারত্বের হার বেড়েই চলেছে। এই সংকট এখন কোরিয়াকেও গ্রাস করেছে — যে দেশকে পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে সফল দেশ বলে ভাবা হতো। আই এম এফ বলছে, এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক মন্দা তাঁদের গৃহীত নীতির কার্যকরিতাই নাকি প্রমাণ করে। এই ধরণের কথাকে পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি বা বলবো?

কোনও দেশেই অর্থনৈতিক মন্দা স্থায়ি আকার ধারণ করে না। তবে পূর্ব এশিয়ার এই সমস্যার সুদীর্ঘ স্থায়িত্বের একটা বড় কারণ হলো আই এম এফ-এর ভূমিকা। এর ফলে সেখানকার সমস্যা এতো বেশি সুদীর্ঘ, সুগভীর এবং সুকঠিন আকার ধারণ করেছে। সেই কারণে, থাইল্যাণ্ডের অবস্থা সবচেয়ে উদ্বেগজনক। তুলনায়, মালয়েশিয়া বা কোরিয়ার অবস্থা ততো খারাপ নয়। বলা বাহুল্য, থাইল্যান্ড আই এম এফ-এর নির্দেশ যেভাবে অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তবায়িত করেছে তুলনায়, মালয়েশিয়া বা কোরিয়াকে বেশ খানিকটা স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে কাজ করতে দেখা গেছে। তাই তাঁদের অর্থনীতির অবস্থা ততো বেহাল হয়ে পড়েনি।

আমি অনেক সময় এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি যে, আই এম এফ-এ কর্মরত অর্থনীতিবিদরা, যাঁরা অত্যন্ত কৃতী ও মেধাবী ছাত্র, তাঁরা এমন কাজ করছেন কেন যে তাঁদের সংস্থার সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলি এইভাবে গভীর সংকটে খাবি খাচ্ছে? এর কারণ কি? আসলে, সমস্যা হলো, এই সংস্থা যে 'মডেল' কে অবলম্বন করে কাজ করছে তা মোটেই যথার্থ নয়। একটা উদাহরণ দিলে হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে খানিকটা সুবিধা হবে। পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে সেখানকার দেউলিয়াপনা এবং ঋণের অর্থ অনাদায়ের ভীতি। এর জন্য, সেখানকার অর্থনীতির এই সমস্ত সমস্যাকে অনুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করতে হবে। এই ধরণের নানা সমস্যা বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চলের নিজস্ব এবং সেই হেতুতে অনন্য, স্বকীয়। কিন্তু এই সংস্থা যে 'ম্যাকরো মডেল' (macro model)-এর ভিত্তিতে কাজ করে তাতে এই ধরণের দেশীয় বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনার সুযোগ নেই। তাই পূর্ব এশিয়ার এই ধরণের নিজস্ব সমস্যাকে না অনুধাবন করে আই এম এফ যে পূর্ব নির্ধারিত 'মডেল' নিয়ে কাজ করেছে তাতে যা হবার তা-ই হয়েছে।

আই এম এফ-এর কাজের ধারার আরও একটি বড় সমস্যা হলো তাঁদের কাজের অকারণ গোপনীয়তা। অপরের সমালোচনা ও পরামর্শ যদি গঠনমূলক হয় তাহলে তা গ্রহণ করতে অসুবিধা কোথায়? কিন্তু যেহেতু তাঁদের কাজে অস্বচ্ছতা রয়েছে তাই তাঁরা চায় না যে তাঁদের কাজ খোলামেলাভাবে অপরে বিচার করে বা মূল্যায়ণ করে দেখুক। এক্ষেত্রে আই এম এফ-এর দোসর হ'লো মার্কিন সরকারও। আমি নিজে বহু সময় আই এম এফ-এর কাজের নানান ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছি, বিরোধিতা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার এই সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আরো উদ্বেগের হলো, সংস্থার ভেতরে সমালোচনা এবং বিশেষ করে যা কিনা গণতান্ত্রিক বিশ্বাসযোগ্যতার জন্যে করা হয়, তারও কোন সদুত্তর দেওয়া বা আলোচনা করা হয়না। বহু সময়ই তাঁদের ভূমিকায় এক ধরণের অহেতুক ক্রোধেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে মার্কিন মুলুকের গণ-মাধ্যমও সমানভাবে দায়ী। তাঁরা যদি ঠিক ঠিক ভূমিকা পালন করে আই এম এফ কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু সঙ্গত প্রশ্ন তুলতো তাহলে অবস্থা ততোখানি বেগতিক হতো না এখন যেমনটি হয়েছে।

যেমন, একটা প্রশ্ন করা তো মনে হয় খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় ছিল যে, আই এম এফ পূর্ব এশিয়ায় যে ভূমিকা পালন করে চলেছে তা কি ওই অঞ্চলের স্বার্থের সহায়ক নাকি পরিপন্থীমূলক? দ্বিতীয়ত, এই ধরণের ভূমিকা নেবার লক্ষ্য কি ওই অঞ্চলের দেশগুলিকে সাহায্য করা নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পৃথিবীর বৃহৎ শিল্পোন্নত দেশগুলিরই স্বার্থসিদ্ধি ঘটানো। যদি ধরে নেওয়া হয় যে আই এম এফ-এর কাজের লক্ষ্য হলো, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে সহায়তা করা তাহলে এর নিদর্শন বা প্রমাণ কোথায়? সে কথা খোলামেলাভাবে জানানো হচ্ছে না কেন? আমি নিজে এই বিতর্কে অংশগ্রহণকারী হিসেবে সাক্ষ্য প্রমাণ দেখার চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।

গোটা পৃথিবীতে তথাকথিত 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ'-এর অবসানের পর বিশ্ব অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থার গুরুত্ব ক্রমেই জোরদার হয়েছে। এই নতুন কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিতে একদল অর্থনীতিবিদ, আমলা এবং আধিকারিকদের চেষ্টার অন্ত নেই এবং তাঁরা সকলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পৃথিবীর কয়েকটি নির্দিষ্ট উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধি। এই কারণে, তাঁদের যে ভূমিকা তা এই সমস্ত দেশেরই স্বার্থসহায়ক। অথচ, তাঁরা অর্থনীতির যে ভাষায় কথা বলেন, তা সাধারণ মানুষেরা কতোখানি বোঝেন তাতে ঘোর সন্দেহ রয়েছে। আবার, যে সকল নীতিনির্ধারকের তাঁদের এই সমস্ত কথার বাস্তবায়ন ঘটানো কর্তব্য, তাঁরা তা আদৌ করেন না।

গোটা পৃথিবীর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মিথষ্ক্রিয়া তার মূল অবলম্বন হলো তাঁদের গৃহীত অর্থনৈতিক নীতি। অথচ, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নীতির সংস্কৃতিতে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও নেই। এ এক কম উদ্বেগের পরিস্থিতি নয় কি?

এর বিরুদ্ধেই আই এম এফ-এর কাজকর্ম নিয়ে মাঠে-ময়দানে উত্তাল গণবিদ্রোহ প্রতিবাদ তৈরি হয়েছে। তবে এই সংস্থার কাজকর্মের যে জটিল এবং সুকুটিল প্রবাহ তা আলোচনা করার জন্য মাঠে-ময়দানে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি আই এম এফ-এর সঙ্গে খোলামেলা বিতর্কে এখন যেতে হবে। গোটা পৃথিবী যে আই এম এফ এবং মার্কিন সরকার পরিচালনা করছে, তাঁদের এখনই সমালোচকদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসতেই হবে! তাঁদের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা উঠেছে তা মন দিয়ে এই কারণেই এখন অনুধাবনের প্রয়োজন হয়েছে যেহেতু তাঁদের গৃহীত নীতি মোটেই ঈপ্সিত সুফল তো দেয়ইনি, পরন্তু পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। আমি নিজে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

তাই এই অবস্থায়, আই এম এফ-এর দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মধারা যে এখনই পরিবর্তন করা প্রয়োজন, তা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করা দরকার।

ভাষান্তর ঃ শমিত কর

'What I Learned At The World Economic Crisis : The Insider'-এর ভাষান্তর লেখকের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত।

বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অর্থনীতি

সামির আমিন

একটি স্বর্ণযুগ

বিংশ শতাব্দী এমন একটি আশ্চর্যজনক বাতাবরণের মধ্যে পড়েছে যার থেকে জন্ম নিয়েছে এক অদ্ভুত "স্বর্ণযুগ" (অন্ততঃ পুঁজির কাছে যুগটা সুন্দর বা রমণীয়।)

ইউরোপীয় শক্তিগুলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর জাপান (যাদের আমি এখানে 'ত্রয়ী' বলে অভিহিত করব এবং ১৯১০ থেকে যারা একটি পৃথক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে) — এই তিনকে নিয়ে তৈরি বৃন্দগানের দল তাদের বিপুল জয়ের গৌরব গাথায় মুখরিত হয়েছে। বিশ্বপুঁজির কেন্দ্রের শ্রমজীবী শ্রেণী ঊনবিংশ শতাব্দীর মতো আর "বিপদজনক শ্রেণী" নয় এবং বিশ্বজনসাধারণের বাকি অংশ পশ্চিমী সুসভ্যকরণ-এর প্রকল্প ("Civilizing mission") মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

এই স্বর্ণযুগ মৌলিক বিশ্বপরিবর্তনের এমন একটি শতাব্দীকে সূচিত করেছে। যার সূচনা প্রথম শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে হয়েছে আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উদ্ভবও এই সময়েই ঘটেছে। ইউরোপিয় উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। বাণিজ্যবাদী যুগের পুরোনো অঞ্চলগুলো (লাতিন আমেরিকা এবং ব্রিটিশ ও ডাচ অধিকৃত ইস্ট ইন্ডিজ) এই দ্বৈত বিপ্লব থেকে বাদ পড়ে, আবার পুরোনো এশিয় দেশগুলো (চিন, ওটোমান সুলতানীয় এবং পারস্য) নতুন বিশ্বায়নে অবিচ্ছেদ্য অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বপুঁজির কেন্দ্রের এই জয় জনবিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে নিজের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। যার ফলে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের জনসংখ্যা ছিল পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ — ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তা বেড়ে ৩৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একইসঙ্গে ত্রয়ীদের কাছে শিল্পসম্পদের কেন্দ্রীভবনের ফলে সম্পদের এমন মাত্রায় মেরুকরণ ঘটেছে মানবসভ্যতা যা আগে কখনো দেখা যায়নি। শিল্পবিপ্লবের ঠিক আগে, সবচেয়ে উৎপাদনশীল পঞ্চম রাষ্ট্রের সঙ্গে বাকিদের শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতার বৈষম্যের অনুপাত কখনোই দুইভাগের একভাগের বেশি হয়নি। ১৯০০ সালের মধ্যে এই অনুপাত বেড়ে একুশভাগের একভাগে দাঁড়ায়।

সেই ১৯০০ সালেই বিশ্বায়নকে উদযাপন করা হয়, এমনকি তখনও বলা হয়েছিল এটা "ইতিহাসের সমাপ্তি" — ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে যা আবার সাম্প্রতিক ঘটনা হিসাবে অবির্ভূত হয়েছে। ১৮৪০-এ চিন ও ওটোমান সাম্রাজ্যের উন্মুক্তকরণ, ১৮৫৭-এ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৮৫ থেকে শুরু হওয়া আফ্রিকার বিভাজন বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার

ক্রমানুযায়ী পদক্ষেপগুলোকে সূচিত করে। পুঁজির পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়া (এমন একটি প্রক্রিয়া যা হ্রাস পায় না) তরান্বিত করার বদলে এই প্রক্রিয়া ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৬ এর মধ্যে কাঠামোগত সঙ্কটের সৃষ্টি করে এবং এর ঠিক এক শতক পরে এটা আবার দেখা দেয়। প্রথম সঙ্কটের পাশাপাশি যদিও, এমন একটা নতুন শিল্পবিপ্লব (বিদ্যুৎ, পেট্রোলিয়াম, অটোমোবাইল, এরোপ্লেন) ঘটে, যা মানব সভ্যতায় একটা পরিবর্তন নিয়ে আসে। বর্তমান সময়ে ইলেকট্রনিক্সের মতো।

সমান্তরালভাবে, প্রথম শিল্প ও ফিনান্সের গোষ্ঠীউদ্যোগ তৈরি হয় — ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনসমূহ (TNCS) মাধ্যমে। ফিনান্সের বিশ্বায়ন স্বর্ণ-ষ্টার্লিং প্রামাণিক (মান)রূপে একটি স্থায়ী ধাঁচে (যেটাকে প্রচলিত সমসাময়িক ধারণার চিরন্তন বলে ভাবা হত) আত্মপ্রকাশ করে। এখনকার ফিনান্সের বিশ্বায়নের কথা যে উদ্দীপনার সঙ্গে বলা হয় সেইরকম উদ্দীপনা নিয়েই নতুন স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের আন্তর্জাতীকরণের কথাও তখন বলা হয়। জুলে ভার্ন তার নায়ককে (অবশ্যই ইংরেজ) আশি দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পাঠিয়েছিলেন। তার কাছে, "বিশ্বগ্রাম" তখনই একটি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অর্থনীতিতে কয়েকজন মহান ধ্রুপদী তাত্ত্বিকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো পরবর্তীকালে মার্কস ও তার ধ্বংসাত্মক সমালোচকরা ছিলেন এর মূল স্তম্ভ। অধঃপতিত বিশ্বায়নের জয় নতুন "উদারনৈতিক" প্রজন্মের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। এই বিশ্বায়ন প্রমাণ করার চেষ্টা করে পুঁজিবাদ অনতিক্রম্য কারণ তা একটি চিরন্তন, কাল উত্তীর্ণ যুক্তিবাদের বহিঃপ্রকাশ উদারনৈতিক প্রজন্মের মূলপ্রবক্তা ওয়ালরাস (সমসাময়িক অর্থনীতিবিদরা কাকতালীয়ভাবে তাকে আবিষ্কার করেন নি), বাজার স্বনিয়ন্ত্রিত — এটা প্রমাণ করার জন্য আমরণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এখনকার নিও-ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের মতোই তার প্রচেষ্টার সাফল্য অত্যন্ত সীমিত।

বিজয়ী উদারনৈতিক মতাদর্শ সমাজের ধারণাকে শুধুমাত্র কতগুলো ব্যক্তির গুণফল হিসাবে সংকীর্ণ করে দেখায়। এই সংকীর্ণ ধারণা থেকে এই মতাদর্শ দাবি করে যে বাজার ব্যবস্থায় সৃষ্ট ভারসাম্য সর্বোচ্চ অনুকূল সামাজিক অবস্থা সৃষ্টির পাশাপাশি স্থায়িত্ব ও গণতন্ত্র সুনিশ্চিত করে। প্রকৃত পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বকে একটি কাল্পনিক পুঁজিবাদের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করলে এরকম সব কিছুই ঠিকঠাক পাওয়া যাবে। এই অর্থনৈতিক সামাজিক মতধারার সবচেয়ে কুৎসিত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ব্রিটন আলফ্রেড মার্শালের গ্রন্থে, যেটিকে তৎকালীন অর্থনীতির বাইবেল বলে ধরা হত।

বিশ্বগ্রাসী উদারনীতিবাদ যে সমস্ত উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিশ্রুতির কথা বলত স্বর্ণযুগে ক্ষণিকের জন্য সেগুলো সত্যে পরিণত হয়েছিল। ১৮৯৬ এর পরে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব নয়া আর্থিক নীতি এবং ফিনান্সের বিশ্বায়নের নতুন ভিত্তির উপর উন্নয়ন বৃদ্ধি আবার শুরু হয়। "সঙ্কটের গর্ভ থেকে আবির্ভূত" এই বৃদ্ধি শুধুমাত্র যে আধুনিক অর্থনীতিবিদদের গঠনমূলক পুঁজিবাদের মতাদর্শকে বিশ্বাসযোগ্য করেছে তাই নয় জঙ্গী হয়ে ওঠা শ্রমিক আন্দোলনের ভিত্তি-ও নাড়িয়ে দিয়েছে। সোস্যালিস্ট পার্টিগুলো তাদের সংস্কারবাদি অবস্থান থেকে আরো নরম নমনীয় আকাঙ্ক্ষার প্রত্যাশী হয়ে পড়ে ঃ শুধুমাত্র সমাজব্যবস্থা পরিচালনায় সাহায্যকারীর ভূমিকায় নেমে আসে। বর্তমান সময়ের এখনকার টনিব্লেয়ার ও জাহার্ড স্কোডার এর আলোচনায় অনুরূপ ধরনের পরিবর্তনের কথা পাওয়া যায়। বিশ্বক্ষমতার পরিসীমার (Periphery) এই আধুনিক আভিজাতরা মনে করে যে, পুঁজিবাদের আধিপত্যকারী যুক্তির বাইরে কিছুই কল্পনা করা সম্ভব নয়।

স্বর্ণযুগের এই জয় দুই দশকও স্থায়ী হয়নি। সেই সময়কার কিছু ডাইনোসার দিগ্‌গজ, তখনো তরুণ (যেমন লেনিন) এই বিপর্যয়ের আগাম বার্তা দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের কথার কেউ কর্ণপাত করেনি। উদারনীতি বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী "মুক্ত বাজার"-এর অলীক জগতকে (utopia) বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে পুঁজির একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন। এই সমাজব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন দ্বন্দ্বের মাত্রাই হ্রাস করতে পারেনা। বরঞ্চ এ গুলোকে আরো তীক্ষ্ণ করে। পুঁজিবাদী ইউটোপিয়ার নির্বোধ মোহে সংঘবদ্ধ ওয়ার্কার্স পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর উল্লসিত স্তোত্র নামের পিছনে বিভাজিত, দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু সর্বদা ফেটে পড়ার প্রাকমূহুর্তে থাকা ও নতুন বিকল্পের সন্ধানী সামাজিক আন্দোলনের নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি শোনা যায়। "সম্পত্তির আয় ভোগীদের রাজনৈতিক অর্থনীতি" মুক্তবাজারের আধিপত্যের কথা বলত এবং বলশেভিক বুদ্ধিজীবিদের কাছে তা নেশাগ্রস্তদের ভাষ্য হিসাবে হাসিঠাট্টার উপকরণ ছিল। উদারনীতির বিশ্বায়ন শুধুমাত্র সমাজব্যবস্থার সেই যুগের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে সামরিকীকরণ প্রতিযোগিতা গড়ে তোলে, একটি যুদ্ধের বীজ বপন করে, যা ১৯১৪ থেকে১৯৪৫ পর্যন্ত কখনো ঠাণ্ডা ও কখনও উষ্ণস্তরে ছিল। আপাতশান্ত এই স্বর্ণযুগের পিছনে ভয়াবহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব ও সামাজিক সংগ্রামের উত্থান ছিল। চীনে, বুর্জোয়া আধুনিকীকরণ প্রকল্পের প্রথম প্রজন্মের সমালোচকরা একটি পরিচ্ছন্ন রাস্তায় হাঁটা শুরু করে। কিন্তু ভারত, আরবদুনিয়া ও লাতিন আমেরিকায় এই সমালোচকরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে এরা তিনটি মহাদেশ ও বিংশশতাব্দীর পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ জুড়ে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

তিরিশ বছরের যুদ্ধ (১৯১৪-১৯৪৫)

১৯১৪ থেকে ১৯৪৫ এ ব্রিটিশদের ক্রমলুপ্ত নেতৃত্ব আধিপত্যকে নিজ দখলে নিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ চলে। যেন তেন প্রকারেণ আধিপত্য নেতৃত্ব কায়েম করার প্রতিযোগিতা তথা দখল ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় মত্ত হয় এই দুটি দেশ। অন্যদিকে সেভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিকল্প নেতৃত্ব উঠে আসে।

পুঁজিবাদের কেন্দ্রে, সমস্ত বাধা ঠেলে ১৯১৪-১৮ এর যুদ্ধের বিজয়ী ও বিজেতা উভয়েই বিশ্বব্যাপী উদারীকরণের ইউটোপিয়া পুনরুদ্ধারে প্রচেষ্টা চালায়। তার স্বর্ণ প্রামাণিক (Gold Standard) প্রথা ফেরত আসে। হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়, এবং যুদ্ধকালীন অবস্থার নিয়ন্ত্রণ আরোপিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপে পুনবায় উদারিকৃত করে দেওয়া হয়। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও এর একটি ইতিবাচক ফলাফল দেখা গিয়েছিল। ১৯২০ তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বতস্ফূর্ত অর্থনীতির নতুন জনগণের গতিশীলতায় অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার খানিকটা পুনরুদ্ধার হয় এবং নতুন ধাঁচের শ্রমিক সমাগম ঘটে (চার্লি চ্যাপলিন তার 'মডার্ন টাইমস্'-এ অভূতপূর্ব ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে একে দেখিয়েছেন)। কিন্তু মূল ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতেও এইসব পরিবর্তনের সর্বশেষ ব্যপ্তি ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। ১৯২০ তে পূর্বে উল্লেখিত পুনরুদ্ধারের গতি হ্রাস পেতে শুরু করে এবং ১৯২৯-এই বিশ্বায়ন ব্যবস্থার অগ্রণী অংশগুলোতেও অর্থনৈতিক সঙ্কট ও বিপর্যয় ঘটে। এর পরবর্তী দশকটি ছিল যুদ্ধ বিজড়িত — দুঃস্বপ্নের মতো। এই মন্দার সময়ে বিশ্বের বড় শক্তিগুলোর সেই সময় যে প্রতিক্রিয়া ছিল, ১৯৮০ বা '৯০-এও একই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ধারাবাহিক মুদ্রাহ্রাসের নীতিতে সঙ্কট আরো ঘনীভূত হয়, নিম্নগামী মজুরী-দাম জালের সৃষ্টি হয়, যা ব্যাপক আকারে বেকারী সৃষ্টি করে। এই ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে আরো দুর্ভাগ্যজনক

হল, নিরাপত্তা প্রদান করার যে অবকাশ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে থাকে— সেটাও অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। এই সঙ্কট প্রতিরোধ করার ক্ষমতা উদারনৈতিক বিশ্বায়নের ছিল না। স্বর্ণভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও প্রতিষ্ঠিত সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর গোষ্ঠী বিন্যাসের পরিবর্তন হয়। এই সংঘাতের সূত্র ধরেই শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

পশ্চিমের সমাজগুলোতে এই বিপর্যয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটে। কিছু দেশ যুদ্ধকে বিশ্বস্তরে পটভূমি পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করে ফ্যাসিবাদে ঝুঁকে পড়ে (জার্মানী, ইতালী, জাপান)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স হল ব্যতিক্রম। রুজভেল্টের নতুন চুক্তি ও ফরাসী জনগণের জনপ্রিয়তার মধ্যে দিয়ে তারা একটি নতুন ধারণা সৃষ্টি করে, শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনে সক্রিয় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাজার পরিচালন ("নিয়ন্ত্রণ")। প্রথমাবস্থায় এই ফর্মূলার বাস্তব প্রয়োগ অনেকটাই স্তিমিত ও পরীক্ষামূলক ছিল ১৯৪৫ এর পর থেকে এর পূর্ণ প্রস্ফুটন ঘটে।

বিশ্বের ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে দূরে পরিসীমায় অবস্থানকারী দেশগুলোতে (peripheries) কল্পিত স্বর্ণযুগের স্বপ্নের একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরমপন্থার জন্ম দেয়। নিজেদের স্বাধীনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ধাঁচের জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন করে। মেক্সিকোতে ১৯১০ ও ১৯২০ তে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহ ; আর্জেন্টিনায় ১৯৪০-এর পেরোনিবাদের উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রাচ্যে, তুর্কী কামাল-বাদের উত্থান এর বিপরীত পৃষ্ঠ। ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর, চীনে আধুনিক বুর্জোয়া কুয়া-মিন-তাঙ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ চলে। অন্যত্র, ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলা এই ধরনের জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পরিস্ফুটন কয়েক দশক পিছিয়ে দিয়েছে।

এককভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক নতুন কক্ষপথে হেঁটেছে। ১৯২০ তে তারা বৃথাই ভেবেছিল তাদের বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবের রূপ নেবে। পরবর্তীকালে তারা নিজস্ব শক্তির ভিত্তির উপর ফিরে আসে, এর পরবর্তীকালে ধারাবাহিক কতগুলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নষ্ট হওয়া সময়ের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করেন। লেনিন একে "সোভিয়েত শক্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ" আখ্যা দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ বলতে নতুন শিল্পবিপ্লবকে বোঝানো হয়েছে। — কয়লা বা ইস্পাতকে নয়। কিন্তু বৈদ্যুতিকরণ (মূলতঃ কয়লা ও ইস্পাত) সোভিয়েত শক্তির উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এর লক্ষ্য অধরাই রয়ে গেছে।

সামাজিক জনপ্রিয়তা সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহীত নীতিগুলোর চরিত্র নির্ধারণ করলেও, এই কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত পুঞ্জীভবন একটি স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। যদিও সেইসময় সংযুক্ত জার্মান বা জাপান কারোরই আধুনিকীকরণ গণতন্ত্রীদের হাত ধরে হয়নি। সোভিয়েত ব্যবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত দক্ষ ছিল, যতক্ষণ তার লক্ষ্যগুলো ছিল সহজ-সরল ঃ ব্যাপকভাবে পুঞ্জীভবন (দেশের শিল্পায়ন) ত্বরান্বিত করা ও এমন একটি সেনাবাহিনী গঠন করা যারা পুঁজিবাদী প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম। নাৎসী জার্মানীকে পরাস্ত করে এবং ১৯৬০-এ পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপনাস্ত্রের (মিশাইল) ক্ষেত্রে আমেরিকার একচেটিয়া কারবার ভাঙার মধ্যে দিয়ে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

যুদ্ধের পরে
উচ্চ বৃদ্ধির হার (১৯৪৫-১৯৭০) থেকে সঙ্কট (১৯৭০-বর্তমান সময়) পর্যন্ত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একটি নতুন পর্যায়ের বিশ্বব্যবস্থার জন্ম দেয়। যুদ্ধোত্তর কালে (১৯৪৫-

১৯৭৫) যে উত্তরণ পর্ব দেখা যায় তা মূলতঃ তিনটি সামাজিক প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে উদ্ভূত হয়েছিল এবং এই প্রকল্পগুলো পরস্পরকে স্থায়ীত্ব দান করেছে ও পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে। এই তিনটি সামাজিক প্রকল্প ছিল ঃ ক) পশ্চিমী দুনিয়ায়, উৎপাদনশীল স্বাধীন জাতীয় ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জাতীয় সামাজিক গণতন্ত্রের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রকল্প খ) সমাজব্যবস্থায় পরিসীমা অঞ্চলে বুর্জোয়া জাতীয়তা গঠনের "ব্যাণ্ডাঙ্গ প্রকল্প" (Bandang Project) (উন্নয়নের মতাদর্শ) বা সোভিয়েত-স্টাইলে "পুঁজিপতি বিহীন পুঁজিবাদের প্রকল্প"-যা আধিপত্যকারী বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যেও আপেক্ষিক স্বাধীনতা/স্বয়ংচালিত ভাবে বিরাজ করত। ফ্যাসিবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের জোড়া পতনের ফলে পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনে ক্ষতিগ্রস্ত জনপ্রিয় শ্রেণীগুলো পুঁজির উপর বিভিন্ন সীমাবদ্ধ বা প্রতিযোগিতামূলক, কিন্তু স্থায়িত্ব যুক্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার সুযোগ পায়। পুঁজি এর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয় এবং এটাই হল এই সময়কালের উচ্চ বৃদ্ধির হার ও পুঞ্জিভবনের ত্বরণের উৎস।

এরপরে যে সঙ্কট আসে (১৯৬৮ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যে শুরু হয়)-তা প্রাথমিক অবস্থায় পূর্বেকার উত্তরণে ক্ষয় ও পরবর্তীকালে তার পতন হিসাবে দেখা দেয়। এই সময়কাল, যা এখনও চলেছে — তাকে কোন অবস্থাতেই নতুন বিশ্ব ভারসাম্যের উদ্ভব হিসাবে দেখানো যায় না। কিন্তু প্রায় সময়ই তা দেখানোর চেষ্টা হয়। বরঞ্চ, এই সময়কালকে চরিত্রগতভাবে অনতিক্রম্য কিছু বিশৃঙ্খলা দিয়ে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে যে সমস্ত নীতি গৃহীত হয় সেগুলো পুঁজি সম্প্রসারণে কোন ইতিবাচক নীতি নয়, কেবলমাত্র পুঁজির সঙ্কট নিরাময় করার নীতি। এই নীতিগুলো সাফল্যমণ্ডিত হয় নি কারণ, সামাজিক শক্তিগুলোর সম্মিলিত ও দক্ষ প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব কোনরকম পরিকাঠামো ছাড়া কোন হস্তক্ষেপহীন পুঁজির সক্রিয় আধিপত্যে সৃষ্ট 'স্বতস্ফূর্ত' প্রকল্প একটি অলীক জগৎ বা ইউটোপিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ 'বাজার' নামক অস্ত্রটি দিয়ে বিশ্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ-- পুঁজির আধিপত্যকারী শক্তিগুলোর স্বল্পকালীন স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আধুনিক ইতিহাসে, স্থায়ী পুঞ্জীভবনের মাধ্যমে পুনরুৎপাদনের পর্যায়গুলোর (phases) পরেই একটি বিশৃঙ্খলার সময় এসেছে। এই পর্যায়ের প্রথমটায়, যুদ্ধোত্তর উত্তরণ পর্বের মতোই, ঘটনার পরম্পরা একটা আপাত নিশ্চিত একঘেয়ে ধারণার জন্ম দেয়, কারণ যে সমস্ত সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এর কাঠামোকে ধরে রাখে সেগুলো স্থায়ী ছিল। সমাজব্যবস্থার গতিজাড্যের গতিপ্রকৃতি এই সম্পর্কগুলোকে পুর্নস্থাপিত করে। এই পর্যায়গুলোতে "নিয়মশৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তিদের" (methodological individuals) সম্পর্কিত পরিপূর্ণ ভ্রান্তি সৃষ্টির সক্রিয়, সংজ্ঞাযুক্ত ও সুবিন্যস্ত সামাজিক ঐতিহাসিক বিষয় পরিষ্কারভাবে প্রস্ফুটিত (সক্রিয় সামাজিক শ্রেণী, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল এবং আধিপত্যকারী সামাজিক সংগঠন)। তাদের কার্যকলাপ একটি স্বচ্ছ নির্দিষ্ট ধাঁচের হয় বলে ধারণা করা হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের প্রতিক্রিয়া আগাম অনুমানযোগ্য বলে ধরা হয়; যে মতাদর্শ দ্বারা তারা পরিচালিত — তা হল একটা আপাত প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন বৈধ ব্যবস্থার উপকার গ্রহণ করা। এই সমস্ত ক্ষেত্রে, ঘটনার পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু কাঠামো স্থায়ী থাকবে। আগাম অনুমান সেক্ষেত্রে সম্ভবপর হবে, এমনকি সহজ হবে। এই আগাম অনুমানগুলোর উপর বেশি নির্ভরশীল হলেই সেটা বিপদ্জনক হয়, বিশেষর্তঃ যদি ভিত্তি কাঠামোটি শাশ্বত ও "ইতিহাসের সমাপ্তি" বলে চিহ্নিত হয়। এই কাঠামোতে জড়িয়ে থাকা সংঘাতগুলোর আলোচনা তখন যার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, তাকে উত্তর আধুনিকতাবাদীরা অত্যন্ত সঠিকভাবেই "দুরন্ত ভাষ্য"

(grand narratives) "ইতিহাসের নিয়ম" বলে আখ্যা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ইতিহাসের বিষয়গুলো মুছে গিয়ে তথাকথিত বস্তুগত কাঠামোগত যুক্তিকে জায়গা করে দেবে।

কিন্তু যে সংঘাতের কথা আমরা আলোচনা করছি, তা নিঃশব্দে নিজ কাজ করে যাবে এবং এই "স্থায়ী" কাঠামো ভেঙে পড়বে। সেইদিন ইতিহাস একটি নতুন পর্যায়ে উন্নীত হবে যাকে পরবর্তীকালে সন্ধিক্ষণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু এই সন্ধিক্ষণের গন্তব্য অজ্ঞাত। এই নতুন ঐতিহাসিক বিষয়গুলো অত্যন্ত মন্থর গতিতে দানা বাঁধছে। এই বিষয়গুলো এক নতুন রীতি চালু করে, নিরীক্ষা ও ভ্রান্তি পদ্ধতিতে (trial and error method) নতুন মতাদর্শগত আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের বৈধতা প্রমাণ করে বিভ্রান্তি ঘটায়। একমাত্র গুণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যথেষ্ট পরিমাণে পরিণতি লাভ করলে নতুন সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে এবং সেক্ষেত্রেই সন্ধিক্ষণোত্তর ব্যবস্থা স্বয়ম্ভূত হয়ে বজায় থাকতে সক্ষম হয়।

যুদ্ধোত্তর উত্তরণ পর্বে সারা বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলে একটা ব্যাপক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন ছিল পুঁজির উপর শ্রমজীবী ও জনপ্রিয় শ্রেণীগুলোর আরোপিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলশ্রুতি। সেগুলো বাজার সম্প্রসারণের যুক্তির ফলশ্রুতি ছিল না (এবং এখানে উদারনৈতিক মতাদর্শ ভ্রান্ত বলে পরিলক্ষিত হয়।) কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো এতটাই বৃহৎ ছিল যে বর্তমানে পরিলক্ষিত বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া সত্ত্বেও তারা এমন একটি কাঠামো গঠন করেছিল, একবিংশ শতাব্দীর মুখে দাঁড়িয়েও বিশ্বের জনগণকে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। একটি দীর্ঘ সময় ধরে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে শিল্পবিপ্লব থেকে শুরু করে ১৯৩০ (সোভিয়েত ইউনিয়নে) অবধি বা ১৯৫০ (তৃতীয় বিশ্বে) অবধি— আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্র ও পরিসীমার বৈপরীত্য শিল্পোন্নত ও শিল্পোন্নত নয় দেশগুলোর বৈপরীত্যের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন ধরনের। বিশ্ব ব্যবস্থার পরিসীমায় সংগঠিত বিদ্রোহ চীন ও রাশিয়ায় ঘটে যাওয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের চেহারাটা একই ছিল এবং এই সমাজগুলো তাদের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া বজায় রাখতে ব্যস্ত ছিল। শিল্পোন্নত পরিসীমাভুক্ত দেশের সৃষ্টি পুরনো মেরুকরণকে উল্টে দেয়। কিন্তু তার পরবর্তীকালে একটি নতুন ধরনের মেরুকরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও ভবিষ্যতের মেরুকরণের ধরন পাঁচটি নতুন একচেটিয়া শক্তি সম্পন্ন দেশকে লক্ষ করে গড়ে ওঠে যার মধ্যে ত্রয়ী দেশগুলো ছিল আধিপত্যকারী। প্রযুক্তি 'বিশ্বফিনান্স' প্রবাহ (ব্যাঙ্ক, বীমা এবং কেন্দ্রের পেনশন তহবিলের মাধ্যমে)-এর নিয়ন্ত্রণ, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আধিপত্য প্রচার মাধ্যম যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গণধ্বংসকারী অস্ত্রসমূহের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে এদের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

এই পাঁচটি একচেটিয়া শক্তি একত্রে এমন একটি কাঠামো সৃষ্টি করেছে যেখানে বিশ্বমূল্য নির্ধারণের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। মূল্যনির্ধারণের নিয়ম বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক যুক্তিবাদ দ্বারা শুধুমাত্র প্রকাশ করা সম্ভব নয় তথা, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করাও সম্ভব নয় বরঞ্চ সামগ্রিক এই পরিস্থিতির একটি ঘনীভূত রূপ হিসেবেই একে প্রকাশ করা সম্ভব। এই পরিস্থিতিই বাজার কর্তৃক সৃষ্ট ব্যক্তিগত পছন্দের কল্পনা বা যুক্তিবাদ পরিমাপের বদলে পরিসীমা অঞ্চলে শিল্পায়নের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়। উৎপাদিত বস্তুতে যে উৎপাদক শ্রম থাকে তাকে অবমূল্যায়ণ করে এবং ক্ষমতাকেন্দ্রের উপকারের স্বার্থে নতুন একচেটিয়া শক্তিগুলোর কার্যকলাপের মাধ্যমে যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় তাকে অধিক মূল্যায়ন করে। কাজেই এইভাবেই তারা বিশ্বস্তরে আয়বণ্টনের একটি নতুন ধারণার প্রবর্তন করে। এই ধারণা পূর্ববর্তী সমস্ত ক্ষেত্রগুলো থেকে অধিক অসাম্য এবং পরিসীমার শিল্পগুলোতে দুঃস্থ শ্রেণী সৃষ্টি করে। এই মেরুকরণ এমন একটি

নতুন ভিত্তির জন্ম দেয় যা মেরুকরণের ভবিষ্যৎ রূপগঠনে সাহায্য করে।

বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলনের বিজয়ে উজ্জীবিত সামাজিক শক্তিগুলোর দ্বারা আধিপত্যকারী পুঁজির উপর আরোপিত শিল্পায়ন বিভিন্ন জায়গায় অসমান ফলাফলের সৃষ্টি করে। বর্তমানে, আমরা অগ্রণী পরিসীমাভুক্ত দেশ ও প্রান্তিক পরিসীমাভুক্ত দেশের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। অগ্রণী পরিসীমাভুক্ত দেশগুলো বিশ্বপুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যেই সম্ভাবনাময় প্রতিযোগিতামূলক শিল্পযুক্ত উৎপাদনশীল জাতীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম। প্রান্তিক পরিসীমাভুক্ত দেশগুলো ততটা সফল নয়। সক্রিয় পরিসীমাভুক্ত ও প্রান্তিক পরিসীমাভুক্তের পার্থক্য পরিমাপের মূল মাপকাঠি শুধুমাত্র সম্ভাবনাময় প্রতিযোগিতামূলক শিল্প নয় ঃ একটি রাজনৈতিক মাপকাঠিও রয়েছে।

সক্রিয় পরিসীমাভুক্ত দেশের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এবং তাদের পিছনে অবস্থানকারী সমাজ (সমাজে বিরাজমান আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসহ) একটি প্রকল্প ও তা রূপায়ণে একটি নীতি নিয়ে থাকে। চীন ও কোরিয়ার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ভারত ও কয়েকটি লাতিন আমেরিকার দেশে কিছুটা কমমাত্রায় এই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এইসব জাতীয় প্রকল্পগুলোর সঙ্গে বিশ্বের আধিপত্যকারী সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্বের ফলাফলই আগামী দিনে বিশ্বের সামগ্রিক চেহারাকে নির্ধারণ করবে।

অপরদিকে প্রান্তিক পরিসীমাভুক্ত দেশগুলোর না আছে কোনো প্রকল্প (এমনকি যখন ইসলাম রাজনৈতিক শক্তি-এর ঠিক বিপরীতটাই দাবি করে) না আছে তাদের নিজস্ব কৃতকৌশল। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী 'তাদের জন্য চিন্তা করে' এবং এই অঞ্চলগুলোতে এককভাবে 'প্রকল্প' বৃদ্ধির চেষ্টা করে (যেমন ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর আফ্রিকান এসোসিয়েশন, ইজরায়েল ও বৃটেনের মধ্যসূরীয় প্রকল্প বা ইউরোপের তথাকথিত ভূমধ্যসাগরীয় প্রকল্প)। কোনো স্থানীয় শক্তি কোনো প্রকারের বাধা সৃষ্টি করেনি; এই দেশগুলো সেই কারণে বিশ্বায়নের নিষ্ক্রিয় বিষয়।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তনের রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করলে তাতে পরিসীমায় উদ্ভুত জনসংখ্যা স্ফীতি আসতে বাধ্য। ১৯০০ খ্রীঃ এশিয়া (USSR ও জাপান বাদে), আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা ও ক্যারাবিয় জনসংখ্যা ছিল মোট বিশ্ব জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ, বর্তমানে তা ৮১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

যুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যবস্থার তৃতীয় সঙ্গী হলো সেইসমস্ত দেশ যেগুলোতে আগে প্রকৃত সমাজতন্ত্র পূর্বে বিরাজ করত বর্তমানে ইতিহাস থেকে বিদায় নিয়েছে। সোভিয়েত ব্যবস্থার অস্তিত্ব, ব্যাপক শিল্পায়ন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তার সাফল্য, বিংশ শতাব্দীর আমূল পরিবর্তনের একটি চালিকা শক্তি ছিল। কমিউনিস্ট মডেলের 'ভয়াবহতা' বাদ দিলে পশ্চিমের সমাজবাদী গণতন্ত্র কখনোই কল্যাণ মূলক রাষ্ট্রগঠন করতে পারত না। সোভিয়েত ব্যবস্থার অস্তিত্ব, পাশাপাশি ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান তৃতীয় বিশ্বের (অনুন্নত) বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বশাসনের মাত্রাকে বৃদ্ধি করেছিল।

যদিও সোভিয়েত ব্যবস্থা নতুন পর্যায়ের নিবিড় পুঞ্জীভবন করতে সক্ষম হয়নি; কাজেই এই ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তির সময়কালে উদ্ভূত (কম্পিউটার চালিত) নতুন শিল্পবিপ্লব সংগঠিত করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার কারণ খুব জটিল। তথাপি, এই ব্যর্থতা আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুকে সোভিয়েত শক্তির অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপে এনে ঠেকায়। এরফলে বিভিন্ন সংঘাত প্রতিহত করার জন্য যে মৌলিক জরুরী অগ্রগতি সমাজতন্ত্রের দরকার ছিল তা আভ্যন্তরীণভাবে করা সম্ভব ছিল না। তা শেষপর্যন্ত আভ্যন্তরীণভাবে গঠন করা

যায়নি। সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতি বলতে আমি বুঝিয়েছি অর্থনীতি ও সমাজের নিবিড় গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া যার মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক পুঁজিবাদের কাঠামোর' সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়েও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম। সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক হবে অথবা তার অস্তিত্ব থাকবে না; এটাই হলো পুঁজিবাদের ভাঙনের প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা।

পশ্চিমের তৃতীয় কল্যাণমূলক রাষ্ট্র এর উন্নয়ন, পূর্বের সোভিয়েত ব্যবস্থা, দক্ষিণের জনপ্রিয়তা স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রমুখী বাস্তাবায়নের বৈধতা সৃষ্টিকারী সামাজিক চিন্তা ও আধিপত্যকারী অর্থনৈতিক সমাজ বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বগুলো মূলত মার্কস ও কেইনসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। যুদ্ধোত্তর সময়ের নতুন সামাজিক সম্পর্ক অধিক পরিমাণে শ্রমিকদের অনুকূলে গিয়েছিল যার ফলে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বাস্তবায়ন ঘটেছিল এবং উদারনীতিবাদীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। মার্কসের তত্ত্ব অবশ্যই 'প্রকৃত বিরাজমান সমাজতন্ত্র' এর আধিপত্যকারী ভাষ্য দ্বারা গঠিত ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এই দুই প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব ক্রমান্বয়ে মৌলিক সমালোচনার আবিষ্কারক হিসাবে তাদের গুণগত মানকে ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছিল এবং মূলত রাষ্ট্রশক্তির অস্তিত্বের বৈধতার প্রচারক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। উভয়ক্ষেত্রেই সরলীকরণ ও অন্ধবিশ্বাসের দিকে একটি ঝোঁক দেখা যায়।

১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে সমালোচনামূলক সামাজিক চিন্তা পরিসীমাভুক্ত ব্যবস্থা বিষয়ক ছিল। এক্ষেত্রে জাতীয় জনপ্রিয়তার বাস্তব প্রয়োগ সোভিয়েতবাদের একটি দুর্বল সংস্করণ — এবং তা 'প্রকৃত অস্তিত্বযুক্ত সমাজতন্ত্রে'র একটি বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনাকে উন্মুক্ত করে। প্রায় দেড়শতক ধরে এই সমালোচকরা পুঁজির বিশ্বসম্প্রসারণের ফলে উদ্ভূত মেরুকরণের নতুন ধারণাকে প্রকৃতপক্ষে একদম উপেক্ষা না করলেও একে ক্ষুদ্র করে প্রকাশ করে। প্রকৃত বিরাজমান পুঁজিবাদের সমর্থক এই সমালোচকরা পুঁজি প্রসারণের বৈধতা সম্পর্কিত সামাজিক চিন্তা ও সামাজতন্ত্রের তথ্য ও প্রয়োগের সমলোচনায় মুখর থাকেন এবং পরিসীমাভুক্ত দেশগুলোতে আধুনিক চিন্তার প্রবেশ ঘটান। এইসময় সমালোচকরা যদি নির্ভরশীলতার তত্ত্বকে ছোট করার চেষ্টা করতেন তাহলে সেটা হতো মস্তবড় ভুল তার কারণ এই সমাজচিন্তা সমাজতন্ত্র ও তার সন্ধিক্ষণ সম্পর্কিত মৌলিক বিতর্ককে পুনরায় উন্মুক্ত করেছিল। তদুপরি এই সমালোচকরা মার্কসবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কিত বিতর্ককে পুনরুজ্জীবিত করে এবং ইউরোকেন্দ্রীভবনের সীমাবদ্ধতা ও আধুনিক চিন্তার উপর তার আধিপত্য বিস্তৃত থাকার অন্তঃসারতা সম্পর্কে উপলব্ধি সৃষ্টি করে। এটা অনস্বীকার্য যে মাওবাদী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই সমালোচকরা সোভিয়েতবাদ ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাওয়া নয়াবিশ্বায়নবাদ উভয়েরই বিরোধী ছিল।

আদর্শহীনতার সঙ্কট

১৯৬৮ থেকে ১৯৭১-এ তিনটি যুদ্ধোত্তর মডেলের পতনের পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশের মতোই সমাজব্যবস্থায় একটি পরিকাঠামোগত সঙ্কট উদ্ভূত হয়। বৃদ্ধি ও বিনিয়োগের হারে ব্যাপক হ্রাস (পূর্ববর্তী অবস্থার প্রায় অর্ধেক), বেকারত্ব ছেয়ে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে নিঃস্বকরণ (pauperization) প্রক্রিয়া নিবিড় হয়েছিল। সেখানে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে— তা পুঁজিবাদী বিশ্বের বৈষম্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবে।

মানব সমাজের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ২০ শতাংশ পৃথিবীর মোট সম্পদে তাদের অংশ শেষ দুই দশকে ৬০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ বাড়িয়ে নিয়েছে। বিশ্বায়ন কিছু লোকের ভাগ্য খুলে দিয়েছে কিন্তু অধিকাংশর ক্ষেত্রে বিশেষত একমুখী পরিকাঠামো পরিবর্তন নীতির (structural

adjustment policies) চাপে পরা তৃতীয় বিশ্বের জনগণ ও নাটকীয় সামাজিক ধ্বংসের সাক্ষী পূর্ব ইউরোপের জনগণ-এর কাছে বিশ্বায়ন একটি বিপর্যয় হিসেবে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু এই কাঠামোগত সংকট পূর্বের সংকটগুলোর মতই একটি তৃতীয় প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এই বিপ্লব শ্রমিক সংগঠনগুলোর রূপকে বহুলাংশে পরিবর্তিত করেছে এবং (বিশ্ব পুঁজির ভয়াবহ আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে) শ্রমিক ও জনপ্রিয় সংগঠনগুলোর পুরনো ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করেছে এবং বৈধতাদানের প্রচেষ্টা করেছে। বহুবিভক্ত সামাজিক আন্দোলন এখন অব্দি এমন কোনো শক্তিশালী ফর্মুলা বার করতে পারেনি যা দিয়ে সমস্ত আরোপিত বাধা বিপত্তির মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু এটা সেদিক থেকে দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন এনেছে এবং সমৃদ্ধশালী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে সেটা হলো প্রধানত সামাজিক জীবনে মহিলাদের শক্তিশালী প্রবেশ এবং তার পাশাপাশি পরিবেশ ধ্বংস নিয়ে ব্যাপক আকারে একটি নতুন চেতনার জন্ম, যা ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই গ্রহের জীবনকে একটি সুসংহত রূপ দান করেছে। কাজেই পুঁজিবাদী কেন্দ্রের 'পাঁচ নতুন একচেটিয়া শক্তি' ক্রমবিকাশের সঙ্গে একটি বহুজাতিক বিশ্বব্যাপী সামাজিক আন্দোলনের (যার স্তরের সমৃদ্ধশালী পরিবর্তশক্তি বিকল্প হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে) প্রাথমিক রূপরেখাগুলো এখনি প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে।

পুঁজির অনুকূল ক্ষমতা সম্পর্কের বর্বরোচিত বিপরীত বিন্যাসের উপব ভিত্তি করে উদ্ভূত সংকটের মোকাবিলার মধ্যে দিয়ে উদারনীতিবাদীদের পক্ষে 'মুক্তবাজার' পদ্ধতিকে নতুনভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। মার্কস ও কেইনসকে সমাজ চিন্তা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে 'বিশুদ্ধ অর্থনীতির' এই 'তাত্ত্বিকদের' একটি কল্পিত পুঁজিবাদের দ্বারা প্রকৃত বিশ্বের পর্যালোচনা নিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এই তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল অলীক ভাবনার সাময়িক সাফল্য একটি বিপর্যয়ের পূর্বলক্ষণ অলীক কল্পনা নিয়ে যুক্তিবাদের প্রতিস্থাপন এটাই প্রমাণ করে যে পুঁজিবাদ অনতিক্রম্য নয়।

সংকট নির্মাণ কর্মসূচী ইতিমধ্যেই পতনের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও কোরিয়ার সংকট আগাম অনুমানযোগ্য ১৯৮০-তে এই দেশগুলো (চীনসহ) বিশ্ববিনিময়ে (সস্তা শ্রমের 'তুলনামূলক সুবিধার' উপর ভিত্তি করে) অধিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বসংকট থেকে নিজেদের সুবিধা আদায়ে সফল হয়েছিল। বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে সাফল্য পেলেও ফিনান্সের বিশ্বায়নের প্রভাবে তা ম্রিয়মান হয়ে গিয়েছিল এবং (চীন ও কোরিয়ার ক্ষেত্রে) উন্নয়ন প্রকল্প জাতীয় নিয়ন্ত্রিত কৌশল দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। ১৯৯০ এ কোরিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ফিনান্সের বিশ্বায়নে নিজেদের উন্মুক্ত করেছিল যেখানে চিন ও ভারত এই উন্মুক্তকরণের দিকে খানিকটা ঝুঁকেছিল।

আঞ্চলিক উচ্চবৃদ্ধির হার ভাসমান বৈদেশিক পুঁজির উদ্বৃত্তকে তার নিজের দিকে প্রবাহিত করে কিন্তু বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত হওয়ার বদলে এক্ষেত্রে শেয়ার সম্পদ মজুত ও স্থাবর সম্পদের স্ফীতি ঘটে। আগাম অনুমান মতোই ফিনান্সের বুদবুদ কয়েকবছর পরেই কেটে যায়। এই ব্যাপক সংকটের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন নতুন দিক দেখা যায় — উদাহরণস্বরূপ মেক্সিকীয় সংকটের উদ্ভূত ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ঠিক পরেই জাপান তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করতে কোরীয় সংকটের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে (যদিও এই প্রচেষ্টার অন্তঃসারশূন্য দিকটি হল এটা গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত)। কাজেই, এই পুনরুদ্ধার ইউ. এস ও জাপানী গোষ্ঠী পরিচালিত নীতির কাছে আঞ্চলিক শক্তিগুলো ফিনান্স বিশ্বায়নের আরোপিত বাধাকে বিভিন্নভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করে মালয়েশিয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত ও চীনে অগ্রাধিকার তালিকা থেকে এদের নাম বাদ দেওয়া হয়।

ফিনান্সের বিশ্বায়নের এই পতন জি-৭ দেশগুলোকে (সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী ৭টা দেশের একটি গ্রুপ) বাধ্য করে নতুন কৌশলের কথা ভাবতে যার ফলে উদারনৈতিক চিন্তায় একটা সংকট দেখা দেয়। এই সংকটের আলোকে আমরা জি ৭ এর আরোপিত প্রতি আক্রমণের রূপরেখাকে আরোপিত করতে পারি রাতারাতি তারা নিজেদের সুর বদল করে পূর্বতন বাতিল 'নিয়ন্ত্রণ' শব্দটি পুনরায় তাদের গৃহীত হয়ে পড়ে। সেইসময় বিশ্বব্যাঙ্কের প্রধান অর্থনীতিবিদ যোশেফ স্টিগলিৎস 'ওয়াশিংটন ঐক্যমত উত্তরকাল' সম্পর্কিত একটি নতুন বিতর্কের প্রস্তাব দেন। কিন্তু সেটা ইউ. এস আধিপত্যের বর্তমান প্রচারকদের কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। ট্রেজারী সেক্রেটারী লরেন্স সামার স্টিগলিৎসের স্থলাভিষিক্ত হন।

মার্কিন কর্তৃত্ববাদী আক্রমণ
একুশ শতক মার্কিনীদের হবে না

এই বিশৃঙ্খল যুগসন্ধিক্ষণে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিশ্ব আধিপত্য পুনর্গঠন ও নিজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থে বিশ্বব্যবস্থার বিন্যাসে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য কি পতনের মুখে? নাকি একবিংশ শতাব্দীতেও আমেরিকার পুর্ণপ্রতিষ্ঠা হতে চলেছে?

আমরা যদি অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সংকীর্ণ অর্থে মাথাপিছু দেশীয় আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) ও বাণিজ্য শর্তের কাঠামোগত প্রবণতা হিসাবে ধরি, তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা যাবে যে, ১৯৪৫ সালে ব্যাপক বিপর্যয়ের পর, ১৯৬০ ও ১৯৭০-এ মার্কিন আধিপত্য পুণর্জাগরিত হয়। ইউরোপ ও জাপানেরও অভূতপূর্ব পুনরুত্থান ঘটে। ইউরোপীয়রা সাধারণ ভাবে ক্রমশই সেটা বাড়িয়ে চলছে; ইউরোপীয় ইউনিয়ন হল প্রথম বিশ্বস্তরের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জোট। যদিও, তার প্রকাশ বড় তাড়াহুড়োর মধ্যে ঘটেছে। কারণ, যদি এটা সত্যিও হয় যে একটি অখণ্ড ইউরোপীয় বাজারের অস্তিত্ব আছে, অভিন্ন মুদ্রারও আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু অখণ্ড ইউরোপীয় অর্থনীতির কথা একইভাবে বলা যাবে না (অন্তত এখনও পর্যন্ত অখণ্ড অর্থনীতি সৃষ্টি হয়নি)। 'ইউরোপীয় উৎপাদন ব্যবস্থা'' বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। বরঞ্চ মার্কিন উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই ধারণা খানিকটা বাস্তবায়িত।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে ঐতিহাসিকভাবে বুর্জোয়াদের উত্থান ও স্বয়ংকেন্দ্রিক জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা এর মধ্যে দিয়ে গঠিত ইউরোপীয় অর্থনীতিগুলোর গঠন (যতই উন্মুক্ত ও আক্রমণাত্মক হোক না কেন) প্রায় একই রয়েছে। কোন ইউরোপীয় টি.এন,সি (T.N.C.) নেই। কেবল ব্রিটিশ, জার্মান বা ফরাসী টি এন সি আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা জাপানের সঙ্গে প্রতিটি ইউরোপীয় দেশের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে পুঁজির প্রভাব, ইউরোপীয় দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ সম্পর্কে পুঁজির প্রভাব থেকে কম নয়। যদি ইউরোপীয় উৎপাদক ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ ক্ষয় ঘটে এবং যদি 'বিশ্ব পারস্পরিক নির্ভরশীলতার' ফলে তারা এমনভাবে দুর্বল হয়ে যায় যাতে তাদের জাতীয় নীতিগুলো রূপায়ণ করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকে তাহলে সেটা বিশ্বায়নের পক্ষে একটা সুযোগ এবং মার্কিন শক্তির পক্ষে 'ইউরোপীয় ঐক্যের' উপর আধিপত্য করার একটা সুযোগ — বর্তমানে যা নেই।

মার্কিন আধিপত্য একটি দ্বিতীয় স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত সেটা হলো সামরিক শক্তি। ১৯৪৫ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এই শক্তি সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। এই বাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয় যেখানেই ইউ. এস সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দরকার।

সোভিয়েত সামরিক শক্তি জন্য এই বাহিনী হয়তো কিছু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছিল। এখন এই চিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে, মার্কিন বাহিনী সারা বিশ্বজুড়ে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়েছে। হেনরি কিসিঙ্গার তার স্মরণীয় উদ্ধত উক্তিতে যাকে বলেছেন, "বিশ্বায়ন আমেরিকার আধিপত্যেরই অপর নাম।" আমেরিকার এই বিশ্ব কৌশলের পাঁচটি উদ্দেশ্য আছেঃ ত্রয়ীর অন্য শরিকদের (ইউরোপ ও জাপান) নিষ্ক্রিয় ও অধীনস্থ করা, মার্কিন কক্ষপথের বাইরে তাদের কার্যক্ষমতাকে সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে আসা, ন্যাটোর উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করা ও পূর্বতন সোভিয়েত দেশের খণ্ডগুলোকে "লাতিন-আমেরিকীকরণ" বা "লাতিন-আমেরিকায়" পরিণত করা, মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া বিশেষত যেখানে পেট্রোলিয়াম সম্পদ আছে, তার উপর বাধাহীন প্রভাব সৃষ্টি, অন্যান্য বৃহৎ দেশের (ভারত ও ব্রাজিলে) আনুগত্য সুনিশ্চিত করা এবং বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় দরকষাকষিতে সক্ষম হতে পারে এমন সম্ভাবনাময় আঞ্চলিক গোষ্ঠী গঠিত হতে না দেওয়া এবং তৃতীয় বিশ্বের অঞ্চলগুলো এমনভাবে দুর্বল করে রাখা যাতে তারা নিজেদের কোন স্বার্থের কথা উত্থাপন না করতে পারে।

এইজন্য এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পছন্দের হাতিয়ার হল সামরিক শক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরা বারংবার এটাই বলে থাকেন। এই আধিপত্য সারা বিশ্বে ত্রয়ীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে, এর ফলে আমেরিকার শরিকরা তাকে অনুসরণ করতে সম্মত হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী ও জাপানের এই অনুজ্ঞা অস্বীকার করার মতো মেরুদণ্ড নেই (এমনকি সাংস্কৃতিকভাবেও নয়)। এর অর্থ হল, ইউরোপীয় অর্থনৈতিক শক্তি সম্পর্কিত সমস্ত বক্তব্য (যা ইউরোপীয় রাজনীতিবিদরা জনসাধারণের কাছে রাখেন) প্রকৃত অর্থে মূল্যহীন। বর্তমান পরিস্থিতি বাণিজ্য পুঁজির যুগের একটি সমৃদ্ধ ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে বিবাদের মতোই, ইউরোপ (যার নিজস্ব কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রকল্প নেই) অনেক পরে যাত্রাকারী একটা জাতির কাছে পরাভূত। ওয়াশিংটন সেটা ভাল করে জানে।

যে প্রধান সংস্থা ওয়াশিংটনের গৃহীত কৌশল বাস্তবায়িত করে তার নাম হল ন্যাটো। এর থেকে বোঝা যায়, ওয়াশিংটন কেন এই সংস্থার উদ্দেশ্য পূরণ করবে এমন শত্রুরও পতন রোধ করে। আজও ন্যাটো "আন্তর্জাতিক সমাজ"-এর নাম করে কথা বলে এবং ইউ.এন. এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ন্যায়নীতির প্রতি অবমাননা প্রকাশ করে। তবে, ন্যাটো শুধুমাত্র ওয়াশিংটনের লক্ষ্যকেই প্রতিপালন করে — তার বেশিও না, কমও না। উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে কসোভা ইত্যাদি গত দশকের ইতিহাস থেকে তা দেখা যায়।

ইউ. এস. এ-র নির্দেশে রচিত ত্রয়ীর কৌশলের লক্ষ্য হল একটি অভিন্ন মেরুর বিশ্ব সৃষ্টি যাতে দুটি পরিপূরক নীতি বিরাজ করবে ঃ আধিপত্যকারী টি.এন.সি পুঁজির ও বিস্তীর্ণ ইউ. এস সামরিক সাম্রাজ্যের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা — সমস্ত দেশ যার কাছে নতিস্বীকার করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যকোন প্রকল্প সহ্য না করা। এমনকি ন্যাটোর নিম্নপদস্থ মিত্র ইউরোপীয়দের প্রকল্পও নয়। বিশেষত চীনের মতো কিছু মাত্রার স্বশাসন সুনিশ্চিত করা প্রকল্প প্রয়োজনে ভেঙে দিতে হবে।

অভিন্ন মেরুর বিশ্বস্থাপনের স্বপ্ন বহুমেরুর বিশ্বায়ন দ্বারা প্রতিহত হয়। এই একটি কৌশলই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রহণযোগ্য সামাজিক উন্নয়নকে সম্ভবপর করে, এবং সামাজিক গণতন্ত্রীকরণকে লালিত পালিত করার মাধ্যমে দ্বন্দ্বকে হ্রাস করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সঙ্গী ন্যাটোর আধিপত্য কৌশলের আজ প্রধান শত্রু হলো সামাজিক অগ্রগতি গণতন্ত্র ও শান্তি।

একবিংশ শতাব্দী আমেরিকার শতাব্দী হবে না। ওয়াশিংটন ও পুঁজির উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত করার মতো সামাজিক সংগ্রাম জন্ম নেবে এবং সেটা হবে একটা তীব্র দ্বন্দ্ব।

আধিপত্যকারী শ্রেণীগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তুলবে সঙ্কট। একটি দ্বন্দ্ব ক্রমশ আন্তর্জাতিক সঙ্কটপূর্ণ রূপ নেবে। তার ফলে তা বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে। এর প্রথম পূর্বাভাস একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও তাদের আনুগত্য মিত্র অষ্ট্রেলিয়া ও অপরদিকে চিন ও অন্যান্য এশিয় দেশগুলোর দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার দ্বন্দ্বের পুনর্প্রতিষ্ঠা হওয়ায় অস্বাভাবিক নয়, যদি রাশিয়া বরিস ইয়েলেৎসিন ও তার মার্কিন "উপদেষ্টা" আরোপিত মৃত্যু ও খণ্ডীকরণের দুঃস্বপ্ন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। এবং ইউরোপীয় বামপন্থীরা যদি পুঁজি ও ওয়াশিংটনের কাছে তাদের জোড়া আনুগত্য থেকে মুক্ত হতে পারে, তাহলে নতুন ইউরোপীয় কৌশল এবং তার সঙ্গে রাশিয়া, চীন, ভারত এবং সামগ্রিকভাবে তৃতীয় বিশ্বের সংযুক্তির মাধ্যমে বহুমেরুকরণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার কথা ভাবা অলীক নয়। এটা যদি না হয়, ইউরোপীয় প্রকল্প নিজেই বিলীন হয়ে যাবে।

সেক্ষেত্রে মুখ্যত যে প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলো কিভাবে দ্বন্দ্ব ও সামাজিক সংগ্রামকে (এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) জোড়া দেওয়া যাবে? এবং সেক্ষেত্রে কোনটি বিজয়ী বলে প্রতিপন্ন হবে? সামাজিক সংগ্রাম কি দ্বন্দ্ব গঠিত কাঠামোয় দ্বন্দ্ব কি সামাজিক সংগ্রামের উপরে নিজের স্থান করে নেবে? তার পরিধি নির্ধারণ করবে? সামাজিক সংগ্রামের নেতৃত্ব চলে যাবে আধিপত্যকারী শক্তির হাতে? হয়ে উঠবে তাদের সহায়তার হাতিয়ার?

অবশ্যই, একবিংশ শতাব্দীতে আমি এমন দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের কথা কল্পনা করছি না যা পূর্বতন শতাব্দীকে ফিরিয়ে আনবে। চক্রাকার মডেল অনুযায়ী ইতিহাস নিজের পুনরাবৃদ্ধি ঘটায় না। আজকে সমাজ প্রতিটা ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। কিন্তু নিশ্চিতভাবে, শতাব্দীর শুরুতে পুঁজিবাদের যে দ্বন্দ্ব ছিল, শতাব্দীর শেষভাগে তা তীব্রতর হয়েছে। তার কারণ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর কাছে (সর্বকালের থেকে বেশি) দুটি বিকল্প রয়েছে "সমাজতন্ত্র বা বর্বরতন্ত্র"।

ভাষান্তর ঃ সুজয় ভট্টাচার্য

মূল রচনাটি ফরাসি ভাষায় লিখিত। পাস্কাল গাজালে (Pascale Ghazaleh) কর্তৃক ইংরাজী ভাষান্তরের শিরোনাম 'The Political Economy of the Twentieth Century'। এটি ২০০০ সালের জুন সংখ্যা 'মান্থলি রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের সম্মতিক্রমে বর্তমান সংকলনে লেখাটি সংযুক্ত হয়েছে।

বিশ্বায়ন ও সাম্রাজ্যবাদ

সুকোমল সেন

অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বায়নের বর্তমান পর্যায় হচ্ছে পুঁজিবাদের বিকাশের চারশো বছরের ইতিহাসে দুনিয়া জুড়ে পুঁজির সম্প্রসারণের তীব্রতম আগ্রাসনের কাল।

আজকের পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন বুঝতে গেলে আমাদের কার্ল মার্কসের ধ্রুপদি তত্ত্বের দ্বারস্থ হতে হবে, যেখানে তিনি বিশ্বায়নের চালিকাশক্তিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন।

এটা সকলের জ্ঞাত, কার্ল মার্কস, তাঁর ঐতিহাসিক সৃষ্টি, ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত 'ম্যানিফেস্টো অফ্ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রন্থে, অপরিমেয় দূরদর্শিতার সাথে বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে প্রসারিত বাজারের প্রয়োজন বুর্জোয়াদেরকে বিশ্বব্যাপী তাড়া করে বেড়ায়। পুঁজি প্রত্যেকটি জায়গায় ঘর বাঁধতে চায়, স্থায়ীভাবে থাকতে চায়, যোগাযোগ স্থাপন করতে চায়।' এই একই রচনায় মার্কস দেখিয়েছিলেন 'বিশ্বব্যাপী বাজারের' অর্ধেক তখনই দখল করে নিয়েছে বুর্জোয়ারা।

পুঁজিবাদী বিস্তারের চালিকা শক্তি হল উদ্বৃত্ত মূল্য নিষ্কাশন পদ্ধতির বিস্তার ঘটানো, অর্থাৎ মুনাফার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদীদের বিশ্বব্যাপী চলাচলের উৎস হল মজুরিহীন শ্রমশক্তি।

পরবর্তীকালে, ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডে মার্কস ব্যাখ্যা করেন, 'উদ্বৃত্ত উৎপাদন বা উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের অংশরূপে মজুরি না দেওয়া শ্রমেব মূল্য, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে গঠন করে। একথা ভুলে গেলে চলবে না, এই উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন এবং এর পুঁজিতে পরিবর্তিত অংশ, উৎপাদনের উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে।'

এই একই গ্রন্থে মার্কস 'শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতা'র শর্তহীন বিকাশের কথা লিখেছেন। কিন্তু কীভাবে এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা হয়? 'ম্যানিফেস্টো অফ্ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রন্থে মার্কস বলেছেন, 'উৎপাদনের যন্ত্রপাতির এবং তার সাথে সাথে উৎপাদন সম্পর্ক ও সমগ্র সমাজব্যবস্থার সম্পর্কের ক্রমাগত আমূল পরিবর্তন না ঘটালে বুর্জোয়া শ্রেণী তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না।'

এই পদ্ধতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বিরাজ করে ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে মার্কস অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা ব্যাখ্যা করেছেন। 'পুঁজি নিজেই, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রকৃত বাধার সৃষ্টি করে।

এখানে সেই পুঁজি ও তার বিস্তারের কথা বলা হয়েছে, যা উৎপাদন পদ্ধতির উদ্দেশ্য ও চালিকা শক্তি রূপে কার্যকরী। এই উৎপাদন ব্যবস্থা শুধুমাত্র পুঁজির উৎপাদন করার জন্য, উল্টোটা কখনই হয় না; উৎপাদনের উপাদান বলতে উৎপাদক সমাজের জীবনযাত্রা পদ্ধতির নিরন্তর উন্নতির হাতিয়ারকে বোঝানো হয় না।'

মার্কস পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন যে, পুঁজির বিস্তার ঘটানোর এই পদ্ধতি কোনভাবেই 'উৎপাদক সমাজ' অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর উপকার করে না। শ্রমিকের আর্থিক দুরবস্থার প্রশ্নে মার্কস পুঁজির বিস্তার উপযোগী এই উৎপাদন পদ্ধতিকে দায়ী করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'যে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, বৃহৎ সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করে ও তাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় রেখে, পুঁজির মূল্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও স্ব-বিস্তার ঘটে, তা নিজে থেকেই ভেঙ্গে পড়ে — পুঁজি উৎপাদনকারী উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে এই নিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্ব বিরাজমান। এই ব্যবস্থা সীমাহীনভাবে উৎপাদন দ্রব্য সৃষ্টি করে যা উৎপাদন ব্যবস্থাকেই ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতার শর্তহীন বিকাশের পথে নিয়ে যায়।' এইভাবে, উৎপাদন ব্যবস্থার সীমাহীন বিকাশের নীট প্রভাবে পুনরায় শ্রমিকশ্রেণী আরও শোষিত হয় এবং তাদেরকে আরও দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলে এবং শেষপর্যন্ত 'গোটা ব্যবস্থাটাই অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।'

কিন্তু এই অতি উৎপাদনের পরিণতি কি? মার্কস বলেছেন, 'উৎপাদিত দ্রব্য নয়, পুঁজির অতি উৎপাদনের ফলে পুঁজির অতিরিক্ত পুঞ্জিভবন ঘটে, যদিও পুঁজির অতি উৎপাদন ঘটলে দ্রব্যেরও অতি উৎপাদন ঘটে।'

সুতরাং, মার্কসের ব্যাখ্যা অনুসারে. পুঁজিবাদী মুনাফার উৎস, উদ্বৃত্ত মূল্যের ক্রমবর্ধমান নিষ্কাসন উদ্দেশ্যচালিত, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের যে পরিণতি ঘটে তা হল ঃ

(১) শ্রমশক্তির থেকে আরো বেশি করে উদ্বৃত্তমূল্য নিষ্কাসন করার উদ্দেশ্যে পুঁজি বিশ্বের সর্বত্রই নিয়োজিত হয় — সর্বত্রই স্থায়ী হয়;

(২) সামাজিক উৎপাদনশীলতা বিস্তারের জন্য পুঁজি সর্বদাই উৎপাদনের উপকরণের উন্নয়ন ঘটায় অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণগুলির প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটায়;

(৩) ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমাগত বিস্তারের কারণে শ্রমিক শ্রেণীর কষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং এদের উপর শোষণ ও দুর্দশার মাত্রা আরও বাড়ে।

(৪) পুঁজির অতিরিক্ত উৎপাদনের মধ্যেই দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন ও অতিরিক্ত পুঞ্জিভূত পুঁজি নিহিত থাকে।

মার্কসের ভাষায়, অল্প কথায় বলা যায়, 'ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার তিনটি অপরিহার্য বিষয় হল ঃ

(১) উৎপাদনের সকল উপকরণ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হস্তগত হওয়া;

(২) সহযোগিতা ও শ্রমবিভাজনের মধ্যে দিয়ে, শ্রমিকশ্রেণী সামাজিক শ্রমে পরিণত হওয়া এবং **প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে শ্রমশক্তির বন্ধন সৃষ্টি;**

(৩) বিশ্ব-বাজার ব্যবস্থার সৃষ্টি।

পরিশেষে, মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'ব্যাপৃত পুঁজির মূল্যবৃদ্ধি করার শর্তগুলির সাথে উপরোক্ত বিষয়গুলির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, **ফলত সঙ্কটের সৃষ্টি হয়।**'

শ্রমের উৎপাদনশীলতার দ্রুত বৃদ্ধি, উদ্বৃত্ত মূল্যের হারকে বৃদ্ধি করে, কারণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ঘটলে পণ্যের দাম হ্রাস পায়; এবং উচ্চ ব্যয়ে উৎপাদিত একই পণ্যের বাজার মূল্য ও নিজেদের উৎপাদনের ব্যয়ের পার্থক্য পুরোপুরিভাবে এই পুঁজিপতিদের পকেটে যায়।

যেহেতু উৎপাদনের উপকরণের উন্নতি ঘটালে পণ্য-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় ও পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়, তাই পুঁজিপতিরা, সবসময়ই, উদ্বৃত্তমূল্যের হার বৃদ্ধির জন্য এই উন্নতি ঘটাতে আগ্রহী।

শ্রমশক্তিকে সংগঠিত করার প্রসঙ্গে মার্কস, তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে বলেছেন যে, শুধুমাত্র সহযোগিতা ও 'শ্রমবিভাজন' নয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে শ্রমশক্তির মিলন ঘটানোর ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা আরও বেশি বেশি করে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই তীক্ষ্ণ ছিল। অতএব, 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে শ্রমশক্তির মিলন' বিষয়ে মার্কসের ব্যাখ্যার অর্থ, শ্রমশক্তির সাথে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে নিয়োজিত হয়। সকলেই অবগত আছেন যে, বর্তমানের বিজ্ঞানও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যুগে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে উৎপাদনের শক্তি রূপে, বিজ্ঞানের একটা ভূমিকা আছে।

সুতরাং, পুঁজিপতিদের আরও বেশি বেশি উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টির আকাঙ্খার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে বর্তমানের এই পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। বিশ্বের প্রত্যেক অংশে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত পুঁজিপতিদের দ্বারা এই প্রবণতা, আক্ষরিক অর্থেই, কার্যকরী হচ্ছে এবং এই উন্নত প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগে (era of STR = Science & Technological Revolution) উৎপাদনের শক্তি রূপে বিজ্ঞানকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সকলেই জানেন, বর্তমান কালের এই পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন, কিভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে আরও দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলছে, বেকারত্ব বৃদ্ধি করছে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বি-শিল্পায়ন ঘটাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করছে।

সমগ্র বিশ্বের দরিদ্র মানুষগুলোকে তীব্র দারিদ্রের মধ্যে অসহায়ভাবে ফেলে রাখার ঘটনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের মতো ব্রেটন উড সংস্থা ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের বিগত কয়েক বছরের প্রতিবেদনগুলিও আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, কি চরম বঞ্চনা এবং তীব্র আয়বৈষম্য আর উপযোগিতাবৈষম্য নেমে এসেছে আমাদের পৃথিবীতে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য তাৎপর্যগুলি নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হল ঃ

- বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন এক সক্রিয়তা অর্জন করেছে যাতে অঞ্চলগুলির মধ্যের প্রতিযোগিতা, প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার মতোই বাস্তব ঘটনা;
- সমগ্র বিশ্বের অর্থ, প্রযুক্তি আর বাজারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির হস্তগত হয়েছে;
- একটি অভিন্ন ভোগবাদী সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে বিশ্বের সমস্ত মানুষকে বস্তুগত কামনা পূরণের অভিষ্ট লক্ষ্যে চালনা করা হচ্ছে;
- বিনিয়োগকারীদের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে সমস্ত দেশীয় সরকার ও অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে;
- সংস্থাগুলিকে, জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া ব্যতিরেক, শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনের জন্য কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে;
- ব্যক্তিগত ও সংস্থাগত, উভয়ক্ষেত্রেই সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে 'বাজারের ভাষায়'; এবং
- কোন স্থানের প্রতি ও কোন জাতির প্রতি বিশ্বস্ততা দেখানোর কোন মূল্য নেই।

কোন কিছুর প্রতি, এমনকি যে দেশ থেকে উৎপত্তি তার প্রতি ও নিজের জাতির প্রতি, বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিশ্বস্ততা কতখানি কম তা বোঝা যায় আরও বেশি মুনাফার লক্ষ্যে ঐ সংস্থাগুলির দেশীয় সীমারেখা টপকে বিশ্বব্যাপী চলাচল করার মধ্যে থেকে; এবং বিভিন্ন

সরকারগুলি এর জন্য নিজেদের মধ্যে কতখানি লাগামহীন প্রতিযোগিতায় উপনীত হয়েছে তার উদাহরণ হল ঐ সরকারগুলির হাত ধরে দেশী অর্থব্যবস্থার নিলাম হওয়া, যার ফলে যেমন মজুরি নিম্নমুখী হচ্ছে, তেমনি ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারও খর্ব হচ্ছে।

পুঁজিবাদের বিজয় যাত্রা ?

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশগুলির পতনের পর ধনতন্ত্রের যে বিজয় নিনাদ উচ্চারিত হয়েছিল, তা ছিল একান্তই অসময়োচিত। আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির বিজয়রথের বাধাহীন যাত্রার জন্যে উদার বাজার ব্যবস্থার সমর্থকদের কারসাজিতে বিশ্বব্যাপী যে ভ্রান্তি আর মরীচিকার সৃষ্টি হয়েছিল, ১৯৯০-৯১ থেকে, কয়েকটি অনিয়ন্ত্রিত বছরের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তা প্রায় মিলিয়ে যেতে বসেছে।

এটা সত্যি, গত শতাব্দীর শেষ দশক পুঁজিবাদের এই জয়যাত্রার সাক্ষ্য বহন করে, কিন্তু এর পরবর্তী সময়, অন্য কথা বলে। যে এশিয়ার আঞ্চলিক ও বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ সমগ্র বিশ্বের বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ ছিল, সেই মহাদেশ আজ অতিমন্দায় আক্রান্ত, যা এখন সারা বিশ্বব্যবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এই অশুভ লক্ষণ দেখে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বিনিয়োগকারী, জর্জ সোরোস, মার্কিন কংগ্রেসকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে বলেছিলেন, 'আমাদের উন্নতির প্রধান কারণরূপে যে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পরিচিত, তা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে'।

বক্তব্যটি পেশ করা হয়েছিল ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। নতুন শতাব্দীর প্রথম বছরে, ঐ চিত্রটি আরও করুণ হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদের বিজয়রথের চাকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র — আমেরিকার তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে অধোগতি থেকে শুরু করে গোটা মার্কিন অর্থনীতি এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে, সেখানে অতি মন্দা দেখা দিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে পশ্চিম ইউরোপ, জাপান সহ গোটা বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত। এই অর্থনৈতিক মন্দা মার্কিন দুনিয়ায় দেখা দিয়েছে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এরও পূর্বে, যদি ঐ সন্ত্রাসবাদী হানার ফলে আর্থিক মন্দা বিশ্বব্যাপী আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। যে সমস্ত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী কিছুদিন আগেও পুঁজিবাদের জয়যাত্রার পক্ষে মতামত জ্ঞাপন করছিলেন, তারাও আজ বিশ্বব্যাপী আর্থিক অবনতির কথা স্বীকার করছেন।

একথা সত্যি যে, পুঁজিবাদী উন্নয়নের বর্তমান স্তর — বিশ্বায়ন ও লগ্নিপুঁজির রমরমা বাজার কিছু মানুষের কাছে নতুন সুযোগ নিয়ে এসেছে। এর ফলে কর্পোরেট দুনিয়া শক্তিশালী হচ্ছে, কয়েকশ আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্পদ ও ক্ষমতা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু, এই তীব্র মন্দা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে পূর্বে প্রচলিত সমস্ত মতবাদকে নস্যাৎ করে দিয়ে, গোটা ব্যবস্থাটিকে এক চরম সঙ্কটে ঠেলে দিচ্ছে। পুঁজিকে পুঞ্জিভূত করার মধ্য দিয়ে সঙ্কটের যে শিকড় পোঁতা হয়েছিল আজ তা উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্কটের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে; পুঁজিবাদের এই কাঠামোগত সঙ্কটকে কোনভাবেই পূর্বের সাধারণ বৃত্তাকার সঙ্কট বলে অভিহিত করা যায় না।

'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের, 'আইনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব' - পরিচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন পুঁজির স্ব-বিস্তার বৈশিষ্ট্য এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের বৃদ্ধি ঘটানোর প্রবণতা, দেখিয়েছেন শেষ পর্যন্ত গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কিভাবে সঙ্কট সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী উন্নয়নের বর্তমান অবস্থা ও তার তীব্র কাঠামোগত সঙ্কট, মার্কসের ঐ ব্যাখ্যাকেই সমর্থন করে।

এই সঙ্কটের অন্য সমস্ত কারণ ব্যাতিত, শুধুমাত্র পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার যে সমস্যা, বিশেষত, কম্পিউটার, বৈদ্যুতিন ভোগ্যপণ্য ও মোটরগাড়ী উৎপাদন ক্ষেত্রের অতিরিক্ত ক্ষমতা, তা আমাদের কাছে উদাহরণস্বরূপ। পূর্ব এশিয়ার এই

আর্থিক মন্দার কারণে খনিজ তেল ও অন্যান্য পণ্যের দাম, গত শতাব্দীর শেষ বছরে, ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল, যা গত ২০ বছরের রেকর্ড; এর প্রভাবে, ঐ সব পণ্য রপ্তানির উপর নির্ভরশীল সমস্ত দেশের অর্থনীতিতে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়।

আমরা সকলেই জানি, পূর্ব এশিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থা মার্কিন, জাপানী ও ইউরোপীয় বহুজাতিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন। এই তীব্র ও ব্যাপক সঙ্কটের ফলে উদ্ভুদ তীব্র বেকারত্ব, উপার্জন হ্রাস, ব্যবসায়িক ও ভোগজনিত কু-ঋণ এবং সরকারী ব্যয় হ্রাস-এর কারণে চাহিদা আরও কমে যায় এবং অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার সমস্যা আরও তীব্র আকারে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। বাস্তবিক এটাই ঘটেছে—অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার এই তীব্র সঙ্কট, উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলিকেও আঘাত করেছে। পুঁজিবাদের নৈরাজ্যবাদী মত অনুসারে, এই সমস্যা উৎপাদন ব্যবস্থার চরম ক্ষতি করবে এবং ব্যাপক আকারে বেকারী বৃদ্ধি করবে; পাশাপাশি, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনীর আয়ের সাথে অসংখ্য সাধারণ মানুষের আয়ের তীব্র বৈষম্য দেখা দেবে।

বিশ্বের অন্যদিকেও, মেক্সিকান সঙ্কটের পর, ব্রাজিলে আর্থিক দুরবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এই সঙ্কট সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকাতে ছড়িয়ে পড়ে।

রাশিয়ার লগ্নি হ্রাস ও আর্থিক অবনতি বিশ্ব অর্থনীতির এই সঙ্কটে এক নতুন ধারা রচনা করেছে, যা ১৯৯৭ সালের পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মুদ্রাজনিত সমস্যার সাথে শুরু হয়েছিল। এই সমস্যা রাশিয়ার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও সঙ্কটের বীজ বপন করা ছিল, তা প্রকাশ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার - বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশিত পথে অর্থনীতিকে চালনা করার ফলে, রাশিয়া বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের কেন্দ্র হওয়া (যা কয়েকদিন আগেও পুঁজিবাদের সমর্থকরা প্রচার করতেন) দূরে থাক, গোটা আর্থিক ব্যবস্থাকে বর্বরোচিত জঙ্গলের রাজত্বে পরিণত করেছে। কয়েকজন পশ্চিমী অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে রাশিয়ার ঐ সঙ্কট গোটা পশ্চিমী পুঁজিবাদ, বিশেষত মার্কিন পুঁজি নির্ভর ব্যবস্থাকে আঘাত করেছে। জ্যাকব স্লেশিংগার, ১৭ আগষ্ট ১৯৯৮ তারিখের ওয়ালষ্ট্রীটে জার্নালে 'পুঁজিবাদের প্রতি রাশিয়ার চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, 'রাশিয়ার এই সঙ্কটের ফলে সমস্যাসঙ্কুল শেয়ার বাজারে আরও তীব্র সঙ্কট সৃষ্টি করেছে এবং ড' কোম্পানীর অবতরনের জন্য দায়ী। বিস্তৃতভাবে বলা যায়, আমেরিকার কর্পোরেট বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও শেয়ার বাজারের উন্নতির মধ্যে দিয়ে বিশ্বব্যাপী বাজার বিস্তারের জন্য যে ভরসা পুঁজিবাদী দুনিয়া অর্জন করেছিল, রাশিয়ার এই সঙ্কটের ফলে, তাতে আঘাত এসেছে।'

সোভিয়েত ব্যবস্থার পতনের (যে কোন কারণেই হোক) সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চক্র ও সমাজতন্ত্র বিরোধী তাত্ত্বিক ব্যক্তিরা পুঁজিবাদকে সফল ব্যবস্থা হিসাবে ঘোষণা করে। এখন, রুশ পুঁজিবাদের পতন এবং তথাকথিত 'এশিয়ান টাইগার' দেশগুলি ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যর্থ হওয়াতে, এই ব্যবস্থা বাতিল করার সংকেত ছড়িয়ে পড়েছে।

গত শতাব্দীর শেষ দশকে মার্কিন ও পূর্বের দেশগুলির চাঙ্গা শেয়ার বাজার দেখিয়ে, জর্জ সোরোসের মত বুর্জোয়া পরিকল্পনাকারী এশিয়ার সঙ্কটের গুরুত্ব নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। ক্লিন্টন, গ্রিনস্প্যান (মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান) থেকে শুরু করে জি-৭ দেশগুলির নেতারা, এই সঙ্কটের বিশ্বব্যাপী প্রভাবকে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিলেন। কিন্তু নতুন শতাব্দীর শুরুতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং 'চাঙ্গা' শেয়ার বাজার ধসে যাওয়ার কারণে পশ্চিমী ও অন্যান্য পুঁজিবাদী (উন্নয়নশীল দেশসহ) দেশগুলিতে যে ভয়াবহ আর্থিক দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে প্রত্যেকেই ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে তীব্র ব্যাধির কথা মার্কস বলেছেন তা নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদের বর্তমান সময়, নামান্তরে সাম্রাজ্যবাদ

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, জাতীয় ও বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের প্রশ্নে পুঁজিবাদী ধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৬০-র দশকের শেষভাগ থেকে যে ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে তার তীব্র ব্যবস্থাগত সঙ্কটকে মাথায় রাখলে, বিষয়টি আরও নিশ্চিত হয়। এই সংগঠনের পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখন আর কোন বিতর্ক নেই। এই সংগঠনের বিশ্বব্যাপী বিস্তার ঘটছে। বস্তুতপক্ষে, যুগের এই পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যই বিশ্বজনিনতা। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশ্বায়ন কোন নতুন বিষয় নয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিস্তারের দীর্ঘ ইতিহাসের একটি নতুন ও তীব্র শোষণের অধ্যায়।

পুঁজিবাদী উন্নয়নের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, এই ব্যবস্থা বহুবার পুঞ্জিভূত পুঁজির কারণে সঙ্কটে পড়েছিল এবং পরবর্তীতে গোটা ব্যবস্থাটিরই পুনর্গঠন করা হয়েছে। শেষ যে ধাক্কা এই ব্যবস্থার উপর এসেছে তা মোটামুটিভাবে ১৯২০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ব্যবস্থার যে নজরকাড়া বৈশিষ্ট্য আছে তা দু'জন বিদগ্ধ মানুষ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

(১) ১৮৭০ দশকের পরিপ্রেক্ষিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে পুঁজির যে কেন্দ্রীয়ভবন ঘটেছিল তার ফলাফল রূপে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল— শিল্প পুঁজির ও লগ্নিপুঁজির বৃহৎমাত্রিক একাত্মকরণ, একচেটিয়া কর্পোরেট সংস্থার সৃষ্টি, সারা বিশ্বের উপনিবেশগত আঞ্চলিক বিভাজন, পুঁজির রপ্তানি, এবং শিল্পপণ্য উৎপাদক দেশ ও কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থার প্রসার।

(২) পুঞ্জীভবন ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে ফরডিস্ট (Fordist) (ধ্বংসাত্মক) শাসন গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন ধরনের জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে বৃহৎ মাত্রার উৎপাদন ব্যবস্থা ও শ্রম-পরিচালনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখা দিয়েছিল।

(৩) শ্রমিক সংগঠন, বামপন্থী দল ও শ্রমিকশ্রেণীর উপর সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রভাবের চাপে পড়ে, রাষ্ট্রগুলি একগুচ্ছ আর্থিক ও সামাজিক সংস্কারে বাধ্য হয়, যার মধ্যে কর্মসংস্থানের চরম বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কল্যাণমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ অন্যতম।

(৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী পূর্ব-পশ্চিম বিভাজনকালে, বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থার উপর মার্কিন আধিপত্য কায়েম হয়েছে, তখন পুনঃ উপনিবেশ সৃষ্টি ও উদার আর্থিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার তাগিদে, বিশ্বজুড়ে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার আর্থিক বৃদ্ধি ও পুঁজিবাদী উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল— যে সময়কেই 'পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগ' বলা হয়। এই সমস্ত সাফল্য, মার্কিন ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে কেইনসিয় অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করার ফলে এই সমস্ত সাফল্য এসেছিল।

(৫) অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা জাতীয় উন্নয়নের মাধ্যমরূপে পরিলক্ষিত হয়, যার মূল লক্ষ্য জাতীয়করণ, শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণকে ভিত্তি করে আর্থিক ব্যবস্থা কার্যকর করা, দেশীয় শিল্পগুলিকে রক্ষা করা এবং শ্রমিক শ্রেণীও প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের একত্রীকরণ করে বাজার সৃষ্টি করা।

কিন্তু ১৯৬০-এর শেষদিকে, এই কেইনসিয় উপায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে পারল না। এবং গোটা ব্যবস্থার ভিত টলে গেল; পাশাপাশি উৎপাদন নিশ্চল হয়ে পড়ল, উৎপাদনশীলতার হ্রাস ঘটল এবং আরও বেশি মজুরি, ভাল কর্ম পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তার দাবীতে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এই সমস্ত বিষয়গুলি পুনরায় প্রমাণ করে যে

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই সঙ্কটের বীজ বপন করা থাকে এবং এর থেকেই পুঁজিবাদে বাধা সৃষ্টি কারী সমস্ত ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

পুঁজিবাদী শক্তি এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালায়। ফলস্বরূপ বৃহৎ পুঁজিবাদী বা বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একগুচ্ছ পদ্ধতি অবলম্বন করে যার মধ্য অন্যতম মার্কিন ডলারের সাথে মূল্য ও বিনিময় হারের 'ব্রেটন উড' চুক্তিকে একতরফাভাবে বাতিল ঘোষণা এবং বিনিময় হার ও সুদের হারের ক্ষেত্রে ফেডারেল রির্জাভ ব্যাঙ্ক-এর মাধ্যমে নিজ উদ্দেশ্য সাধন।

একই সাথে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে, অন্যান্য কয়েক দফা ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঃ বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে শ্রম নিবিড় উৎপাদন ইউনিটগুলিকে সস্তার শ্রমের অঞ্চলগুলিকে স্থানান্তর করা, শ্রমশক্তির পরিবর্তে প্রযুক্তির নির্বিচার ব্যবহার, উদারীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনক্ষম বা অনুৎপাদক পুঁজির বিশ্বায়ন, উন্নয়নশীল দেশের ক্ষতি সাধনের বিনিময়ে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে বিনিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন ঘটিয়ে মার্কিনী সহ সমস্ত উন্নত দেশের দাসে পরিণত করা; যার ফলশ্রুতি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব হ্রাস। এই ভাবেই বিশ্বব্যাপী অধুনা প্রচলিত পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও টাকাকড়ির বাজারের শূন্যগর্ভ স্ফীতি সর্বশক্তি দিয়ে চালু করা হয়েছিল।

পুঁজি বলতে যাই বোঝানো হোক, তার অন্তিম ফলাফল ছিল আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন, বহুজাতিক সংস্থার বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী, নতুন পরিকল্পনা গঠন এবং নতুন প্রযুক্তির ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী একটি অখন্ড উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলন, পাশাপাশিভাবে পুঁজির পুঞ্জিভবন এবং শ্রম ও পুঁজির নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্রান্ত ফোর্ডিস্ট পরবর্তী সময়কালকে ভিত্তি করে একটি নমনীয় উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ।

ফলাফল হিসাবে, মজুরি, কর্মপরিবেশ ও সুরক্ষা সংক্রান্ত বিচারে এবং পাশাপাশি সংগঠন গড়ে তুলে নিজেদের দাবীসনদ পেশ করার ক্ষেত্রে, শ্রমিক শ্রেণীর উপর তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে, ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে। এর থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, পুঁজিবাদী কাঠামোর পুনর্গঠনের যুপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়েছে, আপামর শ্রমিক শ্রেণীকে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে নতুন ধারার বিশ্বব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে চাইছে, তাতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং একই সাথে, দেশগুলির অভ্যন্তরেও চরম আয় বৈষম্য সৃষ্টি করা ছাড়া, অন্য কিছু ঘটবে না। পুঁজিবাদী উন্নয়ন ও মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লক্ষ্য পূরণে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার আর বিশ্বব্যাঙ্কের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাকে। পরবর্তীকালে, মুক্ত বাণিজ্যের লক্ষ্যে দ্রব্য ও সেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস ও অন্যান্য বাধা বিলোপের জন্য আলোচনার ফোরামে, 'গ্যাট'-এর পরিবর্তে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা তৈরি করা হয়। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য মার্কিন সাম্রাজাবাদ প্রচলিত নতুন ধারার বিশ্বব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় বাকী কাজগুলো শেষ করা।

মোটের উপর, এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী নীতির লক্ষ্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠন যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি টিকে থাকে। এই নব্য-উদারী রাষ্ট্রগুলির প্রধান কাজ হবে বিশ্বব্যাপী পুঁজির পুঞ্জীভবন করতে এবং শ্রমশক্তির হ্রাস ঘটাতে এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সাহায্য করা। এই ভূমিকার দিকে লক্ষ্য রেখে, রাষ্ট্রগুলি সরকারি ক্ষেত্রের হ্রাস ঘটানো, বিকেন্দ্রীকরণ চালু করা এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিকাঠামো ও আধুনিক উপকরণের সাহায্যে আধুনিকীকরণ করার কাজ করছে। এই সমস্ত পদ্ধতি লাগু করার ফলে রাষ্ট্রগুলি তাদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারণ করার ক্ষমতা পুঁজিবাদের কাছে দ্রুত সমর্পণ করছে

এবং পাশাপাশি, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ, বিশেষত মার্কিন পুঁজিবাদের স্বার্থ আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

বিশ্বায়ন— সাম্রাজ্যবাদের এক হিংস্র অধ্যায়

লেনিন, তাঁর বিখ্যাত রচনা 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থের মুখবন্ধের শেষ পরিচ্ছদে লিখেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে, মূল অর্থনৈতিক প্রশ্ন, যা সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক নির্যাস ব্যাখ্যা করে, বুঝতে পাঠককুলকে এই ইস্তাহারটি সাহায্য করবে। অন্যথায় আধুনিক কালের যুদ্ধ ও আধুনিক রাজনীতি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।'

এই পরিচ্ছদ লেখার পর প্রায় ৮৫ বছর অতিক্রান্ত। তা সত্ত্বেও 'সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক অর্থ' বুঝতে আর আধুনিক কালের যুদ্ধ ও আধুনিক রাজনীতি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে,' এই পরিচ্ছেদের গুরুত্ব আজও অপরিসীম।

মার্কসের 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো' পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে যে পুঁজি সর্বদা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে এবং নতুন নতুন বাজার জয় করতে চায়। পরবর্তীকালে, 'পুঁজির একত্রীভবন' এবং 'আইনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব' বিষয়ে তাঁর রচিত 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে অলোকপাত করা হয়েছে। লেলিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ' গ্রন্থে 'উৎপাদনের একত্রীভবন ও একচেটিয়া কারবার' বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এবং পুঁজিবাদের একচেটিয়া পর্যায় বা সর্বোচ্চ পর্যায়ই যে 'সাম্রাজ্যবাদ' তা ব্যাখ্যা করেছেন।

মার্কসের রচনার পর থেকে পুঁজিবাদী উন্নয়নের ১৫০ বছর অতিবাহিত হয়েছে এবং লেলিনের 'সাম্রাজ্যবাদ' গ্রন্থ রচনার পর ৮ দশকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে পুঁজিবাদী বিশ্বে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে— সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে এবং শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতেও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

এক্ষণে, প্রত্যেকেই একমত হবেন যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস যে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, তা আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে এক ভীতিপ্রদ পুঁজিবাদী অবস্থার সৃষ্টি করেছে; এবং এই সমগ্র ওঠা পড়ার মধ্য দিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও জাপানের মতো পুঁজিবাদী দেশগুলিকেও ভৃত্যবৎ তৈরি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সুরক্ষিত করতে এই বিশ্বায়ন ব্যবস্থাকে ব্যবহার করার লক্ষ্যে, এক ভয়ংকর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

কোন একজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'শীতল যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পরে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গর্বোদ্ধত আচরণের আকাশছোঁয়া বৃদ্ধি। পশ্চিম ইউরোপের বহু মানুষের চোখে, সোভিয়েত ব্লকের পতন, শুধুমাত্র এক রাজনৈতিক জয় ছিল না, পাশাপাশি মুক্ত বাজার পরিচালিত পুঁজিবাদের এবং 'মার্কিন জীবনযাত্রা গ্রহণের' স্বপক্ষে এক মতাদর্শগত জয় রূপে চিহ্নিত হয়েছিল।'

তিনি ১৯২৭ সালে তাঁর 'ফরেন অ্যাফেয়ারস্' প্রবন্ধে স্যামুয়েল হান্টিংটন-এর রচনা উদ্ধৃত করে বলেন, "নিম্নলিখিত কর্মসূচী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে চালু করার চেষ্টা করেছে... উদার বাণিজ্য ও মুক্ত বাজারের শ্লোগান তুলে মার্কিন কর্পোরেটগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত করেছে, ঐ সমস্ত সংস্থার স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের পরিচালন ব্যবস্থা পাল্টিয়ে দিয়েছে,... মার্কিন অর্থনীতির স্বার্থবাহী আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অন্য দেশগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করেছে, অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির তুলনামূলক বিক্রি বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টার মধ্য দিয়ে সর্বস্তরে মার্কিন অস্ত্র ব্যবসা বৃদ্ধি করেছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্তমান মহাসচিবকে বিতাড়িত করে, তার উত্তরাধিকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছে...

এবং মার্কিন স্বার্থ সুরক্ষিত করার উপায় বর্জন করার অপরাধে বিশ্বের কিছু রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র (প্রতিষ্ঠান) থেকে বিতাড়িত করার জন্য চিহ্নিত করেছে।"

অতঃপর তিনি সঠিকভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, 'বিশ্বজুড়ে এখন এই ধারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেকে লুণ্ঠনকারী দেশের তালিকার শীর্ষে প্রতিষ্ঠা করেছে। শীতল যুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে নিজেকে জাহির করার মার্কিন আকাঙ্ক্ষার, এই প্রচলিত ধারণার কারনে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।'

লুণ্ঠনবাজ রাষ্ট্রের ভূমিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের এই ধারা, বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় বর্তমান পৃথিবীতে এত যুদ্ধের কারণ এবং বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির গতিপ্রকৃতি।

ইস্তেভান মেজারোস সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন স্তরের পার্থক্য করতে গিয়ে দেখান, ক্ষমতার দিক থেকে বিচারে ভয়ংকরতম সম্রাজ্যবাদী যুগে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কি ভাবে নিজেকে নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে বিশ্বব্যাপী দারোগার ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, 'এই সমস্ত কিছুর পেছনে যে যুদ্ধ রয়েছে তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে যুদ্ধাস্ত্রের যে কল্পনাতীত মারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা মাথায় রাখলে এটা কখনই অত্যুক্তি বলে মনে হয় না যে ইতিহাসের ভয়ংকরতম সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা এখন বাস করছি। এখন যে ব্যবস্থা চলছে তাতে বিশ্বের কোন একটি নির্দিষ্ট অংশের উপর দখলদারী কায়েম করা নয়, মূল লক্ষ্য, একটি অতিশক্তিধর রাষ্ট্রের হাতে সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা; সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য স্থানীয় কোন স্বাধীন প্রতিরোধকে কখন সহ্য করলেও, আর্থিক ও সমরবিদ্যায় অতিশক্তিধর সেই রাষ্ট্র তার কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার জন্য চরম ব্যবস্থা, এমন কি, প্রয়োজন পড়লে সেনা অভিযান করতে পিছপা হয় না।' বিশ্বব্যাপী বিকশিত পুঁজির চরম বাস্তবতার লক্ষ্যে সমস্ত রকমের বিরোধিতাকে ছেঁটে ফেলতে এই চরম ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আজকের পুঁজিবাদী সমাজে, পুঁজির যুক্তিতে, এই চরম ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হলেও, বাস্তবে, নাৎসি যুগকে মাথায় রেখেও বলা যায়, পৃথিবীর বুকে মানবিক গুণাবলী টিকিয়ে রাখার শর্তগুলির কাছে,এই যুগ ইতিহাসের চরম বিচারহীন সময়।

এরপর তিনি প্রতিটি স্তর ভাগ করে দেখিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে তিনটি ভিন্ন যুগ দেখা যায় ঃ

(১) আধুনিক উপনিবেশিক শাসক, ইউরোপের কিছু রাষ্ট্র দ্বারা বিশ্বের প্রতিরোধহীন অংশে উপনিবেশ স্থাপনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার;

(২) 'পুনর্বণ্টনবাদী' সাম্রাজ্যবাদ, যার সৃষ্টি দেশীয় প্রায় একচেটিয়া সংস্থাগুলির স্বার্থবাহী প্রধান শক্তিধর দেশগুলির হাত ধরে 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' বলে লেনিন বর্ণিত এই পর্যায়ে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কয়েকটি প্রকৃত সহযোগী ও পূর্বের উপনিবেশগুলিতে আজও তাদের পক্ষালম্বী শক্তিকে পাশে নিয়ে এর বিস্তার ঘটায়; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এই পর্যায় সমাপ্ত হয়ে গেছে;

(৩) বিশ্বব্যাপী আধিপত্য কায়েমকারী সাম্রাজ্যবাদ, যার হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; গণতান্ত্রিক সাম্যের মুখোশের আড়ালে রুজভেল্টের নীতি 'মুক্ত দরজা'র (ওপেন ডোর) ছায়ায় ঢাকা এই মার্কিন আধিপত্যবাদের শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যহতি পরেই; এই সাম্রাজ্যবাদ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ১৯৭০ দশকের পুঁজির কাঠামোগত সঙ্কটের কালে, যখন পুঁজি তার সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে আধিপত্যকারী অতিশক্তিধর দেশের হাত দিয়ে বিশ্বের বুকে নামিয়ে এনে 'বিশ্বব্যাপী একনায়কতন্ত্র' কায়েম করতে চাইছে।

মেজারোস একই সাথে বলেছেন যে, 'এটা বাস্তব যে, মার্কিন আধিপত্যকারী সাম্রাজ্যবাদ সফল হয়েছে এবং এখনও তা চালু আছে, কিন্তু এর অর্থ কখনই নয় যে, এই ব্যবস্থা স্থায়ী, চিরকালীন।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত 'বিশ্বজনীন সরকার' এখনও একটা তাত্ত্বিক ভাবনা, যেমনভাবে 'গণতন্ত্রের জন্য মৈত্রী' এবং 'শান্তির জন্য অংশীদারিত্ব' তৈরী করা হয়েছিল যাতে 'নতুন ধারার বিশ্বব্যবস্থা' সৃষ্টি করতে।

লুণ্ঠনকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য

এটা সকলেরই জানা আছে যে 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থটি লেনিন রচনা করেছিলেন এমন এক সময় যখন 'পুঁজিবাদী সংগঠন' ও 'সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উত্তীর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক নির্যাস একচেটিয়া পুঁজি'র মধ্যে বিভাজন ও পুর্নবিভাজন হেতু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে।

তখন থেকেই, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ক্ষমতার এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে — 'মার্কিন প্রভাব ও ক্ষমতার বিস্তারে মুখে পুরানো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে থাকে' এবং 'মুক্ত' বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন প্রভূত্বের কাছে বিট্রেন ও ফ্রান্স (বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও পর্তুগালের কথা বাদ দিলে) তাদের আধিপত্য হারিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ছোট শরিকে পরিণত হয়েছে।"

এক সহস্রাব্দের শেষ আর অন্য সহস্রাব্দের শুরুতে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে, বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় মার্কিন অর্থনৈতিক ক্ষমতার আধিপত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮০-র দশক এবং ১৯৯০-র দশকের প্রথমভাগে এই আধিপত্যের রূপ ছিল 'গ্লোবাল কর্পোরেশন'-এর বিশ্ব ব্যবস্থা — কেউ কেউ এটাকে বলে থাকেন 'গ্লোবাল ভিলেজ' আর অন্য একদলের মতে এই ব্যবস্থায় স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে আন্তর্জাতিক নিগমবদ্ধ প্রতিষ্ঠান দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার এই সংযুক্তিকে রীতিবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই সমগ্র ব্যবস্থায় মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলির আধিপত্য অপরিসীম ও তা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এশিয়ার অত্যাশ্চার্য অর্থনৈতিক শক্তিগুলিকে আধার করে যে 'দ্বি-কেন্দ্রিক' বা 'ত্রি-কেন্দ্রিক' বিশ্ব ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছিল, তা আজ মরীচিকায় পর্যবসিত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের মতো কিছু অর্থনৈতিক শক্তির দুর্বল প্রতিক্রিয়া ব্যতিত, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যের আভ্যন্তরীণ শত্রুতা সেভাবে প্রকাশ পায় নি। সুতরাং অখণ্ড জার্মান অর্থনীতির পুনরুত্থানকে কেন্দ্র করে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে, যে ইউরোপীয় শক্তিকে কল্পনা করা হয়েছিল তা বাস্তবে ফলপ্রসু হয়নি, বিশেষত বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এরকম বৃহৎ সংস্থার সংখ্যার বিচারে।

ফিদেল কাস্ত্রো বর্ণিত "সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন" নামক এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার ফলাফলরূপে দেখা যায় অন্যকে শোষণ করে মার্কিন সংস্থাগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পাশাপাশি, এই সংস্থাগুলির কার্যনির্বাহী আধিকারিকদের অকল্পনীয় হারে প্রাচুর্য বৃদ্ধি। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, এইভাবেই সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রেই — অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামরিক — মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জয়ধ্বজা উড়ানোর পথ তৈরী করছে।

বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের গতিপ্রকৃতি

'বিশ্বায়নের দিকে জোর ধাক্কা' তত্ত্বটি ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়। ১৯৬০-র

দশকের শুরু থেকে বামপন্থী, জনপ্রিয় ও জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা সরে যেতে শুরু করে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আদিষ্ট বিশ্বায়নের সমর্থক, দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির হাতে, যার রাজনৈতিক ফলাফল ছিল এই 'জোর ধাক্কা'র তত্ত্ব। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই 'ধাক্কা'র তত্ত্বের কারণ হিসাবে শ্রমিক সংগঠনগুলির দুর্বল হয়ে পড়া ও পশ্চাদপসরণ এবং শ্রমিক শ্রেণী, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষক সমাজের প্রভাব হ্রাস পাওয়াকে চিহ্নিত করা যায়। ফলত, সমাজের ক্ষমতাশালী শ্রেণী — পুঁজিপতি ও তাদের সহযোগী যারা পুঁজি ও বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক চক্রের সাথে যুক্ত, বিশেষত লগ্নি পুঁজির ক্ষেত্র, এই বিশ্বব্যাপী প্রতি-বিপ্লবের মঞ্চ তৈরী করে তোলে। ফলে চিলি আর মেক্সিকোর মতো কিছু তৃতীয় বিশ্বের দেশে যা শুরু হয়েছিল, দাবানলের মতো সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ে।

মার্কিন আধিপত্যের অধীন পুঁজিবাদ বামপন্থী শাসনের 'বিপর্যয়' ও 'সঙ্কট' - এর সুযোগ শুধুমাত্র ব্যবহার করেনি, তারা তাদের 'ভবিষ্যৎ বাণীকে' সার্থক করার জন্য প্রতিমুহূর্তে তীব্রভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল। সুযোগ পেলেই তা কার্যকর করার জন্য ব্যাপক ভূমিকা নিয়েছিল; এ কাজে তারা প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ, মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, যুদ্ধাস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং ভ্যাটিক্যান ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থবাহী তথাকথিত মানব-হিতৈষী সংগঠনগুলোর সাথে রাজনৈতিক গাঁটছড়া বাঁধার কাজ করেছিল। উদাহরহণস্বরূপ, দক্ষিণ আমেরিকায়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা এসে সমস্ত প্রতিরোধকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতিসাধন করেছে। আফ্রিকা, অ্যাঙ্গেলা, মোজাম্বিক ও অন্যত্র মাথা তুলে দাঁড়ানো স্বাধীন শক্তিকে গুঁড়িয়ে দিতে ছদ্ম যুদ্ধ চালিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। রেগনের শাসনকালে, সোভিয়েত অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধাস্ত্র প্রতিযোগিতা চালু করা হয়েছিল যাতে গোটা সোভিয়েত ব্যবস্থাই তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। পূর্ব ইউরোপ, বিশেষত পোল্যান্ডে, ধ্বংসাত্মক প্রচার ও সি.আই.এ-র টাকা দেশীয় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর হাতে পৌঁছে দিতে ভ্যাটিক্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পূর্ব ইউরোপে, কোটিপতি শেয়ার দালাল জর্জ সোরোস লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করে চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী ও পোল্যান্ডে স্তাবক বুদ্ধিজীবী তৈরী করেছিল যারা পরবর্তীতে পুঁজিবাদপন্থী, ন্যাটো রাজনীতিপন্থী প্রচারক হয়ে ওঠে।

বিশ্বব্যপৃত এই নয়া পুঁজিবাদী শ্রেণী-র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার নীট প্রভাব ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ, বাজার ও শ্রমশক্তিকে পুঁজিবাদী শোষণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যে সমস্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবন্ধকতা ছিল তাকে দুর্বল করে তোলা এবং খনি, লগ্নি ও শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারী বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির মালিকানা গ্রহণ করা। মজুরি হ্রাসকরণ ও সামাজিক প্রকল্পগুলিতে অর্থ বরাদ্দ হ্রাস করে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আরও ধনী করে তোলার ক্ষেত্রে জাতি-রাষ্ট্রগুলির শক্তিশালী ভূমিকা ছিল; দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় যোগ দিয়ে আরও ধনী হয়ে উঠল। জাতি-রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা হারালেও, বিশ্বায়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক সমর্থক হয়ে উঠল। বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও পরবর্তীতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, ঋণ ও ধার দেওয়ার শর্ত হিসাবে 'অর্থনৈতিক সংস্কার'কে চাপিয়ে দিয়ে বিশ্বব্যাপী একতরফা নীতি চালু করে। জনবিরোধী ও শ্রমিকশ্রেণী বিরোধী কাঠামোগত সংস্কার নীতিগুলি পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষমতাকে আরও তীব্র করে তোলে পাশাপাশি, বেসরকারীকরণ ও বি-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জাতীয় গর্বের

প্রতিষ্ঠানগুলির উপর তাদের আধিপত্য কায়েম হয়। জাতিরাষ্ট্র ও তার সাম্রাজ্যবাদ-স্বার্থবাহী নীতিগুলিই বিশ্বায়নের দিকে "জোর ধাক্কা" তত্ত্বকে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয় উপাদান হয়ে উঠল।

শ্রম-পুঁজি সম্পর্ক দ্বারা আরোপিত নিয়ন্ত্রণ ছিল বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক নির্ধারক। মুখোমুখি সম্পর্কে পুঁজির অক্ষমতার মধ্যে মুনাফা সঙ্কোচন নিহিত ছিল। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায়, প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে, শ্রমশক্তি অতিরিক্ত অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায়ে সক্ষম হয়েছিল, যা মোট ব্যয়ের হিসাবে পুঁজির পাওনার উপর (পুঁজিবাদের কাছে) অগ্রহণযোগ্য বোঝা সৃষ্টি করে। বিদেশের উৎপাদনস্থলে কম ব্যয়ে উৎপাদনক্ষম বিনিয়োগের মাধ্যমে মজুরি-পুঁজি সম্পার্কে পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণী বিশ্বব্যাপৃত শ্রম বাজার সৃষ্টি করেছিল, যার মধ্য দিয়ে মুনাফার বৃদ্ধি ঘটে এবং স্থানীয় শ্রমবাজারে চাহিদার উপর নিম্নাভিমুখী চাপ সৃষ্টি হয়। এইভাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের, পুঁজিপতি শ্রেণীর পক্ষালম্বী, পুঁজি-শ্রম ভারসাম্যকে ধ্বংস করা হয়।

বিশ্বায়নের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্ধারকের প্রাথমিক ছবিতে প্রচলিত প্রযুক্তিগত বিপ্লবের স্থান কোথায়? নিশ্চিতভাবে, এক্ষেত্রে, প্রযুক্তিগত বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও প্রচুর অবদান আছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্ধারকের কাছে এই ভূমিকা নিশ্চিতভাবে গৌণ। এই সমস্ত আবিষ্কারই রাষ্ট্র-চালিত বা ভর্তুকি দেওয়া গবেষণার ফসল, যা পরবর্তীকালে বেসরকারী ক্ষেত্রে হস্তান্তর করা হয়েছে।

যাইহোক, শ্রম ও ভোগের বিন্যাস বুঝতে, দ্রুততম পথে আদানপ্রদান করতে — প্রভৃতি কাজে উচ্চ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের কথা অস্বীকার করলে তা অতিরঞ্জিত করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার, বর্তমান বিশ্বায়নবাদী শ্রেণী আরও বেশি করে গ্রহণ করছে, যার ফলে আরও বেশি আধিপত্য কায়েম করা ও শোষণ বৃদ্ধি করার পক্ষে তারা প্রভূত ক্ষমতাবান হয়ে উঠছে।

মার্কিন কর্পোরেট সংস্থাগুলির আধিপত্য

আজকের পৃথিবীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একতরফা প্রাধান্য এবং এর রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্যের সূচনা হয়েছে তার কর্পোরেট সংস্থাগুলির আধিপত্য থেকে। পুঁজিবাদী উন্নয়নের এই পর্যায়ে — সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যুগে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা প্রাধান্য ও চ্যালেঞ্জ আধিপত্য বিশ্বের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনজনিত অভাবনীয় ধাক্কার পর থেকেই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্রুত বৃদ্ধি ও হিংস্রতার সাক্ষ্য বহন করছে পরবর্তী দশকগুলির ইতিহাস।

৮ জানুয়ারী ১৯৯১ তারিখে 'ফিন্যান্সিয়াল টাইমস্' পত্রিকায় বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থাগুলির দ্বারা বাজার ব্যবহার সংক্রান্ত একটি 'সার্ভে রিপোর্ট' প্রকাশ করা হয়, যেখানে দেখা গেছে, বিশ্বের ৫০০টি বৃহত্তম সংস্থার মধ্যে ২৪৪টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ৪৬টি জাপানের ও ২৩টি অবিভক্ত জার্মানীর। যদি সমগ্র ইউরোপের সংখ্যা যোগ করা হয় তবে তার সংখ্যা ১৭৩ — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থার সংখ্যা থেকে অনেক কম। এই প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় জাপানী পুঁজিবাদ নয়, ইউরোপীয় পুঁজিবাদই মার্কিন কর্পোরেটের বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জাপানের ক্ষমতার হ্রাস ঘটেছে ১৯৯৮ সাল থেকেই, যখন দেখা যায়, বিশ্বের বৃহত্তম ৫০০টি সংস্থার মধ্যে মার্কিনী সংস্থার সংখ্যা ২২২ থেকে বেড়ে ২২৪ টি হয়েছে, সেখানে জাপানী সংস্থার সংখ্যা ৭১ থেকে

কমে হয়েছে ৪৬টি। এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ পরবর্তী কয়েক বছরে মার্কিনী বহুজাতিক সংস্থাগুলি বহু সংখ্যক জাপানী, কোরিয়ান, থাই সহ অন্যান্য দেশের সংস্থাগুলিকে কিনে নিয়েছে।

আমরা যদি সর্ববৃহৎ ২৫টি সংস্থার দিকে তাকাই, যাদের সম্মিলিত পুঁজির পরিমাণ ৮৬ বিলিয়ান ডলার, তাহলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। এই মোট পুঁজির ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ২৬ শতাংশ ইউরোপীয় দেশগুলি এবং মাত্র ৪ শতাংশ নিয়ন্ত্রক জাপান। যদি সর্ববৃহৎ ১০০টি সংস্থার হিসাব নেওয়া যায়, তবে তার মধ্যে ৬১ শতাংশ মার্কিনী সংস্থা, ৩৩ শতাংশ ইউরোপীয় সংস্থা এবং মাত্র ২ শতাংশ জাপানী সংস্থা। বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিশ্ব অর্থনীতিকে যত বেশি করে নিয়ন্ত্রণ করবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেট আধিপত্য তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। এখনও পর্যন্ত দেখা গেছে অধিগ্রহণ বা সংযুক্তির মাধ্যমে বৃহৎ সংস্থাগুলি ছোট সংস্থাগুলিকে দখল করছে; এর থেকে আশা করা যায় পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও একত্রীকরণের লক্ষ্যে এই দখলদারীর খেলায় মার্কিনী সংস্থাগুলির ভূমিকাই মুখ্য।

পুঁজির এই একত্রীভবন ও কেন্দ্রিভবনের মাধ্যমে মার্কিনী বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাত ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, পৃথিবীর বুকে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য কায়েম করছে এবং এর ফলে ইউরোপের পুরানো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ভৃত্যবৎ আচরনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার অধুনা বড় ভাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মান্য করে চলতে বাধ্য হচ্ছে।

গত কয়েক বছরের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর দিকে তাকালে দেখা যায় ইরাক, যুগোশ্লোভিয়া ও আফগানিস্তানের উপর নির্মম সামরিক আগ্রাসনে তথাকথিত বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ভূমিকা কি ছিল, বিশেষত 'ন্যাটো'র ভূমিকা কি ছিল; এই ঘটনাবলীই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া আধিপত্যের বক্তব্যকেই সমর্থন করে।

দ্বন্দ্বের সৃষ্টি ও প্রতিরোধ

পুঁজিবাদী শোষণ কখনই অপ্রতিহতভাবে কার্যকরী হয় নি। শোষণের ইতিহাসের শুরু থেকেই প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। মার্কসের ভাষায় সর্বহারা শ্রেণীর হাতেই পুঁজিবাদের কবর খোঁড়া হয়। মার্কসের এই ভবিষ্যৎবাণী আজকের পৃথিবীতে যেভাবে মিলে যাচ্ছে তা আর কোন দিনই হয় নি।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রেই সর্বহারা শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে অতি দ্রুত — উৎপাদনের উপাদান থেকে প্রত্যক্ষ উৎপাদকের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে, লক্ষ, কোটি কর্মহীন মানুষ সৃষ্টি করে. অস্থায়ী ও অপ্রচলিত ক্ষেত্রে শ্রমিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে, কৃষককে চরম দুর্দশার মধ্যে নামিয়ে এনে এবং সর্বোপরি দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ আর শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক শ্রেণীকে চরম শোষণের শিকার বানিয়ে পুঁজিবাদ এই তালিকাকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রের মানুষই, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যূপকাষ্ঠে নির্বিচারে বলি হচ্ছে। এর হাতেই কবর খোঁড়া হচ্ছে এই 'বিশ্বায়ন'কে নিক্ষেপ করার জন্য।

সুতরাং এই সমস্ত সর্বহারা মানুষের শ্রেণীগত প্রতিরোধ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে।

প্রথমত, যখন নির্বাচন পদ্ধতি প্রতিরোধের উৎস ছিল, সংসদ-বর্হিভূত কর্মসূচীর মধ্যে দিয়েই বিশ্বায়নবাদী নীতির বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেত। যখন থেকে বিশ্বায়ন-বিরোধী শক্তি নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে এবং/অথবা বিশ্বায়নের প্রভাব সংসদীয় রাজনীতির উপর পড়েছে, তখন থেকেই বিশ্বায়নের

প্রভাব এতটাই আধিপত্য বিস্তার করেছে যে আগেকার বিপ্লবী শক্তি, এমনকি বামপন্থী দলগুলিও সংসদীয় ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না গড়ে তুলে, ভবিষ্যতকেই মেনে নিয়েছে।

এর ফলে, বিশ্বায়নের বলি বেশিরভাগ শ্রেণীই সংসদ-বর্হিভূত কর্মসূচী পালন করছে ও নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলেছে; ফ্রান্স, ইতালি, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ; এমন কি ভারতবর্ষ, ব্রাজিলের কৃষিজীবী মানুষ প্যারাগুয়ে, এল সালভাদোর, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, গুয়েতেমালা প্রভৃতি দেশের জনগণ বারংবার সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের ঝড় তুলছে; ভেনেজুয়েলা, ডোমিনিকান সাধারণতন্ত্র, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের নাগরিক বিদ্রোহ এবং মেক্সিকো, কলম্বিয়া, পেরু, জাইরে প্রভৃতি দেশের গেরিলা আন্দোলন বিশ্বায়নের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে। সংসদীয় দলগুলির অক্ষমতা ও অসততার কারণেই এই সংসদ বর্হিভূত আন্দোলনকে প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে আঁকড়ে ধরছে সাধারণ মানুষ।

বিশ্বায়নবাদী শাসক শ্রেণীর হাতে সাধারণ মানুষের যে অধিকার ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, বিরোধীশক্তি তা রক্ষার জন্য আন্দোলন করছে। কর্মচ্যুতি, বেসরকারীকরণ বা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর, জীবনযাত্রার মানের, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধার ছাঁটাই বা শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য সরকারী ব্যবস্থার বিলোপ করার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে, সেগুলিই বিশ্বায়ন বিরোধী তীব্র আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর। বিশ্বায়নবাদীদের দ্বারা মুনাফার নতুন উৎসের সূচনা আয়-ব্যয় ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে। পুরানো জনপ্রিয় নীতি অভিমুখী এই সাধারণ প্রতিরোধের মধ্যেও কিছু আন্দোলন গড়ে উঠেছে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের দাবীতে — চিয়াপাস ও মেক্সিকোর কৃষক আন্দোলন, ব্রাজিলের ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের আন্দোলন, চাপারে, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশের কোকো চাষীদের আন্দোলন, কলম্বিয়ার কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদি এই প্রতিরোধের উদাহরণ হিসাবে উঠে এসেছে।

সংখ্যালঘু হলেও, এই প্রতিবাদী জনতার ভীড়ে একটা অংশ সৃষ্টি হয়েছে যারা প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বায়ন-বিরোধী, এমন কি পুঁজিবাদ-বিরোধী মতালম্বী। তার উপরে, নভেম্বর '৯৯-এর সিয়াটেল থেকে জুন-২০০১-এর জেনোয়া পর্যন্ত বিশ্বায়ন-বিরোধী, পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনগুলি প্রমাণ করে দুনিয়াজোড়া শ্রমিক শ্রেণীর এক নতুন আন্তর্জাতিকবাদ সৃষ্টি হয়েছে।

পল সুইজি সঠিকভাবেই বলেছেন, "(কিন্তু) সাম্রাজ্যবাদের যুগে, পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন মানেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন।"

যাইহোক, বিশ্বায়ন বিরোধী এই আন্দোলন, মহাদেশ থেকে মহাদেশে, দেশ থেকে দেশে সমানভাবে হচ্ছে না। ইউরোপের, বিশেষত ফ্রান্সের প্রতিরোধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরোধের তুলনায় অনেক এগিয়ে। ব্রাজিল আর মেক্সিকোর প্রতিরোধ চিলি আর পেরুর তুলনায় অনেক বেশি। এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের প্রতিরোধ অনেক তীব্র।

প্রতিরোধের তীব্রতা কতখানি হবে তা নির্ভর করে রাজনৈতিক সচেতনতা, সংগ্রামের ঐতিহ্য, গণসংগঠনগুলির আভ্যন্তরীণ গঠন এবং প্রশাসনিক স্তরে অন্তর্ভূক্ত বিরোধী শক্তির উপর।

সুতরাং, এখন প্রশ্ন ওঠে, এই পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামকে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিরোধী লড়াই সংগ্রামের রূপ দেওয়া যায়।

বিকল্পের সন্ধান

বিশ্বায়ন বিরোধী শক্তি বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধান করছে; কিন্তু এই ব্যবস্থা কি হবে তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে, বর্তমান পর্যায়ের হিংস্র, পুঁজিবাদী শোষণের একমাত্র বিকল্প সমাজতন্ত্র। কিন্তু এ বিষয়েও স্পষ্টতার অভাব রয়েছে। বিশেষত সোভিয়েত ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বিহ্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।

মার্কস সমাজতন্ত্র বলতে কখনই কোন নির্দিষ্ট সামাজিক গঠনকে বোঝান নি। মূল বিষয় হল, পুঁজিবাদী শোষণের সমাপ্তি। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়াও বর্তমান বিশ্বেও অন্য অনেক সমাজতন্ত্রী দেশ রয়েছে — চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া এবং কিউবা। এই প্রত্যেক দেশেই সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি সমান নয়। প্রত্যেক দেশই তার ঐতিহাসিক শর্তাবলী ও দেশের চরিত্র অনুযায়ী নিজেদের সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছে।

এইভাবে, বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের হিংস্র শোষণকে প্রতিরোধ করতে, অনেকেই বিকল্পের সন্ধান করছে। এই বিষয়ে কোন মত পার্থক্য নেই। এই সন্ধান প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধারার মধ্যে একটি রূপালীরেখা দেখা যাচ্ছে — প্রত্যেক ধারার শেষ লক্ষ্য সমাজতন্ত্র এবং এই কারণে "মার্কসের কাছে ফিরে চল" শ্লোগান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। এই কাজে সময়ের প্রয়োজন এবং আরও তীব্র লড়াই সংগ্রামের পথ ধরে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বিশ্বায়নের স্পষ্ট বিকল্প রূপে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুসন্ধানে

আজকের পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রূপ অনেক হিংস্র ও তীব্র আক্রমণাত্মক; তার রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির কাছে বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুর্জোয়া সরকার আত্মসমর্পণ করেছে। এখন এই প্রশ্ন উঠতে পারে এমন এক আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কি বাস্তবে সম্ভব।

প্রশ্ন হল ঃ কোন একটি দেশই বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে দাঁড় করাতে পারবে, নাকি দেশগুলি একত্রিত হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে? ইউরো-মার্কিন মতাদর্শের শক্তি ও একচেটিয়া ব্যবসাকারী দেশীয় প্রচার মাধ্যমের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর পাল্টা প্রচার গ্রামের ও শহরের দরিদ্র মানুষকে প্রভাবিত করতে পারবে কি? নতুন করে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করা সম্ভব কি?

আরও একটি প্রশ্ন উঠে আসে যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডকে সহায়তা দিত শক্তিধর সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন; এই দেশের অস্তিত্ব বিলোপের পরেও বিপ্লবী কার্যকলাপকে সাফল্যের সাথে চালনা করা কি সম্ভব।

পূর্ববর্তী সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিরোধ এবং জনপ্রিয় বিপ্লবী কর্মসূচীকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে উপরের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে সুবিধা হবে।

আজ পর্যন্ত, পৃথিবীর বুকে যতগুলি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে বা পরীক্ষামূলকভাবে বিপ্লবী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিই ছিল কোন না কোন যুদ্ধের ফসল — সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী ও নির্যাতিত মানুষের যুদ্ধ অথবা ঔপনিবেশিক বা প্রায় ঔপনিবেশিক শাসনে অত্যাচারিত মানুষের যুদ্ধ। ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের ফলাফল ছিল বিখ্যাত 'প্যারিকমিউন'। 'প্যারিকমিউন' মাত্র কয়েকমাস স্থায়ী হলেও, এর সংগঠন, আইন প্রণয়ন, এমনকি এই বিপ্লব যে সমস্ত ভুল করেছিল তার প্রত্যেকটি, মার্কস ও

লেনিনের দ্বারা বিপ্লবী তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়ে ব্যবহারিক মডেলের কাজ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামরিক আগ্রাসনের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, জনজাতির বিতাড়ন, দুর্ভিক্ষ এবং ধ্বংসের পথ বেয়ে হাঙ্গেরি, বাভারিয়া, ফিনল্যান্ড এবং রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়; যদিও রাশিয়ার 'মহান নভেম্বর বিপ্লব' ছাড়া অন্য কোন সমাজতন্ত্র টিকে থাকে নি।

যুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুনরুত্থান ঘটেছিল, এবং এই শক্তির সাথে দ্বন্দ্বে ও জয়ের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে সেই সমস্ত দেশে যারা ছিল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ও ব্যাপকভাবে শোষিত (উদাহরণস্বরূপ চীন, ইন্দো-চীন, কোরিয়া)।

কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামী নেতৃত্বের মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত বিপ্লব সফল হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্স ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে অভাবিত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ভিয়েতনামকে আধুনিক মহাকাব্যের মহানায়কের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে; প্রায় ৫ লক্ষ মার্কিন সেনাবাহিনীর আক্রমণ, আধুনিক বোমারু বিমানের 'কার্পেট বোম্বিং' ও ব্যাপক ধ্বংসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে ভিয়েতনামের বিপ্লবী জনগণ তাদের জয়ধ্বজা উড়িয়ে রেখেছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নাকের ডগায় অবস্থিত দেশ কিউবার উদাহরণই ধরা যাক — মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস, প্রতিবিপ্লব, গুপ্তহত্যা এবং তীব্র অর্থনৈতিক-অবরোধের পরিকল্পনাকে প্রতিহত করে ঐ ছোট্ট দেশটি তার বিপ্লবী কর্মসূচী পূরণ করেছিল এবং সেই বিপ্লবকে ধরেও রেখেছে।

বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পরেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য হস্তক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও ঐ সমস্ত দেশ তাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যের সাথে ধরে রাখতে পারছে।

এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা কোন বিষয় ছিল না, কারণ ঐ দেশগুলির কোনক্ষেত্রেই বিপ্লবের শুরুতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন সাহায্যই করে নি, যদিও বিপ্লবোত্তর সমাজে ঐ দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সোভিয়েত ইউনিয়ন অকুণ্ঠ সহায়তা করেছিল। ঐ সমস্ত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য ছিল মতাদর্শগত এবং যুক্তিসঙ্গত।

ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বৈপ্লবিক সংগ্রাম

বর্তমান আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, একশ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতবর্ষ, অন্যতম শোষিত ও দুর্দশাগ্রস্ত।

বিগত এক দশক ধরে ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চালু হয়েছে যার ফলে এই বৃহৎ দেশে দ্রুত বি-শিল্পায়ন ঘটছে ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে — প্রথমত, নৈরাশ্য ও আত্মসমর্পণের মনোভাব এবং অনিবার্যতা বা "অন্য কোন উপায় নেই" লক্ষণ দেখা দেওয়া। অন্য প্রতিক্রিয়া হল, এই হিংস্র শোষণবাণী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে আপসহীন প্রতিরোধ ও চরম গণসংগ্রাম গড়ে ওঠা।

অন্য আর একধরনের প্রতিক্রিয়া, সারা বিশ্বের মতোই, ভারতবর্ষেও দেখা যাচ্ছে — বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষকে ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতিদাঙ্গা ও প্রাদেশিকতার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের বুকে ভয়ঙ্করভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

মার্কসের বিপ্লবী তত্ত্ব আর বিভিন্ন বৈপ্লবিক কর্মসূচীর ক্ষেত্রে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ, পুঁজিবাদী শোষণ আর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে অনমনীয় ও সংগঠিত প্রতিরোধকে শিক্ষিত করে। ব্যাপকভাবে গণচেতনা গড়ে তুলতে এবং গণসংগ্রাম সংঘটিত করতেও মার্কসবাদের শিক্ষা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, যারা মার্কসবাদে বিশ্বাস করেন এবং শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সংগঠন বা গণসংগঠনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলনের শরিক হয়েছেন, তাদের প্রত্যেককেই ঐতিহাসিকভাবে জোটবদ্ধ হতে হবে এবং পুঁজিবাদী শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় শোষণ ও নির্যাতনকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীগত ঘৃণা ও শ্রেণীগত প্রতিহিংসা গড়ে তুলতে, তাদের বিরুদ্ধে ক্রোধে জ্বলে উঠতে; ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে সাংগঠনিক ও মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বৈপ্লবিক সংগ্রামের লক্ষ্য ভিত্তিক শর্তাবলী পরিণত হচ্ছে। এই প্রচলিত ব্যবস্থার শিকার হয়ে অনেক বেশি বেশি মানুয এই সংগ্রামে যোগদান করছে। পুঁজিবাদ হয়তো লাগামছাড়া, সাম্রাজ্যবাদ হয়তো ভয়ংকর, কিন্তু বৈপ্লবিক চেতনায় জ্বলে ওঠা সাধারণ মানুযের কাছে, এদের পরাজয় নিশ্চিত। এই সংগ্রামের পথে নেতৃত্ব দিতে হবে কমিউনিস্টদের এবং অন্যান্য বামপন্থী ও অগ্রগামী শ্রেণীকে, যারা বৈপ্লবিক লক্ষ্যের প্রতি নিবেদিত প্রাণ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. কার্ল মার্কস — ম্যানিফেস্টো অফ কমিউনিস্ট পার্টি ও ক্যাপিটাল (৩য় খণ্ড);
২. জেমস পেত্রাস ও হেনরি ভেল্ট মেয়ার — গ্লোবালাইজেশন আনমাস্‌কড্‌;
৩. ভি. আই. লেনিন — ইম্পিরালিজম্‌ দ্য হাইয়েস্ট স্টেজ অফ্‌ ক্যাপিটালিজম্‌;
৪. ডেভিড এন. গিব্বি — ওয়াশিংটনস্‌ নিউ ইন্টারন্যাশালিজম, হেজিমনি এন্ড ইন্টার-ইম্পিরালিস্ট রাইভালরিস্‌,
৫. ইস্তভান মেজারোস — সোস্যালিজম অর বারবারিজম,
৬. পল ব্যারন — দা পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ্‌ গ্রোথ;
৭. পল এম. সুইজি — দ্য ওয়ে অফ্‌ ক্যাপিটালিস্ট ডেভেলপমেন্ট।

ভাষান্তর ঃ জয়দীপ ভট্টাচার্য

এই গ্রন্থের জন্য ইংরেজীতে লিখিত প্রবন্ধটির শিরোনাম 'Globalization and Imperialism'।

ডব্লু টি ও
কৃষিচুক্তি ও উন্নয়নশীল দেশে তার প্রভাব

মোগেনস বুখ হানসেন

Trade theory is about identifying whose hand is in whose pocket and trade policy is about who should take it out. – J. M. Finger)

ভূমিকা

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ে চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নভেম্বর, ২০০১ সালে কাতারের রাজধানী দোহা শহরে। এই প্রান্তিক আরব রাষ্ট্রকে বৈঠকের জন্য নির্বাচিত করার পিছনে বিভিন্ন কারণ ছিল। '৯৯ সালে সিয়াটেল শহরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ভেতর ও বাইরে থেকে নানা হুমকি ও ঝামেলার সামনে পড়তে হয়েছিল। সে সময়ে বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র ও সাধারণ মানুষের মনে এই সংস্থা সম্পর্কে সন্দেহ ছিল, পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকেও খুব অল্প সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার উপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চলে। বিভিন্ন কারণে বিশ্বায়নের চালিকা শক্তি হিসাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে প্রতিভাত করার জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এই আরব রাষ্ট্রকে খোঁজা হয়েছিল। পশ্চিমী দুনিয়ার ইচ্ছায় তাই বৈঠকস্থল হল কাতার।

১৯৯৪ সালে, উরুগুয়ে পর্যায়ের আলোচনার শেষ পর্বে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। কৃষি বিষয়কে একটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গণ্য করার প্রস্তাবও সেই পর্বে গৃহীত। উন্নত দেশগুলি, বিভিন্ন আলোচনা পর্বে, নানা রকম চাপ ও বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চালিয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর। স্বভাবত শুরু থেকেই উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেদেরকে অপাংক্তেয় ও গুরুত্বহীন সদস্য-রাষ্ট্র ভেবেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও মুক্ত বাণিজ্য প্রবক্তাদের তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি হল তাদের নিও-ক্লাসিক্যাল বা 'নব্য ধ্রুপদি অর্থনৈতিক তত্ত্ব'। এই মতবাদের মূল কথা অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু হলে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব এবং এই ব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দেশের কৃষি ও শিল্পে উন্নয়ন ঘটবে এবং দারিদ্র্য দূর হবে। এই মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা যোশেফ স্টিগলিৎস-এর বক্তব্য, সত্যিকারের অবাধ বাণিজ্য উন্নয়নশীল দেশগুলির যথার্থ উপকার করবে।

তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন, উন্নত দেশগুলির নানা কপটতার ফলে এখন পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অবাধ বাণিজ্যের পথে বিশেষ লাভ হয়নি।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার, বাণিজ্যিক সংক্রান্ত বিষয়ের মূল তিনটি ভিত্তি হল— রপ্তানি বিষয়ে ভর্তুকি, আভ্যন্তরীণ বাজারে সহায়তা প্রদান ও তৃতীয়ত, বিভিন্ন বাজারে সহজে প্রবেশের রাস্তা। তিনটি মূল বিষয়েই দেখা যাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির সামনে সমস্যার পাহাড়। প্রথমত আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের নিজেদের কৃষিক্ষেত্রে যে পরিমাণ রপ্তানি ভর্তুকি দিয়ে থাকে, উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে তা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল বেশ কিছু দেশে এখনও অবাধ বাণিজ্যিক বাজারের পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি। তৃতীয়ত আমেরিকাসহ উন্নত দেশগুলি নানাভাবে চাপের খেলা খেলে, উন্নয়নশীল বিশ্বে নিজের বাজার দখল করে নিয়েছে, অন্যদিকে নিজেদের বাজারে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রবেশের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য উন্নত দেশগুলি, খাদ্য বিষয়ে সহায়তা দেবার অছিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলির বাজারকে নিজেদের কৃষিপণ্যের আবর্জনা ফেলার আস্তাকুঁড়ও বানিয়ে ফেলেছে।

কৃষি বিষয়ক চুক্তির, একটা মূল কথা হল, কৃষি বাণিজ্যের উদারীকরণ এর জন্য নানা প্রতিবন্ধকতা দূর করে মুক্ত বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা। উন্নত বিশ্ব এ ব্যাপারে মুখে এক, কাজে ভিন্ন। তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে এমনকি কৃষিতেও সরকারি ভর্তুকি কমিয়ে আনতে হবে, অবাধ বাণিজ্যের স্বার্থে। অথচ OECD ভুক্ত দেশগুলি নিজেদের ক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি করেছে। ১৯৮০ সালে ঐ দেশগুলিতে ভরতুকির অঙ্ক ছিল ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯৯৯ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩৬০ বিলিয়ন ডলার।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ২০ কোটিরও বেশি কৃষিজীবী মানুষ এখনও সনাতনী প্রথায় চাষ-আবাদ করে। কৃষিকাজ তাদের কাছে কেবল মাত্র একটা জীবিকা নয়, এটা তাদের সামগ্রিক জীবন চর্চার অঙ্গ, এই কাজের সঙ্গে তাদের ধর্ম, বিশ্বাস, আচার-আচরণ জড়িত। আজকে পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু সনাতনী প্রথায় কৃষি কাজে এই পরিবেশ রক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। কৃষিকে পণ্য হিসাবে, অন্যান্য উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে এক করে দেখার যে তত্ত্ব, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা উপস্থাপন করেছে তাতে উন্নয়নশীল দেশের কৃষকরা আশাহত, তাদের সনাতনী ধ্যানধারণা ধাক্কা খাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ উন্নত বিশ্ব, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মকানুনগুলি সহজ করার জন্য কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন উপধারা তৈরি করেছে। তারা প্রকাশ্যে বলছে রাষ্ট্রসংঘের নিয়মকানুন বেশ জটিল, তাই এখানকার নিয়মগুলি সহজ করা প্রয়োজন। এজন্য করা হয়েছে, Trade Related Intellectual Property Right (TRIPS), Trade Related Investment Measures (TRIM), Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS), Environmental Standards (ES) প্রভৃতি (বাংলায় এদের কারোর নাম ব্যবসা সম্পর্কিত মেধা সম্পত্তির অধিকার (TRIP), করো নাম ব্যবসা সংক্রান্ত বিনিয়োগ পদ্ধতি (TRIM) ইত্যাদি)।

জেনেভা সহ বিভিন্ন স্থানে মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকগুলিতে নব্যধ্রুপদি অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে কৃষিতে যা চালু করার চেষ্টা হচ্ছে, তা মূলত উদারীকরণের মাধ্যমে। বিভিন্ন দেশীয় ও

আঞ্চলিক ব্যবস্থা ও ধ্যানধারণাগুলো ভেঙ্গে এক মার্কিন পুঁজিব্যবস্থা চালু করা। উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিকাঠামো ও তাদের বৈচিত্রময় ধ্যানধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

কৃষি সম্পর্কিত চুক্তির পশ্চাদপট

৫০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুমকি দেয় যে তাদের কয়েকটি অতিরিক্ত স্পর্শকাতর কৃষিপণ্যের উপর সংরক্ষণ মূলক ব্যবস্থা বজায় রাখতে না দিলে তারা গ্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। এই অবস্থায় গ্যাট থেকে কৃষি বাদ পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সময়সীমা নির্দিষ্ট না করে কৃষিপণ্যে ছাড় দেওয়ায় অন্যান্য কৃষিপণ্য প্রস্তুতকারক দেশগুলোতেও আইন শিথিল করা হয়। উন্নত বিশ্ব নিজেদের কোলে ঝোল টেনে নানা ভাবে নিজেদের কৃষিকে সংরক্ষিত করে। নানা সংরক্ষণ ও প্রচুর ভরতুকি ব্যবস্থার মাধ্যমে ৭০ দশকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন খাদ্য আমদানিকারক দেশ থেকে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়। মার্কিন কৃষিব্যবস্থাও সংরক্ষিত ও প্রচুর ভর্তুকিতে সমৃদ্ধ। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে কৃষিপণ্যের রপ্তানিতে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়। পাশাপাশি উন্নত দেশগুলোতে কর দাতাদের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে উন্নত রপ্তানিকারক দেশগুলি তাদের অপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলিতে খাদ্য সহযোগিতার নামে কৃষিপণ্যের আস্তাকুঁড় গড়ে তোলে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের গোমাংস বছরের পর বছর রপ্তানি করে পশ্চিম আফ্রিকায় পশু মাংসের বাজারকে ধ্বংস করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত বাজরায় বলিভিয়ার বাজার ভরে উঠেছে।

আশির দশকে, উদ্বৃত্ত কৃষিজাত পণ্যের বাজার দখল নিয়ে দুই মহাশক্তির মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। অসংশোধিত তেল উৎপাদনকারি দেশগুলি বেশি বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল খাদ্য আমদানির উপর। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, এমনিতেই গরিব, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশেও খাদ্যাভাব দেখা দেয়। সুযোগ বুঝে উন্নত বিশ্ব, বিভিন্ন কর্মসূচীর নাম দিয়ে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কপটতা করে, নিজেদের উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্যের বাজার তৈরি করে নেয়। এভাবে চলতে চলতে ৮০ দশকের শেষ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন দুই শক্তিই বুঝতে পারে যে পারস্পরিক বাণিজ্য যুদ্ধে কোনো পক্ষেরই লাভ নেই। তখন এই দুই শক্তি নিজেদের মধ্যে এক হয়ে, (১৯৯৮) কৃষিকে উরুগুয়ে মন্ত্রীপর্যায়ে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হয়, এবং কর্তাদের মর্জিমত তা আলোচনাতেও আসে (১৯৯২)। নানা চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং স্থির হয় ২০০০ সালে কৃষিচুক্তির বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে।

'৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীপর্যায়ের সিয়াটেল বৈঠকে প্রতিনিধিরা ঐকমত্য না হওয়ায় পুনরায় আলোচনা অগ্রসর হয়নি।

এর মূল কারণ, চুক্তি অনুযায়ী উন্নয়নশীল বিশ্বে কৃষিক্ষেত্রে যেসমস্ত পরিবর্তন আনা হয়েছিল, তাতে তাদের বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। এই চুক্তি সম্পর্কে তারা অনিশ্চয়তা ও অখুশি মনোভাব প্রকাশ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলির মূল কথা, তাদের দেশের কৃষিতে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেবার কথা বলা হয়েছে, উন্নত বিশ্বের কৃষিতে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরঞ্চ তারা উল্টোদিকের যাত্রী। অন্যদিকে, তাদের জন্য যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি উন্নত বিশ্ব ঘোষণা করেছিল তাও রক্ষা করা হয়নি। তাদের ধারণা তারা প্রতারিত। দোহায় মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে, বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশই নতুন পর্যায়ে আলোচনায় যাবার আগে, ইতিমধ্যে গৃহীত

বিষয়গুলির পরিষ্কার ব্যাখ্যা দাবি করে। বিভিন্ন দেশের প্রয়োগের পটভূমির বিভিন্নতায়, উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষিউন্নয়ন ও নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ ঘটেনি। যোশেফ স্টিগলিৎসের মত, নব্য উদারনৈতিক অর্থনীতির প্রবক্তরা বারে বারেই বলেছেন বিশ্ববাণিজ্যের উদারীকরণের মাধ্যমে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ারে উন্নয়নশীল দেশগুলির বেশি লাভ হবে। তাঁরা অবশ্যই এই অর্থনীতির ভুল-ত্রুটি বিশেষত অসম বাজার ও অসম প্রতিযোগিতার, দিকে দৃষ্টি দেবারও কথা বলেছেন। এই অর্থনীতির প্রবক্তরা আরও জানিয়েছেন নিম্নমানের শুল্ক আরোপের মাধমে উন্নত বিশ্ব নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করেছে। এগুলি দূর করা দরকার। এক মার্কিন অর্থনীতিবিদের ধারণা, পরিপূর্ণভাবে উদারীকৃত বিশ্ববাজার হয়ে উঠবে পৃথিবীর স্বর্গ। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে উদারীকরণ করার পথে যে সমস্ত অসম ব্যবস্থা রয়েছে, তা দূর না করেই, বিশ্ববাজারকে উদারীকরণের চেষ্টায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের ক্ষেত্র ক্রমশই ধ্বংসের পথে চলেছে, তাদের আত্মনির্ভরতার পথও বন্ধ হয়েছে।

রপ্তানির স্বক্ষমতা

জাতীয় স্তরে, আর্থিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা বেশি। আদর্শ বিশ্ব পরিবেশে কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণগুলি নিয়োজিত হবে তার প্রাকৃতিক সম্পদের স্বধর্ম অনুসারে। কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশ আছে, যাদের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক অনুকূলতা কৃষি উৎপাদনের অনুকূল। এই দেশগুলির রপ্তানি বাণিজ্যেরও একটা ঐতিহ্য আছে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশকে আমরা এই পর্যায়ভুক্ত করতে পারি। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও এই দেশগুলো কিন্তু রপ্তানি বাণিজ্যে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। কারণ উন্নত বিশ্ব অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে সরকারি ভরতুকি ও আভ্যন্তরীণ সহায়তা দেওয়া হয়। ফলে প্রতিযোগিতার অসমতায় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা পিছিয়ে পড়ে। আর্থিক দৃষ্টি থেকে দেখলে উন্নয়নশীল দেশে কৃষিকে রপ্তানিমুখী পণ্যের অনুকূলে গড়ে তুললে তুলনামূলকভাবে লাভ বেশি। কিন্তু পরিবেশগত ও রাজনৈতিক, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, এই ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে কম লাভজনক। কারণ উদারীকৃত বাজারে বিশ্বায়ন ঘটবে। উৎপাদন হবে বৃহদায়তনে, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার হবে নিগূঢ় এবং মূলধনের কেন্দ্রীভবন ঘটবে। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন নানা পরিবেশগত সমস্যারও উদ্ভব হবে। শেষকথা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি নিঃশেষিত হয়ে, কৃষি শ্রমিকে পরিণত হবে।

উদারীকরণ : প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব

অর্থনীতিবিদ যোশেফ স্টিগলিৎস বলেছেন, বাণিজ্যে উদারীকরণ করা হলে এবং এমনকী তা একটা দেশে একতরফাভাবে করলেও তুলনামূলকভাবে সেই দেশ লাভবান হবে। কোনো একটি ক্ষেত্রে, কাজের সুযোগ সংকুচিত হলে, অন্য ক্ষেত্রে সুযোগ বৃদ্ধি হবে এবং নতুন ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মীনিয়োগ বাড়বে। তত্ত্বগতভাবে কথাটা ঠিক হলেও, বাস্তবে ব্যাপারটা এভাবে খাটে না। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নপর্বে দেখা গেছে জৈব সার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শ্রমের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়েছে। ইতিমধ্যে ঐ সব দেশে বৃহদায়তন শিল্প চালু হয়েছে এবং তা ছিল শ্রম-নির্ভর, ফলে কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমিক, শিল্প শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় আর তা সম্ভব নয়

কারণ এমনিতেই শিল্পক্ষেত্রে শ্রম সঙ্কোচন হচ্ছে এবং আজকের বৃহদায়তন শিল্প শ্রমনির্ভর নয়, উন্নত প্রযুক্তি-নির্ভর। নব্য উদার-অর্থনীতির প্রবক্তাদের নির্দেশ অনুযায়ী বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে 'Structural Adjustment' এর নামে অর্থ সাহায্য ও ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছে। এই ঋণ ও সাহায্য দেবার প্রাথমিক শর্ত হল গ্রহিতা দেশকে সরকারি ক্ষেত্রে কর্মী সংকোচন করতে হবে। এই ব্যবস্থায় কৃষিতে আধুনিকীকরণের ফলে শ্রম সংকোচন হবে, সরকারি কর্মী উদ্বৃত্ত হয়েছে, শিল্পক্ষেত্রের দরজাও বন্ধ। মানুষ যাবে কোথায়? কি কাজ করবে?

সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাঙ্কের এক সমীক্ষায় প্রকাশ হয়েছে, উদারীকরণের নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পদ্ধতিগত পরিবর্তনের জন্য, বাড়িঘর, অফিস, যন্ত্রপাতি, অফিসারদের প্রশিক্ষণ, আইনিব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, স্বাস্থ্যপরিষেবা ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, কোনো কোনো স্বল্প উন্নত দেশের তা গোটা একবছরের উন্নয়ন বাজেটের চেয়েও বেশি। সম্প্রতি এশিয়ার উন্নত দেশগুলির আর্থিক বাজারে মন্দা নেমেছিল। আর্থিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ঐ দেশগুলির আর্থিক ব্যাপারে কোনো রকম পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা না করে, অতিদ্রুত আর্থিক ক্ষেত্রের উদারীকরণের ফলেই এই মন্দা অবস্থা।

বাজারে প্রবেশের পথ

থাইল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়ার মত কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ, শুধুমাত্র ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের দরজা খোলা চাইছে না, তারা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের গড়ে ওঠা বাজারেও প্রবেশ চাইছে। এই দেশগুলোর কৃষি উৎপাদন, রপ্তানি কেন্দ্রিক, সেই কারণে এইসব দেশ নিজেদের দেশে আমদানি শুল্ক কম করতে রাজি। বিনিময়ে তাদের দাবি থাকছে, তাদের কৃষিপণ্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক কমাতে হবে। কৃষিপণ্যে রপ্তানির কোটা বাড়াতে হবে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এই ব্যবস্থায় নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের লাভ হলেও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ক্ষতি, অন্যান্য দেশগুলির খাদ্য উৎপাদনে দেশীয় স্বয়ং সম্পূর্ণতা নষ্ট হবে, কৃষি উৎপাদন সামগ্রিকভাবে হ্রাস পাবে। দ্বিতীয়ত, পুরানো খাদ্যাভাসের বদলে নতুন খাদ্য গ্রহণে মানুষ প্রলোভিত হয়। আমদানিকৃত এই খাদ্য অনেক ক্ষেত্রেই অস্বাস্থ্যকর বলে জানা গেছে। ভারত, জামাইকা, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে সস্তা দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে। এই দুধজাত খাদ্য ইউরোপীয় দেশ থেকে রপ্তানি করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ম্যাগি' খেয়ে মেক্সিকোর মানুষ ক্ষুধা নিবারণ করছে।

'ম্যাকডোনাল্ড', 'কে-এফ-সি', 'কোকাকোলা' প্রভৃতি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান উদারীকরণের সুযোগে উন্নয়নশীল দেশের বাজারে ঢুকে পড়েছে। ঝকঝকে মোড়কে, দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করে তারা নতুন নতুন খাবার নিয়ে উন্নয়নশীল দেশে হাজির। সেখানকার মানুষ বিজ্ঞাপনের চটক ও প্যাকেটের ঝলকানিতে ভুলে নিজেদের তাজা খাবার ফেলে কৌটোবন্দী বা প্যাকেটভরা খাবারে অভ্যস্ত হচ্ছে। থাইল্যান্ডের মানুষ ভাত খাওয়া ছেড়ে, কৌটোর খাবারে বেশি অভ্যস্ত হয়েছে। ভারতের মত দেশের উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে উজ্জ্বল মানুষও, স্বদেশের স্বাস্থ্যপ্রদ খাবার ছেড়ে, পশ্চিমী 'ফাস্ট ফুডের' দোকানে ছুটছে।

ক্রমবর্ধমান অসাম্য

উদার বাণিজ্যের প্রবক্তরা. তত্ত্বগত ভাবে প্রচার করছেন যে. বাণিজ্যের উদারীকরণের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলি বেশি করে লাভবান হবে। আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা 'FAO'

এক হিসাবে জানিয়েছে ২০০০ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলি সমবেতভাবে ২২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের খাদ্য সামগ্রী আমদানি করেছে। ১৯৮৮ সালের তুলনায় এই আমদানিকৃত অর্থের বৃদ্ধি শতকরা ৬২ ভাগ।

উন্নত দেশের সরকারি ভর্তুকি ও আভ্যন্তরীণ সাহায্যপ্রাপ্ত কৃষি ও খাদ্য পণ্যের সঙ্গে উদার বাজারে উন্নয়নশীল দেশের কৃষি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। উদার দরজার সুযোগে বরং উন্নত দেশের সস্তা কৃষিপণ্য রংচঙে মোড়কে উন্নয়নশীল দেশে ঢুকে পড়ছে। স্থানীয় চিরাচরিত খাদ্যের চাহিদা কমছে, চাহিদা কমায় উৎপাদন কমছে, আরও মানুষ বেকার হচ্ছে।
উন্নত দেশের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের অসাম্য বাড়ছে, তেমনি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যেও স্থানীয় সাম্য নষ্ট হচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রে উদারীকরণ প্রক্রিয়ায় নানা কপটতার চিহ্ন

ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান ও সোভিয়েত রাশিয়ার পতনে পুঁজিবাদ সদম্ভে নিজেকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছে। উন্নয়নশীল দেশে কিছু হতাশ, নব্য উদার অর্থনীতির প্রবক্তরা সুযোগ বুঝে পুঁজিবাদকে নতুন প্যাকেজে তুলে ধরেছেন। পুঁজিবাদী রাজনৈতিক নেতারা নতুন শ্লোগান তুলেছেন। মার্গারেট থ্যাচার সোচ্চার ঘোষণা করলেন 'TINA' বা There is no Alternative' অর্থাৎ বিকল্প কিছু নেই, পুঁজিবাদই প্রথম ও শেষ কথা।
দোহায় মন্ত্রীপর্যায়ে বৈঠকের আগে পর্যন্ত, কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশে যেটুকু উদারীকরণের প্রয়াস হয়েছিল, তাতে ঐ দেশগুলোতে বিশেষ কোনো উন্নতি তরান্বিত হয়নি। তা সত্ত্বেও দেখা গেল বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ একে একে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় নাম লেখাচ্ছে। কারণটা কি? পরিদর্শকরা চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

(১) উরুগুয়ে রাউন্ডের কথাবার্তা ও চুক্তিপত্র বোঝার মত বিশেষজ্ঞ, অনেক স্বল্প উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ছিল না। সাধারণভাবে বলা যায় যে কৃষি বিষয়ক এই চুক্তির প্রতিক্রিয়ার গুরুত্বও অনেক দেশই উপলব্ধি করতে পারেনি। তবুও তারা গেছে নতুন সুযোগের সন্ধানে।

(২) উন্নয়নশীল বিশ্বের ধারণা ছিল, বিভিন্ন উপধারা এবং 'বিশেষ ও পার্থক্যসূচক' ব্যবস্থার সুযোগে, তারা উন্নত বিশ্বের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা করতে পারবে।

(৩) বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ডাক উপেক্ষা করলে 'বিশ্বব্যাঙ্ক' ও 'আই এম এফ' থেকে পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয়ে ঋণ পাওয়া যাবে না।

(৪) কিছু কিছু দেশ বাণিজ্য সংস্থার সভ্য হয়েছে, শুধু এই কারণেই যে, একলা চললে কিছুই পাওয়া যাবে না।

২০০১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৪৪।

কৃষিক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের ছ'বছর পর দেখা গেল, আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। উন্নয়নশীল বিশ্ব এর কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে উন্নত বিশ্বের কপটতাকে। তারা সমতার নামে 'Tarification' ও 'Special ও Differential Treatment' নিয়ে নোংরা খেলা খেলেছে। নিজেদের দেশে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক অন্যভাবে নির্ধারণ করে। বিশেষ ও দ্বিমুখী ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজেদের বাণিজ্য বৃদ্ধি করছে।

ব্যবসা সংক্রান্ত বিনিয়োগ পদ্ধতি (TRIM)

এই যুক্তি সহজেই উত্থাপন করা যায় যে দ্রুত বর্ধমান প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের [FDI] ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরস্পরের পরিপূরক। এক দেশ থেকে অন্য দেশে সরাসরি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায়, যুক্তিসঙ্গত ভাবেই কোনো না কোনো নিয়ন্ত্রক শক্তির প্রয়োজন। একইভাবে এই যুক্তিও তোলা যায় যে, সমতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং শ্রম সংক্রান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থারও প্রয়োজন। আরও প্রশ্ন উঠেছে পুঁজি ও উৎপাদিত পণ্য একদেশ থেকে অন্য দেশে যদি সরাসরি ও অবাধে চলাচল করতে পারে, তাহলে শ্রমিক কেন অবাধে ও সরাসরি চলাচল করতে পারবে না?

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলি,তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধির জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি নিদান দিচ্ছে, 'Do it my way' আমার পথে চল, যদিও সে চলার পথে এখন অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই চলার পথও বন্ধ।

কৃষিকেন্দ্রিক অন্যান্য বিষয়

কৃষিকে কেন্দ্র করে অন্যান্য সংযুক্ত বিষয়ের যে ধারণা আজ গড়ে উঠেছে তার মধ্যে আছে খাদ্য ও বিভিন্ন তন্তু উৎপাদন, পরিবেশ ও কৃষিজনিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সংরক্ষণ। পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে স্থানীয় খাদ্যের সতেজতা ও নিরপত্তা রক্ষা। জাপান, সুইজারল্যান্ড এবং নরওয়ের পক্ষ থেকে তাদের অবশিষ্ট কৃষিভূমি ও পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রই তাদের কৃষি ও পরিবেশ সংরক্ষণের পক্ষে।

এ ব্যাপারে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভূমিকা কি? অবশ্যই বলতে হবে তা নেতিবাচক এবং উন্নত বিশ্বের স্বার্থে। উন্নত বিশ্ব তাদের অব্যবহার্য কৃষিপণ্যের ও অন্যান্য দ্রব্যের আস্তাকুঁড়ের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নির্বাচন করছে। তারা এই আস্তাকুঁড়ের সুযোগ ছাড়বে কেন? তাই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ঠুঁটো জগন্নাথ। অর্থিক উন্নয়ন পরিক্রমায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদকে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। এই প্রাকৃতিক সম্পদকে পণ্যে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটি সম্বন্ধে উদার অর্থনৈতিক প্রবক্তাদের বক্তব্য কি?

উন্নয়ন চাই, যে কোনো মূল্যে

উদার অর্থনীতির প্রবক্তরা, একটা বিষয়ে প্রায় সকলকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন এবং তা হল বিশ্ব বাজার যত বেশি উন্মুক্ত ও উদার হবে উন্নয়নের ফসল তত বেশি পাওয়া যাবে। তাঁরা আরও একটি ব্যাপার চালু করতে চাইছেন এবং তা হল কৃষিপণ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারের পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ ব্যবস্থার প্রচলন। স্বাভাবিকভাবেই, এই ব্যবস্থায় জঙ্গলের নিয়ম চালু হবে, জোর যার মুল্লুক তার, সবল রাষ্ট্র দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করবে। উদার অর্থনীতির মূলকথা— নিজের অর্থনীতির সর্বোচ্চ সফলতা, অন্যভাবে বলতে গেলে পার্থিব বস্তুর সর্বোৎকৃষ্ট উপভোগ। এই অর্থনীতির একটাই কথা— যে কোনো মূল্যে নিজের ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করো।

পরিবর্তে, অবশ্যই বিকল্প অর্থব্যবস্থার কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। এই নীতির মূল ভিত্তি হবে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও ভূমিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে যুক্তিসম্মত আর্থিক উন্নতি। উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের আর্থিক নীতির কথা বলা যায়। বৌদ্ধ ধর্মে আর্থিক ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা না বলে, প্রয়োজনীয় চাহিদার কথা বলা হয়েছে, সেখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

পরিমণ্ডল রক্ষা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে। এই অর্থনীতির মূল কথা — অর্থ যেন সমাজকে গ্রাস করতে না পারে, আর্থিক ব্যবস্থা সমাজকে সেবা করবে, সমাজ যেন আর্থিক ব্যবস্থার সেবাদাসী না হয়। সমাজের প্রয়োজনে অর্থনীতি, আর্থিক প্রয়োজনে সমাজ নয়।

প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব-খাদ্যাভাস, কৃষিব্যবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির গাছ-গাছালি ছিল, ছিল নিজস্ব কৃষিব্যবস্থা, যা স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। আজ প্রায় প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশেই সেই 'নিজস্বতা' নিশ্চিহ্ন। আজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী, সমাজসেবী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাজ হল জীববৈচিত্র, প্রকৃতির বৈচিত্র ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে, বিশ্বায়নের পথ তৈরি করা। এককেন্দ্রিক উদার আর্থিক বিশ্বায়ন বিশ্বের বৈচিত্রকে ধ্বংস করছে। সামগ্রিক মানব সমাজের স্বার্থেই এই ধ্বংস রোধ করা প্রয়োজন।

উপসংহার

কৃষিক্ষেত্রে, চুক্তির পারস্পরিক আলোচনায় বোঝাপড়ার স্তরে তিনটি মূল সমস্যা দেখা দিচ্ছে বলে মনে হয়।

প্রথম, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বোঝাপড়ার পর্বটি জটিল ও ব্যাপক।

দ্বিতীয়, উন্নয়নশীল দেশ এবং স্বল্প-উন্নত দেশগুলির মধ্যে বৈপরিত্য এত বেশি যে আলোচনার স্তরে ঠিকমতো নিজেদের চাহিদার বিষয়টিও উত্থাপন করা যাচ্ছে না।

তৃতীয়, পারস্পরিক আলোচনার সময়ে উন্নত বিশ্বের ভণ্ডামি ও কপটতা। কঠিন সময়ের বাস্তবতার নামে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে উন্নয়নশীল বিশ্বে নানা বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সত্যি সত্যি যদি পরিচ্ছন্নভাবে এবং সমতার ভিত্তিতে বিশ্ব বাজারকে কৃষিপণ্যের জন্য উন্মুক্ত করা যায়, তাহলে উন্নয়নশীল দেশের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব এবং সেই দেশের কিছু মানুষের সুখ-সুবিধাও বৃদ্ধি হবে। এ ব্যাপারে পরিষ্কার থাকা ভাল। ঢালাও খোলা বাজারে সুখ স্বপ্নে বিভোর কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশের আজ নিজেদের কাছেই দুটো প্রশ্ন রাখা উচিত—

(১) নব্য আর্থিক উদারীকরণ প্রবক্তাদের অনুসরণ করে, উন্নয়নের পথে চলতে গিয়ে কৃষিক্ষেত্রে, স্থানীয় বৈচিত্র ও পরিবেশের ক্ষতি কতটা? সমাজ অর্থনীতির কি ক্ষতি? দেশের জীববৈচিত্রের ক্ষতি হচ্ছে কি না? এই উন্নয়নের স্থায়িত্ব কি দীর্ঘকালীন?

(২) উদারীকৃত একমাত্রিক অর্থনীতির বিকল্প কিছু আছে কি; যেখানে আর্থিক উন্নতির সঙ্গে, কৃষিক্ষেত্রে স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বনির্ভরতা থাকবে এবং বজায় থাকবে দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং আর্থিক স্বাধীনতা?

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নির্দেশিত উদার অর্থনৈতিক পথে চলতে গিয়ে ধনী বিশ্ব আরো ধনী হচ্ছে তাদের পার্থিব সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি হচ্ছে অন্যদিকে দরিদ্র বিশ্ব দরিদ্রতর হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের প্রয়োজনে উন্নয়নশীল বিশ্ব তাদের কাঁচামাল যোগান দেবার এবং তাদের অপ্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত সামগ্রী ফেলবার কলোনিতে পরিণত হচ্ছে।

এই উদার অর্থনীতির মূলকথা ও মূল্যবোধ একটাই এবং তাহল সীমাহীন সম্পদ ব্যবহার করে অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

ভাষান্তর ঃ কমল দাস

বর্তমান সংকলনের জন্য প্রেরিত মূল রচনাটির শিরোনাম ***'The WTO Agreements on Agriculture and its Impact on Developing Countries'*** *। এটি রসকিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ' এ ২৯ নং ওয়ার্কিং পেপার হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল।*

মুক্তগতির লুটেরা পুঁজি

সমুদ্র গুহ

সময় যত এগিয়ে যাচ্ছে, পুঁজিবাদী বাগাড়ম্বরগুলো তত এক অন্তসারশূন্য ফাঁপা তার্কিকের বুলিতে পরিণত হচ্ছে। উৎপাদনের উপায় এবং সম্পর্কের সাথে জড়িয়ে থাকা দ্বন্দ্বগুলো পুঁজিবাদকে যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে তার সমাধান করতে সে অক্ষম। ঐতিহাসিকভাবেই ক্রমশ পরিণত হিংস্র পুঁজিবাদ ও তার নতুন রণকৌশল বিশ্বায়নকে কাজে লাগাচ্ছে নিজেকে প্রাসঙ্গিক এবং অনিবার্য ব্যবস্থা হিসেবে দাঁড় করাতে অথচ সমসাময়িক দুনিয়ার ঘূর্ণিঝড় তাকে বারবারই এক ত্রুটিপূর্ণ অক্ষম ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত করছে।

একথা ঠিকই যে, এখনও পর্যন্ত পুঁজিবাদ একমেরু বিশ্ব ব্যবস্থায় বিশ্বায়নের তাসটাকে সুচারুভাবে খেলতে সমর্থ হয়েছে। যার দরুন সে এই সময়ে তার সবথেকে প্রয়োজনীয় ফাটকা পুঁজির অবাধ গতির বিশ্বায়নকে বাস্তবায়িত করেছে আর জ্ঞানের, শ্রমের বিশ্বায়নকে পেটেন্ট আইন, বাণিজ্য সংক্রান্ত সুরক্ষা বিষয়ক বিধিনিষেধের জালে কব্জা করে রেখেছে। একদিকে উন্নত প্রযুক্তি অন্যদিকে দুনিয়াদারির কামান-বন্দুক যতই তার সঙ্কটকে সাময়িকভাবে আড়াল করতে সমর্থ হোক না কেন কিংবা হাতগুনতি উন্নত দেশের রাঘববোয়াল কোম্পানিগুলোকে মুঠো মুঠো মুনাফা যোগাক না কেন, বাজার সর্বস্বতার কর্মসূচী একদিকে দেশে দেশে গরীব মেহনতী মানুষকে চাঁদমারির সহজ শিকারে পরিণত করছে অন্যদিকে তার নিজের অবস্থানকে ভঙ্গুর বলে প্রমাণ করছে। কিন্তু বাজার (crisis of market) এবং মূল্যের (crisis of value) সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় পুঁজিবাদের জানা নেই। তাই দিশাহীন ভবিষ্যৎ-এর অকুল পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছে সেইসব দেশগুলো যাদেরকে একসময় তকমা দেওয়া হয়েছিলো অত্যন্ত গতিশীল অর্থনীতির দেশ বলে। যৌবনবতীরা অকাল বার্ধক্যের শিকার হয়েছেন।

আসলে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে যে অনুন্নয়নের উন্নয়ন হয়ে চলেছে তার পিছনে অন্যতম কারণ হলো লগ্নিপুঁজির নতুন চেহারা অর্জন। লগ্নিপুঁজির প্রকৃতি যেমন একদিকে দেশীয় চরিত্র ছেড়ে আন্তর্জাতিক হয়েছে পাশাপাশি সে উৎপাদিকা পুঁজির বদলে ফাটকা পুঁজির মধ্য দিয়ে বাড়তি মুনাফা অর্জনে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এই নতুন চেহারার প্রথম দাবিই হলো বেশি মুনাফার সন্ধানে সব বাধানিষেধ তুলে লগ্নি পুঁজির চলনকে বিশ্বব্যাপী অবাধ বিদ্যুৎগতির; পূর্ণ স্বাধীনতার এক অপরিহার্য সত্তায় পরিণত করো। পরের দাবিই হলো কঠোরভাবে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসভিত্তিক অর্থনীতিকে কার্যকরী করতে হবে। কারণ মুদ্রাস্ফীতি বিনিময় হারের মূল্যহ্রাস ঘটাবে। যার দরুণ ফাটকা পুঁজি, গরম টাকা পালিয়ে যাবে; তাদের বাড়তি নাফা হবে না। এবং

এই মুদ্রাস্ফীতিকে কড়া হাতে বেঁধে রাখতে গেলে অবশ্যই মোট চাহিদাকে ক্ষমতার নিচে রাখতে হবে অর্থাৎ চাহিদা সঙ্কোচন ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সাথে সাথে তারা এখন আর গুণকতত্ত্বের কোনও ধার ধারছেন না। যাতে বলা হয়েছিলো যে প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ বাড়লে আয় বাড়ে, আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে, ভোগ বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে আবার বিনিয়োগ বাড়লে পুনরায় আয়ের বৃদ্ধি হয়। প্রাথমিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং চূড়ান্ত আয়বৃদ্ধির মধ্যেকার কোনও সম্পর্কই তার আর দরকার নেই। তার প্রয়োজন চাহিদার সঙ্কোচন, বিনিয়োগের বৃদ্ধি নয়।

এজন্য যে কায়দাটা নেওয়া হচ্ছে তা হলো — তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে ঢালাও ঋণদানের ব্যবস্থা তৈরি করা যাতে তারমধ্যে দিয়ে যথেচ্ছভাবে বিদেশি পুঁজি (যেটা শিল্পোন্নত দেশে উদ্বৃত্ত এবং যেখানে বিনিয়োগ লাভজনক নয়।) সেখানে ঢুকে, দেশীয় অর্থনীতিকে মন্দাক্রান্ত করার ব্যবস্থা নিতে পারে। এজন্য তারা রপ্তানির ধুঁয়ো তুলে সম্পদকে — কাঁচামালকে দেশীয় বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের থেকে সরিয়ে রপ্তানির কাজে লাগায়। এরপর আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য থাকার দরুন রপ্তানির দর নিয়ন্ত্রণ করে বাণিজ্যে মন্দা নিয়ে আসে অথচ এরফলে উদ্ভূত সামাজিক - রাজনৈতিক সঙ্কটের কোনও দায়িত্ব সে গ্রহণ করে না।

এরফলে যা হচ্ছে তা হলো— 'এটা ঘটনা যে পুঁজিবাদের শুরু থেকে দুটি মেরু তৈরী করলো যাকে স্বাধীন-নির্ভরশীল, প্রবল প্রতাপশালী-অধীন, উন্নত-অনুন্নত, কেন্দ্র-পরিসীমা ইত্যাদি নানানভাবে বর্ণনা করা যায়, যার প্রতিটি পর্বই গুরুত্বপূর্ণ তার উপাদানগুলির বিবর্তনের জন্য। চালিকা শক্তিটা হলো কেন্দ্রে ক্রিয়াশীল পুঞ্জীভবন ব্যবস্থা যা পরিসীমাস্থিত সমাজে কেন্দ্রের প্রয়োজনে এক জবরদস্তী বাজারি শক্তির মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাকে ছাঁচে ফেলে তৈরি করা হচ্ছে।।'[১]

এজন্য তারা কতগুলি সূত্র তৈরি করেছে, যা হলো —

১) যদি কোনও দেশের ব্যালান্স অব্ পেমেন্টের সমস্যা দেখা দেয় তাহলে দেশীয় মুদ্রার External Value-র অবমূল্যায়ন হচ্ছে একমাত্র পথ তা দেশের আমদানি-রপ্তানি দামের সাথে অস্থিতিস্থাপক হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না।

২) যদি কোনও দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তা সে যেকারণেই হোক না কেন, কড়া হাতে আর্থিক ও ঋণদান নীতি কার্যকর করতে হবে কারণ তাতেই নাকি সমাধান মিলবে।

৩) যদি রাজকোষ বিন্যস্ত করার প্রয়োজন হয় তাহলে সার্বিক ক্রয়ক্ষমতাকে কাটছাঁট করতে হবে। যার সহজ লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ, গরিব, শ্রমজীবী মানুষ কিন্তু কখনই বিত্তবানরা নয় কারণ ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে উৎসাহ দান করতে হবে।

৪) সার্বিক উন্নয়নকে হাসিল করা যায় একমাত্র বাজারের মধ্য দিয়ে। পরিকাঠামোর অভাব অথবা চাহিদার অপ্রতুলতার মতো মৌলিক সমস্যাগুলো কোনও ব্যাপারই নয়।

৫) কর কাঠামোর গিমিকের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে উৎসাহ দিতে হবে।

৬) দেশীয় মুদ্রাকে পূর্ণ বিনিময়যোগ্য করতে হবে।[২]

এসব রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে দাবানল তৈরি হয়েছে আর্জেন্টিনায়। যদিও বিপর্যয়ের আজকের এই চেহারাটা খুব অস্বাভাবিক ছিলো না।

গোটা আর্জেন্টিনায় পুঁজিবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার জগাখিচুড়ি সম্পদের সুষম বন্টন এবং আয়ের বিকেন্দ্রীকরণ করতে দেয়নি। ফলত মুষ্টিমেয় মানুষের আয় এবং বিত্তের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দিলেও বেশিরভাগ মানুষ এর আওতার বাইরেই ছিলো। গোটা দেশটাতে কৃষিব্যবস্থার এক বিরাট অংশ জোতদারদের কব্জায় থাকার ফলে ভূমিহীন, প্রান্তিক, ছোট ও

মাঝারি চাষিরা এই কৃষির অগ্রগতির কোনও সুবিধা পায়নি। তাদের প্রকৃত আয় কমেছে। ফলশ্রুতি ক্রয়ক্ষমতার সঙ্কোচন। এরকম একটা দেশের আর্থিক নীতি, কার্যকলাপ দেখাশোনার দায়ভার নিলো আই.এম.এফ. ১৯৮০ সাল থেকে, কারণ ঐ সাল থেকে আর্জেন্টিনায় ঋণদানের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে রেহাই পাবার কারিগর হিসেবে আই.এম.এফের আগমন ঘটে এবং সে শর্ত নিরূপণ করে।

এসব দাওয়াইয়ে সাময়িকভাবে ক্ষতি ঠেকানো গেলেও সামগ্রিকভাবে ক্ষতির বহর বেড়েই চলছিলো যার জন্য মজুরি-চাকরি বাড়ছিলো না, সামগ্রিক অর্থনীতিতে কোনও গতি আসছিলো না বা আই.এম.এফের প্রেসক্রিপশন কোনও নতুন মাত্রা যোগাতে ব্যর্থ হচ্ছিল। এজন্য সামগ্রিকভাবে ঐ ৮০-র দশককে বলা হয় ক্ষতির দশক। এসময় মুদ্রাস্ফীতি ক্রমশ বেড়েছে গড়ে প্রতি বছরে ৪০০ শতাংশেরও বেশি। তাই এককথায় এ পর্যায়টাকে 'ক্ষতির দশক' বলা যায়।

আশির দশকটি গোটা লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রেই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময়ে বিশ্বের এই অঞ্চলে নয়া উদার অর্থনীতি ব্যাপকভাবে চালু হয় এবং একই সময়ে বিভিন্ন দেশে জুন্টারাজ, সামরিক স্বৈরাচার, একনায়কতন্ত্রী সরকারগুলি অপসারিত হয়ে নির্বাচিত বৈধ সরকারগুলি ক্ষমতায় আসে। এ দুটির পিছনেই নয়া সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন ছিলো, কারণ দুটিই তার দরকার ছিলো।

একদিকে সামরিক সরকারগুলির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ অন্যদিকে বৃহত্তর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই ক্রমশ বিস্ফোরক গেরিলা যুদ্ধের চেহারা নিচ্ছিল। পেরু, গুয়াতেমালা, মেক্সিকো, এল সালভাদোর, কলম্বিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্র উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলো। ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিরা বুঝতে পারছিলেন নতুন তাস প্রয়োজন। প্রয়োজনটা জরুরি হয়ে গেলো নিকারাগুয়ায় সান্দিনিস্তারা ক্ষমতায় আসার পর। তাই বিভিন্ন দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হলো যার মধ্য দিয়ে একদিকে ওনাদের চিন্তাভাবনার সমর্থক সরকার ক্ষমতাসীন হলো যারা গোটা লাতিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছাপূরণের স্থানীয় এজেন্টে পরিণত হলো অথচ মানুষের বিক্ষোভ সাময়িকভাবে হলেও স্তিমিত হলো। অন্যদিকে নয়া উদার অর্থনীতির নাম করে দেশে দেশে ফাটকা পুঁজির অবাধ প্রবেশ এবং নির্গমনের ব্যবস্থাকে পোক্ত করা হলো। আর্জেন্টিনাও তার ব্যতিক্রম নয়। ৮০-র দশকেই আর্জেন্টিনার সামরিক সরকার ক্ষমতার তখ্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় কারণ তাদের অবরুদ্ধ শাসনে গুমখুনের প্রকৃত সংখ্যা পৃথিবীর কোনও মানবাধিকার কমিশনের কাছে না থাকলেও সাক্ষী ছিলো সাধারণ মানুষ। এই স্যাণ্ডউইচ্ স্ট্র্যাটেজিতে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল-মেক্সিকো ইত্যাদি বড়ো অর্থনীতির দেশগুলিতে ক্রমান্বয়ে সরকারী আর্থিক নীতি নির্ধারণ করার কাজে বসানো হয় সেই সমস্ত লোককে যারা ওয়াশিংটন ট্রেজারি-ওয়াল স্ট্রীট লবির একেবারে স্ট্যাম্প মারা লোক বলে পরিচিত।

এরকমই একজন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত অর্থনীতিবিদ দোমিন্‌গো কাভালোকে বসানো হলো অর্থমন্ত্রীর পদে ১৯৯১ সালে; বসালেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কার্লোস মেনেম, যার বিরুদ্ধে অস্ত্র চোরাচালানসহ বহু দুর্নীতির অভিযোগ ছিলো।

শুধু তাই নয়, ১৯৯৫ সালে পুনরায় ক্ষমতাসীন হবার পর কার্লোস মেনেম প্রথমেই যেটা করলেন তা হলো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন থেকে আর্জেন্টিনাকে গুটিয়ে ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের অবলুপ্তির পর আর কোনও মুখোশের প্রয়োজন রইলো না। গোটা লাতিন আমেরিকার বুকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সব থেকে সোচ্চার স্তাবকে পরিণত হলেন মেনেম। খুশিতে ডগমগ ওয়াশিংটন আর্জেন্টিনাকে ন্যাটো জোট বহির্ভূত মিত্র দেশ হিসেবে স্বীকৃতি

দিলো যা কিনা ঈজিপ্ট, দক্ষিণ কোরিয়া, ইজরায়েলের পর চতুর্থ মার্কিন নীতির তাঁবেদার হিসাবে আর্জেন্টিনাকে পরিচিতি দিলো। অথচ বর্তমানে যখন গোটা দেশটা বিপর্যস্ত অবস্থায় হামাগুড়ি দিচ্ছে তখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ বিবৃতি দিচ্ছেন যে সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কোনও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি আর্জেন্টিনা সরকারকে একথাও বলা হয়েছে যে, তারা যেন সঙ্কট মোচনে কোনও তড়িঘড়ি ব্যবস্থা না নেয়। অর্থাৎ ডুবছে ডুবুক না, উদ্ধার নয়, ধীরেসুস্থে ডুবতে দাও। কেন এমন হলো?

কাভালো এসে আর্জেন্টিনায় কারেন্সি বোর্ড চালু করলেন এবং আর্জেন্টিনার মুদ্রা পেসো এবং মার্কিন ডলারকে সমমূল্যের করে দিলেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে চালু প্রতিটি পেসোর জন্য এক ডলার সঞ্চয় করে রাখতে হতো। এরফলে নোট ছাপানো বন্ধ হয়ে গেলো এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির বিপদকে আটকানো গেলো। এই কারেন্সি পেগিং হলো মুদ্রার পূর্ণ বিনিময়যোগ্যতার অন্য একটি সংস্করণ। নিতান্ত শক্তিশালী মুদ্রার দেশ ছাড়া এ ধরনের পূর্ণ বিনিময়যোগ্যতায় ক্ষতি বেশি কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে দুর্বল মুদ্রার ওঠানামা বেশি ফলত সে দেশের অর্থনীতি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই কারেন্সি পেগিং এক্ষেত্রে (১ ঃ ১) নেওয়া হলো। এরফলে আশির দশকের শেষের দিকে যেখানে মুদ্রাস্ফীতির গড় বার্ষিক হার ছিলো ৬০০ শতাংশ সেখানে ৯০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে মুদ্রাস্ফীতির হার কার্যত শূন্যে নেমে যায়। ফলে জিনিসপত্রের দামও কমে যায়।

কিন্তু এই কারেন্সি পেগিং মারফৎ মুদ্রা সঙ্কোচন নীতি সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো অন্যক্ষেত্রে। বস্তুতঃপক্ষে এটাই পুঁজিবাদের সবথেকে বড়ো সমস্যা। তার নীতিগুলো হলো সেই ত্যানা কাপড়টার মতো যার একদিক জুড়তে গেলে অন্যদিক ফেঁসে যায়। সমস্যাটা দেখা দিলো তিনভাবে।

প্রথমত ঃ— মুদ্রা সঙ্কোচনের দরুন নেমে আসা মূল্যস্তর (টাকাকড়ির পরিমাণের সাথে মূল্যস্তরের সম্পর্কটি সরাসরি আনুপাতিক) সুদের প্রকৃত মাত্রাকে বাড়িয়ে দিলো। আসলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধরনটাই তাই — যে কোনও ভঙ্গুর মুদ্রানীতিতে সুদের হার অবিশ্বাস্যভাবে কমে গেলেও তা সুদের প্রকৃত হারকে কমিয়ে দেয় না। আর সুদের প্রকৃত হার বেড়ে যাবার ফলে তা সরকারী-বেসরকারী দুক্ষেত্রেই ঋণের বোঝা বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রেও তাই হলো। অর্থনীতিতে এলো নিস্তেজ ভাব। ৯৬ সাল থেকে আর্জেন্টিনায় মন্দার ছায়া পড়তে শুরু করলো।

দ্বিতীয়ত ঃ— নেতিবাচক একটা আঘাত এলো বাণিজ্যের দিক থেকে। কারণ প্রকৃত বিনিময় হার গেলো বেড়ে। অন্যান্য দেশের তুলনায় আর্জেন্টিনার পণ্যর দাম গেলো বেড়ে। এবার রপ্তানি হয়ে গেলো কঠিন, আমদানি হয়ে গেলো সহজ। দেশীয় শিল্পের নাভিশ্বাস উঠলো কারণ তার উৎপাদিত পণ্যকে হটিয়ে বাজার দখল করলো বাইরের থেকে সস্তায় আমদানি করা পণ্য। ৯০-এর দশকের শুরুতে আর্জেন্টিনার মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪.৮ শতাংশ ছিলো আমদানি যা শেষদিকে বাড়তে বাড়তে গিয়ে দাঁড়ালো ১৩.৫ শতাংশে। এদিকে রপ্তানি বাড়লো না। দেখা দিলো বাণিজ্য ঘাটতি।

আর এই বাণিজ্য ঘাটতির দরুন এবং মুদ্রা সঙ্কোচনের নীতির ফলে টাকাকড়ির সরবরাহ স্বাভাবিকভাবেই কমে গেলো। সচরাচর টাকাকড়ির যোগানের টান তৈরি করে অতিরিক্ত মাত্রার সমৃদ্ধি ঠেকাবার ব্যবস্থা হয়। যদিও এই চেষ্টা সবসময় সফল হয় না। কারণ আজকাল সরকারী ঋণের পরিমাণ মাথাভারি হয়ে যায় বলে বাজারে অজস্র ঋণপত্র থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকা তুলে নিয়ে যদি আরও কিছু ঋণপত্র বাজারে বিক্রি করে তবে ব্যাঙ্কগুলি বা ব্যক্তিরা পুরোন ঋণপত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা রেখে বা বিক্রি করে নিজেদের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ

বাড়াতে পারে। আর একটা অসুবিধা হলো এই 'নগদ পছন্দ' অত্যন্ত কমে যেতে পারে। টাকার মূল্য তীব্র মুদ্রাস্ফীতির দরুন কমে যেতে পারে। সেজন্য জিনিসপত্র কিনে রাখা ভালো এই মনে করে লোকে বেশি টাকাকড়ি ছেড়ে দিতে পারে। এখানে 'নগদ পছন্দের ফাঁদ' বলতে বোঝানো হচ্ছে যে সুদের হার সামান্য বাড়লেও, অদূর ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে এই আশঙ্কাতে বন্ডের বদলে ক্রমাগত টাকাকড়ি হাতে ধরে রাখার চেষ্টা। যতই টাকাকড়ির যোগান বাড়াও না কেন, বিনিয়োগ বাড়বে না, সবই ঐ নগদ পছন্দের ফাঁদে তলিয়ে যাবে। অর্থাৎ ইচ্ছে থাকলেই যে বিনিয়োগ বাড়বে তেমনটা নয়।

কিন্তু এখানে হলো অন্যরকম। এখানে মুদ্রাস্ফীতিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হলো, ব্যাঙ্কের ওপর বিধিনিষেধ জারী হলো, পাশাপাশি চলছে বাণিজ্য ঘাটতি। প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্সের ফলে টাকাকড়ির সরবরাহ স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। সব মিলিয়ে দাঁড়ালো যে নগদ পছন্দের তুলনায় টাকাকড়ির যোগান কমে গেলো আর সুদের হার বেড়ে গেলো। (মুদ্রাস্ফীতি এবং সুদের হারের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক।) সুদের হার বেড়ে যাবার অনিবার্য ফল হলো বিনিয়োগ কম হওয়া। বিনিয়োগ কমার সরাসরি ফল হলো কর্মহীনতা বৃদ্ধি — পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্য থেকে বিরাট বিচ্যুতি। তাই হলো আর্জেন্টিনায়। বেকারির হার ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেলো।

তৃতীয়ত ঃ— বিপদ দেখা দিলো কোষাগারীয় নীতির ক্ষেত্রে কারণ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক যে স্বাধীন মুদ্রানীতি অনুসরণ করবে তার কোনও সম্ভাবনা নেই। ঘাটতি বেড়ে চললো। আর কোষাগারীয় ঘাটতিটা বাণিজ্য চক্রের সাথে বিপরীত অনুপাতে চলে। অতএব পরিত্রাণ কোথায়। বাণিজ্যে মন্দা কোষাগারীয় ঘাটতিকে বাড়িয়ে দিলো।

নব্বুই-এর দশকের শুরুতে এই সমস্যাকে সাময়িকভাবে মোকাবিলা করা হয় ব্যাপক বেসরকারীকরণের মধ্য দিয়ে। ফলে কর্মী সঙ্কোচন, সরকারী পরিষেবা - ভর্তুকি - খয়রাতি ছাঁটাই, আইনি - বেআইনি নানান পথে সরকারী সম্পদকে কেনাবেচা - লুঠ বিকটভাবে ক্রয়ক্ষমতার অবনমনকে সূচিত করে। এক সরকারী রেল বেসরকারীকরণ হবার ফলে ওদেশের দুটি রেল কোম্পানি, FA এবং SUBTE'তে যেখানে ১৯৯১ সালে কাজ করতো ১,১৭০০০ লোক তা ৯৬ তে কমে দাঁড়ায় মাত্র ১৭০০০। নব্বুই-এর দশকের শুরুতে প্রত্যক্ষ বেকারত্বের হার ছিলো ৬.৫ শতাংশ। এখন তা বেড়ে ২০ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। ৯০-৯৮ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির ভিতরে বেসরকারীকরণের দিক থেকে এগিয়ে থাকা ১৫টা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলো আর্জেন্টিনা যেখানে ২৮৪৩১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বেসরকারীকরণ হয়। যার আগের দেশটির নাম ব্রাজিল। যার বেসরকারীকৃত মূল্য ৬৬৭২৭.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৪] ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু জাতীয় আয় হ্রাসের হার বার্ষিক ৪.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০১ সালে গিয়ে দাঁড়ালো ১১ শতাংশে। এরকম সঙ্কুচিত অর্থনীতিতে কর সংগ্রহ হলো কম। ফলে কোষাগারীয় ঘাটতি বেড়েই চললো।

এসবের ঝটকা গিয়ে পড়লো বিনিয়োগে। কারণ একদিকে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রণোদনার অবনমন ঘটলো অন্যদিকে মুদ্রা নিয়ে কড়াকড়ি আর প্রকৃত বিনিয়োগ হারের গতির সমন্বয় মূলধন গঠনের হারকেও কমিয়ে দিলো। তাহলে কে দেবে উন্নয়নের গতি, কোথা থেকে আসবে টাকা। অতএব উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়লো।

উন্নয়ন থমকে গেলেও, ঋণ গেলো বেড়ে। কারণ এই ঋণটা করতে হচ্ছে কোষাগারীয় ঘাটতিকে মেটাবার জন্য, এরসাথে উন্নয়নের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু সম্পর্ক আছে ঋণদাতাদের সংক্ষেপে ঋণের বাজারের শাইলকদের, যারা বিনা শর্তে ধার দেবে না এবং এই অবস্থার জন্য তারা মুখিয়ে ছিলো। এরা হচ্ছে আই. এম.এফ., বিশ্বব্যাংক ইত্যাকার দুনিয়াজোড়া

আর্থিক সংস্থাগুলি যাদের হাতেই এখন বিশ্বায়নের স্টিয়ারিং। কড়া শর্তে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হলো আর্জেন্টিনা। ফলে নব্বুই-এর দশকে ওদেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হলো। বর্তমানে বিদেশী ঋণের পরিমাণ ১৩২১৪ কোটি ডলার অর্থাৎ তা ওদেশের জাতীয় আয়ের ৪৬.৪ শতাংশ। আর এই ঋণের একটা বড়ো অংশ খরচ হলো পুরোন ঋণের আসল তৎসহ সুদ মেটাতে। অবস্থা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো যে, গোটা নব্বুই-এর দশকের শেষে দেখা যাচ্ছে শুধু ঋণের সুদ গুনতে গিয়ে যে অর্থ দিতে হয়েছে তার পরিমাণ ঐ সময়ে হওয়া মোট রপ্তানির থেকে বেশি। মনে রাখা দরকার সরকার তার মূলধনী সম্পত্তি বিশ্বায়নের ফরমাস খাটতে গিয়ে বিলগ্নিকরণ করে ভবিষ্যৎ আয়ের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে। সংক্ষেপে সরকারের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা গোল্লায় গিয়েছে। শুরু হলো আর্থিক নৈরাজ্য।

উদভ্রান্তর মতো আর্জেন্টিনা সরকার যেভাবে হোক অর্থ চাই বলে হাত পাতলো বিশ্বায়নের দাদাদের কাছে। মুচকি হেসে ফর্স্টিনস্টির মালিকরা (আই. এম. এফ. এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা) ২৬০০ কোটি ডলার বাড়তি ঋণের ব্যবস্থা করে দিলেন। চুক্তি হলো ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু কতগুলি বাড়তি শর্ত জুড়ে দিলেন। কি কি ছিলো সেগুলি?

১) সরকারী ব্যয় আরো শতকরা ২০ ভাগ কমিয়ে আনতে হবে।

২) শতকরা ২৫ ভাগ কারখানার মজুর ছাঁটাই করতে হবে।

৩) মজুরির হারও কমাতে হবে আরও ৩০ শতাংশ।

৪) গরিবদের ওপর আরও কর চাপাতে হবে।

৫) বার্ধক্যভাতা ও অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধা অর্ধেক করে দিতে হবে।

৬) আরও বেশকিছু রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে সরকারকে টাকা জোগাড় করতে হবে।

৭) নতুন যে ২৬০০ কোটি ডলার বৈদেশিক ঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সাধারণ সুদের ওপর আরও শতকরা ১৬ ভাগ সুদ হিসেব করে ফেরত দেওয়ার টাকার পরিমাণ ঠিক করতে হবে।

এখানেই সবচেয়ে চমকপ্রদ রহস্য। বিদেশীরা ২৬০০ কোটি ডলারের নতুন ঋণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই ঋণের কিস্তি মেটাতে গত এক বছরে আর্জেন্টিনা সরকারের বাড়তি খরচ হয়েছে ২৭০০ কোটি ডলার।[৫]

অর্থাৎ বিশ্বায়নের মুরুব্বিদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার ফলস্বরূপ পুঁজির মুক্তপ্রবাহে দেউলিয়া হয়েছে আর্জেন্টিনা। আসলে ফাটকা পুঁজির গতি অবাধ করে তারপরে পরিবর্তনশীল কি নির্দিষ্ট হারে যেভাবেই বিনিময় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন না কেন তা কখনই অশান্তি বই স্থিতিশীলতাকে সুনিশ্চিত করে না। কারণ পুঁজিবাদ যে দুটি প্রশ্নের সমাধান জানে না সেই পেসোর (মুদ্রা) সমস্যা এবং মন্দার বাজার থেকে মুক্তির উপায় পুঁজিবাদী বিশ্বায়নও দেবে না। দিতে পারে না। কারণ বিশ্বায়ন চলছে ফাটকা পুঁজির অবাধ গতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে তা গোটা বিশ্বকে এক অবিচ্ছিন্ন শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে যুক্ত করতে পারে। এখানে এক কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণ তৈরি হয়েছে যেখানে আই. এম. এফ — বিশ্ব ব্যাঙ্ক — বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, হাতগুনতি কয়েকটি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ রাঘববোয়াল বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে বাদবাকি দেশের পরিচালন ভার নিজেদের তৈরি সুতোয় ঝোলা পুতুল দিয়ে নাচাতে চাইছেন। তাদের মুনাফার স্বার্থে বাদবাকি বিশ্বে উন্নয়নকে থমকে দিয়ে স্থায়ী মন্দা ডেকে আনতে চাইছে। যাতে এই মন্দার থেকে ধেয়ে আসা আর্থিক নৈরাজ্য ওসব দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে ওনাদের মুখাপেক্ষী করে তোলে। ওনারা মুখে বলেন অবাধ মুক্ত বাজারের কথা কিন্তু সেটা কোনওদিনই নিরপেক্ষ ছিলো না। বরং তাকে তালুবন্দী করেই তৈরি শ্রেণী-শোষণের ভিত।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় Income distribution at the production level থাকে সবথেকে অসম, তীর্যক এবং অপরিসীম বৈষম্যের ভিত্তিতে রচিত কারণ শ্রেণীশোষণ সুনিশ্চিত করার রাস্তাই সেটা। সেই মূল রাস্তাটার বদল হলো না অথচ বিশ্বায়নের চালাকিতে ভুলে বিপর্যয়ের অন্ধকার নেমে এলো সাধারণ মানুষের জীবনে। অর্থনৈতিক সংকট জন্ম দিলো রাজনৈতিক সঙ্কটের। একে রোজগার নেই, তায় সরকারী সাহায্য নেই। এদিকে বাজারে অঢেল পণ্য অথচ পকেট শূন্য। এরকম অবস্থায় সরকার ডিক্রি জারি করলো যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কেউ ২৫০ ডলারের বেশি তুলতে পারবে না। তাহলে মানুষ খাবে কী? শুরু হলো ফুড রায়ট— গোটা আর্জেন্টিনা নেমে এলো রাস্তায়। প্রতিদিন যে দেশটার দু হাজার করে মানুষ নেমে যাচ্ছে দারিদ্র্য সীমার নিচে, সেখানে মুখোমুখি লড়াইটা অনিবার্য। তাই, এখন আর্জেন্টিনার রাস্তায় জ্বলছে মধ্যরাতের সূর্য।

চারবার রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন হবার পর এখন ক্ষমতায় এসেছেন এদোয়ার্দো দুহালদো আর কালপ্রিট অর্থমন্ত্রী কাভালোকে তিনদিন অবরোধ করে দেশছাড়া করেছেন মানুষ। ২০শে ডিসেম্বর, ২০০১ বুয়েনস এয়ার্সের রাস্তায় ক্ষিপ্ত জনতার সাথে আর্মড পুলিসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২৮ জন মানুষকে খুন করেও পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারেনি শাসকশ্রেণী।

কি করে আনবেন? ডলারের সাথে পেসোর সম-বিনিময় হারের সুযোগ নিয়ে অনেকেই তাদের ব্যাঙ্কের সঞ্চয় ডলারে রূপান্তরিত করে নিয়েছে। এবার সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে বহুমুখী। যদি পেসোকে পরিবর্তনশীল করা হয় কারণ তাতে পেসোর ভয়ঙ্কর অবমূল্যায়ন ঘটবে যার পরিণতিতে ঘটবে লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতি। যেদেশের বেশির ভাগ ঋণ হচ্ছে ডলারে আর আয় হচ্ছে পেসোতে সেখানে এর ফল হবে মারাত্মক। কারণ তা ঋণ বাড়াবে আর প্রকৃত আয় কমাবে। আর বিনিময় হারের অবমূল্যায়ন করা হলেই বিদেশী পুঁজি কেটে পড়বে। তাই পরিত্রাণের পথ নেই, ঘুরে মরো গোলোকধাঁধায়।

নতুন সরকার ডিক্রি জারি করেছেন যে, যেসব ব্যাঙ্কে সঞ্চয় ডলারে রয়েছে সেগুলি ডলারেই ফেরত দেওয়া হবে। এক লক্ষ ডলারের নিচে যেসব লোন রয়েছে সেগুলি পেসোতে রূপান্তরিত করা হবে (১:১) হারে। এখন পেসোর যে বিনিময় হার সরকার চালু করেছে বা যা বাজারদর (১ ডলার = ২.৫৫ পেসো) তাতে ভয়ংকর ক্ষতি হবে। অর্থনীতিবিদ ভ্লাদিমির ওয়েরনিং-এর মতে বছর শেষে এই হার গিয়ে দাঁড়াবে ২.৭০। এরফলে বাজারে যে ক্ষুদ্র ঋণ রয়েছে তাকে পেসোতে পরিণত করলে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে আনুমানিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গোটা দেশের মোট ব্যাঙ্ক পুঁজি ১৬.৫ বিলিয়ন ডলারের দুই পঞ্চমাংশকে লোপাট করে দেবে।[৮] অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলি প্রায় দেউলিয়া না হলেও ভারি চোট খাবে।

এবার ৩৭ বিলিয়ন ডলার ঋণের কি হবে? কেউ জানে না। এখন ব্যাঙ্কের কাছে সরকারের ৩৩ বিলিয়ন ডলার ঋণ আছে যার বেশ বড় একটা অংশ ইতিমধ্যেই সরকার জানিয়েছে যে তারা পরিশোধ করতে পারবে না— এরফলে ব্যাঙ্কের ক্ষতি দাঁড়াবে তার মূলধনের থেকেও বেশি। এরপর যখন সরকারী ঘোষণামাফিক অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ তুলে নেবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে তখন যদি বেশিরভাগ আমানতকারী তাদের শেষ সঞ্চয়টুকুও তুলে নিতে যায় তাহলে গোটা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাটাই ধ্বসে পড়বে।

যেটা লক্ষ্যণীয় তা হলো আর্জেন্টিনায় কর্মরত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির আপত্তি। মনে রাখতে হবে, বেসরকারীকরণের ফলে আর্জেন্টিনার ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার একটা জবরদস্ত অংশ এখন বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির হাতে যারা একদিকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোকে কার্যত কোনও ঋণ দেয়নি যারফলে এই অংশের বিকাশ হয়েছে কম; তাকিয়ে থাকতে হয়েছে আমদানির দিকে। অন্যদিকে তাদের গোটা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাটা হচ্ছে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ডলার কেন্দ্রিক এবং এইভাবে

উদারীকরণের নামে তারা যেভাবে মুনাফা কামিয়েছে, এখন তারা কোনও ক্ষতি স্বীকার করতে নারাজ।

পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে, এ বছরের শুধু ফেব্রুয়ারী মাসেই ৭৫০০০ চাকুরীর পদ তুলে দেওয়া হয়েছে। বেকারত্বের হার এখন ২৯ শতাংশ। গত ডিসেম্বর থেকে বড়ো বড়ো শহরগুলি ঘিরে গজিয়ে উঠছে সংখ্যাবিহীন বস্তি আর ঝুপড়ি। ফেব্রুয়ারী মাসে এক রোজারিও শহরকে ঘিরে ১০টি নতুন বস্তি এলাকা তৈরি হয়েছে। সর্বশেষ জি ডি পি-র বৃদ্ধির হার এবং শিল্পায়ন বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে শতাংশের হিসেবে যথাক্রমে -১৬.৩ এবং -১২.৪ (সূত্র Economic Times - 21-08-2002)। অর্থাৎ ঝামেলার পয়মন্ত দিনে সমস্যা ফুলেফেঁপে উঠেছে।

ঠিক এরকম একটা ত্রিশঙ্কু অবস্থায় যখন গোটা দেশটা নাকানিচোবানি খাচ্ছে তখন এ বছরের মার্চ মাসে আই এম এফ-এর একটি প্রতিনিধিদল গিয়েছিলো আর্জেন্টিনায়। ওনারা সরকারকে বলে এসেছেন যে, অর্থ আমরা দিতে পারি যদি তোমরা আমাদের ব্যাগ বোঝাই শর্তগুলি মেনে নাও। কি সেই শর্ত?

(১) আগের বছর সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বেতন ও পেনসনে যে ১৩ শতাংশ ছাঁটাইয়ের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তাকে স্থায়ী ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে সরকারি খরচ কমাতে হবে ১৪ শতাংশ।

(২) বেকারত্ব যাতে আর না বাড়ে, তার জন্য বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে যেসব ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

(৩) পরিবহনের মত অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে মূল্যানুপাতিক করে সমস্ত ছাড় বাতিলের মাধ্যমে ভোগ্যপণ্যের ওপর করের হার ব্যাপক বাড়াতে হবে।

(৪) যেসব কোম্পানি তাদের ডলার খাতের ঋণকে পেসোতে রূপান্তরিত করে, তাদের ওপর ৫ শতাংশ হারে কর আরোপ করতে হবে।

(৫) বিদেশী ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে বেআইনিভাবে বিশাল পরিমাণ পুঁজি স্থানান্তর করায় বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আদালতে যেসব মামলা করা হয়েছে তা তুলে নিতে হবে। সেইসাথে রাজ্যগুলির ওপর জোর করে ৬০ শতাংশ বাজেট ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে হবে। এমনকি রাজ্যগুলি তাদের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চালু রাখতে নিজস্ব মুদ্রাও বাজারে ছাড়তে পারবে না।

(৬) আর্জেন্টিনা সরকারকে অবশ্যই বাজেটে উদ্বৃত্তের ব্যবস্থা করতে হবে।"

এরফলে পোয়াবারো হবে আর্জেন্টিনায় কর্মরত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলোর। কারণ সাম্প্রতিক অশান্তিতে তারাও বেশ ফাঁপড়ে পড়ে গিয়েছে। অতএব উদ্ধার কর্তা আই.এম.এফ। যিনি রক্ষক, তিনিই ভক্ষক।

তাহলে সমস্যাটা কি দাঁড়ালো? গাড্ডা থেকে বেরোতে গেলে সরকারকে অবশ্যই কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে যেমন সমবিনিময় হার প্রত্যাহার, কারেন্সি বোর্ড ভেঙে দেওয়া, ঋণ পরিশোধে অসম্মতি ইত্যাদি। কিন্তু এর বিরোধী বিশ্বায়ন, কারণ এসব করলে সরকারি ভূমিকা জোরদার হবে। আপত্তি সেখানে। এথচ এই মুহূর্তে প্রয়োজন সহজ শর্তে ঋণ, পুরনো ঋণ মকুব কারণ অত্যাবশ্যকীয় কাজকর্ম চালাবারও কোনও পয়সা নেই। সেটা দিতে পারে বিশ্বায়নের মুরুব্বি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি আই.এম.এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক, কিন্তু ওনাদের মনপসন্দ কাজকারবার না হলে ওনারা ঋণ দেবেন না। বিশ্বায়ন দুদিক থেকে দেশটাকে মারবার জোগাড় করছে। হয় ঋণ নাও, আমাদের কথামতো চলো। নয়তো তোমার রাস্তায় তুমি হাঁটো, আমি এক পয়সাও দেবো না। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো কর্তাবাবারা এখন রাস্তা বাতলাচ্ছেন এই মর্মে যে, পেসোর অবমূল্যায়ন করে ডলারকে গ্রহণ করা হোক। রাষ্ট্রপতি দুহালদো অবশ্য ইতিমধ্যে

তার পূর্বঘোষিত বাজার অর্থনীতির বদলে 'শ্রম ও দেশীয় শিল্পের মধ্যে আঁতাতের' নতুন মডেলের কথা গিলে, বাবাজীবনদের কথাই তথাস্তু বলে গ্রহণ করেছেন। এবং এই ডলার ব্যবস্থা, বিনিয়োগে মুদ্রাসঙ্কটের হাত থেকে রেহাই দেবে এবং সুদের হারকেও কমিয়ে দেবে কিন্তু এরজন্য বিনিময় হারকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যার অর্থ নিশ্চিত পতন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো হাউসম্যান আরেকটি পরামর্শ দিয়েছেন। ওনার কথামতো ব্যাংকের ডলার স্থিরিকৃত সম্পদ-দায়, সরকারী ঋণ সমেত পেসোকে পরিবর্তনশীল করার আগে মুদ্রাস্ফীতি সূচক পেসোতে পরিবর্তিত করা হোক। কিন্তু তাতে ব্যাংক এবং সাধারণ আমানতকারী দুয়েরই বিরোধিতা আসবে। এবং দুহালদো ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ব্যাঙ্ক সঞ্চয়ে কোনও পরিবর্তন আনা হবে না। এছাড়া এই ডলারিকরণ ভালো করবে তাদের যারা ধার করেছে ডলারে আর ক্ষতি করবে তাদের, যারা ধার করেছে পেসোতে।[৮] একেই বলে কারোর পৌষমাস কারোর সর্বনাশ।

তাই একথা বলতে কোনও অসুবিধা নেই যে কিস্তিমাত করেছে বিশ্বায়ন। তার তুরুপের তাস নয়া উদার অর্থনীতি একটা গোটা দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বকে নির্বিচারে ভেঙে পথের ভিখিরি করেছে। কারণ বিশ্বায়নের টার্গেট তাই— তৃতীয় বিশ্বকে স্বভূমি থেকে উৎখাত করে নয়া উপনিবেশ বানাও। তাই আর্জেন্টিনার রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার দায় এখন শাসকশ্রেণীর হাতে নেই। চলে এসেছে শোষকশ্রেণীর, খেটে খাওয়া মানুষের হাতে।

বিশ্বায়নের ওপর সাড়া জাগানো টমাস ফ্রিডম্যানের লেখা বইতে উনি মন্তব্য করেছেন যে, 'দুটো ঘটনা ঘটেছে... তোমার অর্থনীতি বিকাশ লাভ করেছে আর তোমার রাজনীতি গোল্লায় যাচ্ছে — গোল্ডেন স্ট্রেইটজ্যাকেট ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইচ্ছে-অনিচ্ছেগুলিকে কঠিন সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে রেখেছে। সেজন্য আজকের দিনে যেসব দেশ যারা এই গোল্ডেন স্ট্রেইটজ্যাকেট পরেছে সেখানে সরকারপক্ষ আর বিরোধীপক্ষর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। একবার যদি তোমার দেশ এই সোনার স্টেইটজ্যাকেট পরে ফেলে তাহলে তার রাজনৈতিক স্বাধিকার পেপসি অথবা কোকাকোলার কাছে নতজানু হয়ে পড়ে। সামান্য কিছু নীতি পরিবর্তন, স্থানীয় ঐতিহ্যের মূল্য বিচারে করে যৎসামান্য ছকের পরিবর্তন, এদিক ওদিক কিছু শিথিলতা ব্যতিরেকে মোদ্দা গোল্ডেন রুলের বিরাট কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।'[৯] এখানে গোল্ডেন স্ট্রেইটজ্যাকেট বলতে বোঝানো হচ্ছে সেই বাজার-সর্বস্ব উদার অর্থনীতির কথা যা চাপানো হচ্ছে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের নামে। আর বিরোধী পক্ষ বলতে কমিউনিস্টদের কথা বলা হচ্ছে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কট যখন তীব্র চেহারা নেয় তার সামনে বুর্জোয়া রাজনীতির অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখোমুখি হয়। শোষক এবং শোষিত উভয় শ্রেণীর সঙ্কটই তৈরি করে টালমাটাল সময়ের যার টাইমস্পেস খোঁজে নতুন কিছুর। অথচ প্রথাগত রাজনীতি নতুন কিছু ভাবতে অপারগ, প্রথাসিদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলি (এখানে র‍্যাডিক্যাল এবং পেরোনিস্ট) এককথায় দিশেহারা। মানুষের চোখে ধস নেমেছে। বুর্জোয়া নৈতিকতা, গণতন্ত্র, সংবিধান সবকিছুতে। পবিত্র বলে কিছু রইল না, বৈশ্য রাজনীতি সবকিছুর শুদ্রায়ন ঘটিয়েছে।

পালাচ্ছে। পালাবার হিড়িক পড়েছে। রাউল আলফনসিন, ফার্নান্দো দ্য'লা রুয়া, রোডরিগুয়েজ সা'র মতো রাষ্ট্রপতি কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রামোন মাসত্রে, নিরাপত্তা মন্ত্রী এনরিকো মাসোভ, অর্থমন্ত্রী কাভালো, ক্যাবিনেটের মুখ্য পরামর্শদাতা কার্লোস গ্রোসো মার্কা সব বিশ্বায়নের জো হজুরের দল পালাতে শুরু করেছেন। কারণ আর্জেন্টিনার মানুষ ওদের গোটা দলটাকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, নিজেরা নতুন ইতিহাস গড়বে বলে। পারবেন কি?

এখনও পর্যন্ত বিক্ষোভের যে চেহারাটা আমরা দেখছি তার বেশিরভাগটাই স্বতঃস্ফূর্ত এবং

দিশাহীন। ১৯৯৬ সালের জুন এবং '৯৭ সালে এপ্রিলে দুটি শহর কুত্রোল কো এবং প্লাজা হুইনকালে ব্যাপক বিক্ষোভ-রাস্তা অবরোধ-ভাঙচুড়-রাস্তার লড়াই সব কিছু হয়। কিন্তু তাতে লাভের লাভ বিশেষ কিছু হয়নি। কিন্তু বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলনের অবজেকটিভ উপাদানগুলো নিঃসন্দেহে পোক্ত হচ্ছে। এটা ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে '৯০-এর দশকের মধ্যকাল থেকে শুরু হওয়া মন্দার সূত্র ধরে তৈরি বিক্ষোভ-সমাবেশগুলির হাত ধরে। কীরকম এবং কি কি?

(১) এখানে কর্মচ্যুত বেকার শিল্পশ্রমিক, বেকার যুব, এতকাল সংসারে ব্যস্ত মহিলাদের এক ঘন সমাবেশ লক্ষ করা যাচ্ছে; নিম্ন-মধ্যবিত্তর প্রভাব ব্যতিরেকেই।

(২) প্রতিরোধের লাইনগুলোতে দেখা যাচ্ছে সেইসব কর্মচ্যুত শিল্পশ্রমিকদের যারা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সাথে পরিচিত এবং যাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অভিজ্ঞতা আছে।

(৩) একটার পর একটা চলে আসা সঙ্কটের ধাক্কা যেভাবে গৃহস্থের জীবনে ওলটপালটকে হাজির করেছে যার মধ্য দিয়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হলেও এক বিরাট জঙ্গি মহিলাদের তৈরি করেছে যারা এক অন্ধকার ভবিষ্যৎ-এর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখোমুখি মোকাবিলা করা ছাড়া যার সামনে আর কোনও পথ নেই।[১০]

এরা ইতিমধ্যেই সাবেককালের রাজনৈতিক দল কিংবা জেনারেল কনফেডারেশন অব ওয়ার্কার্সদের (C.G.T) মতো বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে বাতিল করে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের জোয়ার তৈরি করেছে। এরা গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মাটান্‌জা এবং লা প্লাটাতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মানুষদের নিয়ে জমায়েত করেন। এতে স্থানীয় শিক্ষকদের সংগঠন ও রাষ্ট্রায়ত্ত কর্মচারী সংগঠনও (A.T.E) যোগ দেয়। আর্জেন্টিনার ধর্মঘটি শিক্ষকরা দাবি তুলেছেন ক্ষুধার্ত ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে খাবার দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এই মুহূর্তে আর্জেন্টিনায় একেবারে সহায়সম্বলহীন মানুষের সংখ্যা ৬৩ লক্ষ। তাই বেকাররা, যারমধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে ছাত্ররা তারা সংসদীয় রাজনীতির বাইরে একটা নতুন রাস্তায় এগোতে চাইছেন, যার নাম দিয়েছেন, "সোসিয়াল পোল"। কিন্তু এই যে লক্ষ হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছেন বা যাদেরকে নয়া উদার অর্থনীতি একদম রাস্তায় নামিয়ে দিলো এদের মধ্যে কোনও স্পষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনা দানা বাঁধেনি। এরা লা-প্লাটাতে আলোচনার ভিত্তিতে যে ছ'দফা দাবিসনদ পেশ করে তার মোদ্দা কথা ছিলো নয়া উদার অর্থনীতি বাতিল করা হোক এবং পুলিশ-মিলিটারি-কারফিউ-এর রাজত্ব বিলোপ করে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

এ দাবিসনদ নিয়ে খুব বেশি মতবিরোধ নেই দেশের বিভিন্ন অংশের ছড়িয়ে থাকা প্রতিবাদী মানুষগুলোর। কিন্তু বিকল্প রাস্তা কী— এ নিয়ে ধারণা ভীষণই অস্বচ্ছ। প্রত্যেক অঞ্চলই চাইছে চাপ দিয়ে বাড়তি কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে। কিন্তু কোনও বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে কাজ করছে না। বলাই বাহুল্য এই 'না' গুলি প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে যথেষ্ট দম ফেলার সময় দিচ্ছে। এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ সজাগ আছে। যেকোন জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে কিন্তু ক্রমশ পরিণত আন্দোলনের মূল্যবান উপাদানগুলোকে জঙ্গি উপাদানে পরিণত করে বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলনকে বিস্তৃত করার মতো মুন্সীয়ানার কোনও সংগঠন দেখা যাচ্ছে না। করতে পারতো এই কাজটা বামপন্থী-কমিউনিস্টরা। আজ তারাই সব থেকে প্রাসঙ্গিক। কারণ সময়টা ক্রমশঃ ফসকে যাচ্ছে। বুয়েনস এয়ার্স থেকে লা-প্লাটার ব্যারিকেডের লড়াইয়ের ছবিটা অপরিচিত নয়। বছর চারেক আগে একই সমীকরণের বিস্ফোরক সমাবেশ দেখা গিয়েছিলো ইন্দোনেশিয়ায়।

আসলে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দুর্বলতার পর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে 'বৃদ্ধি' যেভাবে সূচিত হচ্ছে তার প্রকৃত বিপদটা লুকিয়ে আছে অন্যত্র। 'বৃদ্ধি' বলতে যা বোঝানো হচ্ছে তা বিপুল পরিমাণ ঋণবৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। ক্রমশ 'মানি'

এবং 'ভ্যালু'র মধ্যে সম্পর্কভঙ্গ হচ্ছে যাকে অন্যভাবে দেখলে দেখা যাচ্ছে যে, পণ্য উৎপাদন এবং বিনিময় পদ্ধতির মধ্যেকার সম্পর্ক অসম্ভব জটিল হয়ে গেছে।

এই জটিলতার ব্যাখ্যায় আজ প্রাসঙ্গিক রোজা লুক্সেমবুর্গ, প্রাসঙ্গিক কমিউনিস্ট ইস্তেহার। যেখানে বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত জায়মান সঙ্কটগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রোজা বলছেন, 'সঙ্কট তৈরি হচ্ছে উৎপাদনের বৃদ্ধির প্রবণতা ও প্রসারণের ক্ষমতার সাথে ভোগের বা খরচের ক্রমশঃ সঙ্কুচিত ক্ষমতার বৈপরীত্যর দরুন এবং এক্ষেত্রে ঋণ হচ্ছে সেই উপায় যা যেকোনও মুহূর্তে বৈপরীত্যটাকে ভেঙে ফেলতে পারে।'[১১] এবং ক্রমবর্ধমান সঙ্কট সম্পর্কে অকাট্য ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিলো কমিউনিস্ট ইস্তেহারে যেখানে বলা হচ্ছে, 'নিজের উৎপাদন সম্পর্ক, বিনিময় সম্পর্ক ও সম্পত্তি সম্পর্কসহ আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ ভেলকিবাজির মতো উৎপাদনের এবং বিনিময়ের এমন বিশাল উপায় গড়ে তুলেছে যে সমাজ, তার অবস্থা আজ সেই যাদুকরের মতো যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে সামলাতে পারছে না।'[১২]

সাথে সাথে আরেকটা বোঝাপড়াও সে গড়ে তুলতে চাইছে।

লক্ষ্যণীয় যে, এই দুটি দেশেই (ইন্দোনেশিয়া এবং আর্জেন্টিনা) বিশ্বায়নের যে ফর্মুলা কাজ করেছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে কাজ করেছে দুটি দেশেরই অতীত অথবা বর্তমান একনায়কতন্ত্রী সামরিক অসামরিক সরকারগুলি। এখানে একটা লুকনো সম্পর্ক রয়েছে যে গাঁটছড়াটাকে আড়াল করে রাখা হয়েছে নানান রঙিলা কাজ কারবারের মধ্য দিয়ে। সম্পর্কটা হচ্ছে — যেকোনও স্বৈরাচারী ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হলো সে গণতান্ত্রিক-সাংবিধানিক বিচার পদ্ধতির স্তম্ভগুলিকে সরাসরি অস্বীকার অথবা ধ্বংস কিংবা এড়িয়ে চলতে চায়। সমস্ত ক্ষমতার একচেটিয়া কেন্দ্রীকরণ করে কারণ সে সম্পদের কোনও বিকেন্দ্রীকরণ চায় না। এই কুক্ষীগতকরণের আন্তরিক প্রচেষ্টা বর্তমানে আরও ব্যাপক চেহারা নিয়েছে। যেখানে যেকোনও রাষ্ট্র তৎসহ সরকার ও গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোগুলির ভূমিকাকে কার্যত তুলে নিয়ে বাজারের অপ্রতিহত শক্তিকে জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। নয়া সাম্রাজ্যবাদের হাতে পরিচালিত অবাধ বাণিজ্য ভিত্তিক বাজারের বিশ্বায়ন এক নয়া শোষণ ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে চাইছে যা কেন্দ্রাভিমুখী এবং স্বেচ্ছাচারী কারণ তা একইভাবে আয় এবং সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ চায় না। তাই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নয়া অর্থনৈতিক নীতি, শাসকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রী রাজনৈতিক চেহারার সাথে মানানসই। কিন্তু সময় যতো এগিয়ে চলেছে ততো সেই আপাতপোক্ত ভিত্তিভূমিতে ধস নামছে।

বিশ্বায়নের নতুন রাস্তা যে নতুন সমস্যাগুলিকে হাজির করেছে তা বিধ্বস্ত দেশগুলিতে শোষক এবং শোষিত উভয়শ্রেণীর সঙ্কটকেই তীব্র করেছে। এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্ব।

ইন্দোনেশিয়ার রাস্তায় মেঘাবতী সুকর্ণপুত্রীর পরিচালিত গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন অথবা আর্জেন্টিনার রাস্তায় লড়াই যার কথাই বলুন না কেন তা নয়া অর্থনীতির বিরোধী হলেও সঠিক বিকল্প রাস্তা সম্পর্কে ধারণাগতভাবে দিশাহীন, অবিন্যস্ত। তাই মেঘাবতী যখন বলেন সুহার্তোর ডিক্টেটরশিপ শেষ করে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে তখন তা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন পেয়ে যায় ঠিকই কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর কোন পথে হবে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সে প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারে না বরং বিশ্বায়নের পীরবাবাদের সাথে গোঁজামিলের আপোস করে। এখানেই বিশ্বায়ন তার আক্রমণকে পুনর্বিন্যস্ত করার সুযোগ পেয়ে যায়। তাই ইন্দোনেশিয়ার বুকে বসবাসরত চৈনিকদের সাথে জাতিগত দাঙ্গা থেকে ধর্মীয় রায়ট, মুসলিম মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কারণ সুহার্তো চলে গেলেও ক্ষমতার অলিন্দে বহাল তবিয়তে টিকে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহকেরা যারা সুযোগ খুঁজছে কিভাবে মানুষের আন্দোলনকে

ছত্রভঙ্গ করা যায়। তাই একটানা ৩২ বছর বেয়নেটের শাসন রদ হওয়াটা প্রগতি কিন্তু তাকে বৈপ্লবিক গণজোয়ারে পরিণত করাটা আরও জরুরি।

ঠিক একইভাবে না হলেও যেদেশে ১৯৫৮ সালের পর থেকে মাত্র তিনজন রাষ্ট্রপতি তার মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে পেরেছে সেখানে নয়া অর্থনীতির বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার মানুষের জেহাদ সেদেশের শাসকশ্রেণীর টালমাটাল চেহারাটাই হাজির করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মেহনতী মানুষের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্যঋদ্ধ হতে পারে না। কারণ সেই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন সংগঠনের অভাব। তাই ক্রান্তিকাল উপস্থিত হলেও বিদ্রোহ বিপ্লবে পরিণত হয় না। রাষ্ট্রকাঠামো প্রহসনে পরিণত হলেও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিষেক ঘটাতে সে ব্যর্থ হয়। তাই ওলটপালট ঘটলেও অন্তিমে আপোস হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে যায় কমরেড লেনিনের কথাগুলো — শোষক ও শোষিত উভয়শ্রেণীর সঙ্কট পরিপক্ক হবার মধ্য দিয়ে ক্রান্তিমুহূর্ত সূচিত হলেও তা সফল হয় না যদি না শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি থাকে।

দেউলিয়ার উৎসব

শান্তনু দে

প্রতিটি নতুন সকাল। ওয়ালস্ট্রিটে কেলেঙ্কারির নতুন খবর। অতলান্তিকের ওপার থেকে কর্পোরেট বিশ্বের কাছে নতুন দুঃসংবাদ।

এনরন দিয়ে শুরু। ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাস। মার্কিন আইনের চ্যাপ্টার - ১১ অনুযায়ী দেউলিয়া আদালতে আবেদন করে এনরন। বিশ্ব পুঁজিবাদ এক বড় ধরনের ধাক্কা খায়। তারপর কেটে গিয়েছে অনেক দিন। বিচার বিভাগ এখনও এনরন নিয়ে নতুন নতুন তছরূপ ফাঁস করে চলেছে। এর মধ্যেই ফাঁস হয়েছে কে মার্ট, টাইকো, এ ও এল-টাইম ওয়ার্নার, জেরক্স, আদেলফিয়া কমিউনিকেশনের মতো একের পর এক মার্কিন ডাকসাইটে সংস্থার জালিয়াতি। নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের নতুন অধিকর্তার নামে উঠেছে ভিতরের খবর জেনে কারবার করার অভিযোগ। গ্লোবালাইজড ফ্রি মার্কেট ইকোনমিতে যাকে বলে 'ইনসাইডার ট্রেডিং'।

শেষে ওয়ার্ল্ডকম। মার্কিন মুলুকের দ্বিতীয় বৃহত্তম দূর সঞ্চার টেলিফোন পরিষেবা সংস্থা। মার্চ মাসে এস ই সি এই সংস্থার বিরুদ্ধে দেওয়ানি প্রতারণার অনুসন্ধান শুরু করে। অভিযোগ, ওয়ার্ল্ডকমের প্রাক্তন সি ই ও বার্নাড এবারস নিজের শেয়ার কেনার জন্য সংস্থার থেকে ৩৪ কোটি ডলার ধার নিয়েছেন। একই সঙ্গে চলে বিচার বিভাগের ফৌজদারি তদন্ত। তাতেই ধরা পড়ে ৩৮০ কোটি ডলার হিসেবের কারচুপি।

২৫শে জুন ওয়ার্ল্ডকম কর্তৃপক্ষ তা স্বীকার করে। সেদিনই শেয়ার দর নেমে যায় ২০ সেন্টে।[১] ৪১০০ ডলার ঋণে জর্জরিত সংস্থা শেষে ২১ শে জুলাই চ্যাপ্টার-১১ অনুযায়ী নিউইয়র্ক জেলা আদালতে আর্থিক সুরক্ষা চেয়ে আবেদন করে।

শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়, বিশ্ব কর্পোরেট ইতিহাসে এ পর্যন্ত এটিই বৃহত্তম দেউলিয়া আবেদন। দেউলিয়া খাতার নাম লেখানোর সময় এনরনের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৬৩.৩৯ বিলিয়ন (এক বিলিয়ন = ১০০ কোটি) ডলার। আর ওয়ার্ল্ডকমের সম্পত্তির পরিমান ছিল ১০৭ বিলিয়ন ডলার।

কেঁচো খুড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়ছে সাপ। বের হচ্ছে নতুন নতুন জালিয়াতি। সংস্থার হিসেব ঘাটতে গিয়ে এই আগষ্টেই বেরিয়েছে নতুন ৩৩০ কোটি ডলারের কারচুপি। ওয়ার্ল্ডকমের নতুন কর্তারা রিভিউ করতে গিয়ে এই গরমিল খুঁজে পান। অর্থাৎ কেলেঙ্কারির পরিমান গিয়ে দাঁড়ালো ৭০০ কোটি ডলারের ওপরে — বিশ্ব কর্পোরেট ইতিহাসে এ পর্যন্ত বৃহত্তম কেলেঙ্কারি।[২]

এর মাঝেই ১১ই আগষ্ট দেউলিয়া খাতায় নাম লেখায় মার্কিন মুলুকের ষষ্ঠ বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইউ এস এয়ার ওয়েজ।[৩]

এরকম আশঙ্কার কথা অবশ্যই আগেই শুনিয়েছিলেন জিওফ্রে কেলভিন। চলতি বছরের ১১ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব পুঁজিবাদের শক্তিশালী মুখপত্র 'ফরচুন'-এর অনলাইন সংস্করণে কেলভিন লিখছেন, 'মার্কিন মুলুকে এখন আক্ষরিক অর্থেই দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার উৎসব চলছে। ... মার্কিন ব্যবসার ইতিহাসে বৃহত্তম ১০টি দেউলিয়া হওয়ার ঘটনার মধ্যে পাঁচটিই ঘটেছে গত বারো মাসে। সর্বকালের চ্যাম্পিয়ান এনরন (তখনও পর্যন্ত, সারণি-১ দেখুন)।' তাঁর বিচক্ষণ মন্তব্য, 'সম্ভবত চরম পর্যায় এখনও আসে নি।' ওয়ার্ল্ডকমের পতন সেই 'চরম পর্যায়' কিনা, না কি তা 'এখনও আসেনি', কেলভিনই জানেন!

তবে 'ফরচুন' জানাচ্ছে, ২০০০ সালে দেউলিয়া তালিকায় যেখানে ১৭৬টি মার্কিন সংস্থা ছিল, সেখানে ২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫৭তে। এনরনের পরপরই জানুয়ারিতে দেউলিয়া হয় ডাকসাইটে দু'টি সংস্থা। গ্লোবাল ক্রসিং এবং কে মার্ট। শেষে সবাইকে ছাপিয়ে ওয়ার্ল্ড কম।

প্রতি সপ্তাহে ওয়ালস্ট্রিটে ফাঁস হচ্ছে নতুন কোম্পানির আর্থিক জালিয়াতি। কিংবা প্রকাশ পাচ্ছে বখে যাওয়া কোম্পানির নতুন কারচুপি। রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা — এরপর কে?

এনরনের দেউলিয়া ঘোষণার পর বড় ধরনের ধাক্কা খায় মার্কিন শেয়ার বাজার। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে লগ্নীকারীদের মধ্যে। মার্কিন জনগণের মধ্যে বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। টাইম ম্যাগাজিনের জনমত সমীক্ষায় দেখা যায়, বৃহৎ কর্পোরেট হাউসগুলির ওপর শতকরা ৬৪ জন মার্কিন নাগরিকের কোনও আস্থা নেই। শতকরা ৬০ জন মনে করেন, কর্পোরেট হাউসগুলির দুর্নীতি ও প্রতারণামূলক কার্যকলাপকে প্রতিহত করতে জর্জ ডব্লিউ বুশ অক্ষম।

আস্থা ফেরাতে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে মাষ্টার ডিগ্রি করা বুশ সাধারণ শেয়ার ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। মার্কিন কর্পোরেট ব্যবস্থা নীতি ও বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এবং তা রীতিমতো স্বাস্থ্যকর। এনরন একটি 'পচা আপেলে'র মতো।[৪] অসংখ্য আপেলের মধ্যে একটি পচা হতেই পারে। কিন্তু বাকিগুলি ভালো। মার্কিন কর্পোরেট জগতেও তাই বিপদের কোন আশঙ্কা নেই।

ওয়ালস্ট্রিটের ভাষণে বুশ বলেছিলেন, 'ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েনি, কেউ কেউ এই ব্যবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়েছেন মাত্র।'[৫]

বুশ ঠিক বলেননি। সেদিন সঠিক মন্তব্য করেছিলেন পল কুর্গম্যান। এম আই টি'র অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক কুর্গম্যান 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর নিয়মিত কলাম লেখক। তিনি বলেছিলেন, '১১ই সেপ্টেম্বরের বিমান সন্ত্রাস নয়, এনরন-ই হবে মার্কিন সমাজের কাছে বড় টার্নিং পয়েন্ট।[৬]

হয়েছেও তাই। ব্যাধি আজ শুধু এনরনে সীমিত নেই। কালান্তক এই ব্যাধি মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে কর্পোরেট আমেরিকার সর্বত্র। বিশ্ব অর্থনীতির ভরকেন্দ্রে খুলে গিয়েছে 'ওয়াটারগেটে'র মুখ। ভেঙে চুরমার কর্পোরেট আমেরিকার চকমিনার দম্ভ।

'ইকোনমিস্ট' পত্রিকার আর্তনাদ, 'আবার কেলেঙ্কারি, আবার আতঙ্ক।'[৭] মার্কিন অবস্থার আকাশচুম্বী অহঙ্কার আজ গভীর সঙ্কটে। 'ফরচুন' পত্রিকার কভারস্টোরি 'ক্রাইসিস অব কনফিডেন্স', আস্থার সঙ্কট, নিবন্ধের শিরোনাম, 'ব্যবস্থা ব্যর্থ, পথ হারিয়েছে কর্পোরেট আমেরিকা।' সঙ্গে আস্থা ফিরিয়ে আনতে ফরচুন-এর রোডম্যাপ।[৮] সি এন এন-এর সংবাদের শিরোনাম, 'বিশ্বাসযোগ্যতার মৃত্যু'।[৯]

বামপন্থী কলাম লেখক জর্জ উইল তাঁর নিবন্ধে একে 'পুঁজিবাদের কাঠামোগত সঙ্কট' বা স্ট্রাকচারাল ক্রাইসিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[১০] কেউ বলেছেন, এটি 'পুঁজিবাদের প্রয়গিক সঙ্কট' অর্থাৎ ফাংশানাল ক্রাইসিস। আসলে এটি 'একটি ব্যবস্থার সঙ্কট', ক্রাইসিস অব এ সিস্টেম। যেমন কুর্গম্যান বলেছেন, 'এনরনের বিপর্যয় নিছক একটি সংস্থার ব্যর্থতা নয়, আসলে এই সমগ্র ঘটনাটি হলো একটি ব্যবস্থার বিপর্যয়।'

অসংখ্য আপেলের মধ্যে এনরন শুধু একটি 'পচা আপেল' নয়, আসলে ব্যবস্থায় পচন। এই পচনেরই ফসল এনরন থেকে ওয়ার্ল্ডকম।

দুই

আটের দশকেও এনরন ছিল একটি ছোট কোম্পানি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় পেন্টাগনে কর্মরত অর্থনীতিবিদ, পরে ফেডারেল পাওয়ার কমিশনের কর্মী কেনেথ লে এর গোড়াপত্তন করেন। হাউস্টন ন্যাচারাল গ্যাস এবং নাব্রাস্কা কেন্দ্রিক গ্যাস কোম্পানি ইন্টারনর্থ মিশে গিয়ে তৈরি হয় হাউস্টন কেন্দ্রিক এনরন কর্পোরেশন। সংস্থার নাম তখনও বিশেষ কেউ জানতেন না।

অথচ, নয়ের দশকে এহেন এনরন রাতারাতি প্রচারের আলোয় চলে আসে। জর্জ ডব্লিউ বুশের খাশতালুক টেক্সাস প্রদেশের বৃহত্তম কোম্পানি হিসেবে এক্সন-মোবিলের পরেই দ্বিতীয় স্থানটি পাকা করে নেয় এনরন। অচিরেই জায়গা করে নেয় দুনিয়ার বহুজাতিক সংস্থাগুলির শীর্ষ তালিকায়।

★ ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে এনরন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম বৃহত্তম কোম্পানি।

★ বিশ্বের প্রথম সারির আর্থিক সাময়িকী 'ফরচুন'-এর জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত 'গ্লোবাল-৫০০' তালিকায় র‍্যাঙ্ক ১৬।

★ ১৯৮৬ সালে রোজগারের পরিমাণ যেখানে ছিল ৭.৬ বিলিয়ান ডলার, ২০০০ সালে — মাত্র চোদ্দ বছরেই তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০১ বিলিয়ন ডলারে।

★ হাইটেক বুদবুদ ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়ার আগে, ২০০০ সালের আগষ্ট মাসেও এনরনের শেয়ারের দাম ছিল ৯০ ডলার।

শুধু 'খোলা বাজার' কিংবা শিল্পের বি-নিয়ন্ত্রণই নয়, এনরনের এই আচমকা উল্লম্ফনের নেপথ্যে ছিল হোয়াইট হাউস। রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্দর মহলের ওপর বিশেষ প্রভাব।

রিপাবলিকান, ডেমোক্র্যাট দুই পার্টির সঙ্গেই ছিল সমান দহরম মহরম। যদিও পাল্লা ভারী ছিল রিপাবলিকানদের প্রতি।

টানা ষোল বছর ধরে সংস্থার সি ই ও পদে থাকা কেনেথ লে বুশের কাছে ছিলেন আদরের 'কেনি-বয়'। আর বর্তমান মার্কিন প্রশাসন তো এনরনের বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এরই সম্প্রসারিত ফর্ম।

ফলে হাউস্টন থেকে বিশ্বের নানা প্রান্তে ডালপালা ছড়াতে এনরনের বেশি সময় লাগেনি। মুম্বাই, ইসলামাবাদ থেকে, কিংবা রাশিয়া — সর্বত্রই ব্যবসা বাড়ানোর ব্যাপারে এনরনকে সাহায্য করেছে মার্কিন প্রশাসন। যেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাপট, সেখানেই গাঁট ছড়া বেঁধে হাজির হয়েছে এনরন। এবং সঙ্গে সি আই এ।

মনে রাখুন, ১৯৯২-২০০০ সালের মধ্যে বিদেশের প্রকল্পগুলি থেকে সংস্থার রোজগারের পরিমাণ ছিল ২৪ কোটি ডলার। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব অ্যারি ফ্লেইসচারের ডাকাবুকো ব্যাখ্যা, 'এর মধ্যে নতুনত্বের কী আছে? ওরা (মার্কিন শিল্প সংস্থাগুলি) কোন্ রাজনৈতিক দল, সেটা মার্কিন নেতাদের বিবেচ্য নয়। নেতাদের কাছে বড় ব্যাপার হলো বিদেশের প্রকল্পগুলিতে তাদের ঠিকেদারি পাইয়ে দেওয়া। সেজন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করা। কারণ সেখানে রয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে এত সহজ করে লেনিনও হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারেন নি!'[১১]

ভারতের দাভোল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কথাই ধরুন। এই প্রকল্পের বরাত পেতে এনরন কাজে লাগিয়েছিল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রশাসনকে। ভারত সরকার এনরন প্রকল্পের চূড়ান্ত সম্মতি দেওয়ার ঠিক চারদিন আগে ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটি এবং ক্লিন্টনের নির্বাচনী তহবিলে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার 'দান' করেছিল এনরন।[১২]

শুধু তাই নয় দাভোল প্রকল্পের ঠিকেদারি পেতে এনরন ভাড়া করেছিল সি আই এ'র ডাকসাইটে এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক উইজনারকে। উইজনারের পরিচয় — তিনি ছিলেন এনরনের বোর্ড সদস্য, ব্যক্তিগত জীবনে সি আই এ'র প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টার সিনিয়র ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের পুত্র। এবং তিনিই এক সময় ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে ছিলেন।[১৩]

আর ভারতে বিরাট ঘুষ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ার কথা তো সবাই জানেন। চাপের মুখে মার্কিন কংগ্রেসের কাছে সেকথা স্বীকার করে নিতেও বাধ্য হয় এনরন কর্তৃপক্ষ। এনরনের কথায়, 'বিদ্যুৎ প্রকল্পের সুবিধেগুলি সম্পর্কে ভারতীয় জনগণকে শিক্ষিত করতে ৬ কোটি ডলার খরচ করা হয়েছে।[১৪]

তিন

১৯৮৩ সালে হাটিসবুর্গের এক কফিশপে বসে চার বন্ধু মিলে একটি ছোট্ট টেলিকম সংস্থা খোলার পরিকল্পনা করেন। সংস্থার নাম দেন ওই কফিশপেরই এক পরিচারিকা। লঙ ডিসট্যান্স ডিসকাউন্ট সার্ভিস (এল ডি ডি এস) নামে ঐ ছোট্ট সংস্থার বিনিয়োগকারী হিসেবেই বার্নাড এবারসের কর্মজীবনের সূত্রপাত। দু'বছরের মধ্যেই তিনি সংস্থার সি ই ও।[১৫]

ইন্টারনেট এবং টেলিকম পরিষেবার ক্ষেত্রে তখন দারুন বাড়বাড়ন্ত। এই সুযোগে এটি অ্যান্ড টি'র কাছ থেকে ব্যান্ড উইথ ভাড়া করে তা কম দামে অন্যদের কাছে বিক্রি করে এল ডি ডি এস ব্যবসা জাঁকিয়ে বসে। ১৯৮৮-'৯৪ সালের মধ্যে তারা ছ'টির বেশি সংস্থাকে অধিগ্রহণ করে, দূরপাল্লার টেলিকম নেটওয়ার্কের জগতে চতুর্থ বৃহত্তম সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শেয়ার মার্কেটের তেজী অবস্থার সুযোগ নিয়ে এল ডি ডি এস তার শেয়ারের দাম বাড়িয়ে দেয়। এবং এই পথে বিপুল ঋণ গ্রহণ করে।

১৯৯৫ সালে এল ডি ডি এস নাম পরিবর্তন করে। নতুন নাম ওয়ার্ল্ডকম। সংস্থার সি ই ও হিসেবে বার্নাড এবারসই থেকে যান। এরপরই শুরু হয় একের পর এক অধিগ্রহণ পর্ব।

প্রথমে ইউ ইউ এন ই টি'র মতো বড় সংস্থাকে অধিগ্রহণ করে। ১৯৯৭ সালের ১০ই নভেম্বর ৩৭ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে কিনে নেয় এম সি আই কে। ১৯৯৯ সালের ২১ শে জুন সংস্থার শেয়ার দর লাফিয়ে ওঠে ৬৪.৫০ ডলারে।[১৬] সম্পত্তির পরিমান দাঁড়ায় ১৮০ বিলিয়ন ডলার। এই সময়ই ছিল ওয়ার্ল্ডকমের স্বর্ণযুগ। ডটকম বুদবুদ ফেটে যাওয়ার পর অগ্রগতির বিপরীত প্রবণতা শুরু হয়।

তবু ওয়ার্ল্ডকম ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম (এটি অ্যান্ড টি'র পর) দূর সঞ্চার টেলিফোন পরিষেবা সংস্থা। ইন্টারনেট বাণিজ্য ও বৈদ্যুতিন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুনিয়ার বৃহত্তম বাহক। প্রথম ই-মেল পরিষেবা চালু করে এই সংস্থাই। একশটির বেশি দেশে রয়েছে ইন্টারনেট সংযোগ। খদ্দেরের সংখ্যা ২ কোটি। সদর দপ্তর মিসিসিপি প্রদেশের ক্লিন্টন শহরে হলেও, সরাসরি ব্যবসা ছড়িয়ে আছে ৬৫টি দেশে। বিদেশে কর্মীসংখ্যা ৬০ হাজার। রয়েছে দেড় লক্ষ কিলোমিটারের বেশি বিশাল নেটওয়ার্ক।

২০০২ সালের জুলাই মাসেও ওয়ার্ল্ডকম ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪২ তম কোম্পানি। ফরচুনের 'গ্লোবাল-৫০০'-র তালিকায় র্যাঙ্ক ছিল ১০৯। ২০০১ সালে বিক্রির পরিমাণ ছিল ৩৫.২ বিলিয়ন ডলার।[১৭]

এহেন সংস্থার বিরুদ্ধেই ২৬ শে জুন নিউইয়র্ক আদালতে জালিয়াতির মামলা দায়ের করে এস ই সি। সেদিনই ধরা পড়ে সংস্থা ২০০১ এবং ২০০২ সালের প্রথম তিন মাস মিলিয়ে বারো মাসের হিসেবে ৩৮০ কোটি ডলার ভুয়ো লাভ দেখিয়েছে। হিসেবের কারচুপি করেছে। কোম্পানি চালাবার জন্য যে খরচ হয় তাকে ব্যয় হিসেবে দেখায়নি। উলটে বলেছে এই অর্থ তারা পুঁজি বিনিয়োগে ব্যয় করেছে। দিনকে রাত, রাতকে দিন। এভাবেই চলতি খরচকে মূলধনী খরচ হিসেবে দেখিয়ে ৩৮০ কোটি ডলার লাভ দেখিয়েছে।

এস ই সি'র তদন্তে বের হয়, সংস্থার প্রাক্তন সি ই ও বার্নাড এবারস (এবছরই এপ্রিল মাসে তিনি পদত্যাগ করেন) নিজের শেয়ার কেনার জন্য ওয়ার্ল্ডকমের কাছ থেকে প্রায় ৩৪ কোটি ডলার ধার নিয়েছিলেন। অথচ, এই এবারসই ছিলেন ডট কম যুগের প্রতিমূর্তি। মিরাক্‌ল ম্যান, বিস্ময় মানব। ওয়ালস্ট্রিটের নয়নের মনি। মার্কিন কর্পোরেট জগতের বাকি সি ই ও'রা তাঁকে নেতা বলে মানতো।

চার

এনরন এবং ওয়ার্ল্ডকম — দু'টি সংস্থাই তাদের লাভের অঙ্ককে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখিয়েছে। 'যেমন এনরন শয়ে শয়ে কোটি ডলার ঋণ তাদের ব্যালেন্সশিট থকে মুছে দিয়েছে। পাহাড় প্রমাণ সেই ঋণকে বাইরের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের হিসেবে ঠেলে দিয়েছে। এভাবেই তারা তাদের আকাশছোঁয়া লোকসানের বহরকে লুকিয়ে রেখেছিল। এবং এভাবেই ক্রেডিটরেটিং এজেন্সি, ব্যাঙ্ক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং রাজনীতিকদের চোখে ধুলো দিয়েছিল।' অপরদিকে ওয়ার্ল্ডকম 'সুপরিকল্পিতভাবে শয়ে শয়ে কোটি ডলার খরচকে মূলধনী ব্যয়ের হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছিল।'[১৮]

উভয় কোম্পানি লাভের অঙ্ককে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোর কারণ একটাই। ফাটকা বাজার, আর্থিক বাজার। এটা বলা মোটেই ভুল হবে না, আর্থিক বাজারের ছন্দেই নাচছে আজকের রিয়েল ইকোনমি। এবং মার্কিন অর্থনীতিতে এটি আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। যেখানে অর্থনীতি মূলত আর্থিক বাজার-ভিত্তিক, জাপান জার্মানির মতো ব্যাঙ্ক-ভিত্তিক নয়। মার্কিন কর্পোরেট দুনিয়ায় কোনও কোম্পানির পারফরমেন্স ঠিক হয় আর্থিক বাজারে শেয়ার দরের ওপ'র। কোম্পানির মৌলিক বা বুনিয়াদী ভিত্তি সেখানে প্রাধান্য পায় না। কিন্তু এই আর্থিক বাজার ভীষণই ত্রুটিপূর্ণ, যুক্তিহীন। রয়েছে নানা অসঙ্গতি। যেমন এক পেনি লাভের সম্ভাবনা দেখা

দিলেই কোম্পানির শেয়ারের দাম দশ শতাংশ লাফিয়ে ওঠে, তেমন সম্ভাব্য মুনাফা থেকে এক পেনি খসার আশঙ্কা দেখা দিলেই শেয়ারদর দশ শতাংশ পড়ে যায়। 'ক্যাসিনো ক্যাপিটালিজমে' এটার দস্তুর। শেয়ারের দামে কখনও সংস্থার প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন ঘটে না। কিন্তু সংস্থা চায় প্রকৃত অবস্থা আড়াল করে নিজেদের আরও ভালো দেখাতে।

এনরনের মতোই ওয়ার্ল্ডকম-ও তাই তাদের মুনাফার অঙ্ককে অনেক বাড়িয়ে দেখিয়েছিল... লক্ষ্য ছিল প্রতিটি ত্রৈমাসিকে বিগত দিনের তুলনায় অতিরিক্ত মুনাফা।[১৯]

বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে এই কাজটা মোটেই সহজ নয়। সংস্থার বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার চেয়ে কেনেথ লে, বার্নাড এবারস'রা বেশি ভাবতেন শেয়ার বাজারে তাঁদের শেয়ার-দর নিয়ে। কারণ উচ্চ হারে মুনাফা দেখানো না গেলে শেয়ার বাজারে কোম্পানির দাম কমে যাবে। শেয়ারের দামকে চড়া রাখতেই তাই ব্যালেন্সশিটের এই জালিয়াতি।

দু'টি সংস্থাই একদিকে তাক লাগানো গতিতে একের পর এক সংস্থাকে অধিগ্রহণ করে বিপুল কলেবর ধারণ করেছে, অন্যদিকে পাহাড়প্রমাণ ঋণকে ধামাচাপা দিয়েছে, মুনাফাকে বাড়িয়ে দেখিয়েছে।

অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় এবং আগ্রাসী গতিতে এই অধিগ্রহণের ফলে পরিচালন ব্যবস্থায় নেমে আসে সঙ্কট। অসংখ্য অধীনস্থ সংস্থার পরিচালনার জন্য যে সুসংবদ্ধ সুষম কেন্দ্রীয় পরিচালন ব্যবস্থা দরকার তার অভাব ঘটে। দেখা যায় হিসেবে কারচুপি করার প্রবণতা। এনরন বা ওয়ার্ল্ডকমের বিপর্যয়ের এটি একটি বড় কারণ।[২০]

দু'টি সংস্থারই উত্থানের অন্যতম কারণ হলো বি-নিয়ন্ত্রণ। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বি-নিয়ন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণ করে এনরন তার ব্যবসাকে বাড়িয়েছিল। শক্তি বিষয়ক টাস্কফোর্স গঠনের সময় মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি ডিক চেনি অন্তত ৬ বার কথা বলেছিলেন সংস্থার কর্ণধার কেনেথ লে'র সঙ্গে। এনরন কর্তার সম্মতি নিয়েই টাস্ক ফোর্সের নীতি চূড়ান্ত করেছিল বুশ প্রশাসন। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের পাশাপাশি টেলিকম পরিষেবার ক্ষেত্রেও বি-নিয়ন্ত্রণ হয়। এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল এল ডি ডি এস, আজকের ওয়ার্ল্ডকম।

দু'টি সংস্থার ক্ষেত্রেই অডিটর সংস্থা ছিল আর্থার অ্যান্ডারসন। মার্কিন মুলুকে হিসেব পরীক্ষায় যে পাঁচটি মহারথীর দাপট অ্যান্ডারসন তাদেরই অন্যতম। নব্বই বছরের পুরনো এই সংস্থাটির ৮৪টি দেশে রয়েছে ৩৯০টি অফিস। কর্মী সংখ্যা ৮৫ হাজার। আয়ের পরিমাণ ৯৩০ কোটি ডলার।[২১]

লাভ-লোকসানের হিসেব যাদের পরীক্ষা করে দেখার কথা, সেই আর্থার অ্যান্ডারসন-ই এনরন ওয়ার্ল্ডকমের যাবতীয় ধুলোকে সযত্নে কার্পেটের নিচে ঠেলে দিয়েছে। যেমন মার্কিন সেনেটের এক সদস্য অ্যান্ডারসনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'এনরন ব্যাঙ্ক লুঠ করেছে, আর আপনারা সেই লুণ্ঠিত অর্থ বয়ে নিয়ে যেতে গাড়ি যুগিয়েছেন।'[২২]

এই অ্যান্ডারসন যেমন ছিল এনরনের হিসেব পরীক্ষক, তেমনই ছিল উপদেষ্টাও। সেকারণেই হিসেব পরীক্ষার জন্য যেমন দক্ষিণা মিলতো, তেমনই পরামর্শ দেওয়ার জন্য মিলতো মোটা অঙ্কের ডলার। 'অডিট ফি'র থেকে বহুগুণ বেশি অর্থ পেতো 'কনসালটেন্সি ফি' থেকে। যেমন গত বছরই এরকম হিসেব বহির্ভূত কাজের জন্য এনরন অ্যান্ডারসনকে দিয়েছিল অতিরিক্ত প্রায় আড়াই কোটি ডলার। অন্ধ হয়ে থাকার জন্য ঘুষ। কোম্পানির লাভের হার বাড়লে বাড়তো অ্যান্ডারসনের কমিশনও। একই সঙ্গে বাড়তো মক্কেল কোম্পানির কাছ থেকে 'উপদেষ্টা'র কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা।[২৩]

বলাই বাহুল্য, অ্যান্ডারসন সব সময়েই তাই মক্কেল সংস্থার আর্থিক অবস্থা ভালো দেখাতে চেয়েছে। এনরন ওয়ার্ল্ডকম বারংবার তার আয়কে কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেখিয়েছে। আর অ্যান্ডারসন বরাবর তার অনুমোদন দিয়ে এসেছে।

ওয়ার্ল্ডকম যখন ডুবছে এবারস তা জানতেন। কিন্তু কোনওভাবেই সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের সতর্ক করেননি। এস ই সি ওয়ার্ল্ডকমের বিরুদ্ধে ভ্রষ্টাচার এবং প্রকৃত আর্থিক অবস্থা গোপন করার অভিযোগ এনেছে। বিপর্যয়ের ঠিক আগে কেনেথ লে সহ এনরনের ২৯ জন শীর্ষস্থানীয় অফিসার তাঁদের শেয়ার বিক্রি করে দেন। কেনেথ লে'রা সব জেনে বুঝে যখন নিজেদের শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছেন, ঠিক তখনই আবার অপরকে শেয়ার কেনার টোপ দিচ্ছেন। জাহাজ ডুবছে জেনেও, সেই জাহাজে ওঠার জন্য সবাইকে বলছেন।

দু'টি সংস্থার কেলেঙ্কারির মারাত্মক দিকটি হলো হিসেবপত্রের এই জাল-জুয়াচুরি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তথাকথিত 'অবাধ বাজার'-এর মতবাদ যে কতটা ভুয়ো, তার অকাট্য প্রমাণ এনরন থেকে ওয়ার্ল্ডকম। সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ফল যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে দু'টি সংস্থা।

জর্জ বুশ সাধারণ মানুষকে শেয়ার বাজারে অর্থ বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমাদের টাকা তোমরা বাজারে খাটাবে না কেন? বাজারে টাকা খাটাও, তোমরাও বড়লোক বনে যাবে।

মানুষ বিশ্বাস করেছিলেন। ব্যালেন্সশিট দেখে শেয়ার কিনেছিলেন। সরল বিশ্বাসে শেয়ার কিনেছিলেন সংস্থার বহু কর্মচারীও। নিজেদের অবসরের সব সঞ্চয় বিনিয়োগ করেছিলেন। দু'টি সংস্থার পতনে হাজার হাজার কর্মীর তাই কেবল চাকরি-ই যায় নি, অবসরের পর প্রাপ্য সমস্ত অর্থও নিঃশোষিত।

কারণ এনরন ওয়ার্ল্ডকমের শেয়ার এখন বাজে কাগজে পরিণত। এই এনরনেরই শেয়ারের দাম ছিল ৯০ ডলার। এক ধাক্কায় তা নেমে আসে মাত্র ২৯ সেন্টে। ওয়ার্ল্ডকমের শেয়ারের দাম ছিল ৬৪.৫০ ডলার। এখন তার দাম ২০ সেন্টও নয়।

লক্ষ লক্ষ শেয়ার হোল্ডার, মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি, বিনিয়োগ বিশারদ, শেয়ার বাজারের দালালরা কোম্পানির এই করুণ অবস্থার কথা আগে কিছুই জানতে পারেননি। যখন জেনেছেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

এবং দু'টি সংস্থারই উল্লম্ফনের নেপথ্যে ছিল হোয়াইট হাউস। রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে বিশেষ প্রভাব।

জুনিয়ার বুশ তখন টেক্সাস প্রদেশের গভর্নর। টেক্সাস থেকে হোয়াইট হাউসে বুশকে পাঠাতে সরাসরি ময়দানে নেমে পড়েন কেনেথ লে। বুশের নির্বাচনী তহবিল গঠনের দায়িত্ব প্রায় একার ঘাড়েই তুলে নেয় এনরন। টেক্সাস থেকে সবচেয়ে বেশি চাঁদা তুলে দেয় তারাই। সংস্থা তার পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি (পি এ সি) এবং কর্মীদের থেকে তুলে দেয় ১ লক্ষ ১৪ হাজার ডলার। বুশের নির্বাচনী তহবিল গঠনের দ্বাদশ সংস্থাটি ছিল এনরন। কেনেথ লে নিজে দেন ব্যক্তিগতভাবে যে কারোর চেয়ে অনেক বেশি। ১ লক্ষ ডলাব। এছাড়া এদিক-সেদিক থেকে তুলে দেন আরও অন্তত ১ লক্ষ ডলার। সমানভাবে এনরনের 'দান' পেয়ে এসেছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিও। ১৯৯১-'৯২ সালে ভোটের সময় এনরন ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে দেয় ৩০ হাজার মার্কিন ডলার। ১৯৯৩-'৯৪ সালে ভোটের সময়েও তারা ক্লিন্টনের পার্টিকে ৪২ হাজার ডলার 'দান' করে। বর্তমানে একশ'জন মার্কিন সেনেটরের মধ্যে ৭১ জনই এনরনের টাকা নিয়েছে। অন্যদিকে ১৮৬ জন কংগ্রেস সদস্য গত এক দশক ধরে এনরনের কাছ থেকে 'দান' পেয়ে আসছে।[২৩]

।তিক দলগুলিকে চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারে ওয়ার্ল্ডকমেরও ছিল দরাজ হাত। পরিসংখ্যান বলছে, গত বারো বছরে ওরা এই খাতে শুধু নগদ খরচই করেছে ৭৬ লক্ষ ডলার। সংস্থা নিয়ে শোরগোল পড়ার ঠিক ক'দিন আগেই এক আনন্দ সন্ধ্যায় তারা রিপাবলিকান পার্টির হাতে তুলে দেয় ১ লক্ষ ডলার। সেই সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে বুশ নিজে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কর ছাড় থেকে বি-নিয়ন্ত্রণের সুবিধে আদায় করতে ওয়াশিংটনে 'লবি' করার জন্য বছরে তাদের বাজেট ছিল ৩০ লক্ষ ডলার।[২৪]

তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো তথ্যটা হলো, ওয়ার্ল্ডকম তদন্তের প্রধান মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল জন অ্যাশক্রফটও বরাবর ঐ সংস্থা থেকে ভেট পেয়ে এসেছেন। ১৯৯৩-২০০০ সাল পর্যন্ত অ্যাশক্রফট সেনেটের সদস্য ছিলেন। তখনই তিনি ওয়ার্ল্ডকমের কাছ থেকে পেয়েছেন ১০ হাজার ডলার।[২৫]

বুঝুন তাহলে! যাকে নিয়ে তদন্ত, তদন্তের দায়িত্বে থাকা প্রধান তার থেকেই এতদিন 'উৎকোচ' খেয়ে এসেছেন।

চমকে দেওয়ার মতো রয়েছে আরও তথ্য। এনরন ওয়ার্ল্ডকমের চেয়েও বুশের অতি বড় সম্পর্কটা ছিল আর্থার অ্যান্ডারসন। ১৯৯৯-২০০০ সালে বুশের নির্বাচনী তহবিলে এই সংস্থা তার পি এ সি এবং কর্মীদের কাছ থেকে তুলে দিয়েছিল ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ডলার। বুশের দাতাদের মধ্যে পঞ্চম স্থানে ছিল অ্যান্ডারসন।

এবং ঘটনা হলো এনরনে পতনে অ্যান্ডারসনের ভূমিকার তদন্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস সদস্য বিল্লি টাউজিনও সংস্থার থেকে পেয়েছেন মোটা অঙ্কের ভেট। অ্যান্ডারসনের কাছ থেকে টাউজিন পেয়েছিলেন ৫৭ হাজার ডলার।[২৬]

রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশের নির্বাচনী তহবিল গঠনে শীর্ষদাতা'রা

১. এম বি এন এ কর্পোরেশন	২৪০,৬৭৫ ডলার
২. ভিনসন অ্যান্ড এনকিনস	২০২,৮৫০ ডলার
৩. ক্রেডিট সুইজ ফার্স্ট বোস্টন	১৯১,৪০০ ডলার
৪. আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ং	১৭৯,৯৪৯ ডলার
৫. অ্যান্ডারসন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড	১৪৫,৬৫০ ডলার
৬. মর্গান স্ট্যানলি ডিন উইটার অ্যান্ড কোং	১৪৪,৯০০ ডলার
৭. মেরিল লিঞ্চ	১৩২,৪২৫ ডলার
৮. প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স	১২৭, ৭৯৮ ডলার
৯. বেকার অ্যান্ড বট্‌প	১১৬,১২১ ডলার
১০. সিটি গ্রুপ ইঙ্ক	১১৪,৩৮০ ডলার
১১. গোল্ড ম্যান গ্রুপ	১১৩,৯৯৯ ডলার
১২. এনরন কর্পোরেশন	১১২,৫০০ ডলার
১৩. ওয়ার্ল্ডকম ইঙ্ক	৪১,৬০১ ডলার

সূত্র — ফেডারেল ইলেকশন কমিশন থেকে সংগৃহীত সেন্টার ফর রেসপনসিভ পলিটিক্স-এর দেওয়া তথ্য।

পাঁচ

এরই নাম 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজিম'। বহুজাতিক সংস্থা এবং সরকারের মধ্যে অনৈতিক জোট। বন্ধুবৎসল পুঁজিবাদ।

'দুর্বল নিয়ন্ত্রণ বিধি'র জন্য ওয়াশিংটন ক'দিন আগেও এশিয়াকে কম গালমন্দ করেনি। গোটা তল্লাটকে চিহ্নিত করেছিল 'স্বচ্ছতার অভাব' এবং 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজিম' হিসেবে।

পরিহাস এই যে তাবৎ বিশ্ব এখন ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই দুষছে। পল কুর্গম্যানের ভাষায়, 'মার্কিন ধাঁচের ক্রোনি ক্যাপিটালিজিমের মুখোশ খুলে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে বুশ প্রশাসন।'[২৭]

কুর্গম্যান লিখছেন, চার বছর আগে এশিয়া যখন চরম সঙ্কটে, তখন বহু বিশেষজ্ঞই এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী করেছিলেন ক্রোনি ক্যাপিটালিজিমকে। এশিয়ার সম্পদশালী ব্যবসায়ীরা তাদের বিনিয়োগকারীদের কাছে কোম্পানির কত সম্পদিত রয়েছে সেই সত্যিটা জানানোর প্রয়োজনটুকু বোধ করেনি। সযত্নে গোপন করে গিয়েছে নিজেদের লাভ-ক্ষতির সঠিক খতিয়ান। আর একাজে মদত দিয়ে এসছে রাজনৈতিক দলগুলি। আর্থিক সঙ্কট যখন শুরু হয়, তখনই মানুষ ব্যবসার ব্যালেন্সশিটের দিকে কড়া চোখে তাকাতে শুরু করেন। যদিও, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উপদেশ দিয়েছে — অর্থলগ্নি ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা দরকার। কোম্পানির সমস্ত হিসেব-নিকেশ বাইরের বিনিয়োগকারীদের কাছে ঠিক ঠিক জানাতে হবে। বর্জন করতে হবে ক্রোনি ক্যাপিটালিজিমকে।

আজ সেই উপদেশ-ই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে ওয়াশিংটনের দিকে। পরিচালনার যে মডেল নিয়ে এতদিন কর্পোরেট আমেরিকার অহঙ্কার ছিল, হিসেব রাখার যে পদ্ধতি নিয়ে গর্ব ছিল, তা-ই আজ কিছু সি ই ও, অডিটর, লগ্নিকারী ও ব্যাঙ্ক চক্রের হাতে পড়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি বড় মার্কিন কোম্পানিরই নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ-বিধি রয়েছে। এখন তারাই নিজেদের তৈরি নিয়ম লঙঘন করছে। চলছে নিয়ম-নীতি ভাঙার রূদ্ধশ্বাস এপিসোড। নিজস্ব-নিয়ন্ত্রণকে ভিত্তি করে তৈরি কর্পোরেট আমেরিকার মডেল ভেঙে পড়ছে তাসের ঘরের মতো।

তাবৎ বিশ্ব এখন ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই দুষছে। মার্কিন ঘরানার ক্রোনি ক্যাপিটালিজম এনরন থেকে ওয়ার্ল্ডকম কেলেঙ্কারি সেঁধিয়ে ঢুকেছে হোয়াইট হাউসের অন্দর মহলে। একই সঙ্গে জাল বিছিয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশন কক্ষে।

'দুর্নীতিমুক্ত মার্কিন প্রশাসন' আর 'সোনার পাথরবাটি' আজ সমান অবাস্তব। এনরন থেকে ওয়ার্ল্ডকমের ঘটনা — মার্কিন প্রশাসনের এই মিথ্যে অহঙ্কারকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। যদিও, এধরনের কেলেঙ্কারি মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। বরং পুঁজিবাদে এটাই দস্তুর। পুঁজিবাদের ইতিহাসে পুঁজির কেন্দ্রীভবনে বরাবরই জালিয়াতি, প্রতারণা জোচ্চুরি ও চাতুরির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেলেঙ্কারির বন্যা এরকম নগ্নভাবে কখনও প্রকাশ পায়নি।

'টাইম', 'লস এঞ্জেলস টাইমস'-এর একসময়ের নিয়মিত কলাম লেখক টম প্লেটের কথায়, হ্যাঁ এটা ঠিক অনেক ক্ষেত্রেই আমেরিকা ব্যতিক্রম। কিন্তু দুর্নীতি অন্য সব জায়গার মতো এখানেও সমানভাবে সংক্রামিত।

বার্লিন কেন্দ্রিক এনজিও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল। এরা দুর্নীতি নিয়ে সমীক্ষা চালায়। সংস্থার সাম্প্রতিক সমীক্ষাতেই রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলির সরকারী আমলা-মন্ত্রীদের উন্নত বিশ্বের বিশেষ করে মার্কিন মুলুকের বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিশাল ঘুষ দেওয়ার অসংখ্য প্রমাণ।

জেরক্স কর্পোরেশনের কথাই ধরুন। মার্কিন এই কোম্পানিটির ভারতে সহযোগী সংস্থার নাম জেরক্স ইন্ডিয়া। পরে বি কে মোদীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি করে মোদী জেরক্স।

এই ২৮ শে জুন জেরক্স কর্পোরেশন তাদের বার্ষিক বিবৃতিতে আমেরিকার সিকিউরিটিজ কমিশনকে জানিয়েছে, ২০০০ সালে ভারতে তাদের সহযোগী সংস্থা মোদি জেরক্স বরাত পাওয়ার জন্য ৭০ লক্ষ ডলার বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের অফিসারদের ঘুষ দিয়েছে। জেরক্সের

মুখপাত্র পল অ্যারোস্মিথ বলেছেন, ভারতে তাদের এই সংস্থা বহুদিন ধরেই ঘুষ দিয়ে আসছে। সংস্থার বিক্রি বাড়ানোর জন্য কতদিন ধরে এই কাজ করছে এবং মোট কত টাকা ঘুষ দিয়েছে, তা তাদের জানা নেই।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, ঘুষ দাতাদের সূচকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০এর মধ্যে পেয়েছে ৫.৩। ফ্রান্স. স্পেন, জার্মানি, সিঙ্গাপুর এমনকি ইংল্যান্ডের থেকেও তারা পিছিয়ে।

'খোলা বাজার' অর্থনীতির ভরকেন্দ্রই আজ টালমাটাল। খোলাবাজারের তত্ত্বই আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। রেগান শুনিয়েছিলেন, খোলা বাজার থাকলে প্রতিযোগিতা থাকবে। বাড়বে স্বচ্ছতা। উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ।

ফান্ড-ব্যাঙ্ক-ডব্লিউটিও'র কর্তারা উন্নয়নশীল দেশগুলির কানে মন্ত্রণা দিয়েছিলেন, বাজারের ওপর পুরো ভরসা রাখুন, নিয়ন্ত্রণের কোনও বালাই রাখবেন না, কোম্পানির কর্তাদের দিয়ে সরকারী সংস্থাগুলি চালান, মন দিন বেসরকারিকরণে, করুন বি-নিয়ন্ত্রণ।

এ প্রসঙ্গে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনের পুরানো ও নিবিড় সখ্যের দিকটি স্মরণ করার জন্য 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা ভাষ্যকার টমাস ফ্রিডম্যান কী বলছেন শুনুন। বাজার অর্থনীতি বা মুক্ত বাজার অর্থনীতির রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখছেন — বাজারের যে অদৃশ্য হাত রয়েছে, তা কখনই অদৃশ্য মুষ্ঠি ছাড়া কাজ করতে পারে না। এই অদৃশ্য মুষ্ঠি সারা বিশ্বে সিলিকন ভ্যালির কমপিউটার বা তথ্য প্রযুক্তিকে নিরাপদে রাখে। এই অদৃশ্য বা লুকিয়ে রাখা মুষ্ঠি হলো মার্কিন সেনাবাহিনী বিমান ও নৌ-বাহিনী এবং নৌ-সেনা।[২৮]

রেগানের 'খোলাবাজারে' স্বচ্ছতার নামাবলি চাপিয়ে আসলে এই 'অদৃশ্য মুষ্ঠি'-ই দাপিয়ে বেরাচ্ছে।

বার্লিনের ভাঙা প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা শুনিয়েছিলেন, ইতিহাসের অবসান হয়েছে। ধনতন্ত্র-ই 'সার সত্য', এর কোনও বিকল্প নেই। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় মানেই দ্বন্দ্বের অবসান, সঙ্কটের স্থায়ী অবসান। কারণ, এই ব্যবস্থা নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

১৯৯২ সালে ফ্রি প্রেস বার করে ফুকুয়ামার 'দ্য এন্ড অব হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান'। প্রকাশনা হতে যতটুকু সময় — মুহূর্তে বেরিয়ে যায় কুড়িটির ওপর বিদেশী সংস্করণ। অচেনা এক অধ্যাপকের বই তুরন্ত চলে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্স, জাপান এবং চিলির 'বেস্ট সেলার'-এর তালিকায়। লস এঞ্জেলস টাইমস দেয় 'বুক ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ড'-এর সম্মান। বইটিকে ঘিরে রীতিমতো হই হই কাণ্ড।

উত্তেজনার পারদ মার্কিন জোয়ার বাজারেও। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় বেড়ে চলে ফাটকা বাজারে লগ্নির পরিমাণ। ১৯৭০ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে পুঁজি চলাচলের ৯০ শতাংশ বিনিয়োগ হতো উৎপাদন ও বাণিজ্যে। দশ শতাংশ হতো ফাটকা বাজারে। বর্তমান ঘটনা ঠিক তার বিপরীত। ১৯৯৫ সালে ৯৫ শতাংশ পুঁজিই খেটেছে ফাটকা বাজারে। প্রতিদিন এধরনের পুঁজি সঞ্চালনের পরিমাণ — সাতটি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের সঞ্চিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার চেয়েও বেশি।[২৯] নয়ের দশকের শেষে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে দৈনিক লেনদেনের আয়তন দাঁড়ায় ১.২ ট্রিলিয়ন ডলারের ওপরে।

পাশাপাশি চলে আর্থিক বাজারের বেপরোয়া বি-নিয়ন্ত্রণ। যা ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে ফাটকা বাজারকে। সংস্থার পাহাড় প্রমাণ মুনাফা আসতে শুরু করে ফাটকা বাজারে শেয়ারের দর থেকে। 'গ্লোবাল ক্যাসিনো'র এই অর্থনীতিতে যেমন অনায়াসেই আমীর বনা যায়, তেমনই রাতারাতি ফকিরও হতে হয়। জুয়ার আড্ডায় এটাই দস্তুর।

আসলে সর্ষের মধ্যেই ভূত। আসলে গোড়াতেই গলদ। ব্যবস্থার জঠরেই রয়েছে সঙ্কটের বীজ। এনরন থেকে ওয়ার্ল্ডকম তারই ফসল। মার্কিন মুল্লুকে কর্পোরেট কেলেঙ্কারির এই বন্যা

নতুন করে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে সমাজতন্ত্রের উপযোগিতা। সেটিই এই ঘটনার বৃহত্তর তাৎপর্য।

চীন ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা

নির্মলকুমার চন্দ্র

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (WTO) দোহা (২০০১) সম্মেলনের প্রাক্কালে বেশীর ভাগ পর্যবেক্ষক স্বীকার করেন, বিগত দশ বছরের 'মুক্ত বাণিজ্যের' ফলে উপকৃত হয় উন্নয়নশীল জগৎ নয়, মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনী দেশ। এমনকি নয়া উদারনীতির (neoliberalism) জোরালো প্রবক্তা, লণ্ডনের সাপ্তাহিক 'ইকনমিস্ট', একই সুরে লেখে। মুক্ত বাণিজ্যের সমালোচকরা যা আশঙ্কা করে, বাস্তবে তাই ঘটে। ১৯৮৬ সালে GATT-এর Uruguay অধ্যায়ের সূচনা। প্রথম দিকে প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশ— ব্রাজিল, মিশর, ভারত, যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি নতুন প্রস্তাবগুলির কঠোর বিরোধিতা করে। কিন্তু নব্বই দশকের শুরুতে ভারত-সমেত প্রায় সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ বিদেশী ঋণের বোঝায় তাদের সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলে। আন্তর্জাতিক দুই মহাজন, বিশ্বমুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের চাপে সবাই বাধ্য হয় ১৯৯৪ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় যোগ দিতে।

তাই প্রশ্ন জাগে ঃ উন্নয়নশীল চীন কেন ঐ সংস্থার সদস্য হওয়ার চেষ্টা করেছে ১৯৮৬ সাল থেকে? GATT-এর বাইরে থেকেও ওরা ১৯৮০-২০০১ সাল পর্যন্ত রপ্তানি বাণিজ্যে অসামান্যভাবে সফল হয়। বিশ্ববাণিজ্যসংস্থার সদস্য হওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? চীনের অভ্যন্তরে পার্টির মধ্যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারী স্তরে, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে তুমুল বিতর্ক হয়েছে, এখনও যার শেষ হয়নি। সমালোচকদের মতে ঐ সংস্থায় যোগ দিলে তৃতীয় বিশ্বের আর সবার মতো চীনও পাশ্চাত্যের নয়া-উপনিবেশে রূপান্তরিত হবে। অপরপক্ষ স্বীকার করে, চীনে আমদানি বাড়বে, অনেক দেশীয় শিল্প বাঁচবে না, আর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক হবে বেকার। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাণিজ্যের পরিবেশে নতুন নতুন সুযোগ আসবে কৃষিতে, শিল্পে ও পরিষেবায়, যার ফলে শ্রমের চাহিদা বেড়ে যাবে।

প্রসঙ্গত, ঠিক একই যুক্তি দিয়েছিল ভারত সরকার ১৯৯৪ সালের চুক্তি স্বাক্ষর করার সময়। জাতীয় আয়ের মাপকাঠিতে চীন এখনও বিশ্বতালিকার নীচের দিকে। ২০০০ সালে মাথাপিছু আয় (ডলারে) ছিল— চীন ৮৪০, ভারত ৪৬০, নিম্ন আয় (low income) দেশগুলির গড় ৪২০, আর 'মাঝারি আয়' দেশগুলির গড় ১১৪০। ডলার প্রতি 'বাজারি বিনিময় হারের' (market rate of exchange) পরিবর্তে যদি প্রতিটি মুদ্রার আপেক্ষিক ক্রয়ক্ষমতার (purchasing power parity) ভিত্তিতে বিনিময় হার নির্ণয় করি, তবুও একই

ছবি বেরিয়ে আসে। চীন এখনও খুবই দরিদ্র, আর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক কৃষিনির্ভর।

অন্য অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু চীন উন্নয়শীল নয়, উন্নত দেশ। প্রায় এক যুগ ধরে চীন-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় আমেরিকা দাবি করে যে চীন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় যোগ দেবে উন্নত দেশ হিসাবে। চীন সেটা মানেনি। আর শেষ পর্যন্ত একটা আপোষ হয়।

এই প্রবন্ধের পরবর্তী অনুচ্ছেদে থাকছে চীনের স্বনির্ভরতা (selfreliance) নিয়ে বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় অংশে আলোচনার বিষয় হবে ওদের আপেক্ষিক উন্নয়নমাত্রা। এর পর সংক্ষেপে বিবরণ দিয়েছি কিভাবে চীন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় যোগদানের আগে নানাভাবে প্রস্তুতি নেয়। যোগদানের লিখিত শর্তগুলি কি? তারফলে কি ধরনের প্রভাব পড়বে দেশের বিভিন্ন স্তরে? চতুর্থ অনুচ্ছেদে এইসব 'কঠোর তথ্য' (hard facts) ও জল্পনা-কল্পনার সংমিশ্রণ। সবশেষে প্রশ্ন তুলেছি, নাতিদূর ভবিষ্যতে চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে মৌল পরিবর্তনের সম্ভবনা আছে কি?

বিভিন্ন বিষয় আলোচনার সময় সোভিয়েত ইতিহাসের উল্লেখ করেছি। আপাতদৃষ্টিতে এটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু চীনের নেতারা প্রতি পদক্ষেপে অনুরূপ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণ করেই নিজস্ব পথ বেছে নিয়েছেন।

স্বনির্ভরতা

নয়া চীনের জন্মমুহূর্ত থেকে এ পর্যন্ত দেশনেতারা একটি ব্যাপারে অবিচল থেকেছেন। রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা একটা মূলমন্ত্র। প্রথম দিকে ক্রুশ্চেভের আমলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল পরিমাণে সাহায্য দেয় চীনের আধুনিক শিল্পের, বিশেষতঃ ভারী শিল্পের ভিত্তিপ্রস্তর রচনায়। সামগ্রিক পরিকল্পনা ব্যবস্থা (planning system), কারখানাগুলির পরিচালন রীতি (management practice)-সহ আরো নানান ব্যাপারে চীন সোভিয়েতের অনুকরণ করে। কিন্তু আর্থিক সাহায্য বা সোভিয়েত-প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল কম। দু'দেশের মধ্যে যখন রাজনৈতিক মতবিরোধ দেখা দেয়, সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা চীন ছেড়ে আসে ১৯৬০-৬১ সালে, অল্প কয়েক বছরের মধ্যে চীন তার বকেয়া ঋণ পরিশোধ করে। অসমাপ্ত কলকারখানাগুলি চালু করতে আরো কিছুটা সময় লাগে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চীনের ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদরা সফল হয়।

১৯৭৯ সালে 'মুক্তদ্বার' (open door) নীতি গ্রহণ করে চীন। বহির্বাণিজ্য, বিদেশী পুঁজি, বিদেশী প্রযুক্তি (technology)– এসব ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। কিন্তু চীন কখনই তার স্বনির্ভরতা হারায় নি।

নয়া উদারনীতির প্রবক্তারা প্রায়শঃ স্বনির্ভরতাকে বিকৃত করে 'স্বয়ংসম্পূর্ণতার' (autarky) নামান্তর বলে চিহ্নিত করে। মার্কস, লেনিন বা স্তালিন, কেউই এ ধরনের ব্যাখ্যা দেননি, আর কাম্বোডিয়ার এককালীন নেতা পল পট (Pol Pot) ব্যতিরেকে কোনো সমাজতন্ত্রী দেশ বহির্বাণিজ্য থেকে বিরত হয়নি। উল্টোদিকে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্নভাবে সমাজতন্ত্রী দেশগুলির বহির্বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

স্বনির্ভরতার একটা মুখ্য সূচক হল বিদেশী ঋণের আপেক্ষিক পরিমাণ, দেশের বিদেশী মুদ্রা অর্জন ক্ষমতার তুলনায়। আজকের চীন প্রতি বছর রপ্তানি করে ২৫,০০০ কোটি ডলার মূল্যের সামগ্রী, আর বিদেশী ঋণের অংক ১৫,০০০ কোটি ডলার ; ভারতের পক্ষে এই পরিসংখ্যানগুলি হচ্ছে যথাক্রমে ৪,৫০০ ও ১১,০০০ কোটি ডালার। এ ছাড়া চীনের 'বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিলে' (foreign exchange reserve) আছে ২০,০০০ কোটি ডলার; চীনের সঙ্গে হংকং (রপ্তানি ১৫,০০০ কোটি ডলার, বিদেশী ঋণ শূন্য, তহবিলে মজুত

১১,৩০০ কোটি ডলার) যুক্ত করলে, সহজেই বোঝা যাবে কেন পাশ্চাত্য ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলি ওদেশের ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি করতে পারে না।

আরেকটি প্রশ্ন উঠবে— চীন কি ভারত-সমেত উন্নয়নশীল দেশগুলির মতো, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সাদর সংবর্ধনা জানাচ্ছে না? সাবেকী সমাজতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা কি আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত বহন করে না? এর উত্তর একাধিক। এক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশী পুঁজি আহ্বান করছে ব্যাপকহারে গত ১৫-২০ বছর ধরে। 'বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ' (foreign direct investment) আমেরিকা যতটা আকর্ষণ করে প্রতি বছর, আর কোনো দেশ ততটা পারে না। শেষের ৩/৪ বছরে মার্কিন কোম্পানিগুলি বিদেশে যত বিনিয়োগ করছে, তার থেকে বেশী মূলধন আসছে আমেরিকায়—জাপান, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ থেকে। কেউ বলবে না যে, এর ফলে আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খর্বিত হয়েছে। কারণ দেশজ পুঁজির অনুপাতে ওদেশে বিদেশী পুঁজি একটা ভগ্নাংশমাত্র। চীনের চিত্রও অনুরূপ— কোনো শিল্প শাখা নেই যেখানে বিদেশীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছে। আমেরিকা বা চীনের মতো, ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজির শতাংশ নগণ্য, কিন্তু আমাদের দেশে অনেক শিল্পশাখায়, বিশেষত যেখানে লাভের হার উচ্চমাত্রায়, বিদেশী পুঁজি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে; নব্বই-এর দশকে বিদেশী পুঁজির প্রভাব বেড়েছে কয়েকগুণ।

ভারত বা আমেরিকার তুলনায় চীনে বিদেশী পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণ অনেক ব্যাপক। সাধারণভাবে, বিদেশী পুঁজি যদি রপ্তানি বাড়ায়, অত্যাধুনিক শিল্প-প্রযুক্তি আয়ত্ত করায় সাহায্য করে চীনের সরকারী উদ্যোগগুলিকে, তবেই তাদের প্রবেশাধিকার থাকে। শুধুমাত্র দেশের বাজারে চাহিদা মেটাতে চায়, এমন বিদেশী পুঁজি সহজে আমন্ত্রণ করে না চীন। কিছু অবশ্য ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন; Coca Cola, MacDonald, Reebok ইত্যাদি। এই সব কোম্পানি মার্কিন কংগ্রেসে ও রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট প্রভাবশালী। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর চীন-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে প্রচণ্ড বিতর্ক হতো। সরকারের সাথে অলিখিত চুক্তি অনুসারে ঐ কোম্পানিগুলি চীনের পক্ষে জনমত সংহত করার চেষ্টা চালিয়েছে। দুই, ভারত সরকার বিদেশী পুঁজি অবলম্বন করে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করতে চায়। নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতিতে এটাই হল বিদেশী পুঁজির সপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি। গত ৫/৬ বছরে চীনে বার্ষিক ৪,০০০ কোটি ডলার বিদেশী বিনিয়োগ ঘটছে, আর ভারতে আসে ১০০-২০০ কোটি ডলার। এ নিয়ে আমাদের সরকারের অশেষ ক্ষোভ। চীনে কিন্তু 'স্থূল জাতীয় সঞ্চয়ের' (gross domestic savings) পরিমাণ বিনিয়োগের (gross domestic investment) থেকে অনেকটা বেশী; ১৯৯৭-২০০১ সালে জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার ছিল যথাক্রমে ৩৯.৫ এবং ৩৭.১। ভারতে ১৯৯৫-১৯৯৯ সালে অনুরূপ শতাংশগুলি ছিল — সঞ্চয় ২৩.২, বিনিয়োগ ২৪.২। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, চীনের অগ্রগতি ঘটেছে জাতীয় সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে আর ভারত আজও বিদেশী পুঁজির মুখাপেক্ষী।

বিনিয়োগ থেকে সঞ্চয় বেশী হওয়ার অন্য ব্যাখ্যা দেয় কিছু পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞরা। এটা নাকি চীন থেকে 'মূলধন নির্গমের' (capital flight) ইঙ্গিত দেয়। আশির দশক থেকে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা, আর গত দশকে রাশিয়া থেকে ব্যাপক হারে মূলধন নির্গমের ফলে প্রতিটি দেশে অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হয়, দারিদ্র্য বেড়ে যায়। চীনের অর্থনীতি কিন্তু দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। চীনের সরকারী উদ্যোগুলি সরকারের অনুমতি নিয়ে গত দু'দশক ধরে বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করছে— প্রধানত হংকং-এ। অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া,

পশ্চিম ইওরোপ ও আমেরিকায় বেশ বড় ধরনের চীনা বিনিয়োগের বিক্ষিপ্ত প্রতিবেদন রয়েছে। সরকারী তথ্যে জানা যায়, চীনে যে বিদেশী পুঁজি আসে, তার ৭৫ শতাংশের উৎস হল 'বৃহত্তর চীন' (Greater China)। অর্থাৎ হংকং, মাকাও ও তাইওয়ান, আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চীনা পুঁজিপতিরা, যারা থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের নাগরিক। সবাই স্বীকার করে বৃহত্তর চীন থেকে যে পুঁজি আসে চীনের মূল ভূখণ্ডে (mainland), তার একটা বড় অংশ আসে বাঁকা পথে (round trip)। চীনের সরকারী উদ্যোগগুলির বিদেশী (বিশেষতঃ হংকং-এ অবস্থিত) শাখাগুলি থেকে। দুর্ভাগ্যতঃ চীন সরকার এসব প্রশ্নে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পরিবেশন করেনি। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে আমিও এটা মনে করি, চীনের সরকারি সংস্থাগুলি বিদেশে যে মূলধন সঞ্চিত করেছে, তার পরিমাণ চীনের অভ্যন্তরে বিদেশীদের সঞ্চিত মূলধনের থেকে খুব একটা কম নয়। স্বয়ংনির্ভরতার এটা বড়ো মাপকাঠি। রাজনৈতিক বা আর্থিক সঙ্কটের মুহূর্তে বিদেশী বিনিয়োগ কমে গেলে, যেটা ঘটেছিল ১৯৯৭সালে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং দক্ষিণ কোরিয়ায়, চীনকে কোন আর্থিক বিপর্যয়ের (financial crisis) সম্মুখীন হতে হবে না।

চীন যে ১৯৯৭ সালের সঙ্কট থেকে মুক্তি পায় তার পিছনে ছিল আরেকটি নীতি. 'চলতি পরিশোধন বিবরণীতে' (current account balance of payment) সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করলেও, মূলধনখাতে আমদানি-রপ্তানির ওপর সরকারী বিধিনিষেধ অব্যাহত থাকে। আরো উল্লেখযোগ্য, এ রপ্তানিতে খানিকটা মন্দাভাবে এলেও চীন মুদ্রা অবমূল্যায়ন (devaluation) বা আমদানি সঙ্কুচিত করেনি। চীন ঐ পথে চললে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সঙ্কট তীব্রতর হতে পারতো। প্রতিবেশী দেশের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে স্বদেশের উন্নতি— এই পথ বর্জন করে চীনের সরকার প্রমাণ করে যে, স্বনির্ভরতার তত্ত্ব আত্মকেন্দ্রিক নয়। চীনের এই দূরদর্শিতা সর্বত্র প্রশংসিত হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থিতি ও আক্রম্যতা

চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা আগেই বলেছি। এটাও দেখিয়েছি, স্বনির্ভরতার পথ অনুসরণ করে চীন কিভাবে আর্থিক সংকট এড়িয়ে এসেছে। অর্থনৈতিক আক্রম্যতা (Vulnerability) রয়ে গেছে।

সমগ্র অর্থনীতির দিকে তাকালে, বিশ্বমানে চীন এখনও পশ্চাৎপদ। শুধু মাথাপিছু আয়ে নয়, আরো অনেক নজির আছে অনগ্রসরতার। যেমন, ওদের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী কৃষিনির্ভর, পাশ্চাত্যে ৫ শতাংশ বা আরো কম চীনের শিল্পশ্রমিকদের গরিষ্ঠ অংশ কাজ করে 'গ্রামীণ উদ্যোগগুলিতে' (township and village enterprises), যেখানে শ্রমিক প্রতি উৎপাদন বা মজুরি শহরাঞ্চলের সরকারী বড় বা মাঝারি শিল্পের ভগ্নাংশ। যেহেতু কৃষিতে আয় আরো কম এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, অগনিত কৃষক খামার ছেড়ে স্থানীয় উদ্যোগে, বা দূরান্তের কারখানায় সামান্য মজুরির কাজ খোঁজে। পাশ্চাত্যের শ্রমবাজারে এতটা মজুরি-বৈষম্য দেখা যায় না। তাই চীনের পরিস্থিতি (ভারতবর্ষেরও) নিঃসন্দেহে অনগ্রসর। এ ছাড়া, চীনের আবাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মান পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় খুব নীচুতে।

উচ্চমানের প্রযুক্তি (high technology) প্রয়োগে চীন এখনও স্বনির্ভর নয়। অজস্র নতুন শিল্প ও পরিষেবার উদ্যোগ ওদেশে স্থাপিত হয়েছে, অনেক আধুনিক শিল্পে তারা বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন করছে, রপ্তানিও করছে পাশ্চাত্যে, কিন্তু বেশীর ভাগ 'কলাকৌশল' (know-how) এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি আসে বিদেশ থেকে। যে-কোনো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এটা

স্বাভাবিক। বহির্বাণিজ্যের তুলনায় প্রযুক্তিতে স্বনির্ভরতা অর্জন করা আরো দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ। সোভিয়েত রাষ্ট্র তার শেষ দিন পর্যন্ত সমরাস্ত্রে মার্কিনদের সমকক্ষ হলেও বেশীর ভাগ অসামরিক শিল্পে অনেক পিছিয়ে ছিল। তার একটা বড় কারণ, আমেরিকা ও তার মিত্রদেশগুলি ওদেশের সঙ্গে 'স্বাভাবিক বাণিজ্য সম্পর্ক' (normal trade relations) রাখেনি; সামরিক অজুহাতে আমদানি/রপ্তানির ওপর ব্যাপক বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেয়। চীনের ক্ষেত্রে বাধাগুলি রয়েছে বটে। কিন্তু তার প্রয়োগ অনেকটা শিথিল। কেননা আশির দশকে চীন ও আমেরিকা, দুটো দেশই ছিল সোভিয়েত-বিরোধী, যাদের মধ্যে একটা অলিখিত মৈত্রীবন্ধন (alliance) তৈরী হয়। তাই দেখি আমেরিকা বিপুল পরিমাণে শিল্পসামগ্রী আমদানি করে চীন থেকে; অন্য কোনো সমাজতন্ত্রী দেশ এতটা সুযোগ পায়নি।

চীনের অগ্রগতিতে জাপানও চিন্তিত। ২০০১ সালের মে মাসে জাপানী সরকার একটি শ্বেতপত্র প্রস্তুত করে, যার সারাংশ মুদ্রিত হয় Yamiuri Shimbum পত্রিকায়। জাপানের আক্ষেপ, তারা এশিয়ায় অর্থনৈতিক প্রাধান্য (economic primacy) হারিয়েছে, প্রতিযোগিতায় চীন ক্রমশঃ শক্তিশালী হচ্ছে। চীনে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করে, উৎপন্ন দ্রব্যের একটা বড় অংশ জাপানী আমদানি করছে জাপানী বড় বড় কোম্পানিগুলি। ফলে, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে জাপানের ঘাটতি বেড়ে চলেছে। ২০০০ সালে এই ঘাটতি ছিল ২,৪৯০ কোটি ডলার। ঐ বছরেই প্রথমবার চীন থেকে (জাপানে) আমদানির পরিমাণ ছাপিয়ে যায় পশ্চিম ইউরোপের অঙ্ককে। আমার মতে, জাপানীদের যুক্তি ও আশঙ্কা গ্রহণযোগ্য নয়। চীনে অবস্থিত জাপানী কারখানাগুলি চীনের সার্বিক উন্নয়নে কতটা সাহায্য করে, সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে। কেননা, মালিকানা, প্রযুক্তি, পণ্যের মুখ্য বাজার — সবই জাপানী পুঁজির নিয়ন্ত্রণে; চীনে কারখানা গড়ার উদ্দেশ্য সস্তায় শ্রমিশক্তির ক্রয়। চীনে মজুরি বাড়লে, জাপানী পুঁজি অনায়াসে মায়ানমার, বাংলাদেশ বা অন্যত্র কারখানা স্থানান্তরিত করবে। আপাতদৃষ্টিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে জাপানের ঘাটতি হচ্ছে। অন্যদিকে, চীন মালিকানার কারখানাগুলি যদি উৎকর্ষ মানের পণ্য তৈরী করে জাপানে বিক্রয়ের সুযোগ পেতো (মুক্ত বাণিজ্যের সূত্র অনুসারে), তাহলে কিন্তু জাপানের ঘাটতি হতো অনেক বেশী। চীনে বিনিয়োগ করে জাপানী কোম্পানিরা আসলে সম্ভাব্য (potential) ঘাটতি কমাচ্ছে; তদুপরি এরা চীনের অভ্যন্তরে উৎপাদনের একাংশ বিক্রয় করে লভ্যাংশ পাঠাচ্ছে জাপানে অবস্থিত সদর দফতরে (head office)।

চীনা রপ্তানির পণ্যবিন্যাস দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। আশির দশকের গোড়ায় কৃষিজ ও খনিজ পণ্যের ভার ছিল অর্ধেকের বেশী। ১৯৯৯ সালে শিল্পজ দ্রব্যের শতাংশ দাঁড়ায় ৮৮। এর মধ্যে 'উচ্চ-প্রযুক্তি সম্পন্ন' (high technology products) দ্রব্যের পরিমাণ ৩,০০০ কোটি ডলার, বা মোট রপ্তানির ১৭ শতাংশ।

উল্টোদিকে চীনের শিল্পজ রপ্তানির সিংহভাগ (৭০ শতাংশের কিছু কম) প্রযুক্তির মাপকাঠিতে নিম্ন স্তরের — যেমন বস্ত্র, জামাকাপড়, খেলনা, স্যুটকেশ, টর্চ, প্রভৃতি। মুক্ত বাণিজ্যের রীতি অনুসারে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আরো তীব্র আকার ধারণ করবে এইসব শিল্পে। চীনের থেকে যেসব দেশে মজুরি কম, তারা অনায়াসে এসব কারখানা গড়ে তুলতে পারে। এর বড় উদাহরণ বাংলাদেশের পোশাকশিল্প (garment industry)। সত্তরের দশকে ওখানো কোনো কারখানা ছিল না, আর আজ ঐ শিল্পশাখায় প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিক, রপ্তানির পরিমাণ কয়েক শত কোটি ডলার।

এই সম্ভাবনা মাথায় রেখে, বহুদিন ধরে চীন চেষ্টা করছে উচ্চমানের শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি বাড়াতে, মূলত ধনী দেশগুলিতে। অন্যদিকে, চীনের আশঙ্কা হচ্ছে, এসব রপ্তানি বাড়লে

পাশ্চাত্য দেশগুলির বাণিজ্যঘাটতি স্ফীত হবে, আর সেই অজুহাতে চীনের রপ্তানি প্রতিহত করতে ওরা অত্যধিক আমদানিশুল্ক বা 'শুল্কাতিরিক্ত প্রতিবন্ধকের' (not-tariff barriers) আশ্রয় নেবে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসাবে চীন নানা ধরনের প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে পারে ঐ সংস্থার নিয়ম অনুসারে। জাতীয় আয়ে রপ্তানির শতাংশ ২০; এটা এতো বেশী যে, রপ্তানির ওপর অর্থনীতি-বহির্ভূত (extra-economic) প্রতিবন্ধক এলে চীনের সামগ্রিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

সোভিয়েত ইতিহাসের দিকে তাকালে এ প্রশ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। ১৯৩০-এর দশকে যৌথখামার (collective farm) প্রবর্তন করার পর ওদেশে গভীর সঙ্কট সৃষ্টি হয়। কুলাক (kulak) উচ্ছেদের নামে কৃষকদের একটা বড় অংশের প্রতি অত্যাচার করা হয়, দেশে দুর্ভিক্ষ আসে, লক্ষ লক্ষ মানুষ কারাবাসে যায় (gulag), ভোগ্যপণ্যের (কৃষিজ বা শিল্পজ) যোগান বহুলাংশে কমে যায় ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্যন্ত। অন্যদিকে সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটে চমকপ্রদ গতিতে; আধুনিক (যদিও অপেক্ষাকৃত নীচু মানের) স্বাস্থ্যব্যবস্থার আওতায় আসে আপামর জনসাধারণ; শিল্পে অভূতপূর্ব অগ্রগতির দরুন অসংখ্য নতুন কলকারখানা স্থাপিত হয়; শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা চার-পাঁচ গুণ বাড়ে; ১৯২৮ সালে যারা ছিল সাধারণ শ্রমিক, তাদের একটা বড় অংশ (উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্তির পর) বিভিন্ন স্তরে পরিচালক/দক্ষ শ্রমিকের স্তরে উন্নীত হয় মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। এক বিশিষ্টা মার্কিন অধ্যাপিকা, Sheila Fitzpatrick, এসব ঘটনাকে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' বলে চিহ্নিত করেন। আমার মতে, এইসব কারণে দুর্ভিক্ষ, gulag ও সাময়িকভাবে জীবনমান নিম্নমুখী হওয়া সত্ত্বেও, তিরিশের দশকে কমিউনিস্ট-বিরোধী মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেনি। সন্দেহ নেই যে, স্তালিনের পুলিশবাহিনী বিরোধীদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেয়। এটাই কি শেষ কথা? স্তালিনের মৃত্যুর পর লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত নাগরিক শোকাহত হয়। খ্রুশ্চেভের স্তালিন-বিরোধী জামাতা লিখেছেন যে, অসংখ্য সাধারণ মানুষ নিজেদের পিতৃহারা বোধ করে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল (Churchill) মন্তব্য করেন ঃ স্তালিন যখন ক্ষমতায় এলেন, তখন রুশ কৃষকরা কাঠের লাঙল নিয়ে চাষ করতো; তিনি যখন দেহত্যাগ করলেন তখন ট্র্যাক্টর এসে গেছে, আর সোভিয়েত সরকারের হাতে ছিল পারমাণবিক অস্ত্র।

স্তালিনোত্তর যুগে প্রায় দু'দশক ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকে, ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবধান কমতে থাকে। কবে ওরা এগিয়ে যাবে মাথাপিছু আয়ের মাপকাঠিতে, এ নিয়ে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা ছিলেন খুবই চিন্তিত। কিন্তু নানা কারণে সোভিয়েত অর্থনীতিতে মন্দা আসে; কেন এটা ঘটল, তার সদুত্তর নেই। আশির দশকে এটা সঙ্কটের রূপ নেয়। অর্থনৈতিক বিকাশ (মাথাপিছু জাতীয় আয়বৃদ্ধি) স্তব্ধ হয়, অচিরে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর মানচিত্র থেকে অবলুপ্ত হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র পুলিশী ব্যবস্থায় নয়, জনসাধারণের রাজনৈতিক সমর্থন অর্জন করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত রাষ্ট্রকে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নেব (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক) পথ প্রশস্ত রাখতে হবে। উন্নয়নের পথে আভ্যন্তরীণ বা বহির্দেশীয় বাধা সৃষ্টি হলে, কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্য (hegemony) বিঘ্নিত হতে পারে।

১৯৮৯ সালে তিয়ানআনমানের ছাত্র বিক্ষোভের মুহূর্তে এমনই একটি রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয় চীনে। ছাত্র ও পার্টির অভ্যন্তরীণ 'উদারনৈতিক' মহলের দাবি মেনে নিলে 'সামাজিক বিপর্যয়ের' (social turmoil) সম্ভাবনা ছিল, দেঙ্ সিয়াওপিং ও তাঁর অনুগামীদের মতে আজকের নেতারাও মনে করেন, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় যোগ না দিলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিপন্ন হবে।

যোগদানের প্রস্তুতিপর্ব

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে আরেকটি পার্থক্য এই যে, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা সৃষ্টির আগে 'আত্মরক্ষার' তাগিদে উন্নত দেশগুলি বেশ কিছু নীতি বদলায়। যেমন, ইউরোপ ও আমেরিকায় কৃষিতে ভর্তুকি অনেক বাড়ে ১৯৮৬ সাল থেকে, কেননা ভর্তুকি ভবিষ্যতে কিছুটা কমবে তার ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু উন্নয়নশীল কোনো দেশ আগামী দিনের পরিস্থিতির চিন্তা করে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেয়নি। চীন অবশ্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নেয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেবো এ প্রসঙ্গে।

(১) সবাই জানে, মুক্ত বাণিজ্যের ফলে বেকার সমস্যা তীব্রতর হবে। গত কয়েক বছর ধরে সরকারি উদ্যোগগুলিতে আধুনিকীকরণ ও পুনর্বিন্যাস (modernisation and restructuring) ঘটছে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে কিভাবে ছাঁটাই শ্রমিকদের অন্যত্র নিয়োগ করা যায়। এছাড়া শহরাঞ্চলে 'সামাজিক বীমাব্যবস্থা' (social insurance) আরো জোরদার করা হচ্ছে, যার ফলে বেকারদের জীবনমান অন্ততঃ কিছুটা সংরক্ষিত হয়। ২০০০ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে সমাজকল্যাণ খাতে খরচের পরিমাণ ৮০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৫,৫০০ কোটি ডলার। ২০০১ সালে আরো বাড়ার কথা।

(২) 'গবেষণা ও উন্নয়ন' (Research and Development) বাবদ সরকারী খরচ ১৯৯৯ সালে ১৮ শতাংশ বেড়ে পৌঁছায় ৮১০ কোটি ডলার; এর সিংহভাগ যায় 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' প্রকল্পগুলিতে। তদুপরি বড় ও মাঝারি সরকারী শিল্পোদ্যোগগুলি (এরাই নবীকরণ বা innovation-এর প্রধান হোতা) নতুন শিল্পকৌশল বাস্তবে রূপায়ণ করার দরুন ৬৭৮ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে ঐ বছরে।

(৩) আগেই বলেছি, মুক্ত বাণিজ্যের প্রশ্নে চীনের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড বিতর্ক হচ্ছে। ঠিক সেই কারণে সরকার অজস্র কমিটি গঠন করে সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নিয়মাবলী লঙ্ঘন না করে, প্রতিকূল অবস্থায় চীন কী ধরনের প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে পারে, এটাও ছিল কমিটিগুলির অনুসন্ধানের বিষয়। ঐ নিয়মাবলীর মধ্যেও যে 'এড়িয়ে যাওয়ার সূত্র' (escape clause) থাকতে পারে, তার বড় উদাহরণ ঔষধের ওপর পেটেন্ট (patent) অধিকার। AIDS-এর ক্ষেত্রে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ডোহা সম্মেলনে স্বীকৃত হয় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলি যে-কোনো উৎপাদকের কাছ থেকে, প্রয়োজনে পেটেন্ট অধিকার ভঙ্গ করে, ঔষধ কিনতে পারে; তদুপরি যে-কোনো ব্যাপক রোগের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশের সরকার 'বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের' (compulsory licensing) আশ্রয় নিতে পারে, যার ফলে পেটেন্ট অধিকারী কোম্পানীগুলি একচেটিয়া মুনাফার সুযোগ হারাবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ভারত সরকারের নতুন পেটেন্ট আইনে বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের উল্লেখ থাকলেও, এটিকে কার্যকরী করার নিয়মাবলী অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ; ফলে সন্দেহ হয়, এই ধারাটি বাস্তবে ফলপ্রসূ হবে কিনা। চীনের পেটেন্ট আইন খুঁটিয়ে দেখিনি; আশা করি, ওরা এ ব্যাপারে সজাগ।

(৪) বিদেশীরা দু'বছর আগে পর্যন্ত পুঁজি বিনিয়োগ করে মূলতঃ 'যৌথউদ্যোগে'(joint venture), যেখানে মূলধনের গরিষ্ঠ অংশের মালিক কোনো একটি সরকারী উদ্যোগ। ২০০০ সাল থেকে সম্পূর্ণভাবে বিদেশী উদ্যোগগুলির (wholly foreign-owned enterprises) প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ২০০২ সালের প্রথম সাত মাসে 'অনুমোদিত' (approved) বিদেশী বিনিয়োগের শতকরা ৬৯ ভাগ যায় সম্পূর্ণভাবে বিদেশী মালিকানার উদ্যোগে।

(৫) বেসরকারিকরণের (privatisation) বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও অনেক 'রুগ্ন' (sick) সরকারী শিল্পোদ্যোগ বিদেশীদের হাতে চলে যাচ্ছে। 'অধিগ্রহণের' (acquisition) সংখ্যা চীনে এখনও খুব কম পাশ্চাত্যের তুলনায়, তথাপি গত কয়েকবছর

চীনে বিদেশী বিনিয়োগের ৫-৬ শতাংশ (বছরে ২০০ কোটি ডলারের বেশী) যাচ্ছে রুগ্ন শিল্পের অধিগ্রহণে।

যোগদানের শর্তাবলী

যেহেতু চীন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় যোগ দেয় ২০০১ সালে, যোগদানের পূর্ব-শর্ত হিসাবে বহু সদস্য দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করতে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চীন-মার্কিন চুক্তি, যেটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৯ সালের শেষে। এই চুক্তি এখনও অপ্রকাশিত। কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় মার্কিন কংগ্রেস-নিযুক্ত কমিটির প্রতিবেদনে, আর মার্কিন সরকারী মুখপাত্রদের প্রকাশিত বক্তব্য থেকে। চীনের সরকার সবগুলি চুক্তি প্রকাশনার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু এপ্রিল, ২০০২ পর্যন্ত তার কোনো চিহ্ন নেই।

চীন-মার্কিন চুক্তি প্রসঙ্গে কৃষি নিয়ে শুরু করি। (১) চীনের আমদানি শুল্ক কমবে গড়ে ৪০ শতাংশ থেকে ১৭ শতাংশে; যেসব কৃষিপণ্য নিয়ে আমেরিকার বিশেষ আগ্রহ, যথা সয়াবীন, মাংস, ফল ইত্যাদি, এদের গড় শুল্ক হবে ১৪.৫ শতাংশ। (২) কয়েকটি পণ্যের দরুন quota বা ন্যূনতম আমদানির পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছে। চীন ১৯৯৯ সালে ২০ লক্ষ টন গম আমদানি করে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় যোগদানের অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ ২০০২ সালের quota হবে ৭৩ লক্ষ টন, আর ২০০৪ সালে ৯৩ লক্ষ টন। সব খাদ্যশস্য ও সয়াবিন তেল মিলিয়ে ২০০৪ সালে quota আমদানির পরিমাণ হবে ২ কোটি ১০ লক্ষ টন। ঐ quota পর্যন্ত আমদানির ওপর শুল্ক হবে নগণ্য, ১/২ শতাংশ, কিন্তু অতিরিক্ত আমদানির ওপর চীন যথেচ্ছ শুল্ক চাপাতে পারে। এর ফলে, চীনের বাণিজ্য সংস্থাগুলি পৃথিবীর বাজারদরে quota পণ্য কিনতে প্রায় বাধ্য হবে। (৩) বিগত দু'দশক ধরে আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উৎপন্ন গমের আমদানি চীন নিষিদ্ধ করে, কেননা ওখানে নাকি এমন কীটনাশক পদার্থ ব্যবহৃত হয় যেটা মানব স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। পরে চীন ও মার্কিন বিশেষজ্ঞরা যৌথভাবে প্রশ্নটি বিচার করে, আর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় চীন। ভবিষ্যতে এমন প্রশ্ন উঠলে যৌথ বৈঠকে বা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মধ্যস্থতায় তার বিচার হবে।

উপরিউক্ত কংগ্রেস কমিটির হিসাবে, ২০০৪ সাল থেকে বর্তমানের তুলনায় অতিরিক্ত (additional) আমদানির মূল্য হবে বছরে ৪০০ কোটি ডলার। মার্কিনদের প্রত্যাশা, এর অর্ধেক আসবে আমেরিকা থেকে। চীন কী এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে? আগেই বলেছি, চীনের মোট রপ্তানির পরিমাণ ২৫,০০০ কোটি ডলার। সেই অনুপাতে quota আমদানির শতাংশ হবে ১.৬ মাত্র। বর্তমান চীনে বার্ষিক শস্যোৎপাদন ৫০ কোটি টনের ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ quota আমদানির শতাংশ দাঁড়ায় ৪.২ মাত্র। আমার মতে, এর ফলে চীন খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কিন্তু কয়েকবছর পর, যখন quota থাকবে না, কৃষিপণ্যেও মুক্ত বাণিজ্য আসতে পারে, তখন চীনের সমস্যা বাড়বে। চীনের সমাজবিজ্ঞান আকাদেমির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী ২০ বছরে শস্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের আভ্যন্তরীণ বাজার দর বিশ্বের বাজার দর থেকে বেশী থাকবে। পাল্টা ব্যবস্থা না নিলে, আমদানি অনেক বাড়বে, কৃষকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

একটা উপায়, আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের অনুকরণে বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি বাড়ানো। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নিয়ম, কৃষিতে ভরতুকির 'সর্বোচ্চ সীমা' (ceiling) মোট উৎপাদনমূল্যের (বাজার দরে) ৫ শতাংশ উন্নত দেশগুলির জন্য, আর উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য ১০ শতাংশ। চীন-মার্কিন চুক্তিতে চীনের সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে ৭-১০ শতাংশ। বর্তমান চীনে ভরতুকির পরিমাণ এই সীমার অনেক নীচে, ফলে ওদের ভর্তুকি বাড়ানোর অধিকার রয়েছে। কিন্তু চীনের মত গরীব, কৃষিপ্রধান দেশে এটা কি সম্ভব? কৃষিতে ভর্তুকি বাড়ালে, শিল্প ও

পরিষেবায় সরকারি বিনিয়োগ কমবে, ফলে অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেবে। কৃষিতে (বা অন্যত্র) ভর্তুকি বাড়িয়ে সাময়িকভাবে কিছু সমস্যা মেটানো যায়, কিন্তু এর ফলে কৃষক বা শ্রমিকের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। জাপান কিন্তু অন্য পথ নিয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় ওরা ১৯৯৫ সালে প্রতিশ্রুতি দেয় চালের বাজার উন্মুক্ত রাখবে, কিন্তু এ পর্যন্ত শুল্কাতিরিক্ত প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে ওরা আমদানি করে প্রয়োজনীয় চালের মাত্র ৭ শতাংশ।

কৃষির বাইরে, চীন-মার্কিন চুক্তিতে বলা আছে, চীনে বিদেশী পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণগুলি শিথিল করতে হবে, ব্যাঙ্ক, বীমা, টেলিযোগাযোগ, পাইকারি বন্টক (wholesale trade) প্রভৃতি শিল্পে বিদেশী পুঁজিকে আরো সুযোগ দিতে হবে। অন্যদিকে এও বলা আছে, আমেরিকায় যদি অত্যাধিক পরিমাণে বস্ত্র ও পোষাক আমদানি হয়, আর মার্কিন উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে মার্কিন সরকার চীনে প্রস্তুত বস্ত্র ও পোষাকের ওপর আমদানি শুল্ক বাড়াতে পারে। এই সূত্র ধরে চীনও তার শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ করতে পারে, শুধু আমেরিকা নয়, যে কোনো দেশের বিরুদ্ধে।

প্রদর্শনী ঃ বিভিন্ন শিল্পশাখার পরিবর্তনের রূপরেখা

পরিবর্তন ঃ

নাটকীয় (dramatic)	রসায়নশিল্প	ইন্টারনেট পরিষেবা বীমা	ব্যাঙ্ক পাইকারি বন্টন খুচরা বন্টন
সীমিত (moderate)	ঔষধশিল্প	স্বয়ংবহ শিল্প (automobile) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	কৃষি ও কৃষিব্যবসা Securities
নগণ্য	শিল্পজ খাদ্য ভোগ্যপণ্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইলেট্রনিক্স		টেলিযোগাযোগ পরিষেবা
বর্তমানে সংরক্ষণের মান	নীচু	মাঝারি	উচ্চ

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় প্রবেশের পর চীনের বিভিন্ন শিল্পশাখায় কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে, তা নিয়ে বিখ্যাত 'উপদেশ সংস্থা' (consultancy firm), Mckinsey একটি প্রতিবেদন ছাপিয়েছে। উপরের প্রদর্শণীতে (exhibit) সিদ্ধান্তগুলি দেওয়া হয়েছে। রসায়নশিল্পে নাটকীয় পরিবর্তন আসবে, যদিও বর্তমানে ঐ শিল্পে সংরক্ষণের মান নীচুতে। উল্টোদিকে, টেলিযোগাযোগ পরিষেবা এ পর্যন্ত অত্যন্ত সংরক্ষিত, কিন্তু সেখানে সামান্য পরিবর্তন দেখা দেবে। বলা দরকার, Mckinsey-এর দৃষ্টিতে 'পরিবর্তনের' মাপকাঠি হল কতটা বিদেশী পুঁজি আসবে বিভিন্ন শিল্পশাখায়।

কি তথ্যের ভিত্তিতে Mckinsey প্রতিবেদন রচিত হয়, সেটা প্রকাশিত হয়নি। পূর্বাভাষগুলি কতটা গ্রহণযোগ্য সে নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে। লক্ষণীয় যে, রসায়নশিল্প বাদ দিলে, অন্য কোনো 'সাবেকী' (traditional) বা আধুনিক শিল্পে নাটকীয় পরিবর্তন হবে না। যারা মনে করে, সরকারি উদ্যোগমাত্রেই অযোগ্য, তারা ব্যাখ্যা করতে পারে না কেন চীনের

পরিস্থিতি ভিন্ন। বিশেষ করে, টেলিযোগাযোগে চীনের ইদানিং সাফল্য প্রশংসনীয়। স্বয়ংবহ শিল্পেও (automobiles) যে বড় রকমের রদবদল হবে না, এটা অনেকেই আশা করেনি।

এবার আসা যাক পণ্যের পাইকারি বিতরণে (wholesale), যেখানে নাটকীয় পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখে Mckinsey প্রতিবেদন। বর্তমান চীনে এক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগগুলির প্রাধান্য, আর বিদেশী পুঁজি নিষিদ্ধ। বেশীর ভাগ পাইকারি বন্টন সংস্থা ক্ষুদ্রাকার, এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা প্রবল, মুনাফার হার কম। বন্টন margin এর (অর্থাৎ, সর্বশেষ ক্রেতার (final buyer) ক্রয়মূল্য আর উৎপাদকের বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য) প্রায় ৮০ শতাংশ পায় পাইকারি উদ্যোগগুলি, মাত্র ২০ ভাগ থাকে খুচরা বিক্রেতাদের হাতে। আমেরিকায় ঠিক উল্টোটা ঘটে — পাইকারি ২০ শতাংশ, খুচরা বিক্রেতা ৮০ শতাংশ। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় প্রবেশের শর্ত হিসাবে চীন এই ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ দেবে। এর ফলে সরকারী পাইকাবি বন্টনের উদ্যোগগুলির গুরুত্ব কমে যাবে। তাছাড়া বিদেশীরা সরাসরি পণ্য আমদানি করে চীনের বাজারে বিক্রি করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, জাপানের বণ্টন ব্যবস্থায় এখনও বিদেশী পুঁজির প্রভাব নগণ্য; ফলে জাপানে অধিকাংশ ভোগ্যপণ্যের বাজার দর পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক বেশী হলেও, আমদানি করা দ্রব্যের চাহিদা যথেষ্ট সীমিত। চীনের সরকারি বন্টনসংস্থাগুলি আভ্যন্তরীণ বাজারে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে অক্ষম হলে, আমদানির পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে।

একটা বড় প্রশ্ন, যার উত্তর আমার জানা নেই চীনের গ্রামীণ উদ্যোগগুলি কিভাবে নয়া পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে। এসব সংস্থায় কর্মরত লোকের সংখ্যা ১৩ কোটি। স্থানীয় সরকাবের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও নানাবিধ সাহায্য — কাঁচামাল সংগ্রহে, মূলধন যোগানে, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে — পেয়েই এই সংস্থাগুলি বেঁচে আছে। আগামী দিনের বাজারি অর্থনীতিতে স্থানীয় সরকারগুলি কতটা এদের সাহায্য করতে পারবে, সে বিষয়ে কোথাও কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। খোলা প্রতিযোগিতায় এরা শহরের বড়/মাঝারি (সরকারী বা বেসরকারী) কারখানাগুলির সমকক্ষ হতে পারবে কিনা, তা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। গ্রামীণ কারখানার অর্ধেক যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তাহলে ৬-৭ কোটি গ্রামীণ শ্রমিক বেকার হবে, যার সামাজিক তাৎপর্য অপরিসীম। এইসব গ্রামীণ শ্রমিকদের জন্য এখনও 'সামাজিক বীমা' চালু নেই, চালু করা সম্ভব কিনা তাও জানিনা। আমার মতে, আগামী দিনে এটা বোধহয় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আকার ধারণ করবে।

কাঠামোগত পরিবর্তন

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় যোগ দেওয়ার পর চীনের অর্থনৈতিক কাঠামো বহুলাংশে পরিবর্তিত হবে, এ বিষয়ে সবাই একমত। দুটো বড় প্রশ্ন তুলতে চাই প্রবন্ধের শেষে। চীন কি সমাজতন্ত্র ছেড়ে পুঁজিতন্ত্রের দিকে ঝুঁকবে? চীন কি তার অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে পারবে?

গত দু'দশকে চীনের সার্বিক উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বও বেড়ে চলেছে নানা দিক থেকে। (১) উপকূলবর্তী ও অভ্যন্তরীণ প্রদেশগুলির মধ্যে আয়বৈষম্য কয়েকগুণ বেড়েছে, যার জন্য দায়ী বাজারি অর্থনীতি; সরকারও রপ্তানি শিল্পগুলিকে বহুবিধ সুযোগ (আয়কর ও শুল্ক ছাড়, যথেচ্ছভাবে মজুরি নির্ধারণ ইত্যাদি) দিয়েছে। ভৌগোলিক দূরত্বের জন্য অভ্যন্তরীণ এলাকা থেকে সমুদ্রবন্দরে মাল পরিবহনের খরচ অনেক, তাই বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে। ১৯৯৬ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সমুদ্র থেকে দূরবর্তী প্রদেশগুলির জন্য অনেক নতুন সুযোগ দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাস্তবে — কি বিদেশী পুঁজি,

কি সরকারী বিনিয়োগ, কি রপ্তানিতে, পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

(২) শহর বনাম গ্রামাঞ্চলের আয়বৈষম্য ঊর্ধ্বমুখী। ২০০০ সালে মাথাপিছু গড় আয় ছিল যথাক্রমে ৭৫৬ ও ২৭১ ডলার। গত কয়েক বছর গ্রামাঞ্চলে আয় মোটেই বাড়েনি, যদিও জাতীয় আয় প্রতি বছরে প্রায় ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অচিরে দুই অঞ্চলের মাথাপিছু আয় সমান-সমান হবে, এটা কেউই আশা করে না। কিন্তু ব্যবধান অনেকটা বেড়েছে গত ১০-১২ বছরে, যার ফলে শহর-গ্রাম অন্তর্দ্বন্দ্ব আরো প্রকট হচ্ছে। 'দারিদ্র্যের' সরকারি মাপকাঠিতে গ্রামীণ জনসংখ্যায় দরিদ্রদের অনুপাত কমেছে অনেকাংশে, কিন্তু আজও ১০-১৫ শতাংশ সীমারেখার তলায় রয়ে গেছে।

(৩) অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়েছে; উত্তর-পূর্ব চীনে এটা ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। অনেক শহরে ছাঁটাই শ্রমিকরা সংখ্যায় কর্মরত শ্রমিকদের ছাপিয়ে গেছে। সরকারি হিসাবে এক কোটিরও বেশী শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে গত কয়েক বছরে। এছাড়া, বিদেশী, বিশেষত হংকং ও তাইওয়ানের, পুঁজিপতিরা গ্রাম থেকে আসা শ্রমিকদের অত্যন্ত কম মজুরি দেয় — দৈনিক ১২ ঘন্টা কাজের বিনিময়ে মাত্র ১ ডলার। কলকাতা শহরেও এই মজুরিতে কোনো অদক্ষ (unskilled) শ্রমিক পাওয়া যাবে না। বিদেশী মালিকানার কারখানাগুলিতে কর্মসংস্থান বাড়লেও, সামগ্রিকভাবে শহরাঞ্চলে বেকার সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী। আগেই বলেছি, গ্রামাঞ্চলের জীবনমান প্রায় স্থিতিশীল, তাদের অনেকেই জমি ছেড়ে কাজের সন্ধানে দূরদূরান্তের শহরে যাচ্ছে। এইসব 'ভ্রাম্যমাণ' (roving) কৃষক-শ্রমিকদের সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না; বিশেষজ্ঞদের মতে, ১০-২০ কোটি, অর্থাৎ সারা দেশে জনসংখ্যার ১০-২০ শতাংশ।

(৪) কি গ্রামে কি শহরে, দেশের সর্বত্র ব্যক্তিগত আয়বৈষম্য (personal income disparity) অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে গত দশকে। দেঙ্ সিয়াওপিঙের মতে, উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাও অগ্রণী ভূমিকা যারা নেবে, সেই উদ্যোক্তারা (entrepreneurs) ধনসঞ্চয় করলে সমাজতন্ত্র বিপন্ন হবে না — আস্তে আস্তে সমস্ত নাগরিক আত্মোন্নতির সুযোগ পাবে। বাস্তবে কিন্তু দেখা যায়, নীচের তলার মানুষ — সাধারণ শ্রমিক বা কৃষকের আয় বেড়েছে মন্থরগতিতে। অন্যদিকে, বেসরকারি উদ্যোগগুলির মালিকরা কোটি কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তি করায়ত্ত করছে। আমেরিকার Forbes পত্রিকা সবচেয়ে ধনীদের তালিকা প্রকাশ করে নিয়মিত। ইদানীং লক্ষ করা হয়, এশীয় ধনীদের তালিকায় একাধিক চীনা (ভারতীয়দের থেকে বেশী) শিল্পপতির নাম রয়েছে, যাদের সম্পত্তির ন্যূনতম পরিমাণ কয়েকশ কোটি ডলার। কোটিপতিদের মধ্যে অনেকের জন্ম প্রাক্-বিপ্লব চীনের বড় পুঁজিপতিদের পরিবারে। আবার অনেকে কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের পুত্র, কন্যা, জামাতা ইত্যাদি। চীনের প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিন কয়েকমাস আগে প্রস্তাব দেন, পার্টির সংবিধান সংশোধন করে পুঁজিপতিদেরও সদস্য করা হোক। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় কেন্দ্রীয় কমিটির ১২ জন বর্ষীয়ান সদস্য। বলা বাহুল্য, পুঁজিপতিরা পার্টির সদস্য হলে পার্টির রাজনৈতিক ভাবমূর্তিতে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। দেশের ওপর পার্টির কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য বজায় থাকলেও 'সমাজতন্ত্রের' কতটা অবশিষ্ট থাকবে, তা নিয়ে অনেকেই সন্দিগ্ধ। কিন্তু 'দুই লাইনের' সংগ্রাম শেষ হয়নি পার্টির ভিতরে ও বাইরে। সাবেকী সমাজবাদীরা পরাভূত হবে, একথা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে, দেশের মধ্যে আয়বৈষম্য না কমলে সমাজবাদীরা উত্তরোত্তর সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে।

সীমিত হলেও কিছু আশাপ্রদ রদবদল হচ্ছে রাজনীতিতে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে মুক্ত নির্বাচন হচ্ছে। পার্টি-তালিকার বাইরে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হচ্ছে। অনেক প্রতিনিধি স্থানীয় প্রশ্নে নিজস্ব মতামত-অনুসারে নীতি স্থির করে - পার্টিনেতাদের আপত্তি সত্ত্বেও। এর ফলে

সাধারণ মানুষের কতটা সুবিধা বেড়েছে, তার ছবিটা এখনও স্পষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়, কৃষকরা বিভিন্ন খাতে বে-আইনি কর বা 'তোলা' দিতে বাধ্য হয় স্থানীয় সরকারকে।

ধরে নেওয়া যাক, চীন সমাজতন্ত্র থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। দেশ কি ঐক্যবদ্ধ থাকবে? এ প্রশ্নেরও সঠিক জবাব আমার জানা নেই। ভারতেও বহুমুখী অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে, চীনের থেকে কোন অংশে কম নয়। দু' দেশেই ভাঙ্গনের আশঙ্কা, কিন্তু ঠিক কি কারণে বা কোন মুহূর্তে দ্বন্দ্বগুলি বিস্ফোরণের আকার ধারণ করে, তার সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শেষের প্রশ্ন হল, চীনে পুঁজিপতিদের ভূমিকা বেড়ে গেলে প্রাক্-বিপ্লব মুৎসুদ্দিয়ানা কি পুনর্জন্ম নেবে পাশ্চাত্যের নয়া উপনিবেশ হিসাবে? বেশ কিছু পর্যবেক্ষক, যেমন William Hinton এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমি ভিন্নমত পোষণ করি। তাইওয়ান বা দক্ষিণ কোরিয়ার বড় বড় পুঁজিপতিরা ব্যবসায় জীবন শুরু করে প্রত্যক্ষ মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায়। জনসাধারণের ওপর কমিউনিস্ট চীন ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিহত করার জন্য শুধুমাত্র মার্কিন সামরিক শক্তি যথেষ্ট নয়। মার্কিন সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, জনসমর্থন পাওয়ার জন্য প্রয়োজন, যত দ্রুত সম্ভব মিত্র দেশগুলিতে, বিশেষতঃ জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া আর তাইওয়ানে, জীবনমান উন্নীত করার। ফলে, পূর্ব এশিয়ার ঐ দেশগুলি আমেরিকায় রপ্তানি বৃদ্ধির অভূতপূর্ব সুযোগ পায় পঞ্চাশ বা ষাটের দশক থেকে। অপরপক্ষে, ওরা ইচ্ছামতো আমদানি সঙ্কোচ করেছে, শুল্ক বসিয়েছে দেশীয় স্বার্থে, কিন্তু আমেরিকা বা বিশ্বব্যাঙ্ক কোনো ওজর-আপত্তি তোলেনি। মার্কিন সরকার বারংবার ভারত ও অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশের ওপর চাপ দিয়েছে মার্কিন পুঁজি-অনুপ্রবেশের সপক্ষে। কিন্তু পূর্ব-এশিয়ার তিনটি দেশে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ গত দশক পর্যন্ত প্রায় নগণ্য ছিল। এইসব কারণে অনেক বৃহদাকার শিল্প গড়ে উঠেছে, যারা বিশ্ববাজারে পাশ্চাত্য কোম্পানিগুলির সাথে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করছে। ১৯৯৭ সালের অর্থসঙ্কটের পর দক্ষিণ কোরিয়ার কয়েকটি বড় শিল্পগোষ্ঠী (chaebol) দেউলিয়া হয়ে যায়; তাদের মোট সম্পত্তির এক-একটা অংশ কিনে নেয় পাশ্চাত্য কোম্পানিরা। কিন্তু এখনও বেশ কয়েকটি কোরীয় শিল্পগোষ্ঠী স্বাধীন ও সফলভাবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে দেশের ভিতরে ও বাইরে।

এর থেকে প্রমাণিত হয়, জন্মলগ্নে মুৎসুদ্দি হলেও, সুযোগ পেলে সব পুঁজিপতি চায় আত্মনির্ভর হতে। আমাদের দেশে টাটা পরিবার উনিশ শতকে গিয়ানা প্রভৃতি বৃটিশ উপনিবেশে ভারতীয় শ্রমিক পাঠিয়ে প্রচুর মুনাফা করে, কিন্তু পরবর্তীকালে বস্ত্র, ইস্পাত, মোটর ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প গড়ে তোলে পাশ্চাত্য পুঁজির সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে। অন্যদিকে, বৃটিশ যুগের Parle কোম্পানি স্বাধীনতার পর কিনে নেয় চৌহান পরিবার। ১৯৭৭ সালে CocaCola কোম্পানি এদেশ ছাড়ার অল্প কয়েক বছরের মধ্যে পার্লের Thums Up, Limca ইত্যাদি ভারতীয় বাজারের ৭০ শতাংশ অধিকার করে। Pepsi Cola আশির দশকে এদেশে এলেও পার্লের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যায় আর প্রতি বছর তাদের লোকসান হতে থাকে। কিন্তু ১৯৯১ সালে ভারত সরকার নয়া উদারনীতি গ্রহণ করার পর, CocaCola ফিরে আসে। পার্লের মালিকরা দেখলেন, CocaCola ও Pepsi Cola এবার বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞাপন হাতিয়ার করে সহজেই এদেশের বাজার দখল করবে। তাই পার্লের Thumbs Up প্রভৃতি soft drinks ব্যবসা CocaCola-কে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। উল্লেখযোগ্য, এ ধরনের ঘটনা পূর্ব এশিয়ার কোথাও দেখা যায়নি এ পর্যন্ত। ইউরোপ-আমেরিকার 'প্রতিযোগিতা আইনে' (competition law) CocaCola পার্লের ব্যবসা অধিগ্রহণ করতে পারতো না।

ভারত ও পূর্ব এশিয়ার দৃষ্টান্তগুলির থেকে সরকারি ভূমিকার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। আগেই বলেছি, কয়েকটি অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে চীন পাশ্চাত্যের সমকক্ষ। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মার্কিন সরকার বা আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের দ্বারস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি মতাদর্শের দিক থেকে দুর্বল হয়ে গেলে, আর জনগণের, বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পাশ্চাত্য উদারনীতি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হলে (এ দুটো লক্ষণই বিদ্যমান আজকের চীনে), বিচ্ছিন্নতাবাদী দল বা গোষ্ঠীগুলি বিদেশের সাহায্য নিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। আমার মনে হয় না, অদূর ভবিষ্যতে এমনটি ঘটতে পারে। অথচ সোভিয়েত রাষ্ট্র ভেঙ্গে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো পর্যবেক্ষক তার পূর্বাভাস দেয়নি। তাই চীন সম্পর্কে দ্বিধাহীন ভবিষ্যদ্বাণী করতে আমি অপারগ। এটুকু শুধু বলতে পারি, অখণ্ডিত চীন, সমাজবাদী থাকুক কিম্বা উত্তরোত্তর পুঁজিবাদী হোক, পাশ্চাত্যের নয়া উপনিবেশে পরিণত হবেনা।

আমার এই অভিমত যদি সঠিক হয়, এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাষ্ট্র একটা বিরাট ভূমিকা নেয় ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে। স্তালিনের আমলে বা পরবর্তীকালে ওদেশ সমাজতন্ত্রী ছিল কিনা সে বিষয়ে মতবিরোধ আছে। তৃতীয় বিশ্বের নেতাদের চোখে সোভিয়েত রাষ্ট্র ছিল মূলত পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী; তাঁদের অনেকেই সাম্যবাদে আস্থা রাখেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সোভিয়েত সরকার প্রয়োজন বা সাধ্যমত সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেবে স্বাধীনতাকামী দেশগুলিকে, এটাই ছিল মুক্তি আন্দোলনের নেতাদের প্রত্যাশা। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, সোভিয়েত সরকার সে প্রত্যাশা পূরণ করে। গত ১০-১২ বছরে ইরাক, ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন, যুগোশ্লোভিয়া আর সবশেষে আফগানিস্তানে যে তাণ্ডবনৃত্য চালিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সেটা সম্ভব হত না সোভিয়েত আমলে। কমিউনিস্ট পার্টি-শাসিত চীন প্রতিটি বিষয়ে ওজর-আপত্তি তুলেছে বটে, কিন্তু মার্কিনদের সরাসরি বিরোধিতা করার ইচ্ছা বা সামর্থ্য তাদের নেই। বিগত দিনের সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভূমিকা নেবে চীন, এটা অলীক স্বপ্নের মতো।

গত দু'তিন দিন বছর ধরে চীন চেষ্টা করছে এশিয়া-ভিত্তিক একটা জোট সৃষ্টির। তাদের আশা রাশিয়া, ভারত, মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি তাদের যৌথ নিরাপত্তার (সামরিক ও অর্থনৈতিক) জন্য আলাপ-আলোচনায় বসবে — মার্কিন আওতার বাইরে। বিশেষ করে রাশিয়া ও ভারতকে নিয়ে চীন 'ত্রিপাক্ষিক সমঝোতায়' আসতে চায়। একাধিক বৈঠক, সেমিনার, ইত্যাদি হয়েছে ঐ তিন দেশের মধ্যে, অথচ আসল অর্থে সমঝোতা বেশীদূর এগোয়নি। মূল কারণ, রাশিয়া ও ভারত বিশ্বমুদ্রা ভাণ্ডারের আদেশমতো নীতি স্থির করে। রাজনীতিতে ভারত আমেরিকা ও ইজরায়েলের সাথে নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। রাশিয়া প্রবেশ করতে চায় European Union এবং NATO-তে। তাই আমার মনে হয়, রাশিয়া বা ভারত যে চীনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হচ্ছে, এটা নিছক 'কৌশলগত ভিন্নমুখিতা' (tactical diversion), আমেরিকার সাথে রফায় আসাই ভারত বা রাশিয়ার মূল লক্ষ্য। চীন যে কৌশলগত সুযোগের সন্ধান করছে না, সেটাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু স্বনির্ভর চীন আমেরিকার ওপর কোনোভাবেই নির্ভরশীল হতে চায় না। উন্নয়নশীল কয়েকটি বড় দেশ যদি স্বনির্ভরতার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্বমুদ্রা ভাণ্ডারের কবল থেকে বেরিয়ে আসে, তবেই চীনের 'সমঝোতা' পরিকল্পনা সফল হবে। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে স্বনির্ভরতার পক্ষে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রগতিশীল মহলের আশু কর্মসূচী হওয়া উচিত। দৃষ্টান্ত হিসাবে, অন্ধ অনুকরণের জন্য নয়, চীনের অভিজ্ঞতা এই আন্দোলনের সহায়ক হবে।

খাদ্য-শিল্প-শ্রম

উৎসা পট্টনায়ক
সি. পি. চন্দ্রশেখর
এম. কে. পান্ডে
জয়তী ঘোষ

খাদ্য নিরাপত্তা এবং বিশ্বায়ন

উৎসা পট্টনায়ক

১. খাদ্যাভাবের পটভূমিকা

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি বজায় রাখার প্রশ্নটি চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে উৎপাদনের উপকরণরূপে জমি প্রাপ্তির উপর। এই বিষয়টি দু-ভাবে ভাবা যায় ঃ আবাদযোগ্য জমির মোট যোগান এবং গৃহস্থ ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এর বন্টন। আমরা মনে করি, প্রথম বিষয়টি, বাণিজ্য উদারীকরণের যুগে খাদ্য নিরাপত্তার কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণভাবে উৎপাদনশীল উপকরণরূপে জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক বলে ধরা হলেও, বর্তমানে একে কার্যকরীভাবে অপরিবর্তনশীল বলে ধারণা করা অনেক বেশি যথাযথ। এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক জনসংখ্যার অর্থনীতি ভারত ও চীন-এ, আবাদী জমির পরিমাণ হয় অপরিবর্তিত নয়তো শিল্প, বাণিজ্য ও বসবাসযোগ্য নির্মাণের প্রয়োজনে হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে মোট বপন হওয়া এলাকার পরিমাণ হয় হ্রাস পেয়েছে অথবা অপরিবর্তিত রয়েছে। চীনে প্রায় দু দশক আগে এই বিষয়টি উদ্ভূত হয়েছে; ভারতে তুলনামূলক নতুন ঘটনা হিসেবে গত দশকের শুরু থেকে এর প্রকাশ পেয়েছে। যদিও প্রকৃতিগতভাবে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না, তথাপি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এর অর্থনৈতিক পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব. আবাদী জমির প্রকৃতিদত্ত পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাস্তবে না থাকলেও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুটি উপায়ে জমি বৃদ্ধি করা যায় ঃ বহুফসলি চাষের বৃদ্ধি ঘটিয়ে (অপরিবর্তনশীল নীট বপন করা জমির ভিত্তিতে) এবং প্রতি একক উৎপাদন বৃদ্ধি করে মোট বপনযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানো যায়। এই উভয় বিষয়ই চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে বিনিয়োগ, বিশেষত জলসেচসহ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রযুক্তির উপর।

নয়া-উদারীকরণ অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল প্রতিপাদ্য সমষ্টিগত অর্থনৈতিক সংকোচন-এর প্রথম আঘাত এই উৎপাদনশীল বিনিয়োগের উপর এসে পড়েছে। প্রকৃতিগতভাবে জমির অপরিবর্তনশীলতা বা হ্রাসমান যোগানের সমস্যা বহুদিনের এবং এর জন্য বহু ফসলি উৎপাদন ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও বহুকালের জ্ঞাত বিষয়। তথাপি লক্ষণীয় যে, ভারত সরকার সঠিক সময়ে এই সমস্যাটিতে মনোযোগী হওয়ার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উপরন্তু ৩ নং সারণী থেকে দেখা যায়, আশির দশক থেকে সরকারি কৃষিতে বিনিয়োগ কমেছে এবং ১৯৯১ সালে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংস্কারের

ফলে নব্বই দশকে সরকারি গ্রামীণ বিনিয়োগ ও ব্যয় আরও দ্রুত হারে হ্রাস পেয়েছে।

সারণী - ১
বিভিন্ন শস্যের মোট বপনকৃত জমির পরিমাপ (মিলিয়ন হেক্টরে)

বছর	সমস্ত শস্য	গম ও চাল	প্রচলিত শস্য	কলাই শস্য	তৈলবীজ	কার্পাস	আখ	খাদ্য শস্য জমির সূচক	মোট বপনকৃত জমির সূচক
১৯৬০-৬১	১১৫.৬	৪৭.০	৪৫.০	২৩.৬	১৩.৮	৭.৬	২.৪	৯০.৫	—
১৯৭০-৭১	১২৪.৩	৫৫.৮	৪৬.০	২২.৬	১৬.৬	৭.৬	২.৬	৯৭.৩	৯১.৫
১৯৮০-৮১	১২৬.৭	৬২.৪	৪১.৮	২২.৫	১৭.৬	৭.৮	২.৭	৯৯.১	৯৪.৮
১৯৯০-৯১	১২৭.৮	৬৬.৯	৩৬.৩	২৪.৭	২৪.১	৭.৪	৩.৭	১০০.০	১০০.০
১৯৯১-৯২	১২১.৯	৬৬.০	৩৩.৩	২২.৫	২৫.৯	৭.৭	৩.৮	৯৫.৪	৯৭.৫
১৯৯২-৯৩	১২৩.১	৬৬.৪	৩৪.৪	২২.৪	২৫.৩	৭.৫	৩.৬	৯৬.৩	৯৮.০
১৯৯৩-৯৪	১২২.৭	৬৭.৬	৩২.৯	২২.২	২৬.৯	৭.৩	৩.৪	৯৬.০	৯৮.৭
১৯৯৪-৯৫	১২২.৭	৬৮.৫	৩২.২	২৩.০	২৫.৩	৭.৯	৩.৯	৯৬.৭	৯৮.১
১৯৯৫-৯৬	১২১.০	৬৭.৮	২৯.৪	২২.৩	২৬.০	৯.০	৪.১	৯৪.৭	৯৭.৭
১৯৯৬-৯৭	১২৩.৫	৬৯.৩	৩১.৮	২২.৪	২৬.৩	৯.১	৪.২	৯৬.৬	৯৯.৭
১৯৯৭-৯৮	১২৩.৯	৭০.১	৩০.৮	২২.৯	২৬.১	৮.৯	৩.৯	৯৬.৯	৯৯.৭
১৯৯৮-৯৯	১২৯.৬	৭৬.৭	২৫.৩	২৩.৫	২৬.২	৯.৩	৪.১	১০০.২	১০০.৯
১৯৯৯-০০*	১২৩.১	৭২.৪	২৫.৭	২১.২	২৪.৪	৮.৮	৪.১	৯৬.৩	১০০.৩

১৯৯০-৯১-এর হিসাবে শতকরা পরিবর্তন

বছর	সমস্ত শস্য	গম ও চাল	প্রচলিত শস্য	কলাই শস্য	তৈলবীজ	কার্পাস	আখ	খাদ্য শস্য জমির সূচক	মোট বপনকৃত জমির সূচক
১৯৯৫-৯৬	-৫.৩	১.৩	-১৯.০	-৯.৭	৭.৮	২১.৬	১০.৮	-৫.৩	-২.৩
১৯৯৯-০০*	-৩.৭	৮.২	-২৯.২	-১৪.২	১.৩	১৯.০	১৩.৫	-৩.৭	০.৩

সূত্র ঃ ইকোনমিক সার্ভে ১৯৯৭-৯৮, এস-১৭ এবং ২০০০-২০০১, এস-১৭। ধান ও গম আবাদ জমির পরিমাণ ব্যতিত দানাশস্যের মোট জমির পরিমাণ কলাই শস্যের আবাদ এলাকা।

** চিহ্ন পরিসংখ্যান ঐ বছরের প্রাথমিক হিসাব।*

সূত্র ঃ ইকোনমিক সার্ভে ১৯৯৯-২০০০, সারণী ৮.৬ থেকে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। বৃদ্ধির চক্রবৃদ্ধির হার, "লিস্ট স্কোয়ার" পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা "এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন" থেকে বার করা হয়েছে।

সারণী - ৩

কৃষিক্ষেত্রে প্রকৃত মোট মূলধন সৃষ্টি (১৯৮০-৮১'র আধার মূল্যস্তর ধরে কোটি টাকায়)

বছর	সরকারি	বেসরকারি	মোট	মোটের হিসাবে শতকরা ভাগ সরকারি	বেসরকারি
১৯৭০-৭১	৭৮৯	১৯৬৯	২৭৫৪	২৮.৬	৭১.৪
১৯৮০-৮১	১৭৯৬	২৮৪০	৪৬৩৬	৩৮.৭	৬১.৩
১৯৯০-৯১	১১৫৪	৩৪৪০	৪৫৯৪	২৫.১	৭৪.৯
১৯৯১-৯২	১০০২	৩৭২৭	৪৭২৯	১২.২	৭৮.৮
১৯৯২-৯৩	১০৬১	৪৩১১	৫৩৭২	১৯.৭	৮০.৩
১৯৯৩-৯৪	১১৫৩	৩৮৭৮	৫০৩১	২২.৯	৭৭.১
১৯৯৪-৯৫	১৩১৬	৪৯৪০	৬২৫৬	২১.০	৭৯.০
১৯৯৫-৯৬	১২৬৮	৫৬৯৩	৬৯৬১	১৮.২	৮১.৮
১৯৯৬-৯৭	১১৩২	৫৮৬৭	৬৯৯৯	১৬.২	৮৩.৮

সূত্র ঃ ১৯৯৮-৯৯ সালে প্রকাশিত টাকাকড়ি ও আর্থিক ব্যবস্থার উপর ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিবেদন।

সারণী ১ থেকে দেখা যায়, মোট বপন এলাকার সূচক ১৯৯০-৯১ -এর তুলনায় নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে হ্রাস পেয়ে ঐ দশকের শেষে প্রাথমিক সূচক-মানে উন্নীত হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে খাদ্যশস্য উৎপাদন অঞ্চলের বহুমুখী পরিবর্তন ঘটিয়ে আবার অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জমির আয়তন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বিষয়টি খাদ্য নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলে, কারণ কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি বহির্বাণিজ্যের কাছে মুক্ত হয়ে পড়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন এবং কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশগুলির ঋণ নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য উদারীকরণ দেখা গিয়েছিল প্রাথমিক ক্ষেত্রে। — উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানি এবং দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যদ্রব্য ভোগের মধ্যে একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিরাজমান। এর কারণ নীচে বিশ্লেষণ করা হল।

২. উদার বাণিজ্যের কারণে খাদ্যাভাব

ভারতের মত দেশে দুটি উৎপাদন কাল দেখা যায়, বর্ষাকাল এবং শীতকাল; সেচসুবিধাযুক্ত নদী উপত্যকায় একই জমিতে দুটি ভিন্ন ফসল এবং কোথাও কোথাও তিনটি ফসল পর্যন্ত দেখা যায় (একই গাছের দুটি ফসল বা দুটি ভিন্ন গাছের দুটি ফসল হতে পারে)। যদিও ভিয়েতনামের মেকং বদ্বীপে একটি জমিতে চার বছরে এগারোটি ফসল হয়।

ভারত বৃহৎ উন্নয়নশীল দেশ যার ভূমি বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত। এখানে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে উৎপাদিত হয় না শুধুমাত্র এমন নির্দিষ্ট গ্রীষ্মকালীন ফসল উৎপাদন হয়, আবার নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে গ্রীষ্মকালে উৎপাদিত হয় এমন ফসল, তরিতরকারি এবং ফল শীতকালে উৎপাদিত হয়। অপরদিকে পৃথিবীর শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত উন্নত দেশগুলোতে একটি মাত্র উৎপাদনকাল দেখা যায় এবং সেহেতু কিছু নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদন করতে এরা সক্ষম হয়। এই বৈসাদৃশ্য নিচে দেখানো হল ঃ

অঞ্চল	উত্তর গোলার্ধের ঋতু	
	শীতকাল	গ্রীষ্মকাল/বর্ষাকাল
শীতল নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল	(0,0,...0)	$(a_1, a_2,...,a_n)$
উষ্ণ/স্বল্প উষ্ণমণ্ডল	$(a_1, a_2,...,a_n)$	$(b_1, b_2,...,b_n)$

উত্তর গোলার্ধের শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে গ্রীষ্মকালে উৎপাদিত ফসল, আনাজপাতি ও ফল হলো a_i; শীতকালে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার শীতল নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে কোন কিছুই উৎপাদিত হয় না। উত্তর গোলার্ধের উষ্ণ ও স্বল্প উষ্ণ অঞ্চলের উন্নতশীল দেশগুলিতে শীতকালে একই a_i উৎপাদিত হয়। b_i হলো, এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে ও বর্ষায় উৎপন্ন কৃষিজ উৎপাদন, যা শীতপ্রধান দেশে কোনভাবেই সৃষ্টি করা যায় না। এক্ষেত্রে উত্তরের দেশগুলিতে দেশের অভ্যন্তরে পরিবর্তরূপে উৎপাদন সম্ভব নয় শুধুমাত্র এমন কৃষিজ দ্রব্য b_i, আমদানি করার (নিষেধাজ্ঞামূলক খরচ ব্যতীত) করার সুবিধাই নয়, শীতকালে উন্নতিশীল দেশগুলি থেকে a_i আমদানি করে অসময়ের যোগানও পাওয়া সম্ভব। ইতিহাসে দেখা যায় উত্তরের দেশগুলি তাদের শিল্পায়নের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য এবং কাঁচামাল রূপে নির্দিষ্ট গ্রীষ্মকালীন কৃষিজ দ্রব্য, b_i, উপনিবেশগুলি থেকে আহরণের চেষ্টা করত। b_i -এর অনেক উপাদানই প্রকৃতিদত্ত উৎস থেকে সরিয়ে দূরবর্তী উষ্ণ অঞ্চলে চাষ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কমপক্ষে ৫০ মিলিয়ন মানুষকে জনবহুল উষ্ণ দেশগুলি থেকে কম জনবসতির উষ্ণদেশগুলিতে নিয়ে গিয়েছিল দাস হিসাবে এবং পরবর্তীকালে, কৃষিক্ষেত্রের বাঁধা-শ্রমিক হিসাবে ব্যবহারের জন্য। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, বিশ্ব খাদ্য ও কৃষিজদ্রব্য ব্যবসায় বহুজাতিক সংস্থার আগমনের সাথে সাথে শুধু b_i নয়, উন্নয়নশীলদেশগুলি থেকে a_i সংগ্রহের চাহিদাও বেড়ে গেছে। উষ্ণ অঞ্চলে উৎপাদিত শীতকালীন a_i কে মনে করা হয় শীতপ্রধান দেশের গ্রীষ্মকালীন a_i - এর থেকে পৃথক।

সবথেকে আগে ও সব থেকে বেশি মাত্রায় আমদানি-নির্ভরশীল দেশ ব্রিটেন ১৮৫০ সাল নাগাদ এর প্রাথমিক ক্ষেত্রের দ্রব্যের আমদানি ঐ ক্ষেত্রের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬০ শতাংশ ছিল। বর্তমানেও ইউরোপের ব্রিটেন ও জার্মানি এবং এশিয়ার জাপানের আমদানি নির্ভরতা, সুরা প্রস্তুতের উপাদান ব্যতীত উত্তেজক পানীয় দ্রব্য ও মশলা ছাড়াই অনেক বেশি, আর মাদক ও মশলার হিসাব ধরলে, এই নির্ভরতা অসীমের কাছাকাছি। পূর্বোক্ত দেশগুলিতে মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্য আমদানি হয় আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২০০ শতাংশর বেশি এবং ফল ও তরিতরকারি ১০০ শতাংশের বেশি। কিছুটা স্বল্পোষ্ণ অঞ্চল থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছু উষ্ণমণ্ডলজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে 'যা ঐ দেশে সামান্য উৎপন্ন হয়' আমদানি নির্ভর; যদিও পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতি বা জাপানের থেকে তুলনামূলকভাবে এই নির্ভরতা কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফল ও আনাজপাতির আমদানি এই খাদ্যসংশ্লিষ্ট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের দুই-পঞ্চমাংশ এবং মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্যের ক্ষেত্রে অর্ধেক।

বর্তমানে উন্নত দেশের সাধারণ ভোক্তারা, তাদের দেশে কোনভাবেই উৎপন্ন হয় না বা উচ্চ ব্যয়ে সামান্য উৎপাদিত হয় এমন কৃষিজাত দ্রব্য ভোগে অভ্যস্ত। পশ্চিম ইউরোপ বা আমেরিকার একটি সুপারমার্কেটে গড়ে প্রায় বারোশো অপরিমার্জিত এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, যার অন্ততপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ উষ্ণমণ্ডল থেকে আমদানি করা। উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে প্রাথমিক ক্ষেত্রজাত দ্রব্য সস্তায় আমদানি না হলে উত্তরের ভোক্তাদের জীবনযাত্রার মান মধ্যযুগের শেষভাগের সামান্য উপরে থাকত। উন্নতিশীল দেশগুলি থেকে অসংখ্য খাদ্যদ্রব্য (চা ও কফির মতো উত্তেজক পানীয়, কনফেকসনারি প্রস্তুতকারী চিনি ও

কোকো, মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্য, শজ্জিজাত তেল, ফল ও শাকসজি, মশলা, উষ্ণ মণ্ডলে জাত দানাশস্য এবং পশুখাদ্য) যদি না আমদানি হতো তবে স্বল্পকালে উত্তরের দেশগুলির ভোগ্যপণ্য বিন্যাস ইউরোপের মধ্যযুগের শেষভাগের বিন্যাসের মতো সাধারণ ও একঘেয়ে হয়ে উঠত এবং দীর্ঘকালে, ভোগ্যপণ্য বিন্যাসের সামান্য পরিবর্তন ঘটলে তা অতিমাত্রায় ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠত। আমদানি-পরিবর্ত উৎপাদন চেষ্টার মধ্য দিয়ে দেশীয় উৎপাদনের বৈচিত্র প্রবর্তন করতে গেলে অপরিহার্যভাবে অতি উচ্চ ব্যয় বহন করতে হয়, কারণ শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে উৎপাদন-কাল কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি করতে গেলে ফসলজাত অতি ব্যয়বহুল ইন্ধনশক্তি ব্যবহার কাঁচ দিয়ে গড়া জায়গায় চাষ করতে হবে।

উন্নতদেশের জনসাধারণের উচ্চ বাস্তবআয় নির্ভর করে বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক ক্ষেত্রজাত দ্রব্যের সস্তায় আমদানি প্রবাহ বজায় রাখার উপর। বিশ্বের ৬ বিলিয়ন জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ জনবসতিবিশিষ্ট উত্তর আমেরিকার এবং পশ্চিম দেশগুলির আয় বিশ্বের মোট আয়ের ৮০%। নামিক আয়ের হিসাবে (এই) মাত্র এক বিলিয়ন ধনী মানুষ ৫৪ জন ভারতীয় বা ২৭ জন চীনার কার্যকরী চাহিদা প্রকাশ করে। ক্রয়-ক্ষমতার সমতায় বিচার করলে এই এক বিলিয়ন মানুষ ১৮ টা ভারত বা ৯ টা চীনের সমান। নিজস্ব ভোগ্যপণ্য চাহিদা বিন্যাস যুক্ত বিশ্বের এই ধনী ব্যক্তিদের কার্যকরী চাহিদা সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের কৃষি উৎপাদনের এবং উপকরণ ব্যবহারের গঠনগত পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট যার জন্য ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অর্থনীতিগুলির বর্হিবাণিজ্যে পরিমাণগত ও অন্যান্য যে সমস্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল তা মুক্ত করে উদার-বহির্বাণিজ্য চালু করা হয়েছে।

এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিদময় ভূ-ভাগের উপস্থিতি দক্ষিণের দেশগুলিতে সীমিত। বাস্তব পরিমাপের হিসাবে এই ধরনের জমির যোগান, ফসিল ইন্ধনের মত অপরিবর্তনশীল। গত শতকের মতো উন্মুক্ত ভূভাগ এখন পাওয়া যায় না এবং ব্যাপক হারে বনভূমি হ্রাসের ফলে বাস্তবে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার কোন সুযোগ নেই। সর্বোচ্চ জনবহুল এশিয়ান অর্থনীতিগুলিতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে— পাশাপাশি ভারতের মোট রোপণকৃত জমির পরিমাণ ১৯৯০ সাল থেকে একই রয়েছে। আন্তর্জাতিক ঋণের শর্ত হিসাবে সমষ্টিমূলক অর্থনৈতিক সংকোচন নীতি বাধ্যতামূলক হওয়ায়, বৃহৎসংখ্যক ঋণ-গ্রহণকারী উন্নতিশীল দেশে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অংশ হিসাবে এবং মোট বিনিয়োগের অংশ হিসাবে গ্রামীণ বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। নির্দিষ্টভাবে একই সময়ে নয়া-উদারীকরণ নীতি অনুযায়ী বাণিজ্যকে উদারীকৃত করা হয়েছে। অতএব কৃষিক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ করার অর্থ উষ্ণমণ্ডলে উপকরণ হিসাবে জমির পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে স্থির।

বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে উন্নতিশীল দেশের (চাষ) জমিতে বহির্দেশীয় চাহিদার চাপ অত্যধিক বাড়লে, দেশের অভ্যন্তরের ভোগ মেটানোর উপকরণরূপে খাদ্য উৎপন্নকারী জমি, রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে যদি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ না করা হয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই কৃষি ক্ষেত্রে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনকালে দুটি পরিপূরক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল—

(১) আভ্যন্তরীণ আয়ের দিক-পরিবর্তন নীতি (ভারসাম্য বাজেট বা উদ্বৃত্ত বাজেট) প্রবর্তনের দ্বারা শাসিত শ্রেণীর নিজস্ব উৎপাদনের, বিশেষত খাদ্যশস্যের জন্য চাহিদাহ্রাস ঘটিয়ে রপ্তানিযোগ্য শস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ মুক্ত করা; এবং (২) শহরের জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোগ বা উৎপাদনশীল পরিবর্তন বা অন্যান্য নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উৎপাদিত দ্রব্যের আমদানির বিনিময়ের জন্য রপ্তানি উন্নয়নে ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণী

সরাসরি হস্তক্ষেপ করত। এই নীতি ফলপ্রসূ করার সময়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ খুব সামান্যই করা হয়েছিল।

এটা কোনভাবেই বিস্ময়কর নয় যে, **ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রাথমিক ক্ষেত্রজাত দ্রব্য রপ্তানি ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে খাদ্য প্রাপ্তিসাধ্যতার মধ্যে একটি পরিষ্কার ও লক্ষণীয় ঋণাত্মক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল।** রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেড়ে গিয়েছিল এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার পূর্বোক্ত হারের থেকে, এমনকি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকেও কমে গিয়েছিল, এবং কিছু ক্ষেত্রে ঋণাত্মক। এখন আমরা কিছু প্রকৃত অভিজ্ঞতার দিকে তাকাই। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী আগে ভারতে বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন হার (১.৩১ শতাংশ), খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ঐ হারের (০.১১ শতাংশ) দশগুণেরও বেশি ছিল। ১৯৪৭ সালের ৫০ বছর আগে যখন নীল, আফিম, পাট, কার্পাস, তামাক, তৈলবীজ, গম, চা এবং অন্যান্য রপ্তানিযোগ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের বাইরে পাঠানো হয়েছিল এবং তাদের মাথাপিছু উৎপাদন উচ্চ ছিল, ঠিক সেই সময়কালে বাংলাদেশের প্রধানতম খাদ্যশস্য চালের উৎপাদন পরিমাণ চরমমানে হ্রাস পেয়েছিল এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার ধনাত্মক হলেও তা ছিল জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের থেকে কম ছিল। বঙ্গদেশে মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন ৩৮ শতাংশ কমে গিয়েছিল, গ্রামীণ জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ অপুষ্টির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর পূর্বশর্ত পরিলক্ষিত হয়েছিল, এবং যার ফলস্বরূপ ঘাটতিনির্ভর বাজেটের যুদ্ধ-ব্যয়ের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৩-৪৪ সালে দুর্ভিক্ষে কমপক্ষে ৩ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটে।

একই ঋণাত্মক সম্পর্ক নেদারল্যান্ডের উপনিবেশ জাভাতে আমরা দেখতে পাই, যেখানে ১৮৯৫ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে রপ্তানির জন্য রবার ও আখের উৎপাদন বাৎসরিক ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং একই সময়ে চালের উৎপাদন বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১.৬ শতাংশ)-এর নিচে ১.৪ শতাংশ-এ নেমে গিয়েছিল, ফলে মাথাপিছু চাল উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। জাপানের উপনিবেশ কোরিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, জাপানে উৎপাদন নিশ্চলতার কারণে খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য কোরিয়া থেকেই সেখানকার প্রধান খাদ্যশস্য চাল রপ্তানি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ১৯৩৭ সাল নাগাদ কোরিয়ার মোট উৎপাদিত চালের অর্ধেক জাপানে পাঠানো হত, যা জাপানের মোট চাল আমদানির ৬৫ শতাংশ ছিল (অন্য সূত্র ছিল ফরমোসা)। দরিদ্র কৃষকেরা চালের পরিবর্তে মাঞ্চুরিয়া থেকে আমদানিকৃত সস্তার ভুট্টা ও জোয়ার তাদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করেছিল, এবং এই কারণে যুদ্ধ-মধ্যবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক কোরিয়ায় মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

১৯৯৫ সাল থেকে প্রবর্তিত সংযুক্ত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম গত পঁচিশ বছর ধরে প্রচারিত ও প্রচলিত নব-উদারনৈতিক অর্থব্যবস্থার অংশ বর্তমান বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও প্রাথমিক ক্ষেত্রজাত দ্রব্যের রপ্তানির মধ্যে এই ঋণাত্মক সম্পর্ক পুনরায় দেখা দিয়েছে। সাহারা-সংলগ্ন আফ্রিকার দেশগুলির একটা বড় অংশ, সত্তর দশকের শেষ ভাগে ঋণশর্ত বিন্যাস ও মুক্ত বাণিজ্যের নীতি মেনে প্রাথমিক ক্ষেত্রজাত দ্রব্যের রপ্তানির (পরিমাণগত হিসাবে) 'সফল' বৃদ্ধি ঘটানোর চেষ্টা করেছে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, এই দেশগুলির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে শস্য রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হয়েছে যার কারণ সেচব্যবস্থা ও অন্যান্য উপকরণ, প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিবর্তে, রপ্তানিকৃত শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার ডলারের হিসাবে এদের রপ্তানির একক প্রতি চরমমূল্য হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য-আয় বৃদ্ধি পায়নি।

উপনিবেশগুলির আয় বৃদ্ধি ও আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করতে, ঔপনিবেশিক সময়ে, 'নির্ভরশীল অর্থব্যবস্থা'র নামে ভারসাম্যমূলক বাজেট মতবাদের মধ্যদিয়ে জনসাধারণের চাহিদা পরিবর্তনের নীতি অতিমাত্রায় কার্যকরী হয়েছিল। বর্তমানে, **ঋণগ্রস্ত দেশগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া সমষ্টিগত অর্থনৈতিক সংকোচন প্রবর্তনকারী নয়া উদারনীতি একই অভিষ্টসাধন করছে।** এই অভিপ্রায়টি হলো, উন্নতিশীল দেশে আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি ও নিজ উৎপাদন ক্রয়ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, উপকরণগুলিকে তাদের রপ্তানি চাহিদা পরিপূরণের জন্য ব্যবহার করতে বাধ্য করা। সাহারা সংলগ্ন আফ্রিকার দেশগুলিতে ঋণ শর্তানুসারী ও চাহিদা পরিবর্তনকারী সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নীতিগুলি জনসাধারণের খাদ্যের কার্যকরী চাহিদার হ্রাস ঘটিয়ে ঐ উপকরণগুলিকে বাণিজ্যের জন্য ব্যবহারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ঃ এই অঞ্চলের ৪৬টি দেশের মোট হিসেবে, আশির দশকে (১৯৮০-৮৯) মাথাপিছু বাস্তব মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বছরে ১ শতাংশ করে হ্রাস পেয়েছে এবং এদের ৬টি সর্বাধিক জনবসতিপূর্ণ দেশে মাথাপিছু দানাশস্য উৎপাদন একই সময়ে ৩৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, আর খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত প্রাথমিক ক্ষেত্রজাত দ্রব্য রপ্তানি সর্বনিম্ন বাৎসরিক ৬ শতাংশ (কেনিয়া) চক্রবৃদ্ধি হারে এবং সর্বোচ্চ বাৎসরিক ১৩.৯ শতাংশ (সুদান) চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ এক দশকে এই বৃদ্ধি দ্বিগুণ। এর প্রভাবে সবথেকে খারাপ দেশগুলির অপুষ্টিজনিত ক্ষতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পুনরায় কোন আঘাত আসলে সেখানে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।

আমাদের মতে, তথাকথিত যোগাননির্ভর অর্থনীতি বিশ্ব চাহিদা পরিচালনার একটি রূপ যেখানে আয়-বিক্ষেপ, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সর্বাপেক্ষা বেশি হবে। উন্নতিশীল দেশগুলির কৃষিক্ষেত্রে এসেছে দ্বিমুখী আক্রমণ যার উভয়ই আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করছে ও বহির্চাহিদার কাছে দেশকে মুক্ত করে দিচ্ছে। উন্নতিশীল দেশগুলিতে সাধারণের কাছে পরিগণিত বৃদ্ধির লক্ষ্য আসলে এই বৃদ্ধির হারের হ্রাস ঘটানোর চেষ্টা।

উপরোক্ত সর্বাধিক জনবসতিপূর্ণ ৬টি দেশের মধ্যে ৫টি (যেখানে সাহারা সংলগ্ন আফ্রিকার ৬০ শতাংশ মানুষ বাস করে) দেশে আশির দশকে অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনকালে দেখা গেছে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ হ্রাস পেয়েছে (সারণী-৪, একমাত্র ব্যাতিক্রমী দেশ নাইজেরিয়া' সারণী ৪ ও ৫ একটি খনিজ তেল রপ্তানিকারী দেশ)।

আমাদের দেশে খাদ্যশস্য ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত রপ্তানি বা আভ্যন্তরীণ চাহিদা আছে এমন প্রধান শস্যের— কার্পাস, আখ, তৈলবীজ (বিশেষত সয়াবিন) উৎপাদনে ব্যবহৃত মোট জমির পরিমাণ সারণী-১-এ দেখা গিয়েছিল। উদ্যানপালন ও ফুল উৎপাদনে যে বৃদ্ধি দেখা দিচ্ছে তার তথ্য অসম্পূর্ণ, কারণ এই নতুন ধরনের উৎপাদনের সুক্ষ্ম পরিবর্তন ধরার মতো পরিসংখ্যান ব্যবস্থা এখনও জনপ্রিয় নয়। ভারতের কৃষিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে গত দশকের এই রপ্তানি বৃদ্ধি একমুখী নয়, বরং বিশ্ব বাজারের অবস্থা অনুযায়ী এর পরিবর্তন ঘটেছে। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি খাদ্যশস্য উৎপাদনের মোট জমির পরিমাণ ১৯৯০-৯১-এর তুলনায় অতিদ্রুত প্রায় ৭ মিলিয়ন হেকটর হ্রাস পেয়েছে এবং একই সময়ে কার্পাস ও তৈলবীজ উৎপাদন এলাকা যৌথভাবে ৪.৫ মিলিয়ন হেক্টর বৃদ্ধি পেয়েছে, বাকি জমি অন্যান্য রপ্তানিকারক শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে কিছুটা উন্নতি ঘটেছে—রপ্তানিবৃদ্ধি ভীষণভাবে ধাক্কা খাওয়ায় অন্যান্য বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে জমি ব্যবহার কমিয়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ৩ মিলিয়ন হেক্টর জমি বেশি ব্যবহার হয়েছে, যদিও কার্পাস ও তৈলবীজ উৎপাদনে জমির ব্যবহার একই আছে। আবার ১৯৯৯-২০০০ সালে, ১৯৯০-৯১-এর তুলনায় খাদ্যশস্য

উৎপাদন এলাকা প্রায় ৫ মিলিয়ন হেক্টর হ্রাস পেয়েছে। একক প্রতি উৎপাদনের বৃদ্ধি কম থাকায় উৎপাদনের পরিমাণ বজায় রাখা যায়নি, ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ১.৮ শতাংশ নেমে যায়, যা আশির দশকের ৩.৫৪ শতাংশ হারের প্রায় অর্ধেক। **ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ের খাদ্য সমস্যার পর থেকে গত তিন দশকে খাদ্যশস্য বৃদ্ধির হার এই প্রথম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকে কমে গেছে এবং এই অবনতি বজায় থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে কারণ অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি ব্যয়বন্টনকে আরও তীর্যক করে তুলেছে এবং উদারীকরণ শস্য উৎপাদনের বিন্যাসকে রপ্তানিযোগ্য শস্য উৎপাদনে ঠেলে দিচ্ছে।**

এই ঘটনাপ্রবাহের নিহিতার্থ প্রকাশে পরিষ্কার দুটি ভিন্ন মত দেখা যায়। একদল বিশ্লেষক মনে করেন, কৃষি ক্ষেত্রে এই কাঠামোগত পরিবর্তন, উৎপাদনে দীর্ঘস্থায়ী "সক্রিয়তা" আনে যা আভ্যন্তরীণ বাস্তব আয়বৃদ্ধি এবং প্রচলিত মুক্ত বাণিজ্যজনিত বিশ্ববাজারের চাহিদা ও প্রতিযোগিতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের তথ্য থেকে এই অর্থনীতিবিদরা দেখান, গড় বাস্তব আয় বৃদ্ধির উপর এঞ্জেল প্রভাবের কার্যকারিতায় মাথাপিছু খাদ্যশস্য ভোগজনিত চাহিদা ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। তারা বলেন যে, উপভোক্তারা প্রতি একক ব্যয় পরিবর্তনের সাথে সাথে আরও উন্নত খাদ্যের দিকে সরে যায় এবং খাদ্যজনিত ব্যয়ে দানাশস্যের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে পশুজাত খাদ্যক্রয় বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটে। খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস ঘটিয়ে কৃষি উৎপাদনের এই কাঠামোগত পরিবর্তনকে পরম সত্য বলে মনে করা হয় এবং পরিবর্তিত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দেখানো হয়। বিষয়টি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি— ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক টাকাকড়ি ও অর্থব্যবস্থার উপর প্রকাশিত রিপোর্টে এঞ্জেল প্রভাবের বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে।

অন্যপক্ষের মতে, এই ব্যাখ্যা ভুল কারণ এই বিশ্লেষণে, বেকারত্ব বৃদ্ধিকারী সমষ্টিগত অর্থনৈতিক দশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং চাহিদা পরিবর্তনকারী অর্থনীতির নব্বই-এর দশকে সৃষ্ট দারিদ্র প্রকাশ করেন। এই পরিবর্তনকে এঞ্জেল প্রভাব দ্বারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, **ভারতের দুটি বাদে বাকি রাজ্যের গ্রামীণ ক্ষেত্রে মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণ হ্রাসকারী ভোগপণ্য বিন্যাস পরিবর্তনকে সুচারুভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে (এক্ষেত্রে পঃ বঙ্গ ও কেরালায় মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে)।** পরবর্তী অংশে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হল সেখানে মাথাপিছু বাৎসরিক খাদ্য উৎপাদন ও তা প্রাপ্যতার সরকারি পরিসংখ্যান ব্যতীত সঠিক হিসাব তুলে ধরা হল।

৩. খাদ্যাভাবজনিত পুষ্টি হ্রাস

১৯৭৩ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ন্যাশানাল স্যাম্পেল সার্ভে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মাথাপিছু দানাশস্য ভোগ হ্রাস পাওয়ার (সারণী-৯) ব্যাখ্যা দু'রকম ভাবে পাওয়া যায়। মোট ব্যয় এবং খাদ্যের জন্য মোট ব্যয়, উভয়েরই অংশ হিসাবে খাদ্যশস্যজনিত ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। এই ঘটনার সরকারি ব্যাখ্যা এবং সি. এইচ. এইচ. রাও-এর (২০০০) মতো শিক্ষাবিদদের বিশ্লেষণ দেখাতে চেয়েছে যে বাস্তব আয় বৃদ্ধির দরুন উদ্ভুত এঞ্জেল প্রভাবে খাদ্যশস্য থেকে দানাহীন খাদ্য ও পশুজাত খাদ্যে মানুষের ভোগ বিন্যাস পরিবর্তিত হয়েছে। অন্যান্য অনেকেই এই ব্যাখ্যার চরম বিরোধিতা করেছে। পুরোনো পদ্ধতি, কাজের বিনিময়ে খাদ্যের বদলে টাকায় মজুরি প্রদান এবং মুদ্রাস্ফীতির দরুন খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধির কারণে গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ (বিশেষত কৃষি নির্ভর) কম পরিমাণে দানাশস্য ক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে (সূর্যনারায়ণ, ১৯৯৬, ২০০০)—এই বিষয়টি অনেকেই তুলে ধরেছেন। অন্য অনেকেই

দেখিয়েছেন নব্বইয়ের দশকে জনসাধারণের যে সংখ্যা সর্বনিম্ন ক্যালরি গ্রহণ স্তরে থাকতে পারছে তা সত্তর দশকের তুলনায় অনেক কম (মেহেতা ও ভেঙ্কটরামন ২০০০, সারণী-৫-এ সারাংশ প্রদত্ত হলো) এবং এই একই সময়ে যে দুটি রাজ্যে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে তারা হলো— পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালা।

এই বিষয়ে অংশগত আলোচনা প্রয়োজন ঃ যেখানে সর্বোচ্চ আয়ের ভোক্তারা দ্রুত বাস্তব আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে (বিশেষত নব্বইয়ের দশকে সংস্কার ঘটানোর ফলে উচ্চ আয় বৈষম্য দেখা দিয়েছে) তাদের ভোগ বিন্যাস স্বেচ্ছায় পরিবর্তন করছে, সেখানে নিম্ন আয়ভুক্ত ছয়টি অংশ তাদের অর্থনৈতিক কল্যাণহ্রাসকারি এই পরিবর্তিত ভোগ বিন্যাস মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। ন্যাশানাল স্যাম্পেল সার্ভের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে মাথাপিছু ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে দানাশস্য ভোগের মাথাপিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা খাদ্যশস্যের চাহিদার ঋণাত্মক স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ করে। এই প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনার সাথে প্রচারিত যে বিষয়টি বেমানান তা হলো এই সময়কালে সবথেকে কম ব্যয় করে এমন শ্রেণী ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দানাশস্য ভোগের পরিমাণ কমেনি, ক্যালোরি গ্রহণও কমে গেছে— নিম্নতম শ্রেণীর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ নিশ্চল। এই বিষয়টির কোন অর্থনৈতিক অর্থ নেই। উন্নতদেশগুলিতে যেখানে আধাস্তরে গৃহীত ক্যালোরি ভারতের থেকে বেশি, সেখানে বাস্তব মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সামান্য বৃদ্ধি ঘটলে ক্যালরি গ্রহণের গড় পরিমাণ ভারতের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে বা একই থাকবে, কখনই হ্রাস পাবে না। আমরা মনে করি যে, ভারতের স্বচ্ছল জনসাধারণ কর্তৃক প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, তৈরি খাদ্য এবং বাড়ির বাইরে খাওয়া যায় এমন খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ যে বৃদ্ধি ঘটেছে তা পর্যাপ্তভাবে ন্যাশানাল স্যাম্পেল সার্ভের পর্যবেক্ষণে পাওয়া যায় না।

ইকোনমিক সার্ভের মতো সরকারি সূত্রগুলি মাথাপিছু উৎপাদন এবং প্রাপ্যতা সংক্রান্ত যে তথ্য ব্যবহার করেছে তা অর্থহীন। ১৯৯১-র আদমসুমারি থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সমানভাবে প্রতিবছর ১৬ মিলিয়ন করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ধরা হয়েছে। এই সমান পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি যোগ হওয়ায় আধার স্তরে বৃদ্ধি ঘটলেও জনসংখ্যার বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত হার হ্রাস পেয়ে ১.৭ শতাংশ হয়েছে যা খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হ্রাসপ্রাপ্ত হারের সমান, তাই এই সময়কালে মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়নি বলে যে তথ্য ইকনমিক সার্ভে দেখিয়েছে তা বিস্ময়কর নয়। বাস্তবিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার নব্বই দশকে হ্রাস পেলেও, ইকনমিক সার্ভের অন্তর্নিহিত হারের মতো স্বল্প নয়। জনসংখ্যা বিশারদরা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছিলেন ২০০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ের আগেই ভারতের জনসংখ্যা ১ বিলিয়ন হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসেব মেলাতে গিয়ে ইকনমিক সার্ভে হঠাৎ করে ১৯৯৯-২০০০ সালে ২৩ মিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়েছে (এই বছরই ছিল সর্বোচ্চ কৃষি উৎপাদনকাল যখন প্রথমবারের জন্য উৎপাদন পরিমাণ ২০০ মেট্রিক টনের বেশি হয়) এবং তারপরের বছর আবার ১৬ মিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

যেহেতু ২০০১ সালের আদমসুমারি আমাদের দেখিয়েছে, ১৯৯১ সালের তুলনায় গত দশকে বৃদ্ধির হার বাৎসরিক ১.৮৫ শতাংশ, তাই ইকনমিক সার্ভের এই ভুলে ভরা তথ্য ব্যবহার করার প্রয়োজন এখন আর নেই। সুমারির এই হার ব্যবহার করে আমরা ঐ সময়ের প্রতি বছরের মোট জনসংখ্যা পাই এবং এর থেকে আমরা মাথাপিছু নীট উৎপাদন পাই। সারণী-৬ এর নীট উৎপাদনের হিসাব কষার জন্য দানাশস্যের বাণিজ্যিক চাহিদার পরিমাণ আমরা পাই। এর থেকে দেখা যায় গত দশকের দ্বিতীয়ভাগে, প্রথমভাগের তুলনায় এই হার

বাৎসরিক ৪.৫ কেজি করে হ্রাস পেয়েছে, যদিও জুলাই ২০০০-এ ৪০ মেট্রিক টনের বেশি এবং ডিসেম্বর ২০০১-এ ৬০ মেট্রিক টনের বেশি দানাশস্য মজুত ছিল।

খাদ্যের এই বিশাল ভাণ্ডার মজুত করা হয়েছে এমন এক দশকে যখন ১৯৯১ সাল থেকে প্রচলিত সমষ্টিগত অর্থনৈতিক সংকোচননীতির দরুন সাধারণের আয় বিচ্যুতি ও বৈষম্য ঘটেছে এবং মাথা পিছু উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। আরও ব্যাপকভাবে দেখলে দেখা যায়, গত ৩৫ বছর ধরে সফলভাবে চালু থাকা সকলের জন্য গণবন্টন ব্যবস্থার পরিবর্তে ১৯৯৭ সাল থেকে চালু করা নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য গণবন্টন ব্যবস্থা। মোট জনসংখ্যার শতকরা হিসাবে দারিদ্রসীমার নীচের অবস্থানকারী মোট জনসংখ্যা সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী প্রত্যেক মানুষ ও পরিবারকে সনাক্তকরা সম্পূর্ণ অন্য বিষয় এবং এতে সবথেকে বাস্তবধর্মী অর্থনীতিবিদের আলোচনার কৃত্রিমতা ধরা পড়ে কারণ, এদের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমস্ত উৎস থেকে সংগৃহীত আয়ের তথ্য প্রয়োজন। বাস্তবে, যেহেতু সেক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ পরিবারের তথ্য দরকার, তাই সরকারি-তথ্যসূত্র আমাদের কিছুই বলতে পারে না। 'দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী' জনসংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরিকল্পনা আসলে বিপুল সংখ্যক প্রকৃত দরিদ্র মানুষকে বাদ দেয় এবং উপজাতি অঞ্চলে ক্ষুধা ও অনাহার জনিত মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধিসহ খাদ্য মজুতের দরুন উদ্ভুত অন্যান্য অস্বস্তিকর সামাজিক আঘাত তৈরি করে।

গণবন্টন ব্যবস্থার এই নিষ্ক্রমণ এবং খাদ্যের এই মজুত জনিত কারণে, মাথাপিছু খাদ্যশস্য প্রাপ্যতা এই দশকের শেষে বাৎসরিক ১৪.৫ কেজি কমে গেছে, দশক শুরুর তুলনায়। এই হ্রাসের বেশিরভাগটাই ১৯৯৮ সালে গণবন্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পর ঘটেছে। খাদ্যমজুতের বিপুল বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি এই পরস্পর বিরোধী দুটি বিষয় একসাথে নব্বইয়ের দশকে কমপক্ষে দু'বার দেখা দিয়েছে। ১৯৯০-১ থেকে ১৯৯৫-৬ পর্যন্ত রেশনে খাদ্যশস্যের বিক্রয় মূল্য দ্বিগুণ হওয়ায় এবং উন্নয়ন খাতে ব্যয় হ্রাস পাওয়ার কারণে গণবন্টন ব্যবস্থার হ্রাস পায় এবং খাদ্যমজুত সৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে দানাশস্যের উচ্চ আন্তর্জাতিক দামের কারণে নীট রপ্তানি বৃদ্ধি না পেলে, এই আভ্যন্তরীণ মজুত আরও বৃদ্ধি পেত। দুই বছরের একটি ক্ষুদ্র সময়ে প্রসারণশীল আর্থিক নীতির দরুন গণবন্টন ব্যবস্থা ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল, তারপর, ১৯৯৮ সালের পর থেকে লক্ষ্যভিত্তিক গণবন্টন ব্যবস্থা চালু ও সরকারি ব্যয় হ্রাসের মধ্যে দিয়ে বন্টনব্যবস্থা ব্যবহার কমে যায় এবং নব্বই দশকের মধ্যভাগ থেকে দানাশস্যের আন্তর্জাতিক দাম অর্ধেক হয়ে যাওয়ায় রপ্তানি কমে যায়, ফলে মজুত পুনরায় বৃদ্ধি পায়।

লক্ষ্য নির্ভর গণবন্টন ব্যবস্থা দরিদ্রমানুষের কাছে খাদ্যশস্যের যোগান কমানোর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং গণবন্টন থেকে বিলিকৃত যোগান, ১৯৯৮ সাল থেকে দু'বছরের মধ্যে প্রায় ১২ মিলিয়ন টন হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু লক্ষাধিক কৃষককে ধ্বংস না করে শস্য সংগ্রহের পরিমাণ কমানো সম্ভব না বলে ২০০১ সালের শেষে নজিরবিহীনভাবে ৬০ মিলিয়ন টনের অধিক মজুত সৃষ্টি হয় যা 'বাফার' মজুতের থেকে ৩৫ মিলিয়ন টন বেশি। যখন খাদ্যশস্য বৃদ্ধির হার অর্ধেক হয়ে গেছে, এমন দশকে অতিরিক্ত মজুত অবস্থা থেকে সংকোচনশীল আর্থিক নীতি জনিত কারণে আয় ও চাহিদা বিক্ষেপের সূচক বোঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, ১৯৭২-৩ থেকে ১৯৯৩-৪ এবং একইভাবে ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৩-৪ সাল পর্যন্ত, তিনটি রাজ্য বাদে ভারতের প্রত্যেক রাজ্যের গ্রামীণ ক্ষেত্রে মাথাপিছু মোট ক্যালোরি গ্রহণ হয় নিশ্চল ছিল নতুবা হ্রাস পেয়েছে— পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এবং উড়িষ্যায় এই মান বৃদ্ধি পেয়েছে (স্বামীনাথন ২০০০)। এই বিষয়টির মতো একইভাবে দেখা যায়, যে ঐ তিনটি রাজ্য বাদে অন্যান্য সমস্ত রাজ্যেই গ্রামীণ ক্ষেত্রে দানাশস্যের মাথাপিছু

প্রত্যক্ষ ক্রয় হ্রাস পেয়েছে (সারণী ৯)। মাথাপিছু পুষ্টির এই হ্রাসের সাথে সাথে দেখা যায় গড় খাদ্য গ্রহণের কাঠামোগত পরিবর্তন— দানাশস্যের থেকে কম ক্যালোরি গ্রহণ এবং পশুজাত খাদ্য থেকে বেশি ক্যালরি গ্রহণ, কিন্তু দ্বিতীয়টির বৃদ্ধি কোনভাবেই প্রথমটির হ্রাসকে মেটাতে পারেনি। সুতরাং পশুজাত খাদ্য থেকে বেশি ক্যালরি গ্রহণের মধ্য দিয়ে পুষ্টির উন্নতির যে যুক্তি দেখানো হয় তা একেবারেই ধোপে টেকে না। বাস্তবিকে খাদ্যের যত বেশি কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে, সেই সমস্ত মানুষের অবস্থা ততবেশি খারাপ হয়েছে, যাদের ক্যালোরি গ্রহণ স্তর নিম্ন থেকে নিম্নতর হয়েছে। খাদ্য গ্রহণের এই পরিবর্তন স্বেচ্ছায় কেউ গ্রহণ করেনি বরং খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতার হ্রাস ঘটায় অর্থনৈতিক ভাবে সকলে এই অবস্থায় পড়তে বাধ্য হয়েছে— এর জন্য দায়ী উপরোক্ত ঋণাত্মক সম্পর্ক এবং চাহিদার বিক্ষেপ।

উপসংহারসূচক মন্তব্য

নয়া-উদারনীতির ফলশ্রুতি সম্প্রসারণহীন আর্থিকনীতির কালে, যখন গ্রামীণ বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে, উষ্ণ মন্ডলের উন্নয়নশীল দেশগুলি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে জমির পরিমাণ প্রায় স্থির— এই বিষয়টি এই প্রবন্ধে যুক্তিদ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্ব বাজারে এই সমস্ত দেশের উৎপাদনের অপ্রতিসম ও কেন্দ্রীভূত চাহিদাকে পূর্বানুমান বলে ধরে নিলে, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ব্যতীত, প্রাথমিক ক্ষেত্রজাত দ্রব্যের রপ্তানির বৃদ্ধি ঘটে, ঐ সমস্ত দেশের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের হ্রাস ঘটিয়ে। ইতিহাসে যেরকম দেখা গেছে, বর্তমান কালেও একইভাবে প্রাথমিক ক্ষেত্রজাত দ্রব্যের রপ্তানি ও আভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য গ্রহণের মধ্যে ঋণাত্মক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়, যার কারণ আয় বিক্ষেপকারী নীতি প্রবর্তনের দ্বারা আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ এবং বিশ্ব চাহিদার কাছে দেশীয় কৃষিক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে দেওয়া। এর ফলে সাধারণ মানুষের ভোগ্যপণ্যের বিনিময়ে রপ্তানিযোগ্য শস্যের উৎপাদন করার প্রয়োজনীয় উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে; এর সাথে সাধারণের আয়ের-বিক্ষেপনীতি প্রচলনের ফলে খাদ্যশস্যের মাথাপিছু ভোগ হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বের ভোগ ব্যবস্থার এই দ্বৈত অবস্থা অভ্যন্তরেও দেখা যায়— দেশের স্বচ্ছল মানুষ উন্নত দেশের মতো অধিক প্রাণীজাত খাদ্য নির্ভর ভোগ বিন্যাসে পরিবর্তিত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ ইতিপূর্বের ঘাটতি ক্যালোরি গ্রহণ স্তর থেকে আরও খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে।

দীর্ঘতর সময়ের জন্য ক্রয় ক্ষমতার এই খারাপ অবস্থার উন্নতি ঘটাতে গেলে, আর্থিক প্রসারণের দৃঢ় নীতির প্রয়োজন, যা মুদ্রাস্ফীতির চাপ বিহীন অবস্থা পরিলক্ষিত হলে খাদ্যের বর্তমান মজুত ভাণ্ডার দ্বারা করা সম্ভব। অনেক অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, কাজের বিনিময়ে খাদ্য নীতি প্রবর্তনের দ্বারা বৃহৎ বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব যার দ্বারা উৎপাদনশীল মূলধন (যার মধ্যে সেচ ব্যবস্থা, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, বনসৃজন করা অন্যতম) তৈরি সম্ভব। মূলধন ও কর্মসংস্থানে সৃষ্টিকারী এই সমস্ত ব্যবস্থায় প্রদত্ত আর্থিক মজুরি কোন রকম সমস্যার সৃষ্টি করবে না কারণ প্রাথমিকভাবে এর ফলে মজুত তৈরির খরচ কমবে এবং পরবর্তীকালে ব্যয়ের গুণক প্রভাবের দ্বারা আরও বেশি আয় সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যাবে। ১৯৮৭ সালের খরার পর যদি এই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তবে শিল্পক্ষেত্রের অতিরিক্ত ক্ষমতাসহ মজুরি দ্রব্যের অত্যাধিক মজুত অবস্থায় আরও বড় ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কোন কারণ নেই।

সারণী - ৪
সাহারা অঞ্চলভুক্ত আফ্রিকার ৬টি সর্বাধিক জনবসতিপূর্ণ দেশের পুষ্টি স্তরের পরিবর্তন

দেশের নাম	দানাশস্য আমদানির পরিমাণ (হাজার টনে)		খাদ্যশস্য সাহায্যেরপরিমাণ (দানাশস্য) (হাজার টন)		আমদানিরপরিবর্তন (খাদ্যশস্য সাহায্য ব্যতিত)	মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণেরশতকরা পরিব
	১	২	৩	৪	৫	৬
	১৯৮০	১৯৯০	১৯৭৯-৮০	১৯৮৯-৯০	১৯৮০-৯০	১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৯-৯০
তানজানিয়া	৩৯৯	৭৩	৮৯	২২	-২৫৯	-২.১৭
ইথিওপিয়া	৩৯৭	৬৮৭	১১১	৫৩৮	-১৩৭	-৯.৯২
উগাণ্ডা	৫২	৭	১৭	৩৫	-৬৩	-৬.০০
নাইজেরিয়া	১৮২৮	৫০২	—	—	-১৩২৬	১৫.৪৫
কেনিয়া	৩৮৭	১৮৮	৮৬	৬২	-১৭৫	-৯.৮৬
জাইরে	৫৩৮	৩৩৬	৭৭	১০৭	-২৩২	১.৫৪

সূত্র ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টের বিভিন্ন সংখ্যা থেকে প্রথম ৪টি খাতের পরিসংখ্যান গৃহীত; পঞ্চম খাতটি, আগের খাত থেকে নির্ণীত। শেষ খাতটি "এফ.এ.ও'র ফুড ব্যালেন্সশীট, ১৯৯২-৯৪এর গড়, রোম, ১৯৯৬ থেকে গৃহীত। প্রভাত পট্টনায়েক ১৯৯৯-এ হিসাবীকৃত ও প্রকাশিত— ১৭৪ পৃঃ, সরণী-১।

দ্রষ্টব্য ঃ খাত ৫ = (২-৪) - (১-৩)। আমদানির হিসাব ক্যালেন্ডারের অনুসারে এবং খাদ্য সাহায্যের হিসাব, চাষের সময় (জুলাই - জুন) অনুযায়ী, ফলত এই হিসাবটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যেহেতু সাহায্যের পরিসংখ্যান বিদেশী দাতাদের গৃহীত, 'জুলাই - জুন' সময়কালকে, 'জানুয়ারী - ডিসেম্বর' সময়কালের সাথে তুলনা করার কারণ সাহায্য আসার সময় পার্থক্যকে ধরার চেষ্টা।
প্রভাত পট্টনায়েক, ১৯৯৯ থেকে সংগৃহীত।

সারণী - ৫
মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণের হিসাবে পুষ্টির নির্ধারিত স্তরের প্রায় সমান, নীচে এবং উপরে অবস্থানকারা জনসংখ্যার পারলাক্ষত াবন্যাস, ভারত ১৯৯৩-৯৪ (জুলাহ — জুন)

গ্রামাঞ্চল			শহরাঞ্চল		
মাসিক মাথা পিছু ব্যয়ের শ্রেণী (টাকায়)	মাথাপিছু ক্যালোরি	শতকরা জনসংখ্যা	মাসিক মাথাপিছু ব্যয়ের শ্রেণী (টাকায়)	মাথাপিছু ক্যালোরি	শতকরা জনসংখ
৩০০-র নীচে	১৯২৭-২১৫৪	৬৯.৭	৩৫৫-র নীচে	১৩২৭ থেকে ১৯৮৭	৫৯.৩
৩০০-৩৫৫-এর প্রায় সমান	২৪১০	১০.৭	৩৫৫-৪১০ -এর প্রায় সমান	২০৭০	১০.৩
৩৫৫-এর উর্ধ্বে	২৫৯২ থেকে ৩২৬২	১৯.৬	৪১০-এর উর্ধ্বে	২১৮৯ থেকে ৩০১১	৩০.৪
সমস্ত শ্রেণী	২১৫৩	১০০.০	সমস্ত শ্রেণী	২০৭১	১০০.৪

সূত্র ঃ ভোগ ব্যয় সংক্রান্ত ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের পরিসংখ্যান। মেহেতা ও ভেঙ্কটরামন, ২০০০ থেকে সারাংশকৃত। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ মেডিক্যাল রিসার্চ এর সুপারিশ।

সারণী - ৬

খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন, মোট ও মাথাপিছু, ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০০০-০১

সময়কাল	নীট উৎপাদন (মিলিয়ন টন)			গড়	মাথাপিছু নীট উৎপাদন (কে.জি.)		
	দানাশস্য ব্যতিত (শুষ্ক শস্য)	কলাই শস্য	খাদ্য শস্য	জনসংখ্যা (মিলিয়ান)	দানা শস্য ব্যতিত (শুষ্ক খাদ্যশস্য)	কলাই শস্য	খাদ্য শস্য
১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯১-৯২	১৩৬.০	১৩.৪	১৪৯.৪	৮৫০.৫৮	১৫৯.৯	১৫.৭	১৭৫.৬
১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৪-৯৫	১৪৬.১	১৩.৪	১৫৯.৫	৮৯৯.৬২	১৬২.৪	১৪.৯	১৭৭.৩
১৯৯৫-৯৬ থেকে ১৯৭-৯৮	১৪৯.৯	১৩.১	১৬৩.০	৯৫০.৮৭	১৫৭.৬	১৩.৯	১৭১.৫
১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০০-০১	১৫৮.৪	১৩.৫	১৭১.৯	১০০৪.৫৮	১৫৭.৭	১৩.৪	১৭১.১

দ্রষ্টব্য ঃ ভাল্লা, হাজেল ও কের (১৯৯৯, আই.এফ.পি.আর.আই) কর্তৃক প্রদর্শিত বাণিজ্যিক (শুষ্ক) শস্যের ব্যবহার করে প্রথম খাতা পরিসংখ্যান সৃষ্টি। আদমসুমারি মধ্যবর্তী জনসংখ্যা, ১.৮৫ শতাংশ বাৎসরিক জনবৃদ্ধির হারের দ্বারা হিসাবকৃত।

সারণী - ৭

দানাশস্য ও খাদ্যশস্যের বাৎসরিক প্রাপ্তিসাধ্যতা, মোট ও মাথাপিছু, ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০০০-০১

সময়কাল	মোট প্রাপ্তিসাধ্যতা (মিলিয়ান টন)			গড় জনসংখ্যা	মাথাপিছু প্রাপ্তি সাধ্যতা (কে.জি.)		
	দানা শস্য	কলাই শস্য	খাদ্য শস্য	(মিলিয়ন)	দানা শস্য	কলাই শস্য	খাদ্য শস্য
১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯১-৯২	১৩৫.৫	১২.১	১৪৭.৬	৮৫০.৫৮	১৫৯.৩	১৪.২	১৭৩.৫
১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৪-৯৫	১৪০.৮	১২.২	১৫৩.০	৮৯৯.৬২	১৫৬.৫	১৩.৬	১৭০.১
১৯৯৫-৯৬ থেকে ১৯৯৭-৯৮	১৪৮.৯	১২.০	১৬০.৯	৯৫০.৮৭	১৫৬.৬	১২.৭	১৬৯.৩

দ্রষ্টব্য ঃ প্রাপ্তিসাধ্যতা = নীট উৎপাদন + নীট আমদানি — মজুতের নীট বৃদ্ধি।
ইকোনমিক সার্ভে ২০০০-০১ -এ প্রদত্ত দানাশস্যের নীট আমদানি ও মজুত পরিবর্তন এবং কলাইশস্যের প্রাপ্তিসাধ্যতার পরিসংখ্যান এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

সারণী - ৮

খাদ্যশস্যের সংগ্রহ, গণবন্টনের মাধ্যমে ব্যবহার ও মজুত, ভারত ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০০-০১ (মেট্রিক টনে)

	সংগ্রহ			গণবন্টনের ব্যবহার			মজুত		
আর্থিকবছর	চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট @
১৯৯৫-৯৬	৯.৯	১২.৩	২২.২	১৪.০	১২.৮	২৬.৮	১৩.১	৭.৭	২০.৮
১৯৯৬-৯৭	১১.৮	৮.২	২০.০	১২.৪	১৩.৩	২৫.৭	১৩.২	৩.২	১৬.৪
১৯৯৭-৯৭	১৪.৫	৯.৩	২৩.৮	১১.৪	৭.৭	১৯.১	১৩.০	৫.১	১৮.১
১৯৯৮-৯৯	১১.৬	১২.৬	২৪.২	১১.৮	৮.৯	২০.৭	১১.৭	৯.৯	২১.৭
১৯৯৯-০০	১৪.১	১৭.৩	৩১.৪	৫.০	১০.৯	১৫.৯	১০.৭	২১.৭	৩৩.১

সূত্র ঃ ১৯৯৮-৯৯ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার বাৎসরিক প্রতিবেদন ১৯৯৯-২০০০, সংযুক্তি পত্রের সারণী ১১.৬। পরবর্তী সময়কালের পরিসংখ্যান ইকোনমিক সার্ভে ২০০০-০১, পৃষ্ঠা ৯২, সারণী ৫.৮ থেকে সংগৃহীত।

@ চিহ্নিতগুলি প্রয়োজনীয় শস্য সমেত হিসাব।

সংগ্রহ ও গণবন্টনের মাধ্যমে ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান জুন ৩০ পর্যন্ত ও মজুতের হিসাব ১লা জুলাই-এর। অর্থাৎ শেষ খাত অনুযায়ী মজুতের হিসাব জুলাই ১৯৯৫, জুলাই ১৯৯৬ ইত্যাদি সময়ে যা ছিল। জুলাই ২০০১ (যা দেখানো হয়নি)-এ মজুত ছিল ৫৩ মেট্রিক টনের অধিক।

সারণী - ৯

ভারতের রাজ্যগুলিতে দানাশস্যের মাথাপিছু প্রত্যক্ষভোগ (কেজি/মাস)
১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৯৩-৯৪

রাজ্যের নাম	গ্রামাঞ্চল			শহরাঞ্চল		
	১৯৭২-৭৩	১৯৯৩-৯৪	শতকরা পরিবর্তন	১৯৭২-৭৩	১৯৯৩-৯৪	শতকরা পরিবর্তন
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৫.২৫	১৩.২৭	-১৩.০	১২.৬৮	১১.৩০	-১০.৯
আসাম	১৪.৮১	১৩.১৭	-১১.১	১৫.৫৮	১৪.৩১	-৮.২
গুজরাট	১৩.৩২	১০.৬৫	-১০.০	১০.৭৭	৮.৯৬	-১৬.৮
হরিয়ানা	১৭.৫৭	১২.৯২	-২৬.৫	১১.৮৬	১০.৪৬	-১১.৮
কর্ণাটক	১৫.৬৩	১৩.১৫	-১৫.৯	১১.৩২	১০.৮৭	- ৪.০
কেরালা	৭.৯৭	১০.১১	২৬.৯	৮.১৭	৯.৪৬	১৫.৮
মধ্যপ্রদেশ	১৭.২৮	১৪.২০	-১৭.৮	১২.৮৮	১১.৩২	-১২.১
মহারাষ্ট্র	১২.৬০	১১.৩৯	-৯.৬	৮.৯৫	৯.৩৭	৪.৭
উড়িষ্যা	১৫.২২	১৫.৯৩	৪.৭	১৩.৭৭	১৩.৩৬	-৩.০
পাঞ্জাব	১৫.৩৮	১০.৭৯	-২৯.৯	১০.৭১	৯.০১	-১৫.৯
রাজস্থান	১৮.১৭	১৪.৮৫	-১৮.৩	১৩.২১	১১.৫২	-১২.৮
তামিলনাড়ু	১৪.৫৩	১১.৭২	-১৯.৩	১১.১২	১০.০৫	-৯.৬
উত্তরপ্রদেশ	১৬.৮৩	১৩.৯১	১৭.৪	১২.২৪	১১.০৮	-৯.৫
পশ্চিমবঙ্গ	১৩.৬৪	১৪.৯৬	৯.৭	১০.৫৩	১১.৬৪	১০.৫
সারা ভারত	**১৫.২৬**	**১৩.৪০**	**-১২.২**	**১১.২৪**	**১০.৬৩**	**-৫.৩**

সূত্র ঃ ভোগব্যয় সংক্রান্ত ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের প্রাথমিক পরিসংখ্যান।
সি. এইচ. এইচ হনুমন্ত রাও, ২০০০-এ প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে পুনর্বিন্যাসকৃত।

সহায়কপঞ্জী

১) এইচ. বার্ণস্টেইন, এম. ক্রো, এম. ম্যাকিনটোস এবং সি. মার্টিন (সম্পাদিত) ১৯৯০ — "দ্য ফুড কোশ্চেন— প্রফিট ভার্সেস পিপ্‌ল?"

২) জি. এস. ভাল্লা, পি. হাজেল এবং জে কের, ১৯৯৯, — "প্রসপেক্ট ফর ইণ্ডিয়ান সিরিয়ালস্ সাপ্লাই এন্ড ডিম্যান্ড টু ২০২০"।

৩) জি. ব্লাইন, ১৯৯৬— "এগ্রিকালচারাল ট্রেন্ড ইন ইন্ডিয়া ১৮৯১-১৯৪৭।"

৪) আর. দাভিস্, ১৯৭৯ — "দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভেল্যুশন এণ্ড ব্রিটিশ ওভারসিজ্ ট্রেড।"

৫) এস. ড্রেশ্চার এবং এস. বি. ইংগারম্যান, ১৯৯৮—"এনসাইক্লোপিডিয়া অফ্ ওয়ার্ল্ড স্লেভারি।"

৬) ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অরগ্যানাইজেশন, ১৯৯৬ — "ফুড ব্যালান্স শীট ১৯৯২-৯৪ অ্যাভারেজ (রোম)।"

৭) আর গ্রাবাওস্কি, ১৯৮৫— "অ্যা হিস্টোরিকাল রিএসেস্‌মেন্ট অফ্ আর্লি জাপানিজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন' ইন ডেভেলপমেন্ট এন্ড চেঞ্জ, ১৬"

৮) ওয়াই. হায়ামি এবং ভি ডব্লু. রুট্টান ১৯৭০ — "কোরিয়ান রাইস্, ফরমোশান রাইস এন্ড জাপানিজ এগ্রিকালচারাল স্ট্যাগনেশন' কোয়ার্টারলি জার্নাল অফ্ ইকোনমিক, নভেম্বর।

৯) জে. মেহেতা এবং এস. ভেঙ্কটরামন ২০০০ — "পোভার্টি স্ট্যাটিস্টিকস্ ঃ বার্মিসাইডস্ ফিস্ট' ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি, খণ্ড - ৩৫, সংখ্যা - ২৭, জুলাই ১-৭।

১০) পি. পট্টানায়ক, ১৯৯৯— "অন্ দি পিটফলস্ অফ্ বুর্জোয়া ইন্টার ন্যাশানালিজম" — আর. এম. চিলকোট সম্পাদিত," দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ্ ইম্পারালিজম — ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রাইজালস্" গ্রন্থে প্রকাশিত।

১১) ইউ. পট্টনায়েক, ১৯৯৯— "এক্সপোর্ট অরিয়েন্টেড্ এগ্রিকালচার এন্ড ফুড সিকিউরিটি ইন্ ডেভেলপিং কানট্রিস্ এন্ড ইন্ ইন্ডিয়া" — "দ্য লং ট্রানজিশন্ ঃ এসেজ অন্ পলিটিক্যাল ইকোনমি," গ্রন্থে প্রকাশিত— পূর্বে "ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি"-র আগস্ট ১৯৯৬ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

১২) সি. এইচ. এইচ. রাও ২০০০ — "ডিক্লাইনিং ডিম্যান্ড ফর ফুডগ্রেইনস্ ইন রুরাল ইন্ডিয়া ঃ কজেস্ এন্ড ইমপ্লিকেশনস্" ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি, জানুয়ারী।

১৩) ইউ. পটনায়েক, ১৯৯১— ফুড এ্যাভেইলোবিলিটি ঃ অ্যা লন্‌গ্যার ভিউ" — "জার্নাল অফ্ পিজেন্ট স্টাডিস্" গ্রন্থে প্রকাশিত।

১৪) এ. সেন ১৯৯৬— "ইকোনমিক রিফর্মস্ এমপ্লয়মেন্ট, এন্ডপোভার্টির ঃ ট্রেন্ডস্ এন্ড অপশনস্", ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি-র খণ্ড ৩১, সংখ্যা ৩৫-৩৭, বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

১৫) এম. এইচ. সূর্যনারায়ণ, ১৯৯৬ — "পভার্টি এসটিমেট্স্ এন্ড ইন্ডিকেটরস্" ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি, খণ্ড ৩১, সংখ্যা — ৩৫-৩৭, বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ভাষান্তর ঃ জয়দীপ ভট্টাচার্য

বিশ্বায়নের যুগে ভারতের শিল্পনীতি

সি. পি. চন্দ্রশেখর

উন্নয়নের তত্ত্ব ও প্রয়োগের আলোচনায় সাম্প্রতিককালে দুটি প্রবণতা প্রাধান্য পাচ্ছে। প্রথমটি হল, ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের শিল্পনীতির সমালোচনা। যে নীতির প্রধান মর্মবস্তু ছিল শিল্পায়নে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে শক্তিশালী দেশীয় শিল্প ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির সংরক্ষণের কৌশল অবলম্বন করতে হবে। দ্বিতীয়টি হল কেন্দ্রীভূত ও বিকেন্দ্রীভূত, সিদ্ধান্তের বিভাজন রেখা স্থির করা অথবা বাস্তবিক অর্থে ক্রিয়াশীল বাজারের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা নির্ধারণ করা। বাস্তব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয়টিই অধিকতর প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এই উভয় প্রবণতাকেই যুক্তির বিচারে 'বিশ্বায়নে'র প্রক্রিয়ার বোধগম্য ফলশ্রুতি হিসেবে উপস্থিত করা হয়।

পরিপ্রেক্ষিতের এই পরিবর্তনের পেছনে আছে একটি পূর্ববিবেচনা যে অতীতের ভাবনাগুলির ক্ষেত্র এখন আর বৈধ নয়। মন্দা পরবর্তী বছরগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত দেশগুলিতে উন্নয়নের নীতির ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ বৈষম্য। একথা মনে করা হত যে পিছিয়ে পড়া দেশগুলি শিল্পোন্নত দেশসমূহকে ধরে ফেলার জন্য আন্তর্জাতিক প্রযুক্তির সুযোগ পেলেও বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে অতিরিক্ত সংযোগ শিল্পায়নে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে অসুবিধায় ফেলবে।

এই অসুবিধার কারণ নিহিত আছে বিলম্বিত শিল্পায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যেই — যেখানে শিল্পোৎপাদনে নতুন করে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে নিমজ্জিত ব্যয় (sunk cost) করতে হয়। এই ব্যয় শুধুমাত্র একচেটিয়া সংস্থাগুলির থেকে উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বহন করতে হয় তা নয়। এর সঙ্গে বিপুল ব্যয়ভার থাকে প্রযুক্তিটির মর্মবস্তু উদ্ধারে, প্রযুক্তি হস্তান্তরে এবং তার অন্তর্নিহিত সারবস্তু উপলব্ধি করে সফল বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য। প্রযুক্তির মধ্যে এতটাই অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু থাকার কারণে শুধু কোন প্রযুক্তির ব্লুপ্রিন্ট বা নকশা পাওয়াই যথেষ্ট নয়।

এই অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর কারণেই 'প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে শেখা'র (learning by doing) প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব আধুনিক প্রযুক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অর্থ হল একই প্রজন্মের প্রযুক্তি ব্যবহার করলেও পুরনো উৎপাদকের উৎপাদন খরচের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসতে নতুন উৎপাদকের সময় লেগে যায়। মোটের উপর বাজারে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে শুধুমাত্র বিপণন ও বিক্রির পরবর্তী পরিষেবার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য বিনিয়োগই যথেষ্ট নয়,

ব্যবসায়িক সুনামও প্রয়োজন যা সময়ের উপর নির্ভরশীল। শুরুর সময় যে আয়তনে উৎপাদন করলে নতুন উৎপাদক দামের প্রতিযোগিতায় সক্ষম হবে এক্ষেত্রে সেই আয়তনে উৎপাদন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সমস্ত কারণে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নতুন উৎপাদকের পক্ষে এঁটে ওঠা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়।

কিন্তু দেশীয় উৎপাদকদের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র এই কারণেই জরুরী নয়। এছাড়াও দেশের মানুষের আয় বৃদ্ধির জন্য জিনিসের বিপুল চাহিদা তৈরী হয়। এই চাহিদা যদি দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে মেটানো না যায় তাহলে আমদানির পেছনে বিশাল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার খরচ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এখন যে সমস্ত দেশ মূলত কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির উপর নির্ভরশীল তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হল এই ধরণের পণ্যের আয় ও দামের স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) কম। এ কারণেই এইসব দেশ আন্তর্জাতিক আঘাতের কাছে ভঙ্গুর এবং তাদের ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরশীলতা কোন গ্রহণযোগ্য পথ হতে পারে না। বিশেষত আন্তর্জাতিক অর্থপ্রবাহের সীমিত সুযোগের পরিবেশে এইসব দেশে আমদানি নির্ভরশীলতার পথ স্বল্পকালীন সময়েও লেনদেন ভারসাম্যের সমস্যা তৈরি করবে। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রা ধরে রাখতে এবং নতুন দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনীয় বাজার সুরক্ষিত করতে আমদানিতে কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি সাহায্য অপরিহার্য্য বিবেচিত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতের তিনটি পূর্বানুমান ছিল যা বিশ্বায়নের প্রভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। এগুলি হল ঃ

(১) শিল্প প্রযুক্তি ও শিল্পায়নের প্রকৃতিটাই এরকম যে প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদনের অনুকরণের জন্য বিনিয়োগ ও হস্তান্তরের খরচ অত্যন্ত বেশি।

(২) আন্তর্জাতিক অর্থ প্রবাহের সীমিত সুযোগ এবং রপ্তানির সীমিত সম্ভাবনার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির চলতি খাতে ঘাটতির পরিমাণও নির্দিষ্টভাবেই সীমিত।

(৩) ব্যয় ও অন্যান্য সুবিধার জন্য পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে আধিপত্যকারী সংস্থাগুলি নতুন অঞ্চলে উৎপাদন বিস্তৃত করতে সচেষ্ট নয় তাই উন্নয়নশীল দেশে শিল্পায়ন মূলত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে না।

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিত পরিবর্তিত হয়েছে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা সবাই উপরোক্ত পূর্বানুমানকে চ্যালেঞ্জ করে থাকেন। প্রথমত, বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে বিপ্লব ঘটে গেছে তার জন্য শুধু যে আন্তর্জাতিক উৎপাদন সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় পরিবহণ ও যোগাযোগের সুযোগ সুলভ হয়েছে তাই নয়, তা উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভক্তির (segmentation) সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একারণে গোটা উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ নানা অঞ্চলে সংঘটিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। (ফ্রোবেল, হেনরিখ্স এবং ক্রেই, ১৯৮০)। এছাড়াও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্র এমনকি গণনার মত মৌলিক (generic) প্রযুক্তি ক্ষেত্র গৎ বাঁধা আবর্তের পরিবর্তে অনেক বেশি উদ্যোগ নির্ভর হয়ে ওঠায় বর্তমান প্রযুক্তি প্রকরণ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অতিরিক্ত 'সুযোগের জানলা' (Window of opportunity) খুলে দিয়েছে (ব্রানার, ১৯৯৫)। যে সমস্ত শিল্পক্ষেত্রে উদ্যোগ নির্ভর প্রযুক্তির প্রয়োজন সেক্ষেত্রে প্রযুক্তির পরিবর্তন নতুন উৎপাদকের প্রবেশে বাধা হ্রাস করে, কারণ নতুন উৎপাদক বাজার বহির্ভূত উৎসের থেকে প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ একথা বলা হয়, যে কম্পিউটার যন্ত্রাংশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থিরীকৃত হওয়ায় উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্য সংযোজনে কম্পিউটার আর্কিটেকচার ও সিস্টেম ডিজাইন-এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে উৎপাদনে প্রবেশের জন্য পুঁজির চেয়ে কৃৎকৌশল (skill) অর্জন করা অনেক বেশি প্রয়োজন কারণ অন্য উৎপাদকের থেকে পুঁজি

নিবিড় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করে যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বাজারে নিজস্ব লাভের ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব। একথা বলা হয় যে প্রযুক্তির বর্তমান অগ্রগতি আন্তর্জাতিক বাজারে উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি যেহেতু নতুন নতুন অঞ্চলে তাদের উৎপাদন বিস্তৃত করছে তাই আন্তর্জাতিকভাবে রসদ সংগ্রহ এবং অন্তঃসংস্থা (intra-firm) বাণিজ্য লক্ষ্যণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করলে উপরোক্ত যুক্তির কিছু সমর্থন পাওয়া যায়। ১৯৯০ সালের দামস্তরের বিবেচনায় বিশ্ব রপ্তানির পরিমাণ ১৯৫০ সালে বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৭.০ শতাংশ ছিল। ১৯৭৩ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১১.২ শতাংশ এবং ১৯৯২ সালে তা ১৩.৫ শতাংশে পৌঁছায় (ম্যাডিসন ১৯৯৫)। বিশেষত ১৯৯০ দশকের শুরুতে বিশ্ববাণিজ্যের একটি বড় অংশ অধিকার করেছে বহুজাতিক মূল কোম্পানি ও বিভিন্ন দেশে অবস্থিত তার অনুমোদিত সংস্থা (affiliates)-র মধ্যেকার বাণিজ্য। দেশের মোট রপ্তানির পরিমাণের মধ্যে ওই দেশে অবস্থিত বিদেশী মূল সংস্থার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তঃসংস্থা (intra-firm) রপ্তানির অংশ সুইডেনের ক্ষেত্রে ৩৮ শতাংশ এবং জাপানের ক্ষেত্রে ২৪ শতাংশ। অনুরূপভাবে দেশের মোট আমদানির মধ্যে অন্তঃসংস্থা আমদানির পরিমাণ জাপানের ক্ষেত্রে ১৪ শতাংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ (আঙ্কট্যাড ১৯৯৬)। অংশত এই প্রবণতার পরিণতিতে সারা বিশ্বে শিল্প পণ্যের মোট রপ্তানির মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির অংশ যা ১৯৭০ সালে ৫ শতাংশ, ১৯৯৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২২ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। শুধু তাই নয় উন্নয়নশীল দেশসমূহের মোট রপ্তানির মধ্যে শিল্পজাত পণ্যের অংশ ৬০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী মতবাদে রপ্তানির সম্ভাবনা সম্পর্কে যে হতাশার মনোভাব ছিল তা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তাই যুক্তিযুক্ত নয়।

চলতি খাতে ঘাটতির কঠোর সীমার দ্বিতীয় পূর্বানুমানটিও বিশ্বায়নের যুগে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। ১৯৭০ দশকের প্রারম্ভিক পর্যায়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির চলতি খাতে ঘাটতির কঠোর সীমার প্রধান কারণ ছিল আন্তর্জাতিক অর্থ প্রবাহের সীমিত সুযোগ যা মূলত 'উন্নয়নের জন্য সাহায্য' (development aid)-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সীমা অতিক্রম করলেই উন্নয়নশীল দেশগুলি লেনদেন ব্যালেন্সের সংকট মেটাতে অর্থ সাহায্যের জন্য আই.এম.এফ.এর দ্বারস্থ হতে বাধ্য হত। ঋণের শর্তস্বরূপ আয় বৃদ্ধি রোধ করে আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুদ্রাসঙ্কোচনের (deflationary) প্রস্তাবগুচ্ছ কার্যকরী করা হত। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাণিজ্যে উদারীকরণের ফলস্বরূপ জাতীয় আয়ের সাপেক্ষে আমদানির অনুপাত বৃদ্ধি পেত।

প্রথম তৈল সঙ্কটের পরবর্তী সময়ে এই পরিপ্রেক্ষিতের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। যেহেতু তৈল বাণিজ্যের ফলে উদ্বৃত্ত অর্থ উন্নত দেশগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক গুলিতে জমা হয়, তাই উদ্বৃত্ত পুনর্ব্যবহারের (recycling) ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থাপনাগুলি বিশেষ ক্ষমতাশালী শক্তি হিসেবে উদ্ভূত হয়। এই শক্তি যথার্থই বিরাট আকার ধারণ করে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ঋণ নির্ভর ব্যয় বৃদ্ধি তেল উৎপাদকদের বাণিজ্য উদ্বৃত্তকে স্ফীত করে যা বিভিন্ন অন্তর্দেশীয় (transnational) ব্যাঙ্কগুলিতে জমা হয় এবং আরও বর্ধিত ঋণের উৎসে পরিণত হয়। আর্থিক ঋণের এই ক্ষমতাবৃদ্ধি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন উন্নত দেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি শ্লথ হয়ে যাওয়ার কারণে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের সমৃদ্ধি (boom) ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে—যে প্রক্রিয়া তৈল সংকটের সঙ্কোচনকারী প্রভাবে আরও ত্বরান্বিত হয়। মোট বিশ্বের উৎপাদনের অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলির নীট ঋণের পরিমাণ ১৯৬৪ সালের ০.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮০ সালে ৮.০ শতাংশে এবং ১৯৯১ সালে ১৬.৩ শতাংশে পরিণত হয়। মোট বিশ্ব বাণিজ্যের সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক

ব্যাঙ্কগুলির নীট ঋণের পরিমাণ ১৯৬৪ সালের ৭.৫ শতাংশ থেকে ১৯৮০-তে ৪২.৬ শতাংশ এবং ১৯৯১-তে ১০৪.৬ শতাংশে উপনীত হয় (নায়ার, ১৯৯৫)।

আরও দুটি বিষয় ১৯৮০-র দশকে আন্তর্জাতিক অর্থ প্রবাহের সুযোগ বৃদ্ধির প্রশ্নে ক্রিয়াশীল হয় (ভাদুড়ি, ১৯৯৬)। প্রথমত, বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ব্রেটন-উড্‌সের বছরগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আধিপত্যের কারণে ডলারের বিশ্বাসযোগ্যতা যখন স্বর্ণতুল্য হয়ে ওঠে সেই সময় মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক দায় (liabilities) বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ডলারের স্থিতিশীলতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন জাতীয় বাজেটের বাধ্যবাধকতার কথা না ভেবে বহির্বিশ্বে যে ব্যয় বহন করে তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক স্বার্থের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় এই ধরনের অর্থের বিনিয়োগের একটি আন্তর্জাতিক বিবেচনা প্রাধান্য পেতে শুরু করে। এই সমস্ত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত আর্থিক নীতি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদনের বিকাশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যা মধ্য-সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল ও দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্য ঘাটতির দ্বারা প্রতিভাত হয়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার জন্য, একমাত্র গ্রহণযোগ্য ও মজুতের উপযোগী মুদ্রা হিসাবে ডলারের অবস্থান ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে ফাট্‌কার উদ্দেশ্যে (speculative demand) অন্যান্য মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের চাহিদা স্বভাবতই সুদের হার ও বিনিময়ের হারের পার্থক্যের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয় ফলে বিভিন্ন দেশ ও মুদ্রার মধ্যে পুঁজির প্রবাহ অনেক বেশি অস্থিতিশীল (volatile) হয়ে পড়ে। এই ধরনের প্রবণতার পরিণতি সহজেই অনুমান করা যায়। যেখানে দৈনিক বিশ্ব বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ১১০ কোটি ডলার সেখানে আন্তর্জাতিক অর্থের বাজারে (financial market) দৈনিক বিদেশী মুদ্রার আনুমানিক লেনদেনের পরিমাণ ৪৩০০ কোটি ডলার। আশির দশকের প্রারম্ভে দেশী ও বিদেশী বসবাসকারীদের মধ্যে বন্ড ও চুক্তিপত্রের (securities) লেনদেনের মোট আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও জাপানের ক্ষেত্রে তাদের আভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের (জি ডি পি) ১০ শতাংশ ছিল। ১৯৯৩ সাল নাগাদ এই অংশ বৃদ্ধি পেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে হয় ১৩৫ শতাংশ, জার্মানির ক্ষেত্রে ১৭০ শতাংশ এবং জাপানের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ। এই ধরনের লেনদেনে স্বল্প সময়ে পরিণতির (Short maturities) বন্ডই প্রধান ছিল।

আন্তর্জাতিক অর্থ প্রবাহের এই বৃদ্ধি উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে নতুন সম্ভাবনা উপস্থিত করে। তৈল সঙ্কট পরবর্তী সময়ের আর্থিক ঘাটতি মোকাবিলায় অর্থের যোগান সংগ্রহে বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলির সাথে আলাদা করে লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সুবিধা হল তারা আই.এম.এফ-এর মতো কেন্দ্রীভূত ও আন্তর্দেশীয় অর্থকরি সংস্থার মত শর্ত আরোপ করতে পারে না। অর্থের যোগানে প্লাবিত ব্যাঙ্কগুলি ঋণদানে উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং চলতি খাতে বিশাল ঘাটতি পূরণে এই অর্থের ব্যবহার যে অস্থিতিশীলতার জন্ম দিতে পারে তা বিবেচনার মধ্যে ছিল না। চলতি খাতে ঘাটতির কোনও উচ্চ পরিমাণই সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার প্রকৃতি যা বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক ঋণের আয়তনকে আপেক্ষিকভাবে সীমিত করে রাখে।

একদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির ঋণ নেওয়ার ইচ্ছা এবং অন্যদিকে ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দেওয়ার প্রবণতা — এই দুই স্বার্থের যথাযথ মিলনের কারণেই বেশ কিছু অনুন্নত দেশের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চলতি খাতে ঘাটতি কোন সমস্যা হিসেবে দাঁড়ায়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতের ফলশ্রুতি আজ ইতিহাস। সত্তর এবং আশির দশক জুড়ে একটার পর একটা উন্নয়নশীল দেশের সরকার একদিকে উদারনৈতিক বৃদ্ধির পথ গ্রহণ করে এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ঋণের মাধ্যমে বিপুল

বাজেট ঘাটতি পূরণের রাস্তা গ্রহণ করে যা আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধির উপর উদারনীতির কুপ্রভাবকে অংশত প্রশমিত করে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় বহু উন্নয়নশীল দেশের বৃদ্ধির হার প্রশংসনীয় ছিল যাকে সাধারণত উদারনীতির ফল হিসেবে দেখান হয় কিন্তু আসলে সরকারগুলির দায়িত্বজ্ঞানহীন ঋণনির্ভরতা, যা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ঋণদানের দায়িত্বজ্ঞানহীন পদ্ধতিকে উৎসাহিত করেছিল তা বিবেচনার অগোচরে চলে যায়।

কিন্তু এই উত্থান অচিরেই স্তিমিত হয়ে আসে যখন বোঝা যায় যে কোনও ঋণগ্রহিতাই এ অবস্থায় নেই যে আরও ঋণ না নিয়ে তারা দেয় অর্থ পরিশোধ করতে পারবে। এই উপলব্ধির কারণে এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার উপর অতি নির্ভরশীলতার ফলস্বরূপ অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে অর্থের প্রবাহ মন্দীভূত হতে শুরু করে যাকে 'ঋণের সংকট' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্যাঙ্কগুলি অবশ্য পুরোপুরি এই সঙ্কটের হাত থেকে নিস্তার পায়নি কারণ তাতে ব্যাঙ্কগুলি কার্য্যত বন্ধ করে দিতে হয়। যেহেতু অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে ঋণ মকুব করা ছাড়া বিকল্প কোন পরিশোধের প্রস্তাব সম্ভব ছিল না। কিন্তু সমস্যা আরও গভীর হয়ে ওঠে, কারণ উন্নত দেশগুলিতে শিল্প পুঁজির সাপেক্ষে লগ্নি পুঁজির আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক প্রবাহের স্ফীতি ঘটলেও ক্রমবর্ধমান মন্দার পরিবেশে তা নির্ভরযোগ্যভাবে ব্যবহারের সংকট দেখা দিল।

এই ঋণের সঙ্কটের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হল গ্রহণযোগ্য ভাবে উন্নয়নশীল দেশে পুঁজি বিনিয়োগের এমন পথ খুঁজে বার করা যাতে তা নিরাপদ হয়। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই আই এম এফ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক এগিয়ে এলো যারা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ঋণদানের সঙ্গে যথাযথ সংস্কারের কর্মসূচীকে যুক্ত করল। এই সংস্কারের পদক্ষেপগুলি হল — সরকার ব্যবহৃত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ সঙ্কোচন, দ্রুতগতিতে বাণিজ্যিক সংস্কার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও তাদের প্রতিনিধিদের উপর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও ধীরে ধীরে তাকে রূপান্তরযোগ্য করে তোলা, রাষ্ট্রীয় সংস্থার বেসরকারিকরণ এবং পরবর্তী পর্যায় আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কার প্রকৃত অর্থেই সংকটে নিমজ্জিত উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এই সমস্ত সংস্কার কর্মসূচী আসলে লগ্নী পুঁজির আধিপত্য ও তাদের প্রয়োজনীয়তাকে খেয়ালে রেখে রচিত হয়। লগ্নি পুঁজির সাহায্যে বিশ্ব বাজারের লক্ষ্যে উৎপাদনের জন্য আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে বাণিজ্যে উদারীকরণ ও বিনিয়ন্ত্রন হল অপরিহার্য্য পূর্বশর্ত। রাষ্ট্রীয় অথবা দেশীয় ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ রয়েছে, যেমন উদাহরণস্বরূপ হাইড্রোকার্বনজাত সম্পদ সেগুলি বিদেশী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হল। এইসব প্রকৃত সম্পদ (real assets) বিদেশী সংস্থাগুলির আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জমানত (collateral guarantee) হিসেবে কাজে লাগান হল। এছাড়াও আর্থিক ক্ষেত্রে উদারীকরণ ও মূলধন খাতে ধীরে ধীরে রূপান্তরযোগ্যতার প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে আর্থিক সংস্থাগুলির কাজে ব্যবসার শর্ত গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়।

এই ধরনের সংস্কারের ফলে উন্নত দেশের আর্থিক স্বার্থসমূহের লক্ষ্য অনুন্নত দেশগুলির 'উদ্ভূত বাজার' (emerging market)-এর প্রতি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সমস্ত দেশে আর্থিক উদারীকরণের পথ গ্রহণ করা হচ্ছে, তারা বিপুল পরিমাণ লগ্নি পুঁজি আকর্ষণ করছে, যদিও এই পুঁজি সংশ্লিষ্ট সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বা নিয়ন্ত্রণের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কোন স্বার্থ সুরক্ষিত করে না। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বন্ড, ইক্যুইটি, জমার চুক্তিপত্র ও বাণিজ্যিক লেনদেনের কাগজ-এর মাধ্যমে লগ্নি পুঁজির মোট বিনিয়োগের বার্ষিক গড় ১৯৮৩-৯০ ছিল ১৩০ কোটি ডলার, ১৯৯১-৯২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৯১০ কোটি ডলার এবং ১৯৯৩ সালে এই বার্ষিক গড় ছিল ৮০৯০ কোটি ডলার (বিশ্বব্যাঙ্ক ১৯৯৪ এবং ১৯৯৭)।

যদিও বিভিন্ন অনিশ্চয়তার প্রভাবে এই গড় ১৯৯৪-৯৬ সালে কিছুটা কমে ৬১৩০ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। প্রাথমিক অনুমান হল ১৯৯৮ সালে এটি আবার বৃদ্ধি পেয়ে ৯১৮০ কোটি ডলারে পরিণত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির বাজারে কার্যত এই আর্থিক বিস্ফোরণের প্রধান কারণ নিহিত আছে সেই সব উপাদানের মধ্যে যা উন্নত দেশগুলি থেকে লগ্নি পুঁজির একটি বহির্মুখী প্রবণতাকে উৎসাহিত করছে। প্রথমত উদ্ভূত আর্থিক বাজারগুলিতে অনিশ্চয়তা থাকলেও ঋণের অর্থ অতিরিক্ত সময় পড়ে থাকলে ওই সময়ে বিপুল মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি হয় অথচ উন্নত দেশগুলিতে বৃদ্ধির হার কম হওয়ায় তা আথিৰ্ক স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। তাই উন্নত দেশের তুলনায় অনুন্নত দেশগুলিতে ঝুঁকি বহনের জন্য লাভের পরিমাণ অনেক বেশি হয়। দ্বিতীয়ত বেসরকারিকরণের ফলে মূল্যবান সম্পদের বিক্রি শুরু হওয়ায় মুদ্রার অবমূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে তুলনামূলক কম দামে সেগুলি কিনে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয়ত, এ সমস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিপুল পরিমাণে ঋণের অবদমিত চাহিদা আছে এবং এই সব দেশে আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষা অতীতে হয়নি। সর্বোপরি যে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আর্থিক কড়াকড়ি কাঠামোগত সংস্কারের কর্মসূচীতে অঙ্গীভূত হয়েছে, সেখানে প্রকৃত সুদের হার ও সেজন্যে আর্থিক ক্ষেত্রে লাভের সম্ভাবনাও তুলনামূলক ভাবে বেশি।

ঋণ এবং লগ্নি পুঁজির এই যোগানের কারণে গত দু দশক ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে তুলনামূলক উন্নত দেশগুলিতে ব্যক্তিগত বিদেশী পুঁজি সংগ্রহে কোন সমস্যা হয়নি। লগ্নি পুঁজির আধিপত্য ও তার বিশ্বায়িত প্রভাবের ফলে চলতি খাতে ঘাটতি অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে তাই কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

এই সমস্ত প্রবণতা ও সে সম্পর্কিত পরিবর্তনের কারণে চিরাচরিত উন্নয়নের অপর পূর্বানুমান যে আন্তর্জাতিক বাজারে আধিপত্য বিস্তারকারী সংস্থাগুলি তাদের উৎপাদনের ক্ষেত্র পরিবর্তন করতে অনিচ্ছুক — এই ধারণাকেও আঘাত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনেকের মতে এক নতুন ধরনের বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের প্রবাহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে, যাকে উন্নয়নশীল দেশগুলির শিল্পায়নে প্রধান চালিকাশক্তি বলা যায়। এই মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থিত করতে এশিয়ার নব্য শিল্পায়িত দেশ যেমন চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড-এর অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়, যারা বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণের বিচারে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে প্রথম দশে স্থান অধিকার করেছে। এই অভিজ্ঞতা একটি বিশেষ প্রবণতার ইঙ্গিত বহন করে যে বাণিজ্য ও বিদেশী বিনিয়োগের প্রশ্নে অধিক মাত্রায় খোলা দরজা নীতির সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ, বিদেশী বিনিয়োগ নির্ভর রপ্তানি ভিত্তিক বৃদ্ধির ভিত্তি রচনা করে।

এই প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ও শিল্পজাত রপ্তানি এবং আর্থিক বৃদ্ধির নতুন গভীর সম্পর্ক বিভিন্ন তথ্য ও প্রবণতার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রথমত, উন্নয়নশীল দেশগুলির অভিমুখে মোট বিদেশী বিনিয়োগের একটি উর্দ্ধমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ পরপর বছরগুলিতে বৃদ্ধি পেয়েছে : ১৯৮৬ সালে এর পরিমাণ ছিল ১০৪০ কোটি ডলার, ১৯৯১-তে ৩৩৫০ কোটি ডলার, ১৯৯২-তে ৪৩৬০ কোটি ডলার, ১৯৯৩-তে ৬৭২০ কোটি ডলার এবং ১৯৯৬-তে ১০৯৬০ কোটি ডলার (বিশ্বব্যাঙ্ক ১৯৯৭)।

উন্নয়নশীল দেশগুলির অভিমুখে মোট বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের অংশ ১৯৯০ সালের ১২ শতাংশ থেকে ১৯৯৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ শতাংশে পরিণত হয়েছে, অথচ, এই সময়কালে পৃথিবীতে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মোট পরিমাণ কমেছে।

একথা বলা হয় যে, বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের এই পরিমাণগত প্রবণতার সঙ্গে, আশির দশক ও নব্বইয়ের দশকের প্রারম্ভে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাণিজ্যে উদারীকরণের যে সাধারণ প্রবাহ তৈরী হয়, সেই প্রেক্ষাপটে এই ধরনের বিনিয়োগের একটি গুণগর্ত পরিবর্তনও ঘটেছে। বাণিজ্যে শুল্ক-বহির্ভূত প্রাচীরগুলি তুলে দেওয়া এবং অধিকাংশ আমদানিতে শুল্ক কমিয়ে দেওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির সংরক্ষিত আঞ্চলিক বাজারে প্রবেশের সুবিধা পেতে ওই সমস্ত দেশে বিনিয়োগ ও উৎপাদন স্থানান্তরণে উৎসাহিত হয়। এই প্রবণতার অপর দিকটি হল যে সমস্ত বিদেশী বিনিয়োগকারী মূলত আভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য বিক্রি করত, শুল্ক তুলনামূলকভাবে কমে যাওয়ার ফলে সহজলভ্য আমদানিকৃত পণ্যের সঙ্গেও তাদের প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হতে হল এবং সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী হয়ে ওঠা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। মোটের উপর বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় আমদানি প্রতিস্থাপনের ফলে শিল্পায়নের যুগে বিশ্ব বাজারে আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী এই দুই অংশের মধ্যে একটা পরিষ্কার বিভাজন ছিল। উৎপাদনের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক ভাবেই দুই পৃথক বাজারের অংশের জন্য উৎপাদনের যে বিভাজন ছিল—তা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল। বাজার ও উৎপাদন ক্ষেত্রের এই বিযুক্তির ফলে কোন সংস্থা কোন অঞ্চলে বিনিয়োগ করতে তখনই ইচ্ছুক হবে যদি সেই অঞ্চল সংস্থার বিশ্বব্যাপী কারবারের জন্য উপযোগী হয়। অতএব কোন মূল সংস্থা তখনই নতুন অঞ্চলে উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করবে যদি তা নতুন অঞ্চলের আঞ্চলিক বাজার ধরতে পারে, সংস্থাটির প্রতিষ্ঠিত পুরনো বাজারের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারে অথবা নতুন কোন তৃতীয় একটি দেশের বাজার দখল করতে পারে কিম্বা এই তিনটি লক্ষ্যের কোন সম্মিলিত উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

প্রকৃত অর্থেই বহুজাতিক সংস্থার এই উত্থান অর্থাৎ যারা বিদেশে অনুসারী সংস্থা গড়ে তুলেছে ওই দেশের আঞ্চলিক বাজার দখলের সীমিত লক্ষ নিয়ে এবং মূলত অন্যান্য দেশের বাজারে রপ্তানি করার অথবা মূল সংস্থার পুরনো বাজারের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে এবং 'মূল' ও অনুসারী সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে এক বিস্তৃত বাণিজ্য সাম্রাজ্য গড়ে তুলছে এই বৈশিষ্ট্য ১৯৭০-এর দশকেই নজরে এসেছে (অ্যাডাম, ১৯৭৫)। শিল্প উৎপাদন অঞ্চলের এই পুনর্বন্টনের বিষয়টি গভীর ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ফ্রোবেল, হেনরিখ্স এবং ক্রেই (১৯৮০)। কিন্তু সেই সময় এই প্রক্রিয়াকে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলস্বরূপ দেখা হয়েছিল। এই বিপ্লব পরিবহণ খরচ অনেকাংশে কমাতে সাহায্য করেছে, আন্তর্জাতিক স্তরে উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে ও সহজলভ্য করে তুলেছে। এই কারণেই উৎপাদন প্রক্রিয়ার গোটা ব্যবস্থাটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে পৃথিবীর নানা স্থানে সংঘটিত করা সম্ভব হয়েছে যা একই সাথে আন্তর্জাতিক ভাবে রসদ সংগ্রহ ও অন্তঃসংস্থা (intra-firm) বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। এখন একথা বলা হয় যে বাণিজ্যে উদারীকরণের পরিবেশে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে যদি তাদের অর্জিত বাজার ধরে রাখতে হয় এবং নতুন বাজারের প্রসার ঘটাতে হয় তবে উৎপাদন ক্ষেত্রের পুনর্বন্টন আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সেই কারণেই উন্নয়নশীল দেশের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির এক নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের এই নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার পেছনে যে উপলব্ধি কাজ করছে, তা হল এই ধরনের বিনিয়োগ শুধু স্থিতিশীলই (buoyant) নয় তা সম্পূর্ণ নতুন একটি রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের এই নতুন রূপের বৈশিষ্ট হল যে প্রতিটি শিল্পভিত্তিক বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত এখন উন্নত দেশগুলি থেকে উন্নয়নশীল বিশ্বে শিল্প স্থানান্তরনের বৃহত্তর প্রক্রিয়ার অধীন যা বিশ্বব্যাপী শিল্পোৎপাদন

প্রক্রিয়ার পুনর্গঠনকে সূচিত করেছে। এই পুনস্থাপনের (relocation) প্রক্রিয়া দুভাবে প্রতিভাত হতে পারে — (১) প্রান্তিক বিচারে, বিশ্ববাজারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি শিল্প বা শিল্পক্ষেত্র উন্নত দেশের উৎপাদকরা উন্নত দেশের পরিবর্তে উন্নয়নশীল দেশে স্থাপন করবে যার পরিণতিতে সেই সমস্ত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানির পরিবর্তে আমদানি বৃদ্ধি পাবে। (২) পুনস্থাপনের প্রক্রিয়া আদর্শ রূপ নিতে পারে অর্থাৎ উন্নত দেশে অবস্থিত উৎপাদন একেবারে বা ধীরে ধীরে বন্ধ করে ওই উৎপাদকরাই সমান বা অধিক উৎপাদন ক্ষমতার শিল্প উন্নয়নশীল দেশে স্থাপন করবে। বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ উদারীকরণের যুগে প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে — এর পেছনের যুক্তিটি হল এই ধরনের বিনিয়োগের উক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য যা বিশ্বের শিল্পোৎপাদনের প্রকৃতিকে পুনর্গঠিত করেছে।

শিল্পোন্নয়নে নিয়ন্ত্রণবাদ (interventionism) ভূমিকা পুনর্বিবেচনার কথা একারণেই শুধু বলা হয় না যে বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এটাই শিল্পায়নের সর্বোত্তম পথ বরং সমস্ত বিতর্কের সমাপ্তি ঘটানোর চেষ্টা করা হয় একথা বলে যে বিশ্বায়নের ফলে এছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই। এমনকি যারা এই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচক তাঁরাও স্বীকার করেন যে, "পুঁজির আন্তর্জাতিকরণের ফলে স্বয়ংচালিত জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের সুযোগ কমে এসেছে" (পট্টনায়েক, ১৯৯৩)। কোন নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়ার জন্য একটি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র প্রয়োজন হয় যাকে সাধারণভাবে "জাতীয় অর্থনীতি" বলা যায় সেখানে রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য কার্যকরী করার চেষ্টা করে। এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রর অস্তিত্ব আছে ধরে নেওয়া যায় কারণ বিশ্ব অর্থনীতিতে কোন ঘটনার আভ্যন্তরীণ অঞ্চলে প্রভাবকে অন্তত আংশিকভাবে বাণিজ্য ও বিনিময় হারের নীতির দ্বারা প্রশমিত করা যায়। কিন্তু বিশেষত লগ্নি পুঁজির বিশ্বায়নের ফলে যা ঘটেছে তা হল রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত বাণিজ্য ও বিনিময় হার নীতির দ্বারা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা ছিল তা প্রকৃত অর্থে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। "পুঁজির প্রবাহ একদিকে যেমন বিনিময় হার ও আর্থিক সম্পদের দামের উপর গভীর প্রভাব ফেলে অন্যদিকে এই প্রবাহ বিভিন্ন মুদ্রার আর্থিক সম্পদের থেকে আয়ের সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল। এর অর্থ হল এই প্রবাহের মধ্যে দিয়ে বিনিময় হার, বাণিজ্য ও লেনদেন ব্যালেন্সের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ নীতিকে প্রভাবিত করার শুধু নতুন পথ তৈরি হয় তা নয়। এ সব কিছুই বিদেশের আর্থিক নীতি বা দেশের অথবা বিদেশের যে সমস্ত ঘটনা আয়ের সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।" (আকিউজ, ১৯৯৩)। এই রকম একটি বিশ্বে রাষ্ট্রের কাছে উন্নয়নের কর্মকাণ্ড কার্যকরী করতে নিয়ন্ত্রণের অঞ্চল হিসেবে যে জাতীয় ক্ষেত্র ছিল তা অনেকটাই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখন সমস্ত ফিসকাল, আর্থিক ও বিদেশনীতি ঠিক করতে একথা মাথায় রাখতে হয় যে পুঁজির প্রবাহের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয়তাগুলি কি এবং সেক্ষেত্রে জাতীয় প্রয়োজনীয়তার বিবেচনা আন্তর্জাতিক পুঁজির ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ে।

এই নতুন পরিস্থিতিতে প্রধান উন্নয়নের চিন্তাভাবনায় উদারীকরণ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস এই বিষয়বস্তুকে আজকের দিনের একমাত্র সম্ভাব্য ও একই সাথে সর্বোত্তম নীতি হিসেবে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়। অতএব যুদ্ধোত্তর কালের উন্নয়নের গৃহীত চিন্তার ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে তা সবই সেই সব নতুন বৈশিষ্ট্যের কারণে যা আন্তর্জাতিক পুঁজি বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বিশ্বায়নের ফল অথবা এই প্রক্রিয়ার সহায়ক। এই পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর বাজারের (contextual marketism) ধারণাটিকে তখন বিভিন্ন ধরণের "বাজার ভিত্তিক উত্তরণের" (transcendental marketism) তত্ত্বের-দ্বারা সমর্থন করা হয় (পট্টনায়ক, ১৯৯৩) এবং সেক্ষেত্রে নয়া ধ্রুপদী দক্ষতায় যুক্তি ও নব্য-শ্যুমপিটারীয় ধারণার প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে বাজারের ভূমিকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিভিন্ন মতাদর্শগত চিন্তার মধ্যেও কিছু সাধারণ উপলব্ধি আছে। যে বিষয়ে পার্থক্য আছে তা হল উন্নয়নশীল দেশগুলির শিল্পায়নের সমস্যাগুলির উপর এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট কি প্রভাব ফেলবে, শিল্পোৎপাদনের স্বয়ংচালিত বিকাশের সম্ভাবনা কতদূর ও তাই উন্নয়নশীল দেশের শিল্পবিকাশে রাষ্ট্রের নীতি কী হবে — এই সমস্ত প্রসঙ্গকে ঘিরে।

বাজার নির্ভর (marketist) দৃষ্টিভঙ্গীর মূল সমস্যাটি হল তা বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াটিকে সেই সমস্ত ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করে যারা কোন দেশের শিল্পায়নে বহির্বিশ্বের আঘাতের (external vulnerability) সমস্যাটিকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে অস্বীকার করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির উৎস সহজেই অনুমেয়। শুরুতেই একথা বলা যায় যে, এটা খুব পরিস্কার যে, লগ্নি পুঁজির আধিপত্যের যুগে আমদানী-প্রতিস্থাপনের নীতিটি কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়ে কারণ এই নীতির প্রধান প্রেক্ষাপট ছিল বিশ্বমন্দা (Great Depression)-র সময় থেকে অনুন্নত দেশগুলি বহির্বিশ্বের যে আঘাতের সম্মুখীন হচ্ছিল তাকে মোকাবিলা করা। অর্থ প্রবাহের প্রাবল্যের যুগে এটা সহজেই বোঝা যায় এই আঘাত কোন সমস্যা হিসেবে উপস্থিত তো হচ্ছেই না বরং বৃদ্ধির নীতিসমূহের প্রকৃতি নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখা দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত অর্থের যোগান সুলভ হয়ে ওঠায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমস্ত বাধা দূর করার প্রশ্নে রাষ্ট্রের নানা কৌশল অবলম্বন করার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারগুলি বাজেটে বিপুল ঘাটতি রাখতে পারে কারণ ঋণের অর্থে আমদানির সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই নিশ্চয়তা তৈরি হয় যে কোন অতিরিক্ত চাহিদা (excess demand) মুদ্রাস্ফীতির জন্ম দেবে না। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত চলতি খাতে ঘাটতির কোন সীমা কার্যকরী হচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির বাধাও দেখা দেবে না। তৃতীয়ত বিদেশী পুঁজির উপর এই নির্ভরশীলতা যে মোট বিদেশী মুদ্রার বহির্গমনকে ত্বরান্বিত করে তাতে কোন সমস্যা হবে না কারণ বিনিয়োগের বিশ্বায়নের ফলে রপ্তানির মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রার প্রত্যাশিত আয় এই ঘাটতি পূরণ করবে।

এই অদূরদর্শী (myopic) চিন্তা যে সত্যকে নজর করতে ভুলে যায় তা হল বিশ্বায়নের ফলে বহির্বিশ্বের আঘাতের সম্ভাবনা অনুপস্থিত একথা ঠিক নয়, আসলে বর্তমানে এই আঘাতের ক্ষেত্র শুধুমাত্র চলতি খাত থেকে মূলধনী খাতে পরিবর্তিত হয়েছে। যখন উন্নত দেশের সম্পত্তিবানেরা উন্নয়নশীল দেশের বিপুল আর্থিক সম্পদ ক্রমবর্ধমানভাবে অধিকার করছে এবং সে সমস্ত সম্পদের বৈশিষ্ট্য হল তাদের পরিণতি কাল ক্রমহ্রাসমান (declining maturity), তখন শুধুমাত্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বিনিয়োগের বিশ্বাস (investing confidence) নষ্ট হওয়ায় পুঁজির বহির্গমনের চাপ আজ বাস্তব সমস্যা। অতএব এই প্রবণতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিশ্বায়ন যদি চলতি খাতে ঘাটতি মেটানোর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে না পারে তবে সঙ্কটের সম্ভাবনা সবসময় থেকে যাবে যা মেক্সিকোর ঘটনা ও সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অভিজ্ঞতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

সমস্যা হল বিশ্ববাণিজ্যের বিষম প্রকৃতির কারণে চলতি খাতে বহির্বিশ্বের আঘাতের যে সমস্যা তৈরি হয় তাকে সংশোধন করায় বিশ্বায়ন কোন সাহায্য করে না। বিশ্ব বাণিজ্যের সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলি বিবেচনা করা যাক। বিশ্বে মোট রপ্তানির মূল্য ১৯৮০-তে ২০১০ বিলিয়ন ডলার থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪-তে ৪০৬০ বিলিয়ন ডলারে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৫.৩ শতাংশ। এই হার ১৯৬০-৮০ এই সময়কালে বিশ্ব রপ্তানির মোট মূল্যের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১৪.৬ শতাংশের তুলনায় অনেক কম। যদিও বিশ্ব রপ্তানির মোট আয়তন বিচার করলে ১৯৬০-৮০ এই সময়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৫.৪ শতাংশ থেকে

খুব অল্প পরিমাণ কমে ১৯৮০-৯৪ এই সময়ে ৪.৬ শতাংশে পরিণত হয়েছে। পরবর্তী সময়ের শ্লথতা অনেকাংশেই দামের গতিপ্রকৃতির কারণে ঘটেছে।

বিশ্ববাণিজ্যে উন্নত দেশের আধিপত্য বহাল রয়েছে। বিশ্ববাণিজ্যে উন্নয়নশীল দেশের অংশ যা ১৯৫০ সালে ৩১ শতাংশ ছিল তা পরবর্তী সময়ে দ্রুত হারে কমে ১৯৭০ সালে ১৮ শতাংশে নেমে আসে। যদিও সত্তরের দশকে এই অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮০-তে ২৯ শতাংশে পরিণত হয় কিন্তু এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা আবার পরিবর্তিত হয়ে ১৯৮৮ সালে ২০ শতাংশে নেমে আসে। ১৯৯৪ সালে এই হারের কিছু উন্নতি অর্থাৎ ২৪ শতাংশ লক্ষ্য করা যায় যা আশির দশকের নিম্নগামীতাকে আংশিক ভাবে প্রশমিত করে কিন্তু এর অন্যতম কারণ ছিল পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি থেকে রপ্তানি ব্যাপকভাবে কমে যাওয়া। এছাড়াও উন্নত দেশগুলি শুধু নিজেদের মধ্যেই বিপুল পরিমাণে বাণিজ্য করে থাকে যা পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের ৭০ শতাংশ, অর্থাৎ বিশ্ববাণিজ্যেও অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। ১৯৯৪ সালের তথ্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে মোট ২০০টি দেশ সারা বিশ্ববাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে মাত্র ১৫টি দেশ বিশ্ব রপ্তানির ৭৩ শতাংশ ও বিশ্ব আমদানির ৬৮ শতাংশ অধিকার করে। রপ্তানিকারক প্রথম ১৫টি দেশের মধ্যে মাত্র চারটি (চীন, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান) উন্নয়নশীল দেশ।

সুতরাং বিশ্ববাণিজ্যের গতিপ্রকৃতিতে সামান্যই পরিবর্তন ঘটেছে (মোহান্তি, ১৯৯৬)। এছাড়াও সত্তরের দশকের পণ্যের দামে উল্লম্ফনের (boom) ঘটনা ব্যতিরেকে প্রাথমিক দ্রব্যসমূহের (primary products) বিশ্ব মূল্যস্তর বিশেষত আশির দশকে শিল্পজাত দ্রব্যের দামের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। সুতরাং যদিও বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশের পণ্য সম্ভারের গঠন প্রাথমিক দ্রব্যের পরিবর্তে শিল্পজাত দ্রব্যের পক্ষে পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু প্রাথমিক দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্যস্তর কমে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিনিময় সম্পর্ক (terms of trade) সামগ্রিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির বিরুদ্ধে গিয়েছে। এর ফলস্বরূপ ১৯৮৫-৯৪ এই সময়কালে উন্নয়নশীল দেশগুলির মোট রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির হার উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি ছিল কিন্তু মোট বিশ্ব বাণিজ্যের মূল্যের বিচারে তাদের অংশ হ্রাস পায় কারণ ওই সমস্ত দেশের রপ্তানিকৃত দ্রব্যের একক পিছু মূল্যমানের হ্রাস ঘটেছিল।

অর্থাৎ প্রেবিশের* বক্তব্য অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলির রপ্তানিবৃদ্ধি জনিত লাভ, বিনিময় সম্পর্কের ক্ষতির দ্বারা যে প্রশমিত হতে পারে — এই কথার সত্যতা দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর প্রথম পঁচিশ বছরের তুলনায় আশি ও নব্বইয়ের দশকে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিনিময় সম্পর্কের এই পরিবর্তনের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলির রপ্তানির মধ্যে দিয়ে অর্জিত ক্রয়ক্ষমতা আনুমানিক ৬.৫ শতাংশ বার্ষিক হার থেকে ক্রমহ্রাসমানভাবে ৩.৮ শতাংশ বার্ষিক হারে নেমে আসে অথচ ওই সময়কালে রপ্তানির মোট পরিমাণ বৃদ্ধির হার -০.১ শতাংশ বার্ষিক হার থেকে ৮.৮ শতাংশ বার্ষিক হারে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বাণিজ্যে

** রাউল প্রেবিশ (Raul Prebisch 1901-1985) এবং হান্স সিঙ্গার (Hans Wolfgang Singer 1910-) এই দুই অর্থনীতিবিদ ১৯৫০ সাল নাগাদ যৌথভাবে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে মূলত তার ভিত্তিতে একটি তত্ত্ব উপস্থিত করেন যা প্রেবিশ-সিঙ্গার সূত্র (Prebisch-Singer thesis) বা সংক্ষেপে PS বলে অর্থনীতির অভিধানে পরিচিত।*

যে সব দেশ তাদের আয়ের জন্য প্রধানত কৃষিজাত দ্রব্য ও খনিজ দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল এবং যাদের রপ্তানির আয়ের সিংহভাগ আসে এই ধরনের জিনিস বিক্রি করে, শিল্পদ্রব্যের তুলনায় তাদের রপ্তানির দাম ক্রমাগত পড়ে যেতে থাকে। যার পরিণতিতে সেই সব দেশের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় কমতে থাকে। এই সমস্যার সমাধান হল কৃষি ও খনিজদ্রব্য নির্ভর দেশগুলিতে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়ন গড়ে তোলা। এটিই প্রেবিশ-সিঙ্গার সূত্রের মূলকথা।

উদারীকরণের ফলে এই সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির আমদানির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে এবং এই আমদানির অর্থ যোগান দেয় ব্যক্তিগত বিদেশী পুঁজির প্রবাহ যা এই সমস্ত দেশগুলিকে ১৯৯৩ সালে ৬২ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য ঘাটতির মধ্যে কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করে।অথচ ১৯৮৫ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলির মোট বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৪৪ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এটাও লক্ষ্যণীয় যে বর্তমানের বর্ধিত পুঁজির জোগান ওই সব দেশের বিনিময় সম্পর্কজনিত শক্তির পরিমাণ ২৩০ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় অনেক কম ছিল।

অতএব বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকতর যোগাযোগের ফলে আমদানির খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আরও আমদানি করতে বাধ্য হল, কম দামে আরও বেশি পরিমাণে রপ্তানির পথ গ্রহণ করল এবং বিদেশী পুঁজির উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। বহির্বিশ্বের আঘাতের এই স্থায়ী ও বর্ধিত সম্ভাবনাগুলি কখনই বিশ্বায়নের ইতিবাচক ফলের প্রত্যাশার সঙ্গে মেলে না। শুধুমাত্র আংশিক স্তরেই (disaggregated level) এই ধরনের ইতিবাচক ফলাফলের যুক্তির পক্ষে কিছু সমর্থন পাওয়া যায়।

এই সময়কালে সত্যিই এশিয়ার কিছু অংশে ক্রমবর্ধমান রপ্তানি ও আমদানির সঙ্গে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু এইরকম ইতিবাচক অভিজ্ঞতা আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেখা যায় নি বললেই চলে, যারা ঋণের সংকট ও বিশ্বে পণ্যমূল্যের হ্রাসের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

লাভের প্রত্যাশার এই কেন্দ্রীভূত বৈশিষ্ট্যের আংশিক কারণ হল বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের বিস্তৃতির প্রকৃতি যা মূলত কিছু উন্নয়নশীল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৯৩ সালে উন্নয়নশীল দেশে মোট বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬৫.১ বিলিয়ন ডলার যার মধ্যে একটি দেশ চীনেই বিনিয়োগ হয়েছে ২৪.৮ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৪০ শতাংশ। বিনিয়োগের বিচারে প্রথম চারটি দেশ — চীন, মালয়েশিয়া, আর্জেন্টিনা এবং মেক্সিকো মোট বিনিয়োগের ৬৪ শতাংশ অধিকার করে অর্থাৎ ৪১.৪ বিলিয়ন ডলার। এই বিচারে প্রথম সাতটি দেশ অর্থাৎ চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো এবং হাঙ্গেরি মোট বিনিয়োগের ৭৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৮.৭ বিলিয়ন ডলার অধিকার করে। সর্বোপরি "১৯৮১ থেকে ১৯৯২ এর মধ্যবর্তী বছরগুলিতে প্রথম দশটি পুঁজি আকর্ষণকারী উন্নয়নশীল দেশ উন্নয়নশীল দুনিয়ায় আসা মোট পুঁজির প্রবাহের ৬৬ থেকে ৮১ শতাংশ অধিকার করে। এই দশটি দেশের তালিকাও ওই সময়কালে আপেক্ষিকভাবে স্থিতিশীল ছিল।" (আঙ্কট্যাড, ১৯৯৪)। বর্তমান বিশ্বায়নের পর্যায়ে বাণিজ্য ও শিল্পায়নের যে সমন্বয় (nexus) গড়ে উঠেছে তারই সাথে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের কেন্দ্রীভবন ও বাণিজ্য প্রবাহের কেন্দ্রীভবনের একটি সম্পর্কও বিদ্যমান। এগারোটি দেশ (আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, কোরিয়া, হংকং, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড) যারা ১৯৭০-৮০ এই সময়কালে উন্নয়নশীল দেশ থেকে মোট রপ্তানির ৩০ শতাংশ অধিকার করেছে তারাই বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৯০ সালে ৫৯ শতাংশ ও ১৯৯২ সালে ৬৬ শতাংশ আকর্ষণ করেছে।

বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের এই কেন্দ্রীভবন মোট প্রবাহের অভিমুখের বিচারে শিল্পায়নের সুযোগ সম্পর্কে সাধারণীকরণের ত্রুটিকে ধরিয়ে দেয়। বিশ্বে বিরাট সংখ্যায় উন্নয়নশীল দেশ এবং তাদের অভিমুখে তুলনামূলকভাবে অল্প পরিমাণ বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ একথা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে সবকটি দেশই আগত ভবিষ্যতে বিনিয়োগের পরিমাণ অথবা আভ্যন্তরীণ পুঁজি গঠন ও জাতীয় আয়ের সাপেক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে না। ১৯৯৪ সালে উন্নয়নশীল বিশ্বের অভিমুখে প্রবাহিত মোট বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে যদি সবকটি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে

সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যায় তবে প্রত্যেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার করে পেত যা চীনের মত দেশ যারা বছরে ৩৫ বিলিয়ন ডলার আকর্ষণ করে অথবা ভারতের ক্ষেত্রে যাদের লক্ষ্যমাত্রা বার্ষিক ১০ বিলিয়ন ডলার তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হত। বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের এই চরম বৈষম্যের কারণে, বিশ্বে এই ধরনের পুঁজির বিনিয়োগ যদি ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধিও পায় তাহলেও অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ এই প্রবাহের দ্বারা লাভবান হবে না।

বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবীর অর্থনীতির এই বৈশিষ্ট্যের কারণে একথা বলা যায় যে পুঁজির প্রবাহের নতুন প্রবণতা লক্ষণীয় হলেও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলতি খাতে বহির্বিশ্বের আঘাতের স্থায়ী সম্ভাবনা থাকছে। নতুন পর্যায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি হল এই আঘাত অস্থিতিশীল লগ্নিপুঁজির উপর নির্ভরশীলতার কারণে মূলধনী খাতে আঘাতের দ্বারা গভীরতর হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই আঘাতের বর্ধিত সম্ভাবনার কাছে আত্মসমর্পণ করে সর্বাপেক্ষা সুফলের প্রত্যাশা করাটাই একমাত্র পথ নয় বরং এই সম্ভাবনাকে বিবেচনার মধ্যে রেখে একটি জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা জরুরী। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা পালনের সুযোগ সীমিত হয়ে আসার মানে এই নয় যে সমস্ত সুযোগই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সীমিত সুযোগের ফলে একথা নিশ্চিত যে বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে যে ধরনের উন্নয়নের পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে মোটেও যথাযথ নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলি ফেল্ডম্যান-মহলানবিশের মডেলের পুরনো পথে ফিরে যেতে পারে না যেখানে আমদানি প্রতিস্থাপনের মধ্যে দিয়ে বিদেশী মুদ্রার সর্বোত্তম (optimum) ব্যবহারের কথা বলা হয়েছিল। এই ধরনের পথ একদিকে বৃদ্ধির হার ও ভোগের বিভিন্নতাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে এবং অন্যদিকে শিল্পজাত আমদানির উপর দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনে। এই ভাবে বহুমূল্য বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় করে সাধারণভাবে মূলধনী শিল্পক্ষেত্রে ও বিশেষত যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। যদিও এই পন্থার তিন প্রকারের সমস্যা আছে।

প্রথমত, এটি শুধু সেইসব উন্নয়নশীল দেশের জন্যই সম্ভবপর যেখানে আভ্যন্তরীণ বাজারের আয়তন এবং সম্পদের পরিমাণ একটি ন্যূনতম মাত্রার চেয়ে বেশি।

দ্বিতীয়ত, এই সমস্ত দেশগুলিতেও শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রা নির্ধারিত হয় আভ্যন্তরীণ বাজারের আয়তন ও গুণগত প্রয়োজনীয়তার উপর তাই শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সক্ষমতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরের অভিনবত্ব ও রপ্তানির জন্য উৎপাদনের সক্ষমতা তাল মিলিয়ে চলেনি। ফলে গোটা শিল্পব্যবস্থার সম্প্রসারণের সুযোগ দীর্ঘমেয়াদী বিচারে সীমিত হয়ে আসে।

তৃতীয়ত, বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বাস্তবতায় সমাজের উচ্চবিত্ত অংশ, যারা আন্তর্জাতিক জীবনমানের সঙ্গে পরিচিত তাদের পক্ষ থেকে উন্নত ভোগ্যপণ্য সংগ্রহের সুযোগের জন্য চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে বৃদ্ধির হার ও ভোগের বিভিন্নতা নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। উক্ত পথে প্রত্যাশিত সঞ্চয় হার বা আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে আমদানি নিবিড়তা (import intensity)র প্রত্যাশিত মাত্রা অর্জিত হয়নি। যে সমস্ত মাপকাঠি (parameters) ধরে উন্নয়নের যে ধারণার উপর ভিত্তি করে এই চলার পথ গড়ে ওঠে, আমদানি-প্রতিস্থাপন — তা শেষপর্যন্ত বিফল হয়। সুতরাং যে বিকল্পের আলোচনা করছি তাকে 'পুরোন আমদানি প্রতিস্থাপনের' বৈশিষ্ট্যগুলিকে অতিক্রম করতে হবে যদিও তার মূল লক্ষ্য বহির্বিশ্বের আঘাত থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করার প্রতি অবিচল থাকতে হবে। একথা মোটের উপর সত্যি তার কারণ বিশ্বে অস্থিতিশীল লগ্নি পুঁজির আধিপত্যের যুগে বহির্বিশ্বের আঘাতের প্রকৃতিরই পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

এই নিরিখে আমরা বিকল্পনীতি যা নিয়ন্ত্রণকে (intervention) অঙ্গীভূত করবে তার প্রথম বৈশিষ্ট্য স্থির করতে পারি। এই পন্থা অবশ্যই দেশীয় বাজারের জন্য উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য উৎপাদনের মধ্যেকার দ্বৈততার উত্তরণ ঘটাবে। এই দ্বৈততার চিরাচরিত রূপটি এই যুক্তির মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হয় যে যেহেতু আন্তর্জাতিক বৈষম্যের কারণে রপ্তানির প্রত্যাশা কম (export pessimism) তাই দেশীয় বাজারের উপর ভিত্তি করে শিল্পায়নই যথাযথ। পুঁজিবাদের উত্তরণ যা শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে পরিণতি লাভ করে তাকে ঘিরে একটি বিতর্কের বিষয় আছে। প্রশ্ন হল সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ উপাদান যা কাঠামোর পরিবর্তন করে এবং বহির্জগতের উপাদান অর্থাৎ বাণিজ্যিকীকরণ ও বাজারের প্রসার এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টির উত্তরণে আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি। এই দুই উপাদানের কোন্‌টি মূল নির্ধারক এ বিষয় পরস্পর বিরোধী নানা যুক্তি থাকলেও একটি কথা উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছ হয়ে যায়। সফল ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন বিশ্ববাজার থেকে বিচ্ছিন্ন (insulated) থেকে কখনই সম্ভবপর নয় বরং তা এই বিস্তৃত বাজারে সচেতনভাবে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়।

আমরা 'অংশগ্রহণ' কথাটি ব্যবহার করছি যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করেই। বিশ্ববাজার মোটেই নিরপেক্ষ ও স্বয়ংচালিত (autonomous) শক্তির জন্ম দেয় না যা তৃতীয় বিশ্বের সফল শিল্পায়নকে উৎসাহিত করবে, বরং তার মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বব্যবস্থার সমস্ত বৈষম্যমূলক চরিত্রগুলি। এই সমস্ত বাজারে অংশগ্রহণ করতে গেলে উন্নয়নশীল দেশের হাতে যে সব অস্ত্র অবশিষ্ট আছে যেমন রাষ্ট্রের ক্ষমতা, আভ্যন্তরীণ বাজারের ভিত্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশলে দক্ষ মানবসম্পদ যা প্রযুক্তির উপর কিছু আন্তর্দেশীয় (transnational) সংস্থার নিয়ন্ত্রণকে দমন করতে সক্ষম এবং বিলম্বে প্রবেশকারীর (late entrant) সুবিধা (যা নিম্ন মজুরিহার থেকে শিথিল আইনগত কাঠামো পর্যন্ত বিস্তৃত) কে কাজে লাগিয়ে তাদের জন্য যে সমস্ত বাজারের দুয়ার শক্ত করে বন্ধ করা আছে তাকে প্রবল বেগে খুলে দিতে হবে।

এখানেই দ্বিতীয় বিষয়টি আসে; **একটি সফল বৃদ্ধির পথ অবলম্বন করতে গেলে সক্রিয় (activist) রাষ্ট্র প্রয়োজন।** সক্রিয় রাষ্ট্রের উপস্থিতির সঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণতার (autarky) অথবা বিচ্ছিন্নতার (insularity)র কোন প্রয়োজন নেই। আমদানি প্রতিস্থাপনের সময়ে ভারতের মত দেশের একটি গ্রহণযোগ্য সমালোচনা হল তারা রপ্তানিকে অবহেলা করেছে। একথা যদিও ঠিক যে বৃহৎ উন্নয়নশীল দেশে বৃদ্ধির ভিত্তি কখনো রপ্তানি হতে পারে না কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীল পৃথিবীতে বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আমদানির খরচের যোগান রপ্তানির বিকাশ ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়। এই কারণেই যে সমস্ত দেশে পরবর্তীকালে শিল্পায়ন সফল হয়েছে যার মধ্যে নব্য-শিল্পায়িত দেশগুলিও (NIE) অন্তর্ভুক্ত তারা সকলেই রপ্তানির ব্যাপারে বণিকের নীতি (mercantilist) অবলম্বন করেছে অর্থাৎ যে কোন দামেই বিদেশের বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে। এই নীতির জন্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি পরিমাণগত ও গুণগত পুনর্গঠন প্রয়োজন যার জন্য প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ উভয়ই প্রয়োজন। বিনিয়োগ দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত বিনিয়োগের আয়তন যত বেশি হবে তত বেশি অংশ 'সম্প্রসারণের' (expansion) পরিবর্তে আধুনিকীকরণে কাজে লাগান যাবে। দ্বিতীয়ত পুঁজি ও উৎপাদনের অনুপাতের যে কোন বৃদ্ধির ফলে আর্থিক বৃদ্ধি ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং উৎপাদন ক্ষমতা (capacity)র প্রসার এমন গতিতে ঘটতে থাকে যাতে প্রান্তিক অবস্থায় (at the margin) নতুন প্রযুক্তি অঙ্গীভূত হয়। এই সমস্ত ও অন্যান্য কারণের জন্য শিল্পজাত রপ্তানি বৃদ্ধির হার কোন অর্থনীতিতে বিনিয়োগের অনুপাতের উপর নির্ভর করে।

প্রথম দিকের উন্নয়নের অর্থনৈতিক তত্ত্বে বিনিয়োগকে বৃদ্ধির একমাত্র চাবিকাঠি হিসেবে দেখা হত। ষাটের দশকের শেষভাগে নব্য ধ্রুপদী সমালোচনা দক্ষতার সঙ্গে সম্পদ ব্যবহারের প্রসঙ্গটিকে গুরুত্ব দিল এবং পরবর্তী সময় তা প্রধান বিবেচনা হয়ে দাঁড়াল। এই মতের প্রধান

বিষয়বস্তু হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা (economic regime) যার মধ্যে উন্নয়ন কার্যকরী হয়েছে — এই ব্যবস্থাপনা কি সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা অর্জনের পক্ষে উপযোগী কিনা। নব্য ধ্রুপদি যুক্তিতে এই দক্ষতার উপযোগী ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগের অনুপাতের উপর কি প্রভাব ফেলবে তা কখনই আলোচিত হল না — এটি হল মূলত সামগ্রিক (macro) বিষয়গুলি থেকে নির্দিষ্ট (micro) বিষয়গুলিতে নজর পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণবাদের (interventionist) পরিবর্তে বাজারের (marketist) গুরুত্ব বৃদ্ধির প্রতিফলন। সংক্ষেপে সামগ্রিক বিচারে বিনিয়োগের অনুপাতের বিবেচনা গুরুত্ব হারাল।

আরও সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন মতের একদল লেখকের (ক্রুগম্যান ১৯৯৪, আকিউজ ও গোর ১৯৯৪; সিং ১৯৯৫) লেখায় এই যুক্তি উপস্থিত করা হয়েছে যে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সফল শিল্পায়নের প্রধান কারণ হল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন উপকরণের (factor inputs) বৃদ্ধি যার মধ্যে উচ্চ হারে পুঁজি পুঞ্জীভূত (acccumulation) হওয়ার রূপে পুঁজি উপকরণও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এই সাফল্যের ব্যাখ্যা সেই অর্থে দক্ষতার সঙ্গে সম্পদ ব্যবহারের দ্বারা করা যায় না বরং একটি নির্দিষ্ট দক্ষতায় উৎপাদনের উপকরণের বর্ধিত ব্যবহারই সাফল্যের কারণ। একটি স্তরে এই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা যায় এই তথ্যের ভিত্তিতে। যে ক্রয়ক্ষমতার শক্তির মাপকাঠিতে (purchasing power parity) 'মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা' (Total Factor Productivity বা TFP) বিচার করলে দেখা যাবে যে ১৯৭০-৮৫ এই সময়কালে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং এ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার মিশর, পাকিস্তান এমনকি বাংলাদেশের তুলনায় কম ছিল (ইয়ং, ১৯৯৪)। যদিও উপরোক্ত সূচক (TFP)টি যা বিশ্বব্যাঙ্কেরও পছন্দ তার পূর্বানুমান হল সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ (employment of resources) এবং আদর্শ প্রতিযোগিতা (perfect competition) যা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এই বিষয়ের আর একটি অধিকতর কার্যকরি বিশ্লেষণ পদ্ধতি হল আন্তর্দেশীয় বিচারে (cross country) বিনিয়োগ অনুপাত, উৎপাদন বৃদ্ধির হার, এবং রপ্তানি বৃদ্ধির হারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (co-relation) খুঁজে দেখা। কুড়ি বছরের (১৯৬৮-৮৮) পঁচিশটি উন্নয়নশীল দেশের তথ্য ব্যবহার করে একটি বিশ্লেষণে (পট্টনায়েক ও চন্দ্রশেখর, ১৯৯৬) দেখা যায় যে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের হারের অথবা বিনিয়োগের অনুপাত ও আয়ের মধ্যে মধ্যে নিবিড় পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। একইভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানি বৃদ্ধির মধ্যেও অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। যদি বিনিয়োগ উৎপাদন বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হয়ে থাকে তবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানি বৃদ্ধির মধ্যে গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক থাকলে তা বিনিয়োগের অনুপাত ও রপ্তানি বৃদ্ধির মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হওয়ার কথা এবং তা হয়ও। কেন উচ্চ বিনিয়োগ অনুপাত নিজের থেকেই উচ্চহারে রপ্তানি বৃদ্ধিকে সূচিত করবে তার পক্ষে যথেষ্ট তাত্ত্বিক যুক্তি আছে। কোন সময়ে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন হারে হয়ে থাকে। বিশ্ববাণিজ্যে বৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট হারে, কোন অনুন্নত দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির হার অত্যন্ত গভীর ভাবে নির্ভর করে সেই দেশের উৎপাদন কাঠামো ও সেই কাঠামোর পরিবর্তনের হারের উপর। যেহেতু মোটের উপর বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উৎপাদন কাঠামোর বিশেষীকরণ (specialising) সেই পণ্যদ্রব্যের মধ্যেই আটকে আছে যাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্তিমিত (stagnant) হয়ে এসেছে, তাই রপ্তানি ক্ষেত্রে সাফল্য নির্ভর করে বিশ্বের বাজারে যে সমস্ত দ্রব্যের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই দিকে উৎপাদন কাঠামোর দ্রুত রূপান্তরের ক্ষমতার উপর। এবং এই রূপান্তরের দ্রুততা বিনিয়োগ অনুপাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিনিয়োগ অনুপাত যত বেশি হবে উৎপাদন কাঠামোর

রূপান্তর তত দ্রুততার সঙ্গে হবে এবং তাই বিশ্ববাজারের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ রপ্তানি বৃদ্ধির হার উর্ধ্বমুখী হবে।

একটি সক্রিয় রাষ্ট্র শুধু বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির জন্যেই প্রয়োজনীয় নয় তাকে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটিকে সংগঠিত করতে হবে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অভিজ্ঞতা একথাই তুলে ধরে যে এই সংগঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাজার নির্ধারিত তুলনামূলক সুবিধার পরিবর্তে একটি বাণিজ্যকেন্দ্রিক (mercantilist) শিল্পনীতিই আন্তর্জাতিক বাজারে স্থান করে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ জাপানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রকের উপ-মন্ত্রী ওজমি জাপানের শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "জাপানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রক সেই সমস্ত শিল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যেখানে পুঁজি ও প্রযুক্তির নিবিড় নিয়োগ প্রয়োজন। এই সব শিল্প উৎপাদনের তুলনামূলক সুবিধার বিচারে জাপানের জন্য একেবারেই অনুপযোগী — যেমন ইস্পাত, তৈলশোধন, পেট্রোকেমিক্যাল, অটোমোবাইল, বিমান, সমস্ত ধরনের শিল্পের যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। স্বল্প মেয়াদী স্থিতির দৃষ্টিভঙ্গিতে (static viewpoint) এই ধরনের শিল্পকে উৎসাহিত করা অর্থনৈতিক যুক্তিবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী বিচারে এই সমস্ত শিল্প ক্ষেত্রে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা বেশি, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির হার দ্রুত, এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়।"

দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানের মত দেশগুলিতে এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে যেখানে এরকম ভবিষ্যৎ বিবেচনায় শিল্পনীতির পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যা প্রতিযোগিতায় তাদের সাফল্য এনে দিয়েছে। অতএব ব্যক্তিগত উৎস থেকে উচ্চহারে বিনিয়োগ সংগ্রহ করলেও সরকারকে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে এই বিনিয়োগের একটি বড় অংশ সেই সমস্ত নির্বাচিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত করতে হবে যেগুলি রপ্তানির জন্য অগ্রাধিকার পাবে এবং প্রযুক্তি ও শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সুবিধা এনে দেবে। আমদানি প্রতিস্থাপনের যুগে যখন শিল্পনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল একটি সংরক্ষিত বাজারের উপর নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ শিল্পভিত্তি গড়ে তোলা তখন রাষ্ট্রীয় নীতির প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল অসম প্রতিযোগিতা ও সংঘাতের কুপ্রভাবগুলি — যেমন কেন্দ্রীভবন, একচেটিয়া দাম নির্ধারণ, অলাভজনক (uneconomic) উৎপাদনের মাত্রা (scale) এবং বিষম উৎপাদন প্রক্রিয়া — এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা। একথা বলা হয় যে এই সমস্ত সমস্যাকে উদারীকরণের যুগে সরাসরি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমেই প্রত্যক্ষভাবে সমাধান করা যায়। যদিও একাধিক অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় যে এইসব ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংঘাত যথেষ্ট নয় এবং শুধুমাত্র মুক্তদ্বার (openness) ও প্রতিযোগিতা রপ্তানিতে সাফল্য সুনিশ্চিত করতে পারে না। রাষ্ট্রের কিছুমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে একটি নতুন রূপ ধারণ করেছে তা হল — নির্দিষ্ট শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে পরিকল্পিত ও সংগঠিত রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা।

নতুন ধরনের নিয়ন্ত্রণের এই উদ্দেশ্যসাধনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হল মুদ্রা নীতি (monetary policy)। অভিজ্ঞতা একথাই প্রতিষ্ঠিত করে যে শেয়ার বাজারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে বৃহৎ শিল্পের জন্য আকর্ষণ করার 'বাজার ভিত্তিক নজরদারি' (market based monitoring) পদ্ধতির চেয়ে উপরে বর্ণিত রপ্তানির সাফল্য অর্জন করতে বৃহৎ বিনিয়োগ (corporate finance) কে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট অভিমুখে পরিচালিত করার সুদের হারের পার্থক্যকরণ ও 'ব্যাঙ্কভিত্তিক নজরদারি' (bank based monitoring) অধিকতর কার্যকরী। এটি স্বাভাবিকভাবেই কোন উদারীকরণের প্রক্রিয়াকে

কিছুটা বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যকরী (sequencing) করার কথা বলে যা পূর্বের আমদানি-প্রতিস্থাপনের সময়ের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে আঘাত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। শিল্পক্ষেত্রে উদারীকরণ (লাইসেন্স আইন, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও সরাসরি দাম নিয়ন্ত্রণ) অবশ্যই বাণিজ্যে উদারীকরণের আগে হওয়া উচিত, এবং এই দুটিরই উদারীকরণ আর্থিক ক্ষেত্রে উদারীকরণের আগে হওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত কারণে সরকারের সমন্বয় সাধনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই ধরনের সক্রিয়তার অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে দুটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমত কোন সক্রিয় রাষ্ট্র যা বাণিজ্যিক বৃদ্ধির পন্থা অবলম্বন করেছে তাকে অবশ্যই শিল্প সম্বন্ধীয় শ্রেণীকে (industrial class) শৃঙ্খলাপরায়ণ করার ক্ষমতা রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত এই সক্রিয়তাকে ধরে রাখতে রাষ্ট্রকে উপযুক্ত পরিমাণে সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে। শিল্পে এই শৃঙ্খলার প্রয়োজন কারণ যদিও আমদানি-প্রতিস্থাপনের সময়কালের বিস্তৃত উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসা হচ্ছে কিন্তু উপরে যে নীতি বিধৃত হয়েছে তাতে কৌশলগত (strategic) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ও রাষ্ট্রকর্তৃক সমন্বয় সাধনে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে বিভিন্ন সুবিধাদান (incentives) এবং অন্যদিকে লক্ষ্যপূরণে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখতে হবে। বিশ্ব বাজারের যে অংশের দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদন করা হচ্ছে সমন্বয়সাধনকারী সংস্থাকে ওই বাজারের পণ্য-প্রযুক্তি, উৎপাদনের মাত্রা ও দামের পছন্দকে প্রভাবিত করতে হবে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না এই ধরনের শৃঙ্খলা আরোপ করতে গেলে সমাজের অপরাপর অংশের সমর্থন প্রয়োজন যা এই বিকল্প পথের তৃতীয় ভিত্তি (পট্টনায়েক ও চন্দ্রশেখর, ১৯৯৭)। একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজিক সমর্থন অর্জন করতে গেলে এমন একটি অবস্থা দরকার যেখানে ভূমিসংস্কার বিত্তবানদের ষড়যন্ত্রের পক্ষের কাঠামোগুলিকে ভেঙে দিয়েছে। ভূমিসংস্কারের এই গভীর প্রয়োজনীয়তা আরও উপলব্ধি হয় যখন দেখা যায় যে পূর্ব এশিয়ার ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির দেশগুলিতেও সাফল্যের একটি অন্যতম কারণ হল বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ওই সমস্ত দেশে ঘটে যাওয়া ভূমিসংস্কার।

কিন্তু ভূমিসংস্কার শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমর্থন তৈরীর জন্যেই জরুরী নয়। এটি প্রয়োজন একারণে যাতে ভূমির পুনর্বণ্টন ও গ্রামাঞ্চলে অধিকতর সামাজিক ব্যয় (social expenditures) কে সুনিশ্চিত করা যায় যা সবচেয়ে ভালো ভাবে কার্যকরী হতে পারে সরাসরি নির্বাচিত বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের (ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা) মাধ্যমে। আরও প্রয়োজন এ কারণে যে তা আভ্যন্তরীণ বাজারের দ্রুত প্রসার ঘটায় ফলে কৃষি উৎপাদন দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পায় (উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটেছে) এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। এই লক্ষ্যে ভূমিসংস্কারের সাথে কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রয়োজন অর্থাৎ জলসেচ ও জলবণ্টন এবং অন্যান্য গ্রামীণ পরিকাঠামো যা কৃষির বৃদ্ধিকে সূচিত করে এবং শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটায়। এটি শুধুমাত্র উন্নয়নের ভিত্তিকে প্রসারিত করে তাই নয় বরং তারই সাথে বিকেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোকে অঙ্গীভূত করে যা একটি রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা আরোপের প্রয়োজনীয় শক্তি ও গ্রহণযোগ্যতা (accountability) তৈরি করে।

বিশ্বায়ন হল মৌলিকভাবে একটি কেন্দ্রীভবনের প্রকাশ যা বিভিন্ন অর্থনীতি ও ক্ষেত্রকে কিছু সংখ্যক সিদ্ধান্তকারীর নিয়ন্ত্রিত জগতে টেনে আনে। এই কেন্দ্রীভবনের প্রবণতাটি প্রতিফলিত হয় বিশ্বব্যবস্থায় সংযুক্তির ক্ষেত্রেও যা মুক্ত অর্থনীতি ও বাজারভিত্তিক পন্থার পক্ষে শক্তিশালী দেশীয় সমর্থন তৈরী করে। বর্তমান সময়ে জাতিরাষ্ট্রের (nation-state) আর কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই এ কথা তারাই বলছে যারা একটি সংরক্ষিত আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে

দেশীয় স্বার্থের পরিবর্তে একটি 'সংযুক্তিমূলক' (integrationist) পথকে আর্থিক ভাবে অধিকতর লাভজনক মনে করছে. একারণেই সেই সমস্ত শক্তি যা ১৯৫০-এর দশকে সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষে ওকালতি করেছিল তারাই এখন উদারনীতির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। সমস্যা হল অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিত মানুষ এই উদারনীতি দ্বারা আরও অসুবিধাজনক অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কেন্দ্রীভবনের কারণে একথা বুঝতে পারে না যে জাতিরাষ্ট্রের গুরুত্ব কমে আসার ফলে তাদের অত্যন্ত নিম্ন জীবনমানটিও আক্রান্ত হচ্ছে। এই কারণেই অন্ধ বাজার নির্ভরতার বিকল্প শক্তির সুযোগ তৈরী হয়, তৈরী হয় বিশ্বায়নের কুপ্রভাবগুলিকে বিবেচনার মধ্যে আনার প্রচেষ্টার সামাজিক ভিত্তি। এর অর্থ হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন যাতে অনিয়ন্ত্রিত বাজারে বিকল্প চিন্তাভাবনা ভাষা পাওয়ার সুযোগ পায়। এর অপর অর্থ হল যে কোন বিকল্প পন্থায় এই অংশের মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতে হবে তবেই বিকল্পের পক্ষে আরও সমর্থন সংহত হবে।

সুতরাং বিকল্প পথে অবশ্যই আর্থিক 'সংস্কারের' প্রয়োজন আছে যদিও তা উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশিত পথে নয়। এই সংস্কারের উদ্দেশ্য হবে আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার এবং যথাযথ কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও প্রসারিত করা। কিন্তু বাজারের প্রসার যদি সম্প্রসারণের উৎসাহ (stimulus) ব্যতিরেকে ঘটে তবে তা বিপরীত ফল দিতে পারে, এবং একটি রাষ্ট্র যা সমষ্টিগত ভারসাম্যহীনতার (macroeconomic disequilibria) সম্মুখীন তা কখনই এই উৎসাহ প্রদানের অবস্থায় থাকতে পারে না। এর অর্থ হল এই ভারসাম্যহীনতা যা বিরাট বাজেট ঘাটতির মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় তাকে কাটাতে গেলে প্রত্যক্ষ কর বাড়ানো দরকার ও অনাবশ্যক ব্যয় কমানো প্রয়োজন। কর আদায়ে আরও শৃঙ্খলা আনা, আইনের পরিবর্তন, কিছু ছাড় তুলে দেওয়া এবং উপরের দিকের আয়ের জন্য কর হারের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে আয়কর বাবদ আয়বৃদ্ধি সম্ভব।

প্রত্যক্ষ করের উপর অধিকতর নির্ভরশীলতার ফলে পরোক্ষ কর ও প্রশাসনিক ভাবে দাম বৃদ্ধি করে সরকারি আয় বাড়াবার প্রবণতা বিপরীত দিকে প্রবাহিত হবে এবং তা নিজেই মুদ্রাস্ফীতি রোধ করবে। এছাড়াও মুদ্রাস্ফীতির ফলে আক্রান্ত গরীব মানুষের সুরক্ষার জন্যও এটি প্রয়োজন। একাজ আরও ভালোভাবে করা যায় যদি গণবণ্টন ব্যবস্থাকে ভৌগোলিক ভাবে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত করা যায় ও আরও পণ্যদ্রব্যকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা যায়। এর জন্য সরকারি কোষাগারে যে চাপ সৃষ্টি হবে তাকে যুক্তিযুক্ত সীমার মধ্যে রাখা দরকার। গণবণ্টন ব্যবস্থার লক্ষ্যকে পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন যাতে তা প্রকৃত দরিদ্রদের জন্য কার্যকর হয়। সমষ্টিগত ভারসাম্যহীনতার অপর উপাদান যা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সঙ্কটগ্রস্ত করে তোলে তা হল চলতি খাতে ঘাটতি যাকে মোকাবিলার সরাসরি পথ বিকল্প অর্থনৈতিক পন্থার মধ্যেই প্রস্তাবিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আয় ও রপ্তানি বৃদ্ধি মুক্ত আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল নয় বরং রাষ্ট্রের সক্রিয়তার ফলশ্রুতি। এর অর্থ হল একটি নির্বাচিত অথচ কঠিন আমদানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার সঙ্গে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা যুক্ত করলে লেনদেন যা ভারসাম্যহীনতা মোকাবিলার ভিত্তি রচিত হয়। এছাড়াও বিস্তৃত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উন্নয়নের প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক পুঁজির উপর নির্ভরশীল না হয়ে আভ্যন্তরীণ বাজারের সুযোগকে ব্যবহার করতে পারে। এর অর্থ হল বৃদ্ধি ও বহির্বিশ্বের আঘাতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া গরম টাকার (hot money) প্রবাহের উপর নির্ভরশীলতা বন্ধ হওয়া, অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য এক বিকল্প পথের যাত্রা সুগম হয়ে ওঠা।

সুতরাং এই ধরনের কর্মপন্থা শুধু বিকাশের গতিকে সমবণ্টনের প্রতি নজর রেখে ত্বরান্বিতই করে না বরং কিছুমাত্রায় বৃদ্ধির হার ও ক্রমবর্ধমান বিদেশি পুঁজির উপর নির্ভরশীলতার মধ্যেকার অশুভ সম্পর্ককে ছিন্ন করে। অর্থ সংগ্রহের যে কোন সুযোগ অবশ্যই এই ন্যূনতম মাত্রার বৃদ্ধি (critical minimum) কে অতিক্রম করতে সাহায্য করে অথচ তা আন্তর্জাতিক পুঁজির উপর নির্ভরশীলতার কারণে বহির্বিশ্বের আঘাতজনিত অস্থিরতার অধীন থাকে না। এভাবেই লগ্নি পুঁজির আধিপত্যের ফলে যে 'সুযোগ' সৃষ্টি হয়েছে তাকে কোন উন্নয়নশীল দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ব্যবহার করতে পারে। এই সেই নৈতিক সত্যের আবর্ত যা নতুন পরিস্থিতিতে গ্রহণীয় এবং যার মধ্যে দিয়ে একটি সক্রিয় রাষ্ট্র যখন পণ্য ও পরিষেবার আন্তর্জাতিক বাজারে অংশগ্রহণ করতে চায় তখন তা আন্তর্জাতিক পুঁজির বাজার ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ভিত্তি রচনা করে এবং বিষম আন্তর্জাতিক বাজারে অংশগ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত করতে আরও একটি বিষম অস্ত্র সরবরাহ করে।

সহায়ক পাঠ

★ Akyüz, Yilmaz (1993), "On Financial Openness in Developing Countries", in UNCTAD 1993, pp. 110-124

★ Akyuz, Y and C. Gore (1994), *The Investment-Profits Nexus in East Asian Industrialisation*, UNCTAD Discussion Paper, No 91, October.

★ Adam, Gyorgy (1975), *Multinational Corporations and Worldwide Sourcing*, in Radice (ed.), 1975.

★ Amsden, Alice H (1989), Asia's Next Gaint South Korea and Late Industrialisation, New York : Oxford University Press

★ Badhuri, Amit (1996), Implications of Globalisation for Macroeconomic Theory and Policy. Centre for Economic Studies and Planning, mimeo.

★ Brunner, Hans-Pater (1995) Closing the Technology Gap, Technological Change in India's Computer Industry, New Delhi : Sage Publications.

★ Frobel, Volker, Jurgen Heinrichs and Otto Kreye (1980), The new international division of labour.

★ Krugman, P (1994), *The Myth of Asia's Miracle*, Foreign Affairs, Vol. 73, No.6 (November/December).

★ Maddison, Angus (1995), Monitoring the World Economy, 1820-1922, Paris : Organisation for Economic Cooperation and Development.

★ Mohanty, Ashish Ranjan (1996), India's Trade Flows : An empirical analysis, M. Phil. disseration submitted to the Centre for Economic Studies & Planning, Jawaharlal Nehru University.

★ Nayyar, D. (1995), Globalisation : The Past in Our Present, Presidential Address, 78th Annual Conference of the Indian Economic Association held at Chandigarh.

★ Patnaik, Prabhat (1993), International Capital and National Economic Policy, A Critique of India's Economic Reforms, mimeo.

বর্তমান সংকলনের জন্য সি. পি. চন্দ্রশেখর প্রেরিত ইংরেজিতে লেখা মূল প্রবন্ধটির শিরোনাম 'External Vulnerability and Industrial Policy in the Era of Globalisation' ।

বিশ্বায়ন এবং শ্রমজীবী মানুষ

এম. কে. পান্ধে

দশবছর ধরে বিশ্বায়নের পরিণতিতে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতি চূড়ান্তভাবে ব্যাহত হয়েছে আর সমগ্র ভারতের শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারণ ও কর্মপরিস্থিতি হয়েছে আরো প্রতিকূল।

বিশ্বায়নের সূচনালগ্নে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যদূরীকরণের বর্ণময় প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও শুধু এর অন্ধকার দিকটির অভিজ্ঞতাই মানুষের হয়েছে। ভারত সরকার ভারতের শ্রমজীবী সম্প্রদায় তথা সাধারণ মানুষের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাবের বস্তুগত মূল্যায়ন করতে প্রস্তুত নয় এবং তথাকথিত পুনর্গঠনের গতিতে বেগ আনার প্রস্তাব নিয়ে ঘোড়ায় জিন দিয়ে রেখেছে। এর ফলে ভারতের পরিস্থিতি শুধুই খারাপ হবে এবং এই ধারাবাহিকতার দুর্ভাগা শিকার হবে শ্রমজীবী জনগণ।

শিল্পায়নে মন্দাগতি

সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অর্গানাইজেশনে (CSO) প্রকাশিত তথ্য অনুসারে শিল্পোন্নয়ন হার বিগতবছরের ৬/৭ শতাংশ থেকে ২০০০-২০০১ সালে সোজা নেমে হয়েছে মাত্র ৪.৯ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে অবনতির হার ১৯৯৯-২০০০ সালের তুলনায় ২০০০-২০০১ সালে যথাক্রমে ৭.১ শতাংশ এবং ৫.২ শতাংশ থেকে হয়েছে ৪ শতাংশ এবং ৪ শতাংশ।

চলতি আর্থিক বছরেও কেন্দ্রীয় বাজেটে (২০০১-০২) শিল্পগোষ্ঠীকে প্রভূত ছাড় দেওয়া হলেও পরিস্থিতি বদলায়নি এবং শিল্পক্ষেত্রে নিম্নগতির প্রবণতা বহাল আছে। মন্ত্রীমহলের ভবিষ্যৎবাণীতে একটা ঘুরে দাঁড়ানোর সাড়ম্বর ঘোষণা থাকলেও ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকেও শিল্পোৎপাদন হার ক্রমেই নিম্নগামী হয়ে জানুয়ারির প্রায় ৪ শতাংশ থেকে এপ্রিলে এসে দাঁড়িয়েছে ২.৭ শতাংশে।

সমগ্র শিল্পোন্নতির ভিতস্বরূপ যে উৎপাদন এবং মূলধনী ক্ষেত্র সেখানেও এই ক্রমাবনতির অশুভ উপসর্গগুলি দেখা যাচ্ছে। সরকারি গোষ্ঠীর উদারীকরণ নীতির তাত্ত্বিকেরা এই প্রবণতাকে উড়িয়ে দিতে উদারীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে পরিষেবা ক্ষেত্রে বেশি উন্নতির কথা আউড়ে এর উত্তর খুঁজছেন। কিন্তু ভারতের মতো বিশাল দেশে উৎপাদন ক্ষেত্রের অবনতিকে কিছুতেই পরিষেবাক্ষেত্রের উন্নতি দিয়ে পূরণ করা যাবে না এবং মূল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের

ক্রমাবনতি কিছুতেই শেষ পর্যন্ত পরিপূরক পরিষেবাক্ষেত্রের উন্নতিকে ধরে রাখতে পারবে না।

বর্তমানের অর্থনৈতিক প্রবণতা থেকে এই কঠোর বাস্তব ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উপরে এসে এই সম্পূর্ণ পদ্ধতির ভঙ্গুরতা প্রকাশ করছে।

পরিষেবাক্ষেত্রের উন্নতির হার ৯৫-৯৬ সালে ১০.৫ শতাংশতে পৌঁছনোর পর পরবর্তী বছরগুলিতে ৮ থেকে ৯ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করে ২০০০-২০০১ এ ৮.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের ওপর আশা হঠাৎ নেমে যাওয়ায় ভারতীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করছে।

ইকনমিক টাইমসের (৩০-০৭-০১) একটা সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে কয়েকটা প্রথম শ্রেণীর কোম্পানি ছাড়া বেশিরভাগ আইটি কোম্পানি ২০০১-২০০২ এর প্রথমাংশে মোট বিক্রয়ে একটা বিপুল অবনতির মুখে পড়েছে।

এমনকি দ্রুত 'সংস্কার'-এর উদ্দীপ্ত সমর্থক এফ আই সি সি আই এই পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ না করে থাকতে পারেনি।

এফ আই সি সি আই এর সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ অম্বিত মিটার যখন ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের (৯-৭-০১) সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন তখন তাকে এই মন্তব্য করতে হয় যে উদ্বেগের প্রধান ক্ষেত্রগুলি হল গত দু'বছরে কৃষির অবনতি, বিদ্যুৎ উৎপাদনে গত তিন বছরের অবনতি, ২০০০-০১ আর্থিক বছরে পরিষেবাক্ষেত্রে অগ্রগতিতে বিপুল মন্দা, শিল্পক্ষেত্রে মন্দা এবং নির্মাণক্ষেত্রে আরো ব্যাপক মন্দা যা দাঁড়িয়েছে ০.৭ শতাংশ। সি আই আই এবং এফ আই সি সি আই উভয়েই বেসরকারি ক্ষেত্রে লগ্নি হঠাৎ নেমে যাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যদের দ্বারা মূলধন বিদেশে চলে যাওয়ার প্রবণতা স্বীকার করেছে।

বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড যা অন্যসময় সব ব্যাপারে ওকালতি করে তারা সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছে, "তিনটি ক্ষেত্রেই বিগত বছরগুলির জন্য উন্নয়ন হারে অবনতি হয়েছে। বর্ষা গ্রাম্যচাহিদাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে এই সম্ভাবনা ছাড়া এবছরেও উন্নতির কোনো আশা দেখা যাচ্ছে না। উদারীকরণ এবং সংস্কারের দশমবর্ষপূর্তিতে অর্থনীতির কার্যকলাপ থেকে এর নীতি এবং ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে বহু অবাঞ্ছিত প্রশ্ন উঠে আসছে।"

কৃষি উৎপাদনে মন্দা

কৃষিক্ষেত্রেও উন্নতির হার লক্ষ্যণীয় ভাবে নিম্নগামী হয়েছে। ইকনমিক সার্ভে (২০০০-০১) নির্দেশ করছে যে, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উন্নতির হার ৯৮-৯৯ এর ৭.১ শতাংশ থেকে ২০০০-০১-এ ০.৯ শতাংশে নেমেছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার বিগত বছরগুলির তুলনায় ২০০০-০১ এ ৪.৭ বহুলাংশে কমে গেছে।

বিশ্বস্তভাবে বলা যেতে পারে যে কৃষিক্ষেত্রে এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনের হারে ১৯৯৮ এর তুলনায় এই ক্রমহ্রাসমান অবস্থা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক দেশের খাদ্য অর্থনীতির এই সমস্যাকে শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত বণ্টনের সমস্যা বলে বিবৃত করেছেন। খাদ্য উদ্বৃত্ত সম্পর্কীয় অর্থমন্ত্রকের এই একগুঁয়ে মন্তব্য মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, গুজরাট এবং বিভিন্ন রাজ্যে অনাহারের কারণে আত্মহত্যাগুলির পটভূমিকেই প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। আসলে উদারীকরণ-পরবর্তী খাদ্য অর্থনীতিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যাওয়া, জনবণ্টনব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ খাদ্যশস্যের পরিমাণ কমে যাওয়া এবং এই ব্যবস্থায় সরকারি মূল্য বৃদ্ধি-সহ সরকারি গুদামগুলিতে প্রচুর

মজুতের ফলে উপচে যাওয়ার মতো অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যাচ্ছে।

এই বিষয়টি থেকে এফ সি আই গোডাউনগুলি উপচে পড়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যসীমার আশেপাশে এবং নীচে থাকা মানুষদের কাছে খাদ্যশস্যর প্রকৃত মাথাপিছু প্রাপ্যতা কেন হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে তা বোঝা যায়।

খাদ্য অর্থনীতিতে এফ সি আই গোডাউনগুলির জমানো সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট এই আপাত উদ্বৃত্তের পটভূমিতে উপরিউক্ত বিষয় শুধু সাধারণ মানুষের দারিদ্রের প্রকৃত গভীরতাকেই ফুটিয়ে তুলছে যা দারিদ্র্য সম্পর্কিত সরকারি নথিপত্রে প্রকাশিত নয়। একইসঙ্গে আমদানীতে পরিমাণগত বধিনিষেধ উঠে যাওয়া ও অন্যান্য কারণে বেশিরভাগ গ্রামীণ জনতা বিশেষভাবে কৃষি শ্রমিকদের জন্য কৃষি আয় হঠাৎ নেমে যাওয়া এই সমস্যাতে ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছে এবং উদারীকরণ নীতির দ্বারা প্রচারিত কৃষি অর্থনীতির ভয়ানক বিকৃতি প্রতিফলিত করছে।

কর্মনিযুক্তি ও উন্নয়ন

শিল্পক্ষেত্রেও এক ভয়াবহ ভাঙ্গন ক্রমবর্ধিতরূপে দৃশ্যমান। শিল্পোন্নয়নের হার পড়তির দিকে হলেও কর্পোরেটগুলির লাভের সীমা সটান উঠে গেছে উঁচুতে। ১২৩৮ টি ফার্ম নিয়ে ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের একটি পর্যালোচনায় প্রকাশিত যে তাদের মোট বিক্রয় বিগত বছরের তুলনায় ২০০০-০১-এ ১৭ শতাংশ বর্ধিত, কর দেবার আগের লাভ বেড়েছে ১৮ শতাংশ এবং নীট লাভ (কর দেবার পর) ২১.৮ শতাংশ বেড়েছে। এমনকি চলতি আর্থিক বছরের প্রথমাংশে এই ভাঙন আর অবনতির পটভূমিতেও ৬৯২ টি বড় কোম্পানি তাদের নীট লাভ ২৩ শতাংশ বাড়াতে পেরেছে যদিও তাদের বিক্রি বেড়েছে মাত্রই ৪.৫ শতাংশ (ইকনমিক টাইমস, ৩০.৭.০১) শিল্পগোষ্ঠীদের যে বিপুল ছাড় দেওয়া হচ্ছে তার ফলেই তারা ক্রমাগত উচ্চ আয়ের সুযোগ পাচ্ছে অথচ উৎপাদন এবং কর্মবিনিয়োগের ক্ষেত্রে তেমনকিছু বস্তুগত উন্নতি চোখে পড়ছে না।

প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য এবং উদারীকরণের পূর্ণ সমর্থক মন্তেক সিং আলুওয়ালিয়ার নেতৃত্বে যে কর্মবিনিয়োগ সুযোগ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে তারাও স্বীকার করেছে যে কর্মবিনিয়োগ পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে গেছে। ১৯৮৮-৯৪ পর্যায়ে শ্রমশক্তির বৃদ্ধি বার্ষিক ২.২৯ শতাংশ থেকে ১৯৯৪-২০০০ পর্যায়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে ১.০৩ শতাংশ হওয়া ছাড়াও কর্মবিনিয়োগে বৃদ্ধির হার আরো তীব্রভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে ঐ পর্যায়গুলিতেই ২.৪৩ শতাংশ থেকে হয়েছে ০.৯৮ শতাংশ। ১৯৯০ এ কর্মবিনিয়োগ বৃদ্ধির হার কখনই ০.৮ শতাংশ-এর বেশি হয় নি। সর্বশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে কর্মনিযুক্তির বৃদ্ধির হার ইতিমধ্যেই ঋণাত্মক হয়ে গেছে। একটি পর্যালোচনায় বলা হচ্ছে গত একবছরে শুধু সংগঠিত ক্ষেত্রেই ১০ লক্ষ চাকরি বিনষ্ট হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গীতকৃষ্ণণ কমিটির (ব্যয় সংস্কার কমিশন) অনুমোদন অনুসারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের ঘোষণা, যেখানে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরগুলিতে বার্ষিক ২ শতাংশ হারে মানবসম্পদ হ্রাস করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে ফান্ড/ব্যাঙ্ক নির্দেশিত গোটা সংস্কার কর্মসূচীর নীতিহীনতা তার এক দশকের কার্যক্রমেই প্রকাশ পেয়েছে। উদারীকরণ ছাঁচের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে সরকারের সম্পূর্ণ বিযুক্তি এবং সম্পূর্ণ মুক্ত অর্থনীতি। এখন শিল্পগোষ্ঠী চাইছে অন্যান্য পরিকাঠামো এবং প্রোজেক্টে আরো বেশি সরকারি বিনিয়োগ। যদিও সংশ্লিষ্ট দুটো বাজেটে

পরিকাঠামোয় বেসরকারি লগ্নিতে উদারভাবে কর ও অন্যান্য ছাড় দেওয়া হয়েছে, বেসরকারি করপোরেটগুলি কার্যত কিছুই করেনি। প্রকৃতপক্ষে বিজনেস লাইন (১৯-০৭-০১) এর তথ্য অনুসারে বিগত আর্থিক বছরে তথা চলতি আর্থিক বছরের প্রথমাংশে প্রোজেক্টের ক্ষেত্রে বেসরকারি লগ্নি ধনাত্মক দিকেই বর্ধিত হয়েছে। এখন তারা গঠনগত ও অন্যান্যক্ষেত্রে আরো সরকারি লগ্নির জন্য চিৎকার করছে। এফ আই সি সি আই সেক্রেটারি জেনারেলের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় "যেসব কেন্দ্রীয় সরকারি পরিকাঠামোগত প্রোজেক্টে সংবিধানগতভাবে রাজ্য সরকারগুলি সহযোগিতা করা কর্তব্য তাও আর্থিক অসুবিধার জন্য করা হয় নি।"

(দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস ৯-৭-০১)। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছেন এই সব প্রোজেক্টে লগ্নি করার জন্য এগিয়ে এসে অর্থনীতিতে একটা 'মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট' সূচনা করতে এবং মতবাদমূলক বাজারকে বর্ধিত করতে এবং পশ্চাদপসরণের সমস্যাকে চিহ্নিত করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে।

এফ আই সি সি আই এবং সি আই আই উভয়েই লগ্নিসীমার হ্রাসের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের 'তীক্ষ্ণ নজরদারি'কে দোষ দিয়েছে। কিন্তু তারা সুবিধাবাদীর মতো এই তথ্য চেপে গেছে যে অর্থনীতিতে সমূহ মন্দা সত্ত্বেও বৃহৎ কর্পোরেটগুলি লক্ষণীয়ভাবে তাদের তহবিল সঞ্চয় বাড়িয়ে ফেলেছে যা তাদের বিপুল হস্তমজুত অদৃশ্য উদ্বৃত্তকেই ইঙ্গিত করছে। এ তথ্য ৩০-৭-০১ এর বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে। এর মধ্যে আছে টাটা স্টিল, রিলায়েন্স, ইনফোরসেস্, গ্রাসিম, লারসেন অ্যান্ড টুবরো, হিন্দুস্তান লিভার, উইপ্রো, সত্যম কমপিউটার এবং আরো অন্যান্য।

এই বিষয়টি এই ইঙ্গিতই দিচ্ছে যে প্রকৃত অর্থনীতি, যার ফলে উৎপাদন এবং কর্মনিয়োগ সৃষ্টি হয় তাতে লগ্নি করতে শিল্পগোষ্ঠীগুলি উৎসাহী নয়। তারা চাইছে ব্যাঙ্ক ও এফ আই গুলি তাদের ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদনগুলিতে সস্তাহারে মূলধন দিক যা তাদের সুবিধার্থে এনপিএ-তে পরিবর্তিত হতে পারে এবং অবশেষে আরেক প্রস্থ সুদ ছাড়ের মাধ্যমে স্থির হতে পারে যা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে হচ্ছে।

এখানেই সম্পূর্ণ ছাঁচটির পরস্পর বিরোধিতা লক্ষিত হচ্ছে। সরকার কর্পোরেট এবং এম এন সি গোষ্ঠীকে উদারভাবে কর ছাড় দিয়ে কর আদায়ের উৎসগুলিকে এড়িয়ে যাবে আবার একইসঙ্গে আর্থিক অবনতি ও মুদ্রাস্ফীতিতেও ভুগবে। পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য খরচ করতে হবে, চুক্তিভঙ্গকারী কর্পোরেটদের জন্য জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির তহবিল থেকে উদারভাবে সুদ লাঘব করতে হবে, একই সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলিকেই দোষ দেওয়া হবে নিম্নমানের কাজকর্ম আর উচ্চ এনপিএ নিয়ে।

তাহলে পরিকাঠামো ইত্যাদিতে লগ্নি করার অর্থ আসবে কোথা থেকে? সাধারণ জনগণই হলো সেই একমাত্র নিংড়ে নেবার জায়গা।

কিন্তু তাহলে আবার দেশীয় বাজার আরো মন্দা হবে, পশ্চাৎমুখিতা বাড়বে এবং তার কুফল পড়বে শিল্প ধারণক্ষমতার ব্যবহারযোগ্যতাতে। পাশাপাশি সম্পূর্ণ মুক্ত অর্থনীতি যা ইতিমধ্যেই এসে গেছে তা এই ইতিমধ্যেই নিংড়ে নেওয়া বাজারের বৃহদাংশে ভাগ বসাবে। বিশ্বব্যাঙ্ক/ফান্ড নির্দেশিত উদারীকরণ ছাঁচের কাঠামোটির যে দিকটি ধরেই এগোনো যাক না কেন, এর পরিসমাপ্তি ঘটবে পরিস্থিতির ক্রম-অবক্ষয়ের পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ অর্থনীতির ধ্বংসপ্রাপ্তিতে।

সরকারি ক্ষেত্রের লিকুইডেশন

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক ২০০০-২০০১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার সময় ঘোষণা করেন 'সরকার সম্প্রতি নতুন একটি বিলগ্নিকরণ দপ্তরের সূচনা করেছেন বিলগ্নিকরণ ও বেসরকারিকরণের একটা নিয়মনিষ্ঠ নীতির পথ প্রস্তুত করতে এবং এই কর্মসূচীতে নবদ্রুতি আনতে যা সুনির্দিষ্ট পি এস ইউ গুলিকে পরিকল্পিতভাবে বিক্রয় করায় ক্রমশই জোর দেওয়া বাড়াবে।' এইভাবেই তেল ও পেট্রোলিয়াম, শক্তি, কয়লা, দূরনিগম, বায়ুযান, পোর্ট ও ডক, এয়ারপোর্টের মতো পি এস ইউ গুলি এবং অবশ্যই অর্থক্ষেত্র বেসরকারিকরণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। যে সব পি এস ইউ ইতিমধ্যেই বেসরকারিকরণের জন্য চিহ্নিত হয়েছে তা হলো ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স, এয়ার ইন্ডিয়া, আই টি ডি সি, আই পি সি এল, ভি এস এন এল, সি এম সি, বালকো (ইতিমধ্যেই বেসরকারি) হিন্দুস্থান জিঙ্ক এবং মারুতি উদ্যোগ, রেলওয়েস, প্রতিরক্ষা উৎপাদন। এই বাজেটের লক্ষ্য হলো এই বছরের মধ্যে পি এস ইউ-গুলিকে বেসরকারিকরণের মাধ্যমে ১২০০ কোটি টাকা তুলে নেওয়া। বিলগ্নিকরণ মন্ত্রকের বক্তব্য অনুসারে, 'সরকার পরিকল্পিত বিক্রয়ের উপর জোর দেবার জন্য নীতির পরিবর্তন করছেন। এর অর্থ হলো পি এস ইউ-গুলির শেয়ারের বৃহদংশ এবং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণগুলি একটি মাত্র বেসরকারি ক্রেতার উপর বর্তাবে যা হয়েছিল বালকোর ক্ষেত্রে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যে তথ্য মনে রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন তা হলো 'পরিকল্পিত বিলগ্নিকরণ' বিষয়টির উৎস হলো বিশ্বব্যাঙ্কের একটি গবেষণাপত্র যা নির্দেশ করছে 'যদি যোগ্য ক্রেতারা কোনো ভাবে তহবিলের ব্যবস্থা না করতে পারে সেক্ষেত্রে সংস্থাটি বিক্রয় করা যেতে পারে (পরিচালন নিয়ন্ত্রণ দ্রুত বেসরকারি হাতে দিয়ে তাদের সময় দিতে হবে। যাতে তারা অবশিষ্ট অংশের শেয়ারও ক্রমে কিনে নেবার মতো তহবিল সংগ্রহ করতে পারে) কেনা এবং পুড়িয়ে দেবার স্বাধীনতাও দিতে হবে যা সফল পরিচালন চুক্তির অন্যতম শর্ত'।

বিশ্বব্যাঙ্কের এই নির্দেশিকার সূত্র ধরে বিলগ্নিকরণ কমিশনের সুপারিশগুলি প্রস্তুত হয়েছে। এই পরিকল্পিত শেয়ার বিক্রয় কর্মসূচী সম্পন্ন সরকারি অংশগুলিকে একটি পার্টির কাছে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ইক্যুইটিতে বিক্রয় করে দেবার দিকে জোর দিচ্ছে (ডিসি ভলুম-১ পাতা-৩৮) এই বিষয়টি বর্ধিত করে ডিসি ফের বলছে: 'এই সময়ে (পরিকল্পিত বিক্রয়) ঐ পরিকল্পিত অংশীদারের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে হবে যে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্যে অন্য এক দিন সরকার তার অবশিষ্ট অংশ বিলগ্নী করবে। (ইবিড ভলু-১.৪ পাতা-৬)

এম ও ডি সরকারি ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের উপর বিলগ্নিকরণ মন্ত্রী অরুণ শৌরীর স্বাক্ষরিত ভূমিকা সহ একটি 'ম্যানুয়েল' তৈরি করেছে। সরকারি ক্ষেত্রগুলিকে বাঁচানোর গণ-আন্দোলনের প্রতি জনগণকে অনাগ্রহী করে তোলবার জন্য এর সম্পর্কে জনমানসে খারাপ ধারণা তৈরি করতে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে প্যাঁচালো তথ্য সমূহে নানা হিসাব ও সূত্র দেওয়া হয়েছে। ধারণা এবং চাপগুলি নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, আমদানীতে পরিমাণগত বাধানিষেধ তুলে নেওয়া, আমদানীকর হ্রাস এবং অন্যান্য বাধা তুলে নেওয়া',...

ডব্লু টি ওর কার্যকালের আহ্বান অনুসারে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীতে সরকারি ক্ষেত্রগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেসরকারি করার ব্যাপারে জোর দেওয়া হচ্ছে। চ্যাপ্টার-১২, পাতা-৩৫ আমরা বলে আসছি যে সরকারি ক্ষেত্রের বিলগ্নিকরণ এবং বেসরকারিকরণের ধারণা এবং আরো ভালভাবে বললে ঐ নকশাটিই একটা অন্তসারশূন্য আদর্শের ধারণা, জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, দেশের লোকের প্রতি ভাঁওতা। কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেলের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে দেখা উচিৎ যে পি এস ইউ শেয়ার বিক্রয় করে ১৯৯২ সালে সরকারি

রাজস্বের ঘাটতি প্রায় ৩,৪৪১.৭ কোটি টাকার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। শিল্পক্ষেত্রের জন্য নির্মিত পার্লামেন্টারি স্ট্যাণ্ডিং কমিটির হিসাব অনুসারে ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে পি এস ইউ শেয়ারগুলি বিলগ্নিকরণের যে প্রক্রিয়া চলছে তার ফলে জাতীয় রাজস্বের ঘাটতি প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা! দেশীয় বাজারের চেয়ে কম হারে জি এ আই এল শেয়ারগুলি বিক্রয় করার ঘটনায় একেবারে উচ্চপর্যায়ের নীতিহীনতাই প্রকাশ পেয়েছে।

৫,০০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের (৫১ শতাংশ শেয়ার) ছত্তিশগড়ের কোরবার বালকোপ্ল্যান্টকে কেন্দ্রীয় সরকার ৫৫২.৫কোটি টাকায় সেবির কালো তালিকায় নাম থাকা কোম্পানি স্টারলাইটের হাতে তুলে দিয়েছে।

সরকারি ক্ষেত্রের প্রভূত সম্পদের তালিকায় রয়েছে ২৭২০ একর জমি, ২৭০ এম ডব্লু ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট যার চলতি বাজার মূল্য ১০০০ কোটি টাকার বেশি তৈরি হয়ে থাকা জিনিসের প্রচুর ভাণ্ডার যার মূল্য ১০০ কোটি টাকা, একটা নতুন কোল্ড রোলিং কারখানার জন্য সাম্প্রতিক কালের লগ্নির ২০০ কোটি টাকা ছাড়াও মনিপুর, খড়দা ও আসানসোলের প্রচুর মজুত-সহ বক্সাইট খনি। মডার্ন ফুডস্ এর কথা বিবেচনা করে সিএজি-র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে হিন্দুস্থান লিভার তার কোম্পানির মূল্য নির্ধারণ করেছে ১৬৫.৪৭ কোটি টাকা সেখানে সরকারের মনে হয়েছে মডার্ন ফুড্সের মূল্য প্রায় ৭৮.৫৫ কোটি টাকা (দি টাইমস অফ ইণ্ডিয়া-২৩.৭.০১) উচ্চপর্যায়ের কি বিশুদ্ধ দুর্নীতি!

ম্যানুয়েলটিতে অবশেষে পি এস ইউ গুলিকে বেসরকারিকরণের জন্য মূল্যনির্দ্ধারনের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এখানে চারটি পদ্ধতি চিহ্নিত হয়েছে। ১) ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো ২) ব্যালান্স শীট ৩) ট্রানসাকশন মাল্টিপল ৪) অ্যাসেট ভ্যালুয়েশন। উপরোক্ত চারটি পদ্ধতির মধ্যে অ্যাসেট ভ্যালুয়েশন মেথড হলো বিক্রেতা কোম্পানীর পক্ষে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক এবং ডি সি এফ হলো ক্রেতা কোম্পানির পক্ষে অন্যায়রকমভাবে সুবিধাজনক।

অ্যাসেট ভ্যালুয়েশন মেথডে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত সম্পদসমূহের পুনস্থাপনের মূল্যও অবশ্যিকভাবে নিরূপিত হয়। যখন ইক্যুইটি বিলগ্নিকরণ হয় অথবা অয়েল এ্যান্ড পেট্রোলিয়াম, টেলিকম্যুনিকেশন, এয়ারট্রান্সপোর্ট, ফার্টিলাইজার ইত্যাদি পরিকল্পিত ক্ষেত্রে ব্লুচিপ কোম্পানিগুলির পরিকল্পিত বিক্রয়ের প্রস্তাবনা হয় তখন এটাও গণনা করা উচিৎ যে এই সমস্ত সংস্থা এই দেশে স্থাপন করতে গেলে তার সাম্প্রতিক বাজার মূল্য কত 'ম্যানুয়েল' এই সত্য অস্বীকার করতে পারে না যে সাধারণভাবে এ্যাসেট ভ্যালুয়েশন সেই হিসাবটি দেখাতে সক্ষম যা ঐ ব্যবসায়কে যুক্তিসম্মত করতে একই ধরনের পরিকাঠামো প্রস্তুতিতে ব্যয় হয় অথবা যে মূল্য কোম্পানি বিক্রয়ের দ্বারা সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংগৃহীত হয়।

ডি এফ সি পদ্ধতির স্বপক্ষে বলতে গিয়ে ম্যানুয়েল বলছে, 'ডি এফ সি ভ্যালুয়েশন প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতির নবীকরণ এবং আধুনিকীকরণের মূলধনের মূল্যও করতে পারে। প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতির মতো সম্পদে কতটা পুরোন কী অবস্থায় আছে এবং এদের স্থানান্তকরণের খরচার হিসাবও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই খরচ নগদ খরচ এবং ডি এফ সি ভ্যালু কমাবে। অরুণ শৌরীর বিলগ্নিকরণ মন্ত্রক এই পদ্ধতির সোচ্চার প্রশংসা করে যুক্তি দিয়েছেন 'এটি মূলধন মূল্য, ঋণের মূল্য, ইক্যুইটি মূল্য এবং বাজার মূল্য সম্পর্কেও সচেতন। এই সংস্থাটি যেখানে যাচ্ছে তার ঝুঁকির বিষয়টিও বিবেচনা করে। ব্যবসাটির ঝুঁকির ধারণার উপর ছাড়ের হার নির্ধারিত হয়।' শেষে সিদ্ধান্ত, 'ডি এফ সি পদ্ধতিই সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি।'

এন ডি এ সরকারের সরকারি ক্ষেত্র বিরোধী এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের পক্ষীয় নীতির সঙ্গে একাত্ম হয়েই বিলগ্নিকরণ মন্ত্রক নিশ্চিতভাবে সেই পদ্ধতিকে উপযুক্ত বলেছেন যা জাতীয়

সম্পদ গ্রাস করে ফেলছে। একথা উল্লেখ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সরকারের গ্রহণ করা ভ্যালুয়েশন পদ্ধতির ব্যাপারে সি এ জির দৃঢ় আপত্তি আছে।

বিলগ্নিকরণ নীতি ও পদ্ধতি নামক ম্যানুয়েলটিতে উল্লিখিত চারটি পদ্ধতির মধ্যে দুটোতে সি এ জি অন্তর্নিহিত ত্রুটি খুঁজে পেয়েছে। সরকার আদৃত 'ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো' পদ্ধতিতে বহু অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া গেছে। সি এ জি পুনরায় লিখেছেন 'আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন বিধি অনুসারে ডেপ্রিসিয়েটেড রিপ্লেসমেন্ট কস্ট হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি।'

এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এটা হলো পিএস ইউ গুলির সর্বদিকে উপযুক্ততার উদাহরণ। অপরদিকে এটা বিজেপি সরকারের দুর্নীতি গ্রস্ত মূল্যায়ন পদ্ধতির ফলে পি এস ইউ মূল্যায়নের মোট হিসাবে জাতীয় রাজস্বে বিপুল লোকসান চাপানো হয়েছে তা প্রকাশ করছে। বাজার পদ্ধতির দ্বিচারিতাও ফুটে উঠেছে । যে মুহূর্তে এন ডি এ সরকার বাজেটের মাধ্যমে তাদের ব্লুচিপ পি এস ইউ গুলিকে বিপুলভাবে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, মূলধনী বাজার তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে গেছে।

দেশের জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এবং সত্য গোপন করার জন্য সম্পূর্ণ সরকারি ক্ষেত্রের মোট লগ্নিতে কত ঋণ এবং ইক্যুইটির হিসাব স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়নি। ৩১- ৩-২০০০ অনুসারে সি পি এস ইউ তে মোট লগ্নি ২,৫২,৫৫৪.০০ কোটি টাকা যার মধ্যে আদায়ীকৃত ইক্যুইটি ক্যাপিট্যাল ৮২,৪৩৪.০০ কোটি টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ১,৬৮,১০৪.০০ কোটি টাকা। আবার মোট ইক্যুইটির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ হলো ৬৯,৫১৩ কোটি টাকা যার মূল্য ৮২.৪৩ শতাংশ এবং ঋণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ হলো মাত্রই ২৪.৭১ শতাংশ।

সেভাবেই মোট লগ্নির ফেরৎ, ইক্যুইটির ফেরৎ এবং ঋণের সুদ, কর ইত্যাদিবাবদ সি পি এস ইউ গুলির দেওয়া টাকা এসবও পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। এভাবেই পিএস ইউ গুলি দ্বারা অর্জিত লাভ এবং সরকারি রাজস্ব এর অবদান বিষয়ে একটি বিকৃত ছবি আঁকা হয়েছে। "নীট লাভ হিসাব হয় সুদ ও করের পর (পি এ টি অনুযায়ী) কিন্তু ভগ্নাংশটির হর মূলধন দ্বারা নিযুক্ত। এটা একটা স্ট্যাটিসটিক্যাল ভেলকি। যদি কেউ লবটিকে পিএটি হিসাবে ধরে তবে হর অবশ্যই হবে ইক্যুইটি মূলধন এবং মূলধন নিযুক্তি নয়। আর যদি মূলধন নিযুক্তি হর হয় তবে উদ্বৃত্ত হবে পিএটি এবং সুদ" (সি আই ই আর) অন্যভাবে বলা যায় যদি লগ্নিকে মোট মূলধন নিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয় তবে লাভ অবশ্যই ধরা হবে ঋণের সুদের আগে এবং যদি লাভ হিসাব করা হয় সুদ দেবার পর তবে মূলধনের ভিত্তি হবে ইক্যুইটি মূলধন, মোট লগ্নি নয়।

উপরিউক্ত মাপকাঠির ভিত্তিতে যদি পি এস ইউ গুলির আর্থিক কৃতিত্ব হিসাব করা হয় তবে একটা ভীষণ আশাব্যঞ্জক ছবি ফুটে ওঠে। ১৯৯৯-২০০০-এ পি এস ইউ গুলির অর্জিত নীটলাভ ১৪,৫৫৫ কোটি টাকা যা ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের ১৭.৬৬ শতাংশ এবং মূলধন নিযুক্তির ফেরতের ১৪% । বিগত বছরের তুলনায় নীটলাভ বেড়েছে ১০.২৪ শতাংশ। কর্পোরেট ট্যাক্স, এক্সাইজ ডিউটি, কাস্টমস ডিউটি ও অন্যান্য ঋণের সুদ ও ডিভিডেন্ট ইত্যাদি খাতে ১৯৯৯-২০০০ সালে রাজস্বে পি এস ইউ গুলির মোট অবদান ৫৬,৪৩৩ কোটি টাকা ঐ বছরই পি এস ইউ গুলি ৩৫,৮৯১ কোটি টাকার আভ্যন্তরীণ সম্পদ উৎপন্ন করেছে।

পি এস ইউ গুলির উপর এই চরম পর্যায়ের আক্রমণের সামনে বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা জাতীয় সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য দেশের ভিতরে ও বাইরে যে বেসরকারি মূলধন খাটতে আসছে তার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। সরকারি ক্ষেত্রের শিল্পগুলিকে বাঁচানোর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে এই তথ্যের বিবেচনা করে যে এটা অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা

দেয়, স্বনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নতি দেয় এবং অনুন্নত অঞ্চলে শিল্পের উন্নয়ন করে, কর্মনিযুক্তির প্রধান উৎস ইত্যাদি। এছাড়াও পি এস ইউ গুলির বেসরকারিকরণ ব্যাপক দুর্নীতির উৎস হয়ে উঠেছে। সেই জন্য বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমার্থবোধক।

শ্রম আইনের পরিবর্তন

সারা বিশ্বে বিশ্বায়ন নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো শ্রম আইন পরিবর্তন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের দ্বারা গৃহীত সামাজিক মাপকাঠির ফলে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কল্যাণমূলক এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাদের ন্যূনতম বাঁচার নিশ্চয়তা দিতে। ভারতেও একাধিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা এবং শ্রমঅধিকার অর্জন করা হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, যদিও এর নাগাল মাত্র শ্রমজীবীদের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এখন ভারতে বিশ্বায়নের আবির্ভাবের পর এম এন সি এবং ভারতের বড় বিজনেস হাউসগুলি এই বলে চিৎকার শুরু করেছে যে দেশের বর্তমান আইন কাঠামোটি তাদের বোঝাপড়ার ব্যবস্থার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভারতে প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলির রাষ্ট্রদূতেরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করছেন যে ভারতীয় শ্রম আইন ভারতে বিদেশী মূলধনের অবাধগতিতে বাধাস্বরূপ, যদিও এর অর্থ হলো আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় সমূহ নাকগলানোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পরিবর্তে সরকারি দপ্তরের বিশেষ করে অর্থমন্ত্রকের মুখপাত্র ভারতের মাটিতে দাঁড়ানো এই রাষ্ট্রদূতদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করছেন।

যখন ভারতে তাদের শর্তাদি চাপিয়ে দেয় তখন তাদের আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক মূল বক্তব্যই ছিল শ্রম আইন নমনীয়তা। ওদের দাবি হলো, বর্তমান শ্রম আইন শ্রমবাজারে এক কঠোরতা সৃষ্টি করে যা ভারতে লগ্নি বাড়ানোর পরিপন্থী। বাগবাহুল্যের প্রদর্শনী করে তারা চান নিয়োগ কর্তাদের সীমাহীন ক্ষমতা যাতে তারা মর্জি মতো যে কোনো শ্রমিককে কর্মচ্যুত করতে পারে।

ভারতের কিছু কিছু রাজ্য সরকারের পরিদর্শক প্রথা উঠিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতের ও বিদেশের নিয়োগকর্তাদের মর্জি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। যদিও কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত পরিদর্শকরা অর্থের বিনিময়ে পরিষ্কারভাবেই শ্রমআইন লঙ্ঘন করার অনুমতি দিচ্ছেন তবু অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমপরিদর্শন নীতিজ্ঞানহীন নিয়োগকর্তাদের নিয়মবহির্ভূত কাজকর্মকে প্রকাশে এনেছে। তা সত্ত্বেও নিয়োগকর্তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার জন্য শ্রম আইনের প্রয়োগ এড়িয়ে যেতে প্রশাসনিক আদেশে এই পরিদর্শন বন্ধ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইউ পি রাজ্য সরকার সমস্ত কারখানা পরিদর্শকদের নির্দেশ দিয়েছে যে, কোনো কারখানা পরিদর্শনের আগে অনুমতি নিতে হবে। নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের প্রদেয় পি এফ এবং ই এস আই-এর কয়েক হাজার কোটি টাকার বকেয়া থেকে বোঝা যায় যে নিয়মমাফিক কর্তব্যগুলি নিয়োগকর্তাদের প্রয়োগ করতে রাষ্ট্রযন্ত্র কতটা অপারগ। ৫৫টির বেশি কেন্দ্রীয় শ্রম আইন এবং ২০০-র বেশি রাজ্য আইন থাকা সত্ত্বেও প্রয়োগযন্ত্র রয়েছে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, ফলত দেশে শ্রম আইন কার্যত ধ্বংস হয়ে গেছে। যাইহোক, নিয়োগকর্তারা চান শ্রম আইনের থেকে সমস্ত অস্বস্তিকর দিকগুলি মুছে দিতে চান যাতে তারা শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ ত্বরান্বিত করতে পারে এবং প্রোজেক্টগুলির উচ্চহার নিশ্চিত করতে পারে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক শ্রী যশোবন্ত সিং তার ২০০১-২০০২ সালের বাজেট বক্তৃতায় নিয়োগকর্তাদের চাহিদামত 'শ্রম নমনীয়তা' আনতে শিল্পবিরোধ আইন এবং চুক্তিশ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও উচ্ছেদ) আইনে পরিবর্তন ঘোষণা করলেন। শিল্পবিরোধ আইনের চ্যাপ্টার ভি (বি) তে বলা আছে যে ১০০র বেশি শ্রমিক আছে এমন সংস্থায় কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই করতে গেলে অথবা কোন অংশ বন্ধ করতে গেলে সরকারের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন। শ্রী সিং যে সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে ঐ সীমা ১০০ থেকে বেড়ে ১০০০ হবে যার ফলে সংগঠিত ক্ষেত্রের ৯০ ভাগ শ্রমশক্তি ঐ আইনের ভি (বি) চ্যাপ্টারের আওতার বাইরে রয়ে যাবে। এই অবস্থার ফলে কর্মনিযুক্তি অনুমোদনের উপর মন্তেক সিং আলুওয়ালিয়ার প্রতিবেদনে পুরো চ্যাপ্টারটাই তুলে দিতে বলা হয়েছে।

দুটো প্রস্তাবই যে কোনো শ্রমিককে কোনো আইনি বাধা ব্যতিরেকে ছাঁটাই করবার পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়োগকর্তাদের দিচ্ছে। বর্তমানের আইন সত্ত্বেও বিশ্বায়ন আবির্ভাবের পর ভারতের নিয়োগকর্তারা স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্পের হাত ধরে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে কঠোরভাবে মানবসম্পদ হ্রাস করছে। স্বাভাবিক অবসরের ফলে শূন্য পদে লোকনিয়োগ বন্ধ রাখা ছাড়াও গীতকৃষ্ণণ কমিটির প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি মানবশক্তি ১০ শতাংশ করে কমাতে প্রধানমন্ত্রী প্রতিবছর ২ শতাংশ করে মানব শক্তি কমাবার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা বিভিন্ন রাজ্য সরকারও অনুসরণ করছে। এই পদ্ধতির ফলে বিভিন্ন কল্যাণ কর্মসূচী বাতিল হয়ে গেছে এবং ভারতের অভাবী জনতার সুযোগ সুবিধার সংকোচন ঘটেছে। ভারতের জনকল্যাণ রাষ্ট্র ভাবমূর্তি এর ফলে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের আরেকটি সংশোধনী প্রস্তাব হলো চুক্তি শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও উচ্ছেদ) আইনের মূল বিষয়ের পরিবর্তন যার ফলে বর্তমানে নিয়োগকর্তারা স্থায়ী এবং চিরকালীন ধরনের চাকরিতে কোন চুক্তি শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে না। এখন এই সংশোধনী প্রস্তাবে আছে যে একটা সংস্থার চাকরিকে আভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিভাগীয় এই দুভাগে ভাগ করা হবে। আভ্যন্তরীণ চাকরির সংখ্যা হবে নগণ্য এবং বেশিরভাগ চাকরিই বহির্বিভাগীয়। সংশোধনীর ফলে স্থায়ী কর্মীদের আভ্যন্তরীণ চাকরিতে নিয়োগ এবং বহির্বিভাগীয় চাকরিতে চুক্তি শ্রমিক নিয়োগের স্বাধীনতা নিয়োগকর্তাদের দেওয়া হবে। এভাবেই অধিগৃহীত শিল্প সংস্থার একটা বিরাট অংশ স্থায়ী ও চিরকালীন ধরনের চাকুরিতেও নিয়োগকর্তাদের চুক্তি শ্রমিক নিয়োগের অনুমোদন দিয়ে শ্রমনমনীয়তার সূচনা করা হবে।

যদিও ২০০১-০২ আর্থিক বছর শেষ হতে চললো, দেশজুড়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যৌথ শক্তিশালী প্রতিরোধের ফলে এই প্রস্তাবগুলি কার্যকর হতে পারেনি। এমনকী যে সব ট্রেড ইউনিয়ন এন ডি এ সরকারের আদর্শের অনুসারী তাদের দিক থেকেও এই সব বিলের বিরোধিতা এসেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফের চাপ আরো শক্তিশালী এবং ভারত সরকার কিছু ট্রেড ইউনিয়নের বিরোধিতা লঘু করার জন্য সামান্য সংশোধন করে বিলগুলি পাস করিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছেন। যাইহোক, মহারাষ্ট্র সরকার চুক্তি শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও উচ্ছেদ) আইনের ১০ ধারাটি সংশোধন করে শ্রম নমনীয়তার সূচনা করেছেন এবং একটি সংস্থার মাধ্যমে কিছু চাকরিতে চুক্তিশ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। যদি এই পদ্ধতি ট্রেড ইউনিয়নগুলি মেনে নেয় তবে দেশের অন্যান্য রাজ্যও পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে যার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে।

এন ডি এ সরকার শ্রমের উপর দ্বিতীয় জাতীয় কমিশন তৈরি করেছেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী ভাবে যার শর্ত এবং নির্দেশগুলো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত

করা হয়নি। ঐ কমিশনের সদস্যদেরও ভারত সরকার মনোনীত করেছেন বিশ্বায়নের প্রয়োজনীয় সুপারিশ নিশ্চিত রূপে কার্যকর করতে। এন ডি এ সরকার শ্রম আইন পরিবর্তন করতে এত তাড়ায় ছিল যে কমিশনের সুপারিশগুলি পেশ হওয়া পর্যন্তও তর সয়নি। বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ-এর চাপ দেশের এই সমস্ত বিষয়েও পরিলক্ষিত হচ্ছে। বোনাস দেওয়ার সর্বোচ্চ সীমানা তুলে দিতে এন ডি এ সরকার অস্বীকার করায় সরকারি ও সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মচারীরা এই আইনের বাইরে থেকে গেছে। এর ফলে বোনাস আইন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সি আই আই, এফ আই সি সি আই এবং অ্যাসোচেম তাদের দৃঢ় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে ক্ষতিতে চলা অংশগুলি বোনাস আইনের বাইরে থাকে। এন ডি এ সরকারের এই নীতির ফলে বোনাসের শ্রদ্ধাপূর্ণ বেতন ধারণাটিই বাস্তবে বাতিল হতে চলেছে।

ভারতের সর্বত্র অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী তাদের নিদারুণ কাজের পরিস্থিতির জন্য মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া কোনোরকম আইনি সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। এক দশকেরও আগে প্রতিশ্রুত কৃষিশ্রম আইন এখনও সূর্যালোক দেখেনি। বেশিরভাগ রাজ্যেই ন্যূনতম বেতন আইনটিই সাঠিকভাবে কার্যকর হয়নি। আই এল ও সম্মেলনের বাড়িতে থাকা শ্রমিকদের বিষয়টিও এখনও ভারত সরকার মঞ্জুর করেনি এবং ৫০ লাখের বেশি নারীশ্রমিক ঐ সম্মেলনে গৃহীত আইনী সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত।

এখনও আই এল ও-র সংগঠনের স্বাধীনতা, সংগঠিত হবার অধিকার এবং সংঘবদ্ধভাবে দরাদরির অধিকার সম্পর্কিত মৌলিক মাপকাঠিগুলি এন ডি এ সরকার মঞ্জুর করেনি যার ফলে লক্ষাধিক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিশেষভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরেরা কঠোরভাবে তাদের প্রাথমিক অধিকারকে অস্বীকার করছে।

গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্বীকৃতির দীর্ঘকালীন দাবিকে এখনও ভারত সরকার আইনগত আকার দেয়নি যার ফলে যেসব নিয়োগকর্তা শুধু তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠনের সঙ্গেই আলোচনা করতে পছন্দ করে তারা এক বিপুল সংখ্যক প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকৃতির অধিকার দেয়নি।

পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের বিলটি নিয়ে বিন্দুমাত্র অগ্রসর না হয়ে সরকার এটিকে ১০ বছরের বেশি ঝুলিয়ে রেখেছে। ১১টা প্রধান উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে পর্যালোচনা করে আই এল ও বিশেষভাবে উল্লেখ করছে যে বিশ্বায়নের পর্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তলানিতে এসে ঠেকেছে। ভারতেও এন ডি এ সরকার বর্তমান আইনি ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে বিধিবদ্ধভাবে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অধিকার হ্রাস করে ঐ অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে।

ভাষান্তর ঃ পাপড়ি গঙ্গোপাধ্যায়

বর্তমান সংকলনের জন্য লিখিত প্রবন্ধটির ইংরেজী শিরোনাম 'Globalisation and Working People' ।

বিশ্বায়নের অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের স্বরূপ

জয়তী ঘোষ

[এক]

কারখানায় পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিক স্থানান্তরকরণ এখন আলোচনার অন্যতম বিষয়। শুধু অর্থনীতিবিদদের নয়, সারা বিশ্বের নীতি নির্ধারক, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞেরও নজর কেড়েছে এই ঘটনা। এরকম একটি ধারণা ব্যাপকভাবেই ছড়িয়েছে যে, বিশেষ করে গত দশকে কারখানায় পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিক কাঠামোয় বড় আকারের পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বে কারখানায় উৎপাদিত পণ্য মোট যা রপ্তানি হয়, এই পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে তার প্রায় এক-চতুর্থাংশেরই অংশীদার নাকি উন্নয়নশীল দেশগুলি, দু'দশক আগেও যা ছিল এক-দশমাংশের সামান্য বেশি।

সাধারণভাবে এই স্থানান্তরকরণের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, বিশ্বের উত্তর অংশে উন্নত দেশগুলিতে কারখানায় পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ আসলে কমেছে এবং একই ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে দক্ষিণে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। বলা হচ্ছে, এই স্থানান্তরকরণের পিছনে দু'টি কারণ কাজ করেছে। প্রথমত, পুঁজির চলনশীলতা। সস্তায় যেখানে শ্রম পাওয়া যেতে পারে, বহুজাতিক সংস্থাগুলি সেখানে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যের উদারীকরণ, যা বিশ্বের দক্ষিণ অংশে উৎপাদিত পণ্যকে উত্তরাংশের বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। নিশ্চিতভাবেই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন স্থানে ভাগ করে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে তেমন ক্ষেত্রভিত্তিক দক্ষতার প্রয়োজন অনুযায়ী এর বিভিন্ন উৎপাদনকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। এর পরিণতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশের সমন্বিত ভৌগোলিক পৃথকীকরণের সুযোগ তৈরি হয়েছে, বেড়েছে আন্তঃশিল্প বাণিজ্য, ফিনস্টার মতে (১৯৯৮) যা 'উৎপাদনের খণ্ডীকরণ, (disintegration)।

অবশ্যই এই ঘটনার বিশাল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। উত্তরের শ্রমিকদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। তাঁরা মনে করেছেন, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের মাধ্যমে বিকট শব্দে তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ শুষে নিয়েছে দক্ষিণের গরিব দেশগুলো। উল্টোদিকে, দক্ষিণের শ্রমিক ও অন্যান্য অংশের মানুষের ধারণা; রপ্তানিমুখী

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উত্তরের মতো জীবনযাত্রার মানে পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে তাঁদের সামনে। তাঁরা যাতে সেই সুযোগ নিতে না পারেন, তার জন্য সংরক্ষণবাদী চাপের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে উত্তরের উন্নত দেশগুলিতে। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অংশে অনেক সময়েই নির্দিষ্ট জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতি এই ধারণা তৈরি করেছে। আবার প্রায়শই সেখানেই তার প্রতিফলনও ঘটছে। স্বভাবতই অর্থনীতিবিদদের চর্চার মধ্যে বিষয়টি স্থান করে নিয়েছে।

বস্তুত, উত্তর থেকে দক্ষিণ বিশ্বে* শিল্পপণ্য উৎপাদনমুখী চাকরির রপ্তানি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের কাজ শুরু হয়েছে বেশ আগেই। রক্ষণশীল মূলস্রোত এবং প্রগতিশীল অর্থনীতির ধারা, উভয়ের তরফেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একদিকে বিনস্টক (১৯৮৫) ও অন্যান্যদের লেখায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, অন্যদিকে ফ্রোয়েবেল, হাইনরিখ্‌স্ এবং ক্রায়ে তাঁদের লেখা (১৯৮০) বিভিন্ন নিবন্ধে তা তুলে ধরেছেন। একই বিষয়ে একটি বই লিখেছেন এড্রিয়ান উড (১৯৯৪)। উত্তর থেকে দক্ষিণ বিশ্বে সত্যিসত্যিই কী মাত্রায় চাকরির এ ধরনের স্থানান্তর ঘটেছে, বিশ্বের দুই অংশে তার কী প্রভাবই বা পড়েছে, তা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয় বইটি প্রকাশের পরে। এই বিষয়ে হেকসার-অলিন-স্টোলপার-স্যামুয়েলসনের যে ফলাফল পেয়েছেন, উড তাঁর বক্তব্যে সারবস্তুর দিক থেকে প্রাথমিকভাবে সেই ফলাফলকে তথ্যভিত্তিক সমর্থন জানিয়েছেন। উডের বক্তব্য ছিল, বাণিজ্যের বাধা হ্রাস এবং বহির্বাণিজ্যের উদারীকরণের ফলে বাণিজ্য ও উৎপাদনের ধাঁচ সেই পথেই যাবে, উৎপাদনের উপাদান ও বিনিয়োগকৃত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত পাওয়ার দিক থেকে তুলনামূলক সুবিধা যে দিকে বেশি। এই সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ার আরেকটি বিশেষ কারণ হলো, দক্ষতার মাত্রা অনুযায়ী শ্রমকে বিভিন্ন উৎপাদনের জন্য পৃথক করে ফেলা হয়েছে। উডের আরও বক্তব্য ছিল, বাণিজ্যের সম্প্রসারণ উত্তর ও দক্ষিণের শ্রম বাজারগুলিকে আরও ঘনিষ্ঠ ও কার্যকরীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। তবে তা কিন্তু উভয় অংশের মজুরির মধ্যে সমতা আনেনি। এইসঙ্গেই উড দাবি করেছেন, এই প্রক্রিয়ায় দক্ষিণে কাজের সুযোগ অনেকটাই বেড়েছে এবং তার মাধ্যমে বিশ্বের ঐ অংশে উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়েছে। উল্টো দিকে তাঁর মতে, উত্তর বিশ্বে এই ধরণের বাণিজ্যের জীবনযাত্রার গড় মাপ বাড়লেও এর ধাক্কা গিয়ে পড়েছে অদক্ষ শ্রমিকদের উপর এবং তাঁদের অনেকেই কাজ হারিয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে এযাবৎ যা আলোচনা হয়েছে, তার বেশিরভাগই উত্তর বিশ্বের শ্রমিকদের উপর এই প্রক্রিয়ার প্রভাবের উপরে আলোকপাত করেছে। বিতর্কের মূল বিষয়বস্তু হলো, এই প্রক্রিয়ার পরিণামে কতটা ক্ষতি হতে চলেছে উত্তর বিশ্বের এবং এর মোকাবিলার সর্বোত্তম উপায় কী (ঠিক যেমন বিতর্ক চলছে অদক্ষ ও কম দক্ষ শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সংরক্ষণবাদ বনাম প্রশিক্ষণের কৌশল নিয়ে)। শুধু এই প্রক্রিয়ার পরিণতির মাত্রা নিয়ে নয়, বিতর্ক চলছে চাকরির সুযোগ কমে যাওয়ার কারণ নিয়েও। এমনকি বাণিজ্য বা প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এক্ষেত্রে আরও বড় কোনো ভূমিকা পালন করেছে কি না, বিতর্কে উঠে এসেছে তাও। একপক্ষের মতে (যেমন, লিমের - ২০০০), সামগ্রিক উৎপাদনে শ্রমের প্রয়োজনীয়তাকে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি অবশ্যই নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কারণ, কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের থেকে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ উন্নত দেশগুলির মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জি ডি পি)-এর তুলনায় এখনও অনেক কম। আবার অনেকেই যেখানে মনে করছেন যে, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও বাণিজ্যের উদারীকরণ 'আপাতদৃষ্টিতে

** এক্ষেত্রে North বা উত্তর বিশ্ব বলতে আসলে বোঝায় আর্থিক দিক থেকে উন্নত দেশগুলিকে। তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার মতো দক্ষিণ গোলার্ধের দেশও আছে। South বা দক্ষিণ বিশ্ব বলতে বৈষয়িক দিক থেকে অনুন্নত দেশগুলিকে বোঝায়। মেক্সিকো, চীন ইত্যাদি দেশও এই 'দক্ষিণ বিশ্বের' অংশ।*

সমতুল' এবং বাস্তবে এই দুই প্রক্রিয়া মিলেই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে, সেখানে উড-এর যুক্তি (১৯৯৪) হলো, দক্ষিণ বিশ্বের সস্তার শ্রমের উৎপাদন যে বাণিজ্য প্রাতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করেছে, উত্তর বিশ্বে তারই প্রতিক্রিয়ায় কম শ্রমেই কাজ হবে, এমন প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের উদ্ভব ঘটেছে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশেষত কম দক্ষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ বাড়ায় সেখানকার শ্রমিকদের উপর এ ধরনের বিশ্ব সংহতির প্রভাবকে সাধারণভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইতিবাচক বলে মনে করা হয়। উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনীতিবিদরাও এই ধারণা পোষণ করে থাকেন। অথচ উত্তর বিশ্বের অদক্ষ শ্রমিকদের উপর এর বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য বলে যে অনুমানভিত্তিক বক্তব্য প্রচার করা হয়ে থাকে, ঐ অর্থনীতিবিদরা তার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে থাকেন। বস্তুত, চাকরি 'রপ্তানি'র ধারণার মধ্যেই নিহিত আছে এই বক্তব্যের যুক্তি। উত্তর বিশ্ব থেকে চাকরি যখন রপ্তানি করা হচ্ছে, ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে, অন্য কোথাও তা 'আমদানি' করা হচ্ছে। নিশ্চিতভাবেই দক্ষিণ বিশ্বই সেই জায়গা। অর্থাৎ, কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কম দক্ষতার প্রয়োজন হয়, উত্তর বিশ্বে এমন চাকরির সংখ্যা যদি আদতে কমে গিয়ে থাকে, তাহলে মনে করা যেতে পারে যে, এ ধরনের চাকরির দিক থেকে কার্যত লাভবান হয়েছে দক্ষিণ বিশ্ব।

একদিক থেকে বিষয়টি অনুধাবন করা খুবই সহজ। পণ্য উৎপাদন যদি স্থানান্তরিত হয়ে থাকে এবং সেই সূত্রে বিশ্বের এক অংশে যদি চাকরির সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে খুব সম্ভবত সেই ধরনের চাকরির সুযোগ অন্যত্র বেড়েছে, বিশেষত বিশ্বের যে অংশে পণ্য উৎপাদন বেশি বেশি করে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ঠিকই, বিশ্লেষকরা সহজেই এই ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকাংশের প্রকৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মিলছে না।

এই সময়ের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অন্যতম প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য হলো, ক্রমসম্প্রসারিত উদারীকরণ এবং লগ্নির মাধ্যমে মূলধনী বাজার ও বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য বাজারের একীকরণ। উন্নয়নশীল দেশগুলির বেশিরভাগের অভিজ্ঞতা বলছে, এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এইসব দেশে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাপক মাত্রায় কমেছে। বস্তুত, কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কত চাকরি তৈরি হয়েছে বা চাকরির সুযোগ কতটা বেড়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, চাকরি সব গেল কোথায়? পাশাপাশি আরেকটি বক্তব্যও প্রচার করা হয়ে থাকে যে, বাণিজ্যের ধরন যখন উত্তর বিশ্বে শ্রমের দক্ষতার উপরে জোর বাড়িয়েছে, তখন দক্ষিণ বিশ্বে কমিয়েছে নিশ্চয়ই। নিদেনপক্ষে আগের তুলনায় নিশ্চয়ই অদক্ষ ও কম দক্ষ কাজ পাওয়ার সুযোগ বেড়েছে দক্ষিণ বিশ্বে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু এই বক্তব্যের সঙ্গেও মিলছে না।

এবার এই বিষয়গুলিকে আমরা খতিয়ে দেখব। সাম্প্রতিক অতীতে যেসব উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকে অধিকতর সম্ভাবনাময় ও 'গতিশীল' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেইসব দেশে কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ কীভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, তার নিরিখেই নিবন্ধের বাকি আলোচনা। অমরা দেখব, ক্ষেত্রবিশেষে কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি বা হ্রাসের প্রশ্নে কী কী গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতার লক্ষ্য করা গেছে। আমরা জানার চেষ্টা করব, বাস্তবে প্রথম বিশ্ব থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এ ধরনের কাজের সুযোগ কতটা স্থানান্তরিত হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে বললে, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতার প্রকৃত চিত্রকে এখানে বিশ্লেষণ করা হবে। সবশেষে সমসাময়িক পুঁজিবাদের গতিশীলতা সম্পর্কে বৃহত্তর বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বাস্তব ঘটনার ব্যাখ্যা আসবে আলোচনায়।

[দুই]

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কারখানায় পণ্য উৎপাদনের বিশ্ব বাণিজ্যকে উন্নয়নশীল দেশগুলির দিকে অনেকটাই ঝুঁকে পড়তে দেখা গেছে। ১ নম্বর সারণী অনুযায়ী, ১৯৮০ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের বিশ্ব রপ্তানিতে উন্নয়নশীল দেশগুলি একটি গোষ্ঠী হিসাবে তাদের অংশীদারি আড়াই যুগ বাড়িয়েছে। তার ফলে এ ধরনের মোট রপ্তানির এক-চতুর্থাংশেরও বেশি অংশীদারিত্বের দখল নিয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলি। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই এই বৃদ্ধির সিংহভাগের দাবিদার। আবার একথাও মনে রাখতে হবে যে, সারা বিশ্বে কারখানায় উৎপাদনের মূল্যানুপাতিক সংযোজনে উন্নয়নশীল দেশগুলির অংশীদারি যে হারে বেড়েছে, তা রপ্তানিতে তাদেব অংশীদারি বৃদ্ধির হারের তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় কম। এর অর্থ, উন্নয়নশীল দেশগুলির আয় বাড়লেও তা তাদের রপ্তানি উদ্যোগের ফলাফলের তুলনায় কম বেড়েছে। অন্যদিকে, ঐ সময়ের মধ্যে কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিতে শিল্পোন্নত দেশগুলির অংশীদারি কমলেও (৮২ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৭১ শতাংশ) কারখানায় উৎপাদনের আয়ে তাদের অংশীদারি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে (৬৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৩ শতাংশ)। অর্থাৎ, শিল্পোন্নত দেশগুলি বাণিজ্যে অধোগতি প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে আয় করেছে বেশি। উল্টোদিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলি রপ্তানি বাড়িয়েছে, কিন্তু কারখানায় পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে সেই মাত্রায় নিজেদের আয় বাড়াতে পারেনি।

সারণী - ১

কারখানায় উৎপন্ন পণ্যের বিশ্ব রপ্তানিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির অংশীদারি (শতাংশে)

	কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের বিশ্ব রপ্তানিতে অংশীদারি		কারখানায় উৎপাদনের মূল্যানুপাতিক সংযোজনে (value added) অংশীদারি	
অঞ্চল/অর্থনীতি	**১৯৮০**	**১৯৯৭**	**১৯৮০**	**১৯৯৭**
সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ	১০.৬	২৬.৫	১৬.৬	২৩.৮
লাতিন আমেরিকা	১.৫	৩.৫	৭.১	৬.৭
দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া	৬.০	১৬.৯	৭.৩	১৪.০
নব্য শিল্পায়িত দেশগুলি	৫.১	৮.৯	১.৭	৪.৫
আসিয়ান-৪	০.৬	৩.৬	১.২	২.৬
চীন	১.১	৩.৮	৩.৩	৫.৮
ভারত	০.১	০.৫	০.৪	০.৫

সূত্র ঃ আঙ্কটাড-এর বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন, ২০০২।

কারখানায় পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলি সাধারণভাবে শ্রমনিবিড় পন্থা অনুসরণের চেষ্টা করে বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, এই চিত্র হয়তো তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উন্নয়নশীল দেশগুলির এই প্রবণতার কারণে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূল্যানুপাতিক সংযোজনও

কমের দিকে থাকে। আর তাই রপ্তানিতে অংশীদারি বৃদ্ধির মাত্রায় কারখানায় উৎপাদনের মূল্যানুপাতিক সংযোজনে অংশীদারি না বাড়লেও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কারখানায় উৎপাদনে কর্মসংস্থান মোটামুটিভাবে আনুপাতিক হারে বেড়েছে। তবে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার প্রশ্নে কিছু সমস্যা আছে। প্রথমত, কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলির আয় সেভাবে না বাড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বাণিজ্যে ক্ষতি। বাস্তবে বহু উন্নয়নশীল অর্থনীতিতেই রপ্তানির একক মূল্য হ্রাস পেয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে, কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির খেলায় যত বেশি বেশি সংখ্যায় উন্নয়নশীল দেশ অংশ নিচ্ছে, তত সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল বিশ্বাসের সমস্যা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক মূল্যস্তর হ্রাস পেয়েছে। এমনকি এই কারণে কারখানায় উৎপাদিত বেশ কিছু পণ্যে এমন বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে, যা সাধারণত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রাথমিক পণ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় (যেমন, আপেক্ষিক মূল্য হ্রাসের প্রবণতা এবং স্বল্পকালীন সময়ে দামের ওঠানামা)। দ্বিতীয়ত, কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানিতে যখন সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ প্রতিফলিত হয়, তখন ঐ উৎপাদনের মূল্যানুপাতিক সংযোজনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসলে মুনাফা হিসাবে চলে যায় সেইসব বহুজাতিক সংস্থার পকেটে, যারা এ ধরনের উৎপাদনের ব্যবস্থা করে থাকে। অধিকতর গতিশীল বলে যেসব রপ্তানিকারী দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের অনেকেব ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটেছে। তৃতীয়ত, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে খুব জোর দিয়ে একথাও বলা যাচ্ছে না যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কারখানায় উৎপাদন ক্ষেত্রে আর কিছু না হোক, মূল্যানুপাতিক সংযোজন ঘটায় কম, এমন ধরনের কার্যকলাপ অন্তত ব্যাপক বেড়েছে।

একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, কারখানায় পণ্য উৎপাদন ও সেই উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির বিষয় দু'টি অল্প কিছু উন্নয়নশীল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আশ্চর্যজনকভাবে ঐ দেশগুলিই আবার বিভিন্ন সূত্রে যথেষ্ট ভাল পরিমাণে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সুবিধাও পেয়েছে। অবশ্য রপ্তানি বৃদ্ধির উচ্চ হারের কারণে বা প্রভাবে বিদেশী পুঁজির এই প্রবেশ ঘটেছে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে এইসব দেশই কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের বিশ্ব রপ্তানিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির অংশীদারি বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এই দেশগুলির বেশিরভাগই পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত, অল্প কিছু অবস্থিত লাতিন আমেরিকায়। এমনকি বিশ্বের বাকি অংশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের হারে যে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, তারও মূল কৃতিত্ব তাদেরই। গত দু'দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি যা বেড়েছে, তার প্রায় সমস্তটুকুই দাবি করতে পারে ১৩টি দেশ। এই দেশগুলি হলো আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চীন, হংকং, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, ফিলিপাইন্স, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং থাইল্যান্ড। ১৯৮০ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সওদাগরী রপ্তানিতে এইসব দেশের অংশীদারি ছিল ৩৩ শতাংশ, ১৯৯৬ সালে তা বেড়ে হয়ে যায় ৭২ শতাংশ। আবার ঐ একই সময়ের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানিতে তাদের অংশীদারি ৭৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৮ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যে পরিমাণ সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ হয়েছে, তাতেও তাদের অংশীদারি বাড়তে বাড়তে শীর্ষে চলে গেছে। ১৯৭০-এ যা ছিল, তার প্রায় দ্বিগুণে পরিণত হয়ে ১৯৯৫ সালে ঐ অংশীদারি পৌঁছেছে ৮২ শতাংশে।

সুতরাং কারখানায় উৎপাদন ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ যদি কোথাও স্থানান্তরিত হয়ে থাকে,

তাহলে নিশ্চয়ই তা হয়েছে এইসব দেশে। কারণ, সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ মিলে কারখানায় উৎপাদিত পণ্য যা রপ্তানি করে, তার সিংহভাগ অংশীদারি তো তাদেরই। সেক্ষেত্রে অন্যত্র বদ্ধদশা বা বিশিল্পায়নের অর্থ, শ্রমের যে বিভাজন চলে আসছে, অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশের ক্ষেত্রে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ঐসব দেশে প্রাথমিক পণ্যের রপ্তানি আরও উন্নত দেশ থেকে কারখানায় উৎপাদিত পণ্য আমদানির খরচ যুগিয়ে চলেছে।

সারণী ২

কারখানায় পণ্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বাৎসরিক হার, ১৯৮৫-৯৯

	(শতাংশের হিসাবে)
আমেরিকা	০.১
ব্রিটেন	– ১.৫
জার্মানি	– ১.৯
ইতালি	– ০.২
জাপান	– ০.৬
আর্জেন্টিনা	– ২.৪
ব্রাজিল	– ৫.৭
চিলি	৩.৮
মেক্সিকো	– ০.৩
চীন	৩.১
ভারত	২.৩
মালয়েশিয়া	৭.৮
ফিলিপাইন্স	৫.১
দক্ষিণ কোরিয়া	– ০.১
তাইওয়ান	– ০.২

সূত্র : ইউনিডো-র রিপোর্ট, দেশভিত্তিক শিল্প সংক্রান্ত তথ্য।

২ নম্বর সারণীতে ইউনিডো-র রিপোর্ট থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের কারাখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সম্পর্কে তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, আশানুরূপভাবেই শিল্পোন্নত দেশগুলিতে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির হার কম থেকে ঋণাত্মক। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির দিক থেকে যেসব উন্নয়নশীল দেশকে রীতিমতো গতিশীল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেইরকম বেশ কিছু দেশেও চিত্র একই। অথচ এ ধরনের উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের নতুন ঠিকানা বলেই মনে করা হয় ঐসব দেশকে। একথা ঠিকই যে ১৯৮০-র দশকের শুরু থেকে সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে চীন, মালয়েশিয়া এবং চিলির মতো কয়েকটি দেশে কাবখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান অনেকটাই বেড়েছে। তবে বেশ কিছু 'সফল রপ্তানিকারী' দেশে এই পর্বে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে কম থেকে মাঝারি হারে। আবার এই পর্বেই ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, এমনকি মেক্সিকোয় এ ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রকৃত সংখ্যার দিক থেকেই বেশ কমে গেছে। ১ নম্বর সারণী অনুযায়ী, কারখানায় পণ্য উৎপাদনের আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় স্থানান্তরিত হয়েছে। বাস্তবে কিন্তু

এই স্থানান্তরের তুলনায় আশানুরূপভাবে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগের উৎসাহব্যঞ্জক বৃদ্ধি ঘটেনি। যেটুকু বৃদ্ধি ঘটেছে, তাও অল্প কিছু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। আরও লক্ষ্যণীয় ঘটনা হলো, 'গতিশীল' রপ্তানিকারী বলে চিহ্নিত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ যেটুকু সম্প্রসারিত হয়েছে, তার ৯০ শতাংশই বেড়েছে সর্বসাধারণতন্ত্রী চীনে।

সারণী ৩

কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে বেতনভোগী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির হার (শতাংশে)

দেশ	সময়	বৃদ্ধির বার্ষিক হার
চীন	১৯৮৫-৯৪	৪.৮
মালয়েশিয়া	১৯৮১-৯৪	৭.৩
ইন্দোনেশিয়া	১৯৮০-৮৯	৯.৮
থাইল্যান্ড	১৯৮১-৯৩	৭.৩
ফিলিপাইন্স	১৯৮১-৯৩	০.৯
দক্ষিণ কোরিয়া	১৯৮০-৯০	৪.৪
ভারত	১৯৮০-৯০	১.৪
শ্রীলঙ্কা	১৯৮০-৯৭	২.৮
ব্রাজিল	১৯৮৫-৯৮	-৬.৮
কলম্বিয়া	১৯৮০-৯৭	০.৪
মেক্সিকো	১৯৮৫-৯৮	২.৯
কেনিয়া	১৯৮০-৯৭	২.৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯৮০-৯৩	-০.১
জিম্বাবোয়ে	১৯৮০-৯৭	১.৩

সূত্র ঃ আই এল ও-র ইয়ারবুক থেকে গণনাকৃত।

৪ নম্বর সারণীতে শুধুমাত্র কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রের বদলে সামগ্রিকভাবে শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে (আই এল ও-র পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে)। এবং কী আশ্চর্য, ফের সেই একই চিত্র — কর্মসংস্থানের সুযোগ দ্রুত বেড়েছে শুধুমাত্র অল্প কিছু দেশে। একথা ঠিকই যে, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত হারে। পাশাপাশি চীনের মতো একটি বিশাল দেশে ঐ ক্ষেত্রে বছরে প্রায় ৫ শতাংশ হারে কর্মসংস্থান বেড়েছে। অবশ্যই এর অর্থ, সামগ্রিকভাবে চাকরির সংখ্যা যথেষ্টই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধি মূলত কেবলমাত্র চারটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সবথেকে গতিশীল রপ্তানিকারী দেশ বলে যাদের ভাবা হয়েছিল, তাদের অনেকগুলিতেই (যেমন, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান) কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে অত্যন্ত কম হারে, আর বাকি দেশগুলিতে খুব বেশি হলে মাঝারি হারে। আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বেশ কিছু বৃহৎ আধা-শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে ১৯৯০-র দশকে শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার আসলে ছিল ঋণাত্মক। এখানে আরও একটি চমৎকার তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হলো, রপ্তানির দিক থেকে সাম্প্রতিক অতীতে যেসব দেশ একেবারে সামনের সারিতে চলে এসেছে (যেমন চীন), সেসব দেশেও ১৯৯০-র দশকে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ক্রমশ

কমেছে। অথচ ঐ সময়েই কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি শীর্ষে উঠেছিল বলে প্রচার আছে। মনে রাখতে হবে, এই তথ্য 'সঙ্কট-পূর্ব' পর্বের। সুতরাং এশীয় আর্থিক সঙ্কট এবং তার পরিণতিজনিত মন্দাকে কিন্তু এর জন্য দায়ী করা যাবে না।

সারণী ৪

শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বার্ষিক হার (শতাংশে)

দেশ	১৯৮০-৯০	১৯৯০-৯৬
আর্জেন্টিনা	০.৯	— ৬.৭
ব্রাজিল	২.৩	— ০.৫
চিলি	৩.৮	৩.৮
কলম্বিয়া	২.১	৩.৩
মেক্সিকো	৩.৭	৩.৩
চীন	৬.৯	২.৮
ইন্দোনেশিয়া	৪.৪	৬.৮
মালয়েশিয়া	৪.৮	৬.৬
ফিলিপাইন্স	২.৫	৫.১
দক্ষিণ কোরিয়া	৪.৯	০.৯
তাইওয়ান	৪.২	০.১
থাইল্যাণ্ড	৬.৪	৭.৬
ভারত	—০.৭	১.৫
শ্রীলঙ্কা	৩.৪	৩.৪
কেনিয়া	২.৯	১.৪
দক্ষিণ আফ্রিকা	১.৯	— ১৯.৬
জিম্বাবোয়ে	২	৬.৫

সূত্র ঃ শ্রমের বাজার বিষয়ক আই এল ও-প্রণীত সূচক।

প্রাসঙ্গিক, এই তথ্য কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে বা শিল্পক্ষেত্রে মোট কর্মসংস্থানের নিরিখে শুধুমাত্র কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ সৃষ্টির চিত্র এইটি নয়। সুতরাং এই তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, রপ্তানি বৃদ্ধির কারণে একদিকে যেমন কিছু চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে, আরেকদিকে তেমনি বাণিজ্যের উদারীকরণের পরিণতিতে আমদানির ধাক্কায় অন্য চাকরির সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও উল্লেখ করা দরকার, যা প্রায়ই ভুলে যাওয়া হচ্ছে। তা হলো, কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে উত্তর বিশ্বের সঙ্গে দক্ষিণ বিশ্বের বাণিজ্য ঘাটতি আজও বর্তমান। অতএব কোনো এক পর্যায়ে দক্ষিণ বিশ্বে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগের নিট বৃদ্ধি যে আর ইতিবাচক হতে পারে না, এমন আশা করাই বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে পরে আবার আলোচনায় আসা যাবে। আপাতত এটুকুই বলার যে. চাকরির সুযোগ সৃষ্টি বা ধ্বংসের নিট সংখ্যাই উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে মূল বিচার্য বিষয়।

এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট যেসব দেশ কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের কারণে অত্যন্ত পছন্দের তালিকায় রয়েছে, সেইসব দেশেও কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের মাত্রা বিশ্ব বাণিজ্যে তাদের অংশীদারি বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়া আরও যে বিশাল সংখ্যক উন্নয়নশীল দেশ রয়েছে, যাদের অনেকের কথাই এই আলোচনায় আসবে না, তাদের নিয়ে বেশিরভাগ সমীক্ষার ফলাফলেই দেখা গেছে, বাস্তবে গত দশকে ঐসব দেশে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া হয় বদ্ধদশার শিকার হয়েছে অথবা সে সুযোগ আদতে কমে গেছে।

বেশিরভাগ সমীক্ষাতেই বাণিজ্যের প্রভাব বা স্থানান্তরিত সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের প্রভাবকে উপাদানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয়েছে। ঐসব সমীক্ষার মতে, উত্তর ও দক্ষিণ উভয় বিশ্বেই উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ধাঁচের মধ্য দিয়ে চাকরি স্থানান্তরের প্রক্রিয়া এগিয়েছে। এবং এই প্রক্রিয়ায় কারখানায় নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনের প্রশ্নে অধিকতর অদক্ষ শ্রমনিবিড় কার্যকলাপের জায়গায় পরিণত হয়েছে দক্ষিণ বিশ্ব, আর অধিকতর দক্ষ শ্রমের প্রয়োজন হয়, এমন কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত হয়েছে উত্তর বিশ্বে (উড, ১৯৯৮ ও ক্রুগম্যান, ২০০০)। এর ফলে অনেকেই ভাবছেন, অর্থনীতির দরজা যখন খুলে দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে, বাণিজ্যও যখন বেড়েছে বা বাড়ছে, তখন দক্ষিণ বিশ্বে (অথবা অন্তত সেইসব অর্থনীতিতে, যেখানে কারখানায় রপ্তানিমুখীপণ্য উৎপাদন তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় পৌঁছেছে) কারখানায় পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির গতি বাড়া উচিত। এবং উত্তর বিশ্বে তা হ্রাস পাওয়া উচিত।

তবে এই পরিণতি অবধারিত নয়। কারণ, হেকসার-অলিন-স্যামুয়েলসনের সূত্র অনুযায়ী বাণিজ্যের সবকটি অথবা অধিকাংশ শর্তের উপরে তা নির্ভর করছে। উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে পুঁজির পরিমাপ, উৎপাদনের উপকরণের সমহার মাত্রায় প্রতিদান, পূর্ণ প্রতিযোগিতা, ভারসাম্যযুক্ত বাণিজ্য ইত্যাদি পূর্বানুমানগুলিও এক্ষেত্রে কাজ করছে। আই এল ও এবং ইউনিডো-র তথ্য থেকেও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতা সংশ্লিষ্ট দেশগুলির একেকটিতে একেকরকম, আশানুরূপও নয়।

ব্যবহৃত তথ্য সম্পর্কে এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। অধিকাংশ গবেষকেরই জানা আছে যে, আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে যে তথ্যপঞ্জী দিয়ে থাকে, তা নিয়ে সমস্যা আছে, অনেক সময় এই তথ্য অত্যন্ত সন্দেহজনকও। কিসের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে, তাও সবসময় স্পষ্ট নয়। কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন বা মূল্যানুপাতিক সংযোজনের কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতা গণনার সময়ে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে যায়। কারণ, 'টাইম সিরিজ'-এর দিক থেকে কিছু ফাঁক থাকে। আবার সংগঠনগুলি 'টীকা' পদ্ধতি প্রয়োগ করে কিছু তথ্যের অভাবপূরণ করে, যা অনেকসময় বাস্তবসম্মত হয় না। এই ধরনের তথ্যই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। তার কারণ কিন্তু শুধু এই নয় যে, বৃহত্তর প্রবণতাকে চিহ্নিত করার জন্য ও আন্তর্জাতিক তুলনা টানার জন্য আমাদের কাছে এছাড়া আর কোনো তথ্য নেই। আসলে এইসব সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যই সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৫ নম্বর সারণীতে আই এল ও-র তথ্যের ভিত্তিতে আরও কিছু পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে। কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে মোট মূল্যানুপাতিক সংযোজনের পরিপ্রেক্ষিতে বাছাই করা কিছু উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ কী হারে বেড়েছে, এই সারণীতে তা দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয়ভাবে এখানে, যে কটি দেশের নাম রয়েছে, সবকটিতেই কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতা শূন্যর কাছাকাছি। স্বভাবতই এদের মধ্য থেকে কোনো একটি

দেশকে আলাদাভাবে বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। এমনকি এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে না যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ঐ স্থিতিস্থাপকতা বেড়েছে, আর উন্নত দেশগুলিতে কমেছে।

সারণী ঃ ৫

কারখানায় পণ্য উৎপাদনের কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতা

দেশ	১৯৮০-৯০	১৯৯০-৯৫
ইন্দোনেশিয়া	– ০.০০৫	০.০০১
দক্ষিণ কোরিয়া	০.০০৩	– ০.০০০১
তাইওয়ান	– ০.০০৩	০.০০৪
ভারত	– ০.৫৯	০.০০৪
ফ্রান্স	০.০০৩	– ০.০২
জাপান	০.০০৩	– ০.০০৫
ব্রিটেন	০.০০৭	– ০.০৩
আমেরিকা	–০.০১	০.০৪

সূত্র ঃ আই এল ও-র তথ্য।

আরেকটি তথ্যসূত্র হলো ইউনিডো। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে অর্থাৎ বিশ্বায়নের পর্ব যখন তুঙ্গে, সেই সময়ে বিভিন্ন দেশের কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতার মান কী ছিল, তা গণনা করার জন্য ইউনিডো'র তথ্যকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সময়ে কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন অনেক দেশই যুক্ত রয়েছে। এইসব দেশের মধ্যে যাদেরকে এই রপ্তানি ক্ষেত্রে বেশি সফল বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তাদের কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতাই আমাদের বিবেচ্য। প্রসঙ্গত, কারখানায় পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ বিশ্বে যেসব চাকরি স্থানান্তরিত হয়েছে বলে মনে করা হয়, সেইসব চাকরির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যস্থল বলেও ঐসব দেশকেই ধরা হয়। তবে বৃহত্তম ও সবথেকে সম্ভাবনাময় অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও চীনের সম্পর্কে এই তথ্য কিন্তু অমিল। অবশ্য উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অন্যান্য যেসব দেশ কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির দিক থেকে প্রথম সারিতে রয়েছে, তাদের সম্পর্কে এই তথ্য পাওয়া যায়। নিবন্ধের শেষে সংযোজনীতে ক-১ নম্বর সারণীতে দেশ ও ক্ষেত্রের নিরিখে ঐ তথ্যের ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক গণনার ফল উল্লেখ করা হয়েছে। দেখার বিষয় হলো, অধিকাংশ দেশের কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতাই কত কম! আরও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো, গণনায় বহু দেশেরই কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষত লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে। এমনকি যেসব দেশের কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্র সুনির্দিষ্টভাবে 'শ্রম-নিবিড়', সেসব দেশেও একই চিত্র। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, একই ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যেও কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতার দিক থেকে বিরাট ফারাক বর্তমান।

এই সারণীর কিছু সংখ্যাকে সামান্য বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। যেমন, দক্ষিণ কোরিয়ায় কেবলমাত্র সুতো ও বস্ত্র ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতার মান ১-এর থেকে বেশি, অথচ সে দেশে ঐ দু'টি ক্ষেত্রের শিল্পেই অধোগতি দেখা দিয়েছে। এই ফলাফলের কারণ, আলোচিত পর্বে মূল্যানুপাতিক সংযোজনের বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি উভয়েই ছিল ঋণাত্মক। অন্যদিকে, একই সময়ে যেসব ক্ষেত্রে মূল্যানুপাতিক সংযোজনের বৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ (যেমন, শিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য — বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১৩ শতাংশ), সেইসব

ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতার মান অত্যন্ত কম। একইভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রেও মূল্যানুপাতিক সংযোজন বেড়েছে অনেকটাই, কিন্তু কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতার মান বেশ নিচে থেকে গেছে। ফলে সব মিলিয়ে যখন দেখা যাচ্ছে যে, এই সময়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় শিল্পে বা কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে মোট কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির হার কম থেকে মাঝারির মধ্যে রয়েছে, তখন তা বিস্ময়কর নয়।

আবার এশিয়ার মধ্যে অন্তত কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রশ্নে মালয়েশিয়ার উপস্থিতি অনেকটা যেন 'বাঘ'-এর মতো। ঐ দেশে বছরে প্রায় ৭ শতাংশ হারে কর্মসংস্থান বেড়েছে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে। তবে ক-১ নম্বর সারণী থেকে স্পষ্ট যে, কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতায় তার প্রতিফলন ঘটেনি। বস্তুত, মালয়েশিয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই স্থিতিস্থাপকতার মান কম। আসলে শুধুমাত্র উৎপাদন ও মূল্যানুপাতিক সংযোজন বৃদ্ধিই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ার কারণে, যা সত্যিই নজর কাড়ার মতো। মালয়েশিয়ায় মাত্র দুটি ক্ষেত্রে মূল্যানুপাতিক সংযোজন বৃদ্ধির উচ্চ হারের সঙ্গে কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতার উচ্চ মানের সমন্বয় ঘটেছে। এই দুটি ক্ষেত্র হলো, প্লাস্টিক পণ্য এবং পেশাগত ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এশিয়ার যেসব দেশের কথা এখানে আলোচনার মধ্যে এসেছে, তাদের কয়েকটির কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রকে ব্যতিক্রম হিসাবে বাদ দিলে মূল্যানুপাতিক সংযোজনের দিক থেকে এমন ক্ষেত্রগুলিরই দ্রুত হারে বিকাশ ঘটেছে, যেসব ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতার মান কম। উল্টো দিকে, যেসব ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি তৈরি হয়েছে, মূল্যানুপাতিক সংযোজনের দিক থেকে সেসব ক্ষেত্রের খুব দ্রুত বিকাশ ঘটেনি। কয়েকটি দেশে অবশ্য সুতো ও বস্ত্র ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে, বাকি দেশগুলিতে তেমন ঘটনাও ঘটেনি।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, রপ্তানিমুখী উৎপাদনের সঙ্গে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকে যুক্ত করার এক ব্যাপক প্রয়াস চলছে। বাস্তবে পূর্ব এশিয়ার যেসব দেশ রপ্তানিতে ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে, ১৯৯০-র দশক জুড়ে সেগুলির অধিকাংশতেই মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৮০ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে এইসব অর্থনীতির অনেকগুলিতেই কর্মসংস্থানে মহিলাদের অংশীদারি যথেষ্ট হারে বাড়লেও পরবর্তী সময়ে মহিলাদের কর্মসংস্থান বদ্ধদশার শিকার হয়েছে। এমনকি অনেক জায়গায় তা কমেও গেছে। যেখানে যেখানে কমেছে, সেখানে শুধু মোট কর্মসংস্থানের অংশ হিসাবে কমেনি, সংখ্যায়ও কমেছে (ঘোষ, ১৯৯৯)। এর পিছনে নিশ্চয়ই জটিল কারণ রয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, এশিয়ার দেশগুলিতে একদিকে যখন মহিলাদের কর্মসংস্থান কমেছে, অন্যদিকে তখন মহিলাদের কাজের শর্তের মানোন্নয়ন ও মজুরির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে আইনী প্রচেষ্টা বেড়েছে। অর্থাৎ অন্যভাবে বললে বিষয়টি এরকম দাঁড়াচ্ছে যে, মহিলাদের আপেক্ষিক অবস্থান খুব খারাপ থেকে যত উন্নতির দিকে গেছে, তত মালিকপক্ষের কাছে সস্তা ও 'সহজবশ্য' শ্রম হিসাবে মহিলারা কম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও, যা অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমের সমন্বয়ের বদলে কিছু নির্দিষ্ট ধরনের দক্ষ শ্রমের উপরে নির্ভরতা বাড়িয়েছে। মনে রাখা দরকার, পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানিমুখী শিল্পপণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীরা আজ যে অবস্থার শিকার হয়েছেন, কাল আন্তর্জাতিক অর্থনীতির একটি গোষ্ঠী হিসাবে দক্ষিণ বিশ্বের সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীও সেই অবস্থার মুখোমুখি হতে পারেন।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যেসব দেশের কথা এখানে বলা হয়েছে, এই চিত্র সেখানে আরও করুণ। ঐসব দেশের প্রায় সব ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতার মান সব থেকে ভাল বলতে খুব কম, আর সব থেকে খারাপ বলতে অনেকটাই ঋণাত্মক। মাঝেমধ্যে যখনই কোনো ক্ষেত্রে

কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক হয়েছে, তখনই মূল্যানুপাতিক সংযোজন পরিবর্তনে ঋণাত্মক হার পরিলক্ষিত হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ব্রাজিলের কাঠজাত পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্র। (আমাজনের বনাঞ্চল ধ্বংসের সঙ্গে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের কথা যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে অবশ্য এই তথ্য মোটেই সুখপ্রদ নয়)। এমনকি যে চিলিকে এখন লাতিন আমেরিকার 'সাফল্যের কাহিনী' বলে তুলে ধরা হচ্ছে, সেখানেও অল্প কিছু ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতা বেশি। সেসব ক্ষেত্রেও কিন্তু সব সময়ে মূল্যানুপাতিক সংযোজনের উচ্চ হারে বৃদ্ধি ঘটেনি। ১৯৭০-এর দশকে চিলির অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। এখন চিলিতে কর্মসংস্থানের যে বিকাশ ঘটেছে, তার অর্থ আসলে চিলি ঐ পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং চিলির ঘটনাকে একটি যুগব্যাপী গতিশীল প্রবণতার অংশ বলে বিবেচনা করা যায় না।

একথা ঠিকই যে, নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ এবং ঐসব দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের অবশ্যই কিছু গুরুত্ব আছে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই তথ্যের থেকে অনেক বেশি প্রসঙ্গিক এর বিশ্লেষণমূলক ফলাফল। সাধারণভাবে অর্থনীতিবিদ এবং নীতি নির্ধারকরা মনে করছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সংহতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় বেড়েছে। তবে এই বক্তব্য খুব একটা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। বরং উন্নয়নশীল দেশগুলির বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক-কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষের ধারণা, শ্রমশক্তি যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাড়েনি। এমনকি এই ধারণাও ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে যে, মোট কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়তো কমে যাচ্ছে। বস্তুত, এই ধারণা বাস্তবের সাথে অনেকটা মিলেও যাচ্ছে। এমনকি রপ্তানি বাণিজ্যে সবথেকে 'গতিশীল' বলে চিহ্নিত বেশ কিছু অর্থনীতির বাস্তবতাও এই ধারণার পক্ষে। অর্থাৎ কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রের বেশ কিছু শিল্প স্থানান্তরিত হয়েছে ঠিকই, উন্নয়নশীল দেশগুলির সম্পদ দখল এবং তা ব্যবহারের উপরে বহুজাতিক সংস্থাগুলি সত্যি সত্যি ক্রমশ বেশি করে জোরও দিচ্ছে, কিন্তু উত্তর-বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-বিশ্বে কোন চাকরি রপ্তানি করেনি অথবা খুব কমিয়ে বললেও দক্ষিণ-বিশ্ব আসলে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ আমদানি করেনি। বরং কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রের বহু চাকরিই মাঝপথে কোথাও উধাও হয়ে গেছে!

[তিন]

প্রাথমিকভাবে এই চিত্র সাধারণ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত বলে প্রতীয়মান হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এই চিত্রের ব্যাখ্যা কী? কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রের চাকরি সত্যিসত্যিই গেল কোথায়? উত্তর বিশ্বে এ প্রসঙ্গে যত বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে, তার বেশির ভাগই বাণিজ্য ও প্রযুক্তির আপেক্ষিক তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করেছে। এদের কার তাৎপর্য কতটা, তা পরিমাপেরও চেষ্টা হয়েছে। বাস্তবে সাম্প্রতিক অতীতে একটি বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদের উত্থান ঘটেছে। বাণিজ্য ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের প্রক্রিয়া কী ধরনের হবে, এই উত্থানই তা ঠিক করে দিয়েছে। বাণিজ্য ও প্রযুক্তির মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও তৈরি করেছে। পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। উত্তর বিশ্বের অনেক আলোচনাতেই হয়তো এই বৃহত্তর প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই উন্নয়নশীল দেশগুলির দিক থেকে এই দ্বি-বিভাজনের দৃষ্টিতে বিষয়টিকে দেখে লাভ নেই। কারণ, বাণিজ্যের ধরন ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ধাঁচ, এই উভয় প্রক্রিয়ার মূলেই রয়েছে একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তা হলো, পুঞ্জীভবন ও কেন্দ্রীভবনের নির্দিষ্ট ঝোঁক, যা পুঁজিবাদী উত্থানের বর্তমান ধাপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানিতে দক্ষিণ বিশ্বের অংশীদারি বৃদ্ধি পাওয়ার পরিণতিতে বা সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ স্থানান্তরের জেরে দক্ষিণ বিশ্বে যে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ আশানুরূপভাবে বাড়েনি, তার তিনটি আশু কারণকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথম কারণকে ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রথমেই যে কথা আসবে, তা হলো, কোনো দেশের বহির্বাণিজ্য নিশ্চিতভাবেই একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। উত্তর বিশ্ব যেমন দক্ষিণ বিশ্ব থেকে আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে কারখানায় উৎপাদিত পণ্য আমদানি করছে, তেমনই দক্ষিণ বিশ্বের অভ্যন্তরীণ বাজারেও উত্তর বিশ্বের কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের আমদানি বেড়েছে। বস্তুত, গত দশকে সামগ্রিকভাবে উত্তর বিশ্বের সাপেক্ষে দক্ষিণ বিশ্বের বাণিজ্য তারতম্য ছিল ঋণাত্মক। এমনকি কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও চিত্রটা ছিল একই। সুতরাং স্থানান্তরের দুটি প্রক্রিয়া সমান্তরালভাবে এগিয়েছে। একদিকে, কিছু নির্দিষ্ট ধরনের পণ্য উত্তর বিশ্ব থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে দক্ষিণ বিশ্বে। অন্যদিকে, উত্তর বিশ্ব থেকে আমদানি হটিয়ে দিয়েছে দক্ষিণ বিশ্বের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে। আর গত দশকে প্রায় সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্যের উদারীকরণের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেগুলি এই প্রক্রিয়াকে নাটকীয়ভাবে ত্বরান্বিত করেছে।

উত্তর বিশ্বের প্রচলিত ধারণায়, উভয় ধরনের স্থানান্তরেই শ্রমনিবিড় কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে দক্ষিণ বিশ্বে এবং পুঁজিনিবিড় কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে উত্তর বিশ্বে। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা ঘটেনি, এমনকি সাধারণভাবে তা হয়তো আদৌ ঘটেনি। দক্ষিণ বিশ্বে যেসব পণ্য আমদানির উপর থেকে সদ্য নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছে (নিশ্চিতভাবেই উত্তর বিশ্বে ঐসব পণ্য উৎপাদন করা হয় পুঁজিনিবিড় প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে), তার অনেকগুলিই ক্ষুদ্র ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগসমৃদ্ধ অভ্যন্তরীণ উৎপাদকদের হটিয়ে দিয়েছে। ঐসব উৎপাদকের আবার আন্তর্জাতিক বাজারে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতাও নেই। এর পরিণতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে চাকরির যে সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে, অধিকাংশ দেশেই রপ্তানি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি তার পরিপূরক হয়ে উঠতে পারেনি। এমনকি যেসব দেশ রপ্তানি তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় বাড়াতে সক্ষম হয়েছে, সেসব দেশেও এই চিত্র দেখা যায়নি। ফলে আমদানির ধাক্কায় কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগের প্রকৃত বৃদ্ধি ঘটেছে কম। এমনকি কোথাও কোথাও দেখা গেছে, প্রকৃত বৃদ্ধি ঋণাত্মক।

দক্ষিণ বিশ্বে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের প্রশ্নে এই আপেক্ষিক বদ্ধদশার পরিপ্রেক্ষিতে একটিমাত্র বড় ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গণসাধারণতন্ত্রী চীন সেই দেশ। বস্তুত, এই সময়ে চীনে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ব্যাপক বেড়েছে। এর কারণ হিসাবে শুধুমাত্র শিল্প স্থানান্তরের ধারণাকে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। বাস্তবে দক্ষিণ বিশ্বে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যে চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে, এর সিংহভাগ সৃষ্টি করেছে চীন। বহু কারণেই এটি একটি বিশেষ ঘটনা। তবে প্রাথমিকভাবে এর কারণ, এখনও চীনের বহু শিল্পই রাষ্ট্রের মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন এবং আমদানি উদারীকরণের প্রশ্নে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় চীন অনেক কম পদক্ষেপ নিয়েছে। চীনে রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান অনেকটা বেড়েছে, একথা যেমন ঠিক, তেমনই সে দেশের অর্থনীতিতেও অন্যত্র কাজের সুযোগ কিছুটা নষ্ট হয়েছে। তবে খুব বেশি নষ্ট হয়নি। তার প্রথম কারণ, চীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় কারণ, চীনে আমদানির উদারীকরণ তুলনামূলকভাবে এখনও অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত, যার ফলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উৎপাদিত বহু শিল্পপণ্যই টিকে থাকতে পারছে। কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর প্রশ্নে চীন যে সাফল্য দেখিয়েছে, তার প্রশংসা করতে গেলে এই মৌলিক

অবশ্যই সামনে নিয়ে আসতে হবে। তবে ইতিমধ্যে চীন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউ টি ও) যোগ দিয়েছে। তার জন্য যদি সত্যিই আমদানিকে অনেকটা উদার করা হয় ('ঘোষিত' অবস্থানের বিরুদ্ধে গিয়ে) এবং বাস্তবে যদি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় ঘোষিত 'সংস্কার' প্রক্রিয়াকে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে চীনে কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের হাল কী হবে, তা স্পষ্ট নয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় প্রবেশের ফলে শুধুমাত্র পোষাক ও বস্ত্রশিল্পেই নতুন ১০ কোটি চাকরির সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হবে বলে চীনের কিছু সরকারি স্তর থেকে সম্প্রতি যে আশা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা বোধহয় অতি-ইতিবাচক বলেই প্রমাণিত হতে চলেছে।

কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়াকে ব্যাখ্যা করতে হলে দ্বিতীয় যে বিষয়টির কথা বলতে হবে, তা হলো, রপ্তানি সম্প্রসারণের কাঠামো সম্পর্কে ভুল ধারণা। উন্নয়ন নিয়ে আগে যেসব আলোচনা হয়েছে, তাতে এই কাঠামোর প্রকৃত চরিত্রের উল্লেখ থাকলেও 'বিশ্বায়ন'-কে ঘিরে উত্তেজনা যত ছড়িয়েছে, তত ঐ চরিত্রকে ভুলে যাওয়া হয়েছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, রপ্তানি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণকে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশই তাদের সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। পরে দেখা গেল, মৌলিক পণ্যের ক্ষেত্রে তা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সম্প্রতি বলার চেষ্টা হয়েছে যে, কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের উপর বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে যদি রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনা যায়, তাহলে এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে। ১৯৯০-র দশকের অভিজ্ঞতা বলছে, বাস্তবে তা ঘটেনি। উদাহরণ হিসাবে ১৯৯৪ সালে চীন রেন্‌মিন্‌বির (চীনের প্রচলিত মুদ্রা) যে অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছিল, তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। চীনের ঐ পদক্ষেপ রপ্তানি ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিগুলির প্রতিযোগিতার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছিল এবং তার ফলে তাদের রপ্তানিতে অধোগতি দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালে এই অধোগতিই যে ঐ অঞ্চলে সঙ্কটের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা সবারই জানা আছে অফিস সরঞ্জাম এবং বৈদ্যুতিন ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের মতো কিছু ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রপ্তানি যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার অর্থ, ১৯৯৬ সালের পরে এইসব ক্ষেত্রে রপ্তানিতে কয়েকটি দেশ (বিশেষত চীন, ফিলিপাইন্স) যে সাফল্য দেখিয়েছে, তা ঐ অঞ্চলের বাকি প্রায় সব দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল (ঘোষ ও চন্দ্রশেখর, ২০০১)। আঙ্কটাড-এর রিপোর্টে (১৯৯৯) উল্লেখও করা হয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলির কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানিতে বেশি বেশি করে মৌলিক পণ্য রপ্তানির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে শুরু করেছে, দেখা যাচ্ছে দামের ওঠানামা এবং কমে যাচ্ছে চাহিদার দামগত ও আয়গত স্থিতিস্থাপকতা। এক বিশাল সংখ্যক দেশ যেখানে রপ্তানিমুখী কার্যকলাপকে অর্থনৈতিক বিকাশের মূল ভিত্তি হিসাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে, সেখানে কেন খুব সীমিত সংখ্যক দেশই কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ আদতে বাড়াতে সফল হয়েছে, তার অন্তত আংশিক ব্যাখ্যা রয়েছে রপ্তানির কাঠামো সম্পর্কে যুক্তির এই ফাঁকে।

সবশেষে অবশ্যই আসবে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট। প্রযুক্তি যত এগোচ্ছে তত চরিত্রগত দিক থেকে তার শ্রম-নির্ভরতা কমছে। কোনো সন্দেহ নেই, উৎপাদনের ধাঁচেও এই পরিবর্তনের ছাপ পড়ছে। অবশ্যই শ্রম-সঙ্কোচনমুখী প্রযুক্তিগত পরিবর্তন পুঁজিবাদী বিনিয়োগের কোনো নতুন বৈশিষ্ট্য নয়, বরং অধিকাংশ পুঁজিবাদী আবিষ্কারের এটিই মৌলিক ধর্ম কিন্তু এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটছে অত্যন্ত দ্রুতলয়ে, তাই কর্মসংস্থানের উপর এর আরও সরাসরি প্রভাব এসে পড়ছে। তার অন্যতম কারণ, উৎপাদন যে পরিমাণে বাড়ছে, তা একক প্রতি শ্রমের ব্যবহার হ্রাসকে সামাল দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মনে রাখা দরকার, উন্নত এবং উন্নয়নশীল, সমস্ত দেশেই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের এই প্রভাব একইভাবে প্রতীয়মান। এর একমাত্র কারণ এই নয় যে, পুঁজিবাদের উত্তরাঞ্চলীয় কেন্দ্রগুলিই এখনও অতি মাত্রায় সমস্ত নতুন প্রযুক্তির

মৌলিক উৎস। পাশাপাশি এই কারণও কাজ করছে যে, পুঁজিবাদীরা যেসব লক্ষ্যে উত্তর বিশ্বে শ্রম-সঙ্কোচনমুখী প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী, দক্ষিণ বিশ্বেও পুঁজিবাদীরা সেই একই লক্ষ্য নিয়ে চলে, যদিও অনেক কম প্রকৃত মজুরির বিনিময়েই শ্রমিক পাওয়া যায় দক্ষিণ বিশ্বে।

এই নিবন্ধে আলোচিত প্রক্রিয়াগুলির পিছনে গভীরতর যে কারণ রয়েছে, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের এই দিকটি অনুধাবন করলেই তা বোঝা যাবে। যেসব প্রক্রিয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে, সেগুলিতে পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের মৌলিক প্রবণতাগুলিরই প্রতিফলন ঘটছে। পুঁজিবাদের গোটা ইতিহাস জুড়েই এই প্রবণতাগুলি বর্তমান, কখনও বেশি, কখনও কম মাত্রায়। পার্থক্য বলতে এখন এইসব প্রবণতা আরও সঙঘবদ্ধভাবে দ্রুত গতিতে আত্মপ্রকাশ করছে। আর সেই কারণেই এমন এক ধারণা তৈরি হচ্ছে, যেন নতুন ও আলাদা কিছু ঘটেছে। বাস্তবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। তাই পুঁজিবাদী উত্থানের এই নির্দিষ্ট ধাপ আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলির পুনরুত্থান ঘটানোর বা সেগুলিকে তীব্র করে তোলার অধ্যায় মাত্র, যাকে বলা যেতে পারে পুঁজিবাদের 'বিশ্বায়ন'-এর পর্ব।

এইসব প্রবণতার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো একীকরণ ও কেন্দ্রীভবন। একথা আজ মোটেই গোপন নয় যে, বিশ্বায়নের দশকে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের একীকরণে সবথেকে শক্তিশালী এবং সবথেকে উত্তাল কিছু স্রোত পরিলক্ষিত হয়েছে। পুঁজিবাদের ইতিহাস এইসব স্রোতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছে। অনেকেই একে ব্যাখ্যা করেছেন (যেমন, এপস্টেইন, ২০০০)। বিষয়টি এখন এত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার দরকার নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং জাতীয় সীমানার মধ্যে একীকরণ ও কেন্দ্রীভবনের যে স্রোত বয়ে চলেছে, কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ধাঁচের উপর তার প্রভাব কী, তা জানা খুবই জরুরী।

একীকরণের প্রক্রিয়া কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর অন্তত চারভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আর উত্তর ও দক্ষিণ, বিশ্বের উভয় অংশেই চাকরির পর চাকরি কেন উবে গেল, তার কারণও নিহিত রয়েছে সেখানেই। প্রথমত, একীকরণের মাত্রা বাড়লে প্রতিযোগিতামূলক চাপের তীব্রতাও বাড়তে বাধ্য। কার্ল মার্কস প্রথম একথা লিখেছিলেন, পরে লেনিন তা তথ্যপ্রমাণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্যই সে কথা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধির অর্থ, পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের 'স্বাভাবিক' প্রবণতাগুলি তখন আরও তীক্ষ্ণ ও আগ্রাসী হয়ে ওঠে। যেমন, শ্রমের পিছনে ব্যয় কমানোর নতুন নতুন রাস্তা খোঁজার জন্য চাপ বাড়তে থাকে।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক পুঁজির একীকরণের পরিণতিতে শুধু পুঁজির মধ্যেই প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে ওঠেনি, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে উঠেছে। তার প্রতিফলন ঘটছে বিভিন্ন দেশের সরকারের নানা পদক্ষেপে। পুঁজি দেখাতে চাইছে, তাকে পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। পুঁজি যত বেশি এই ভাব দেখাচ্ছে, তত বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে পুঁজি টানার প্রতিযোগিতা বেড়ে চলেছে। কর ছাড়, নিশ্চিত লাভের গ্যারান্টিসহ কে পুঁজিকে কতটা সুবিধা দিতে পারে, তা নিয়ে এক দেশ আরেক দেশের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। এর অর্থ, শ্রমিকদেরও যথেষ্ট 'নমনীয়তা' দেখাতে বলা হচ্ছে, যাতে পছন্দের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে মালিকপক্ষের কাছে তাঁরা খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেন। তাহলেই মালিকপক্ষ তাঁদের নিয়োগ করবে। বাস্তবে অল্প কিছু হাতে পুঁজির একীকরণ ঘটেছে বলেই পুঁজি প্রত্যাহারের হুমকি দেওয়া এত সহজ হয়ে গেছে, এ ধরনের বৃহৎ পুঁজিকে তুষ্ট করার প্রয়োজনীয়তাও আরও বেশি আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। বার্ক এবং এপস্টেইন-এর বক্তব্য অনুসরণে বলা যায়, পুঁজির একীকরণ বিনিয়োগকারী এবং উৎপাদকদের এ ধরনের হুমকির 'বিবর্ধক প্রভাব' তৈরি করেছে।

তৃতীয়ত, পুঁজির একীকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজির মিশ্রণ ঘটে অথবা তা ধ্বংস হয়ে যায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, উভয়স্তরেই ক্ষুদ্র পুঁজিকে বৃহৎ পুঁজির গিলে নেওয়ার প্রক্রিয়া কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে, এমন ক্ষুদ্র (তুলনামূলকভাবে) শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রের গুরুত্ব কমতে থাকে। পাশাপাশি বাড়তে থাকে বৃহৎ কুশীলবদের আধিপত্য, যারা নিয়োগ করে কম সংখ্যক লোককে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় একচেটিয়া পুঁজির বদ্ধদশাজনিত সুপরিচিত প্রবণতা, যা মোট চাহিদার উপর প্রভাবের মাধ্যমে পরোক্ষে কমিয়ে দেয় কর্মসংস্থানের সুযোগ।

চতুর্থত, উল্লেখ করতে হবে লগ্নি পুঁজির একীকরণের প্রসঙ্গ। বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে প্রভাবশালী ভূমিকা বিস্তার করেছে লগ্নি পুঁজি। এই লগ্নি পুঁজিও সামগ্রিক বদ্ধদশাজনিত প্রবণতাগুলিকে তীব্র করে তুলছে। আর কিছু না পারুক, লগ্নী পুঁজি অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ানো এবং আরও সমতাবাদী বণ্টনের ব্যবস্থা করার প্রশ্নে জাতিরাষ্ট্রগুলির হস্তক্ষেপের সক্ষমতাকে ক্রমশ সঙ্কুচিত করছে। বিভিন্ন দেশের সরকার নিজেদের কোষাগারীয় ঘাটতি সামাল দিতে চলমান লগ্নি পুঁজির দ্বারস্থ হচ্ছে, সেইসঙ্গে তাদের নামিয়ে আনতে হচ্ছে করের উচ্চ হার। কার্যত তা সরকারি ব্যয়ের পরিধিকে কমিয়ে দিচ্ছে। অনিবার্যভাবেই এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপরে।

পরিশেষে এই নিবন্ধের সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, দক্ষিণ বিশ্বে কর্মসংস্থানের প্রবণতাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ না করেই একথা প্রচারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে যে, উত্তর বিশ্বের প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলি দক্ষিণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আদতে চাকরি 'রপ্তানি' করছে। এমনকি এই প্রচার চালানোর সময়ে দক্ষিণ বিশ্বের সবথেকে গতিশীল রপ্তানিকারক দেশগুলিকে নিদেনপক্ষে একটি গোষ্ঠী হিসাবেও বিবেচনা করে কর্মসংস্থানের প্রবণতাকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে না। উত্তর বিশ্বের কারখানায় পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে বেশ কিছু চাকরির বিলোপ ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ বিশ্বে সমভাবে সেসব চাকরির পুনঃপ্রকাশ ঘটেনি। একথা ঠিকই যে, তুলনামূলকভাবে বেশি শ্রমনিবিড় বলে পরিচিত কিছু শিল্পপণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন (এবং কর্মসংস্থান)-এর স্থানান্তর ঘটেছে। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই অন্যান্য শিল্পপণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রের অবনতি তাকে ছাপিয়ে গেছে। এই অবনতির মূলে রয়েছে আমদানির প্রতিযোগিতা। তাছাড়া অধিকাংশ গতিশীল রপ্তানিকারক দেশেই রপ্তানিমুখী শিল্পপণ্য উৎপাদনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো, নতুন উৎপাদনের কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতা কম। তার ফলে কারখানায় পণ্য উৎপাদন বা শিল্পপণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক দেশে। এমনকি সেসব দেশেও বহু শিল্পপণ্যের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে আশানুরূপ গতিশীলতা দেখা যায়নি।

তিনটি কারণকে এর জন্য চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমত, বাণিজ্যের উদারীকরণ উন্নয়নশীল দেশগুলির শিল্পোৎপাদনকে আমদানির প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দিয়েছে। এর পরিণতিতে ধারাবাহিকভাবে হয়ে এসেছে, এমন বহু কার্যকলাপই স্তিমিত হয়ে গেছে। এতদিন যেসব শিল্পপণ্য সাম্প্রতিক আমদানির বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, সেগুলির উৎপাদনে এসেছে মন্দা। এইসব শিল্পপণ্যের বেশির ভাগের উৎপাদনেই তুলনামূলকভাবে বেশি শ্রমনিবিড় প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হতো। দ্বিতীয়ত, রপ্তানির কাঠামো সম্পর্কে ভুল ধারণা, যা উত্তর বিশ্বের বাজার থেকে স্বল্প সংখ্যক দেশের বাইরে আর কাউকেই সুবিধা আদায় করে নেওয়ার সুযোগ দেয়নি। তৃতীয়ত, প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের ধরন, যা রপ্তানি ক্ষেত্রে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান কর্মসংস্থানগত স্থিতিস্থাপকতাকে ছোটখাটো সাহায্যও করেনি।

বাস্তবে এই সমস্ত কিছুই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে উৎপাদনের একীকরণ ও কেন্দ্রীভবনের বৃহত্তর এক প্রক্রিয়ার পরিণতি। এই প্রক্রিয়া নানাভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কর্মসংস্থানের

সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সঙ্কুচিত করে চলেছে। ক্ষুদ্র পুঁজি, যা প্রতি একক উৎপাদনে বেশি শ্রম ব্যবহার করে, এই প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর পুঁজি সেই ক্ষুদ্র পুঁজিকে হয় গলাধঃকরণ করেছে, অথবা ধ্বংস করে দিয়েছে। তার ফলে আসলে কর্মসংস্থান কমেছে। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশ ও পুঁজির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক রেষারেষি বেড়েছে। তা আবার শ্রমের জন্য ব্যয় কমানোর নানা পথ খুঁজে বের করার প্রচেষ্টাকে উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন দেশের সরকারকে এমন ব্যয় থেকে হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য করছে, যে ব্যয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান বাড়াতে পারে, সামগ্রিকভাবে প্রসারিত করতে পারে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে।

সুতরাং পুঁজিবাদের বিশ্বায়নের পর্বে বাণিজ্যগত ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের যে ধরন পরিলক্ষিত হয়েছে, পুঁজির একীকরণের মৌলিক প্রক্রিয়াই তার উৎস। আবার বাণিজ্যগত ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনই এই পর্বে পুঁজির একীকরণের মৌলিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিশ্বায়নের পর্বে পুঁজির একীকরণের প্রক্রিয়া একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর মানে, বাণিজ্যের ধরনে ঠিক কী পরিবর্তন হয়েছে, কিংবা প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের চেহারা ঠিক কিভাবে বদলেছে, চাকরি বিলোপের সমস্যার সমাধান সেখানে খুঁজে লাভ নেই। সমাধানের জন্য এই সমস্যা বৃহৎ পুঁজির ক্ষমতাকে খর্ব করা ও নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করছে।

ভাষান্তর ঃ সুকান্ত দাশগুপ্ত

বর্তমান সংকলনের জন্য প্রেরিত মূল নিবন্ধটির শিরোনাম 'Exporting Jobs or Watching Them Disappear? Relocation, Employment and Accumulation in the World Economy'।

ভাবাদর্শ ও সংবাদ মাধ্যম

প্রভাত পট্টনায়ক
রবার্ট ম্যাকচেসনি
অঞ্জন বেরা
সীতারাম ইয়েচুরি
অশোক মিত্র
দেবু দত্তগুপ্ত

বাজার, নৈতিকতা এবং গণমাধ্যম

প্রভাত পট্টনায়ক

বর্তমান আলোচনায় গণমাধ্যমের ক্ষমতা সম্পর্কে আমার নিজস্ব ভাবনার প্রতি আপনাদের মনযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিভার জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিরা পেশাদার গণমাধ্যমের জগতে প্রবেশ করলেও প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণমাধ্যমের সাংগঠনিক ক্ষমতা ১৯৯০ দশকে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। একটি নমুনা দেওয়া যাক। সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন, উভয় গণমাধ্যমই (আমি এখানে শুধুমাত্র ইংরাজি ভাষার মাধ্যমের কথা বলছি) গুজরাট হত্যাকাণ্ড প্রচারের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত সততার সাথে, ন্যায়পরায়ণভাবে এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যার জন্য গণমাধ্যমের মানুষেরা গর্ববোধ করতে পারেন; আমরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই হত্যাকাণ্ডে রাজ্য সরকারের ন্যক্কারজনক ভূমিকার প্রকাশ এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করার বিষয়ে সমগ্র গণমাধ্যমের বক্তব্য ছিল এক। বাস্তবিকপক্ষে, নিকট অতীতে কোনো একটি ঘটনায় গোটা গণমাধ্যম এভাবে সহমত প্রকাশ করেছে কিনা, তা আমি মনে করতে পারছি না। তবুও, নির্লজ্জভাবে ঐ মুখ্যমন্ত্রী এখনও বহাল তবিয়তে গদীয়ান আছেন।

আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। তহলকা কাণ্ডে, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে যতই নৈতিক প্রশ্ন থাকুক না কেন, এই টেপ্-এ প্রকাশ পায়, আমাদের দেশের বড়মাপের রাজনৈতিক কর্তা-ব্যক্তিরা ও সামরিক কর্তারা একটি কল্পিত প্রতিরক্ষা চুক্তিতেও কিভাবে ঘুষের পরিমান নিয়ে দরাদরি করে। সশস্ত্র বাহিনী এই টেপের ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে, কয়েকজন কর্মরত আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। জড়িত রাজনৈতিক কর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হলেও, পরবর্তীকালে তা অসাড় কল্পনায় পরিণত হয়েছে। তুলনামূলকভাবে কম ক্ষমতাসম্পন্ন একজন দলীয় কর্তাকে বলির পাঁঠা করা হলেও সমস্ত রাঘব বোয়াল, এমনকি দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, কাউকেই তহলকা কাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে, অন্ততপক্ষে, রাজনৈতিক ভাবেও কোনো মূল্য দিতে হয় নি।

পাশাপাশি 'বোফর্স' কেলেঙ্কারির কথা আলোচনা করলে দেখা যায়, গণমাধ্যমে ঐ ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছিল। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর ঐ সরকারটি যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল, সেই লোকসভা ভোট-এ 'বোফর্স কেলেঙ্কারি' প্রধান বিষয়

ছিল; পাশাপাশি, ঐ কেলেঙ্কারি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে, তৎকালিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পদত্যাগ করেন এবং শাসক দলে বিষয়টি নিয়ে বিভাজন দেখা দেয় যা পরবর্তী ভোটে তাদের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। একটি ক্ষেত্রে (বোফর্স) গণমাধ্যমে প্রকাশিত ঘটনাবলীর জেরে সরকারের পতন ঘটলেও, অন্যক্ষেত্রে (তহলকা) সেরকম কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, যদিও নৈতিকতার প্রশ্নে, দুটো ঘটনাই সমতুল্য। গণমাধ্যমের ক্ষমতা হ্রাস বলতে, আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছি।

অন্যান্য কয়েকটি কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রেও একই রকমের অবনমন দেখা গেছে; উদাহরণস্বরূপ, 'কার্গিল কফিন কেলেঙ্কারি' (গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের সূত্র ক্যাগ রিপোর্ট); অর্থমন্ত্রীর মরিশাস কেলেঙ্কারি; বিদেশ সঞ্চার নিগম বিলগ্নিকরণ কেলেঙ্কারি; এবং সাম্প্রতিককালের ইউনিট ট্রাস্ট্রের পতন। এই সমস্ত ঘটনাই গণমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে; একদশক আগে হলেও, এই প্রকাশিত কেলেঙ্কারির জেরে রাজনৈতিক দায় স্বীকার করে অন্তত দু-একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করতেন, এইসব ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সরকারের দায়বদ্ধতার কথা জনগণের কাছে বলা হত। কিন্তু ১৯৯০-এর দশক থেকে, এইসব ঘটনা সমগ্র ব্যবস্থায় কোন আঁচড় কাটতে পারে নি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত এই ঘটনার কারণে কোন শাস্তিতো দূরে থাক, কয়েকদিন আগেও যা সম্ভব ছিল, বর্তমানে, তা অরণ্যে রোদন হয়ে দাঁড়িয়েছে; যদিও (বর্তমান) সরকার মনে করেন 'দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এই ধরনের সংবাদ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা উচিত নয়।

একটা সময় ছিল যখন তদন্তমূলক সাংবাদিকতা জনপ্রিয় ছিল এবং গণতন্ত্রের পরিধির আরও বিস্তার ঘটানোর জন্য প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তবুও, সত্যি কথা বলতে, তদন্তমূলক সাংবাদিকতা বলতে বিশেষ ধরনের 'কেলেঙ্কারি' প্রকাশ করাই বোঝানো হত। উড়িষ্যার জনজাতির মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্য পায় কিনা' এরকম 'পার্থিব' প্রশ্নে তদন্ত করার ব্যাপারে সংবাদ জগতে প্রবল অনীহা ছিল (শুধুমাত্র পি.সাইনাথ, এই বিষয়ে কাজ করেছেন)। তৎসত্ত্বেও, এই তদন্তমূলক সাংবাদিকতার দৌলতে গণমাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু, বর্তমানে, এই ধরনের সাংবাদিকতার প্রভাব অনেকটাই নিষ্ক্রিয় — যে সমস্ত ঘটনা এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়, প্রচলিত ব্যবস্থায় তা কোনোভাবেই আঁচড় কাটে না। ফলত, গণমাধ্যমের ভূমিকা এখন অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে বলা যায়।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মতে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রাচীর গড়ে তোলে; কোনো ব্যক্তি সমর্থন করুন বা না করুন, এই বক্তব্যের কিন্তু একটি অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। বৃহদাকারে প্রাণ হারানোর কোন সম্ভাবনা গণমাধ্যমে প্রকাশ পেলে, সাথে সাথে প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অতএব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংক্রান্ত এই বক্তব্য থেকে আহৃত সিদ্ধান্ত ঃ যেহেতু স্বাধীন সংবাদপত্র বৃহদাকার জীবন হানির সম্ভাবনা প্রকাশ করে, তাই এটা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সাহায্য করে। কিন্তু গুজরাটের ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই বক্তব্য আজকের ভারতবর্ষে সত্য নয়। যাদের উপর গণহত্যা প্রতিরোধ করার সাংবিধানিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, সেই গুজরাট রাজ্য সরকার, ঐ দাঙ্গায় প্রকাশ্যে মদত দিয়েছে; এই খবর সংবাদ মাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনেই প্রকাশ পেয়েছে। হয়ত দুর্ভিক্ষের মতো কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, কিন্তু তার কোনো ভরসা আজ আমরা দেখতে পারছি না। বাস্তবে, আমরা এমন এক সময়ের মধ্যে প্রবেশ করেছি, যখন গণমাধ্যমের ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। সাথে সাথেই প্রশ্ন ওঠে, 'কেন'?

কেউ তাকে সংবাদমাধ্যমের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে ভাবতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, এ

কথা বলা হয় যে, শুধুমাত্র সংখ্যার বিচারের পার্থক্যে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম (এবং মুদ্রণমাধ্যমও) সমস্ত 'বিপর্যয়'কেই সমান চোখে দেখতে চাইছে। এই প্রবণতা 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়' এবং 'মনুষ্য-প্ররোচিত গণহত্যার' মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে দিচ্ছে যার ফলে দর্শকমণ্ডলী (এবং পাঠকবর্গ) গণহত্যার ঘটনাতেও নিস্পৃহ হয়ে পড়ছে; অর্থাৎ সব ঘটনাই (গণহত্যা বা বিপর্যয়) সাধারণ মানুষের মূল্যবোধকে আঘাত করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

এই ধরনের 'অন্তর্নিহিত অর্থ'-এর পক্ষে কোন যুক্তি থাকুক বা না থাকুক, এই বক্তব্যও সম্পূর্ণ নয়। আজ শুধুমাত্র গণমাধ্যমের ক্ষমতাই হ্রাস পায় নি: সমগ্র বুদ্ধিজীবী সমাজের ক্ষেত্রেও এই অবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যখন দেশের প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিকদের অবদান নস্যাৎ করে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির (যার পরিচয় একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত হিসাবে) মতামত তুলে ধরা হয়, যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদের অবদান কতখানি এই বিতর্ক তোলেন 'অর্থনীতি' বিষয়ে অদক্ষ (দেশের) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে দেবার জন্য সুপরিচিত শিল্পী আর বুদ্ধিজীবীদের দাবি মানা হয় না, এবং যখন সমগ্র বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতিবাদ স্বত্ত্বেও যুদ্ধ-জিগির তোলা হয়, তখন বোঝা যায় কতখানি অবনতি ঘটেছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়।

জনগণের উপর গণমাধ্যম আর বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার কারণ হিসাবে যে বিষয়টি আমরা অনুধাবন করতে পারি, তা হল একটি ফ্যাসিবাদী সরকারের ক্ষমতা দখল: একটি সাম্প্রদায়িক ফ্যসিবাদী শক্তির নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট পরিচালিত সরকারের আমলে, এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না ঠিকই; তবু প্রশ্ন জাগে, কোনো হিংস্র একনায়কের পরিচালিত ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা এখনও কায়েম হয়নি, সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন সরকার ক্ষমতায় থাকলেও স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এখনও আমাদের বৈশিষ্ট্য, ফ্যাসিবাদী শক্তির সাথে সরকার পরিচালনায় সহযোগী হিসেবে আছে এমন কয়েকটি রাজনৈতিক দল যাদের কোনভাবেই ফ্যাসিবাদী বা অগণতান্ত্রিক বলা যায় না, তথাপি এমন অবস্থাতেও, গণমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবী সমাজের এরকম চরম ব্যর্থ, দুর্দশাগ্রস্ত পরিণতি কেন হল?

ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে বলা হয়, জরুরি অবস্থা উত্তর সময়ে, ১৯৮০ সালে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের চরম বিরোধিতার আশঙ্কায় তার সরকার পরিচালনায় সমস্যা হত। অথচ বর্তমান সরকার পরিচালনা করতে ক্ষমতাসীন দলের এই ধরনের বিরোধিতায় কোন অসুবিধার চিহ্ন দেখা যায় না? যদি এটা ঘটেই থাকে, তবে বুদ্ধিজীবী মহলের মতামতকে গ্রাহ্য না করার যে প্রক্রিয়া এরা চালাচ্ছেন, তা বাস্তবে সম্ভব নয়।

এই অগ্রাহ্য করার প্রবণতাকে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন এই ভাবে যে, সরকারের হিন্দুত্ববাদী শক্তি আর ক্ষমতায় ফিরে আসবে না জেনে, কোনো কিছুকেই গ্রাহ্য না করে, তাদের মতাদর্শের পক্ষে কাজ করে চলেছে। অন্য কথায়, এরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না বলেই সাময়িক ক্ষমতায় থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এদের সুদূর প্রসারী কার্যকলাপকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে সংক্রামিত করছে। কিন্তু এই যুক্তি অকাট্য নয়। ক্ষমতায় ফিরে আসতে ইচ্ছুক এরকম দল সরকার পক্ষে আছে; তাসত্ত্বেও বুদ্ধিজীবী মহলের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে না কেন? ইন্দিরা গান্ধীর ঐ জমানার সাথে আজকে কি পার্থক্য ঘটেছে?

এই অবস্থার মোটামুটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হিসাবে আমরা কখনই বলতে পারি না যে, মানুষের মানবিক মূল্যবোধ অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবী মহলকে অস্বীকার করার জন্য

একমাত্র দায়ী সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তি। বরং বাস্তব ঘটনা তার উল্টো; সাধারণ মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ হ্রাস পাওয়ার কারণেই গণমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবী মহলকে অবজ্ঞা করার ধৃষ্টতা এই সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদীরা দেখাতে পারছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর নির্ভরশীল দুটি ভিন্ন অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। বিষয়বস্তু দুটি ঃ সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান এবং নৈতিকতার অবনমন। অমরা প্রথমে দ্বিতীয় বিষয়টির দিকে তাকাই।

নৈতিক জগতে পরিবর্তন ঘটে গেছে বলার অর্থ এই নয় যে, মানুষের মনন নৈতিকতার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না; বাস্তবে নৈতিকতা সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে বৃহৎ মাত্রায় বিভ্রান্তিকর, অস্থির ও অস্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে।

'কোনটা ভাল' আর 'কোনটা মন্দ', এই বিষয়ে কোন সমাজেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থাকে না; বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। শুধু তাই নয়, যে কোনো সময়েই, 'ঠিক' এবং 'ভুল' সম্পর্কে কোনো একটি সমাজে একটি বিস্তারিত ধারণার প্রচলন থাকে, যা ঐ সমাজ ব্যবস্থাটিকে নৈতিক স্থিতিতে ধারণ করে। আবার, যে কোনো সময়েই নির্দিষ্ট মাত্রার স্পষ্টতা ও নিশ্চয়তা সহ 'ঠিক' ও 'ভুল' সম্পর্কে জনগণের ব্যক্তিগত ধারণাকে আধার করেই সমাজে একটি স্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে যে অবস্থাটি চলছে, তাতে আমি মনে করি, 'ঠিক' ও 'ভুল' সম্পর্কে জনগণের কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। যেভাবে আগে কোনো বিষয় ভালো-মন্দ অনুভূত হত, বর্তমানে, সেই পরিচ্ছন্নতা আর নিশ্চয়তা নিয়ে তারা সেই ধারণায় অটল থাকতে পারে না; পুরানো দিনের পুরানো মূল্যবোধের স্বচ্ছতা আর স্থিরতা নিয়ে, আজকের যুগে, নতুন কোনো মূল্যবোধেরও জন্ম হয়নি। অন্য কথায়, জনগণের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে নয় (যা সর্বদাই সত্যি, আজকের দিনে আরও বেশি সত্যি) 'ঠিক' আর 'ভুল' সম্পর্কে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে অস্থিরতা আর অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে, সেই কারণেই আমরা আজকে এমন সমাজব্যবস্থায় বাস করছি যেখানে স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়েছে। নতুন স্থিতিশীল ব্যবস্থা সৃষ্টির কোনো চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে ঃ এরকম কেন হল? এর একটা নিশ্চিত উত্তর হল, ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে সমাজ গড়ার স্বপ্ন বিপর্যস্ত হওয়া। কোনো কোনো সময়ে এই বিপর্যয় সাময়িকভাবে নেমে আসলেও, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতনের সাথে সাথে এই বিপর্যয় পুরোপুরিভাবে নেমে এসেছে। যে সমস্ত দেশগুলিতে এখনও সমাজতন্ত্র টিকে আছে, সেগুলি হয় কিউবার মতো খুব ছোট, নতুবা উত্তর কোরিয়ার মতো সমস্যা সঙ্কুল, বা চীনের মতো প্রচলিত পন্থা বিরোধী। ফলত সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতে কেউই উৎসাহিত হচ্ছে না। যাইহোক, এটা লক্ষ্যণীয় যে, 'লেনিনবাদী সমাজতন্ত্রে'র পতনের সাথে সাথে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র'কে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয়নি অথচ ভাবা হয়েছিল ঐ বিপর্যয় সামাজিক গণতন্ত্র আর অ-লেনিনবাদী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগমনী বার্তা; বিপরীতক্রমে ঐ দুই ব্যবস্থারও অবনমন ঘটেছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন এমনকী কল্যানকামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিপর্যয়ের সাথে সাথে লগ্নি পুঁজির বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা এবং সমাজ রূপান্তরের ক্ষমতা সম্পন্ন একমাত্র সংগঠন জাতিরাষ্ট্রের ধারণাকে মুছে দিচ্ছে, রাষ্ট্র ব্যবস্থার এই বিপর্যয় 'ঠিক' আর 'ভুল' সম্পর্কে মানুষের নিশ্চিত ধারণার ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

বস্তুতপক্ষে, বর্তমান সমাজে নৈতিকতার পরস্পর বিপরীত দুটি মূল্যবোধের পিছনে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন অনুঘটক হিসাবে কতটা ক্রিয়াশীল, তা নিয়ে তিনটি ভিন্ন ধারার মতামত আছে। প্রথমত, যা আমি এইমাত্র বললাম, স্থায়িত্বের পতন। শ্রেণী চেতনা এবং

আগেকার সমাজভাবনার দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে পূর্ব ধারণা; এই পূর্ব-ধারণা, অনুভূতি আর সংলগ্নতাকে যেভাবে প্রভাবিত করে সমাজ বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা— কোনটা 'সঠিক' আর কোনটাই বা বেঠিক, সেই সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালিত হয় সেই প্রভাব থেকেই। এখন সমাজ বিশ্লেষণের প্রচলিত কর্তৃত্বকারী বক্তব্যগুলি যদি পূর্ব ধারণার সাথে ব্যাপক ঐকমত্যে গড়ে ওঠে, তাহলে পরিচ্ছন্নতা আর স্থায়িত্বের পরিবর্তন ঘটে না এবং বৃহৎ সংখ্যক মানুষের 'সঠিক-বেঠিক' দৃষ্টিভঙ্গি একই থাকে।

কিন্তু প্রচলিত কর্তৃত্বকারী সমাজ ব্যাখ্যা ও পূর্ব-ধারণার মধ্যে সংযোগ ছিন্ন হলে, নৈতিক বিভ্রান্তি মাথা চাড়া দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে, আজ পর্যন্ত, এই ১৩০ বছর ধরে প্রচলিত, বৃহৎ সংখ্যক মানুষের শ্রেণী চেতনার সদর্থক, সাম্যবাদী সমাজ ভাবনার প্রভাব দীর্ঘ নৈতিক স্থিতি সৃষ্টি করেছিল, যা 'ঠিক' ও 'ভুল', এই দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি বিচার উপযোগী ব্যাপক প্রচলিত একগুচ্ছ সামাজিক ধারণার উত্তরণ ঘটায়। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতনের স্রোতে মিশে বর্তমান সময়ে গ্রাহ্য ও প্রভাবশালী অসাম্যবাদী সামাজিক ব্যাখ্যা, এই দীর্ঘস্থায়ী ধারণার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে পরিবর্ত ধারণা ব্যতিতই (এবং বৃহৎ সংখ্যক মানুষের শ্রেণী চেতনার পরিপন্থী বলে এই অসাম্যবাদী সামাজিক ব্যাখ্যা পূর্বের প্রচলিত ধারণার পরিবর্ত সহজে সৃষ্টি করতে পারবে না)। এই কারণেই আজকের দুনিয়ার এই উদাসীনতা আর নৈতিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

একটা উদাহরণ দিয়ে আমি আমার বক্তব্যকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। বুদ্ধিবৃত্তিগত ভাবে যারা বর্তমানে প্রভুত্ব করছে সমাজ সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যায় আয়ের বৈষম্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়। এই বক্তব্যের পরেই অর্থমন্ত্রী দরিদ্র জনগণের ওপরে করের বোঝা চাপিয়ে সংগৃহীত সম্পদ চালান করেদেন বিত্তবানদের ঘরে। আর এই হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় বিরাট পরিমাণ অর্থ হয় নিজের জন্য, নয় তার পার্টির জন্য গিলে নিচ্ছেন। এই মধ্য পথেব চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে কোনো অসম্মান, অপরাধবোধের বালাইও নেই তাদের। ধনীরাও কিছু মনে করেনা কারণ গরিবদের নিঃস্ব করে নিজেদের স্ফীত করার সম্পদ তারা পেয়েই চলেছে। আর দরিদ্র জনগণ এই আধিপত্যবাদী, অনৈতিকতাকে বৈধতা দেবার নতুন ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ফলে এই পুকুর চুরির বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের প্রতিবাদ হারিয়ে যায়। মধ্যবিত্ত সমাজও চুপ থাকে নৈতিক বিভ্রান্তির কারণে।

এই নৈতিক বিভ্রান্তির সদ্ব্যবহার করেছেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, টনি ব্লেয়ার। তার লেবার পার্টির বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে পার্টি ফাণ্ডের চাঁদার নামে নেওয়া বিপুল অঙ্কের ঘুষের বিনিময়ে লেবার পার্টি সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে ব্যবসায়ীদের (যাদের অনেকেই এশিয়া বংশোদ্ভুত) বেআইনি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। ব্লেয়ার বেহায়ার মতো উত্তর দিয়েছেন ঃ যদি ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে তবে ভুল কোথায়? বস্তুতপক্ষে, এই কাজের জন্য তার সরকারকে সাধুবাদ জানানো উচিত। লেবার পার্টিকে দেওয়া অর্থের ব্যাপারে তিনি বলেন, এটা পৃথক বিষয়; যে কেউই চাঁদা দিতে পারেন। যুক্তি হিসাবে ব্লেয়ারের বক্তব্য অকাট্য। আজকের সমাজের এই পরিবর্তনের কারণে কেউ যদি মনে করে যে সরকার ব্যক্তি-পুঁজিকে ক্ষমতাধর কবতে অবশ্যই সহায়তা দেবে (আগে যুক্তি দেওয়া হত, যদি বেসরকারী সংস্থাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে মাত্রাতিরিক্ত সাহায্য করতে হয়, ওটাকে সরকারী সংস্থা হিসাবে অধিগ্রহণ করা উচিত), তাহলে সে, ব্লেয়ারের বক্তব্যের বিরোধিতা করার নৈতিক জোর হারায়।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন নৈতিক সংবেদনশীলতাকে কিভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে তা বোঝার দ্বিতীয় পথ হল, আমি পূর্বে যে উদাহরণটি দিয়েছি। যদি কোন ঘুষের বিনিময়ে,

দরিদ্রদের বঞ্চিত করে ধনীদের সুবিধা দেওয়া হয়, তবে দরিদ্র সমাজ শুধু 'ঘুষ' বিষয়টি নিয়েই আলোড়িত হবে; কিন্তু যে ক্ষতি প্রকৃতপক্ষে তাদের হল, সে বিষয়ে তারা মাথা ঘামাবে না। (এবং, এই ক্ষতি করার জন্যই যে ঘুষ দেওয়া হয়েছে, এই যুক্তি ধোঁপে টিকবে না, কারণ বর্তমানে প্রচলিত সামাজিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই বঞ্চণা আরও বৃহৎ কোন ভালোর জন্য ধরা হয়েছে)। অন্যভাবে দেখলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর, দুনিয়াজোড়া শ্রমিকশ্রেণীর জীবিকা ও অধিকারের উপর যে তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, তাতে 'দুনীর্তি'র প্রচলিত ধারণায় সামান্য পরিবর্তনই দেখা যায়। এর বিরুদ্ধে শ্রমজীবি মানুষের আন্দোলন করার সময় নেই, কারণ আরও বড় বিপদ নেমে আসছে তাদের উপর।

তৃতীয় বিষয়টি আভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতার সাথে সংযুক্ত — সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অস্তিত্ব যখন ছিল, অসমাজতান্ত্রিক দেশের শাসকশ্রেণী এক ধরনের বাধ্যবাধকতার মুখোমুখি হত, যা এখন নেই। সেইসময়ে বিশ্বাস করা হত, শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা যদি জনপ্রিয় নীতি নামেনে চলে, তবে জনগণই তাদের ক্ষমতাচ্যুত করবে কিংবা গোটা শাসনব্যবস্থাই পাল্টে দেবে। শাসকশ্রেণীর উপর এই নিয়ন্ত্রণ এখন আর নেই।

যদি ক্ষমতালিপ্সু প্রতিটি শাসক গোষ্ঠীর মধ্যেই কমবেশী দুর্নীতির প্রবণতা থাকে তবে এক গোষ্ঠীর পরিবর্তে অন্যগোষ্ঠীকে ক্ষমতায় আসীন করা কোনভাবেই স্বাস্থ্যকর নয়; পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতনের ফলে 'সমস্ত শাসক গোষ্ঠী'কে উৎখাত করে অন্য সমাজ গড়ার বিশ্বাসেও আঘাত নেমেছে। এই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত থাকার কারণে শাসকগোষ্ঠী বাধ্যবাধকতার কোন প্রশ্নেই আর বিব্রত বোধ করে না।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অস্কার লাঙ্গে প্রায়শই বলতেন, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অস্তিত্ব ধনতন্ত্রকে সুস্থিত করে। এই বক্তব্য কতখানি সঠিক ছিল তা বিচার না করেও নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বের কারণেই ধনতন্ত্রের মাত্রাতিরিক্ত অনাচার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বাস্তবিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভয়'-এর কারণে প্রথম বিশ্বের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শাসকশ্রেণী, ব্যাপকভাবে 'কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা' গ্রহণ করেছিল। এই কারণে, সমাজতন্ত্রের পতনের পর, একচেটিয়া পুঁজিবাদী ধনতন্ত্র তার প্রভূত্ব বিস্তারে ন্যাক্কারজনকভাবে নেমেছে।

যাইহোক, এত কথা বলার পরেও, গণমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবী মানুষের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ব্যাখ্যা হিসাবে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন ব্যতিত, আমার মতে, কমপক্ষে আরও চারটি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমত, যা আমি পূর্বে বলেছি, সমাজতন্ত্রের পতনের ফলে ধনতান্ত্রিক দুনিয়াতেও ব্যপক পরিবর্তন ঘটেছে। যদি এই বিপর্যয় শুধুমাত্র সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তবে যে কেউই মনে করতে পারত ঐ ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্যই এই পতন ঘটেছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, সমস্ত সমাজতন্ত্রী দেশ, এমনকি, 'পুর্নবন্টনবাদী' তত্ত্বেরও বিপর্যয় ঘটেছে। শুধুমাত্র সোভিয়েত সমাজতন্ত্র নয়, 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র', কেইনসিয়ানতত্ত্ব, কল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা (যদিও কল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের গতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম), নেহরুবাদী সমাজতন্ত্র, এমনকি জাতীয়তাবাদসহ সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের নিজস্ব সমাজতন্ত্রেরও পতন আমরা দেখতে পাই।

আমাদের সমাজজীবনে এটা নিশ্চিতভাবে সত্যি যে, কোন একটি মতবাদের প্রচারক ব্যক্তি যদি কোন কারণে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে ঐ মতবাদটিও গ্রহণীয় হয় না; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মতবাদটির তাত্ত্বিক ভিত্তি অপরিবর্তিত থাকে, মতবাদটিকে নির্ভর করে নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়। এটা বাস্তব যে কেওয়ামি নক্রামার 'আফ্রিকান সমাজতন্ত্র'-এর

গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়, ক্ষমতা থেকে তার পতনের সাথে সাথে। কিন্তু, পাশাপাশি, নতুন কোন মতবাদের সৃষ্টিও হয় নি যাকে এই মতবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির পরিবর্তরূপে গ্রহণ করা যায়; এটা, আমার মতে, ভেবে দেখা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, অসাম্যবাদী তত্ত্বের বিজয় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে পূর্বনির্ধারিত করেছে; এর আলাদা ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। আমরা ফিরে যাই, রোনাল্ড রেগন ও মার্গারেট থ্যাচারের আমলের অ্যাংলো-স্যাক্সন বিশ্বে যেখানে দেখতে পাই বৃহত্তর ও আরও পরিবেষ্টিত কতকগুলি ধারণাগত পদ্ধতির অংশ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটেছে।

তৃতীয়ত, অসাম্যবাদী তত্ত্বের উদ্ভব ও সাফল্যের কারণ খোঁজা দরকার। নিশ্চিতভাবে এই মতবাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর ব্যবহার ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র, এমনকি, 'পুণবন্টনবাদী তত্ত্ব'কেও, অকার্যকর, কল্পণাপ্রসূত বলে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু অসাম্যবাদী তত্ত্বের উৎপত্তি আর চূড়ান্ত বৃদ্ধির পটভূমি ও বস্তুবাদী শর্ত কি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর পৃথকভাবে আলোচনা প্রয়োজন।

চতুর্থত বা পরিসমাপ্তিতে, সমাজতন্ত্রের পতনধর্মীয় ফ্যাসিবাদের উত্থানকে ব্যাখ্যা করতে পারে না; আমি পূর্বেই, গণমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের মতামতের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাওয়ার প্রসঙ্গে এটা বলেছি। এটা ঘটনা যে, সমাজতন্ত্রের ক্ষয়, ফ্যাসিবাদকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে নিশ্চিতভাবে সাহায্য করেছে; কিন্তু এর থেকে, ফ্যাসিবাদ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার ব্যাখ্যা মেলে না।

সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার পতন সহ সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিপর্যয়, অসাম্যবাদী মতাদর্শের উত্থান এবং আমাদের দেশ সহ, সারা দুনিয়ায় ফ্যাসিবাদের বাড়বাড়ন্ত — এই সমস্ত অঘটনাবলীকে, বৃহত্তর স্বার্থে, আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির প্রভাব দ্বারা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। 'আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি' বলতে সমগ্র বিশ্বের পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কোন একক প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজিকে বোঝায় না। 'আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি' পুঁজির যে গঠনতান্ত্রিক সত্তাকে বোঝায় তা হল একাধিক দেশের থেকে উৎসারিত দেশ নিরপেক্ষ পুঁজি, যা আন্তর্জাতিক ভাবে উচ্চ গতিসম্পন্ন (স্পেকুলেটিভ লাভ বা ফাটকা বাজারের লাভের মত কোন প্রত্যাশিত লাভের ক্ষেত্রে এর গতিশীলতা লক্ষণীয় হলেও, কোন নির্দিষ্ট জাতীয় কর্মসূচীর ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না), এবং সহজে নগদ টাকায় পরিণত করা যায় এমন আর্থিক সম্পদেই যা লগ্নিকৃত হয়। তবে বিষয়টি এমন নয় যে এই আর্থিক সম্পদকে কখনই বস্তুগত সম্পদে পরিণত করা যায় না; বাস্তবিকে, আর্থিক সম্পদের প্রতি এই আকর্ষনের অন্যতম কারণ, একে সহজেই বস্তুগত সম্পদ, যেমন, গুরুত্বপূর্ণ জমি, (বেসরকারিকরণ যুগে) বা রাষ্ট্রীয় সংস্থাতে (জলের দরে) পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু, পরিবর্তিত এই বস্তুগত সম্পদে স্থির থেকে তাকে উৎপাদনশীল সম্পদে পরিণত করার উদ্দেশ্যে আর্থিক সম্পদের এই পরিবর্তন করা হয় না। বরং এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ঐ সমস্ত বস্তুগত সম্পদ থেকে অর্জিত তহবিলকে স্পেকুলেশনে বা শেয়ার বাজারে ব্যবহার করা হয়। বাস্তবিকে, বহুজাতিক সংস্থা সহ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনশীল সংস্থা বলে মনে করা হত, তারা সকলেই এইসময়ে স্পেকুলেটিভ কার্যকলাপ বা ফাটকা বাজারের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ফলত, বহুজাতিক সংস্থাগুলি থেকে ভিন্ন কোন সত্তা নেই লগ্নি পুঁজির, যদিও এই সংস্থাগুলির বাইরেও বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে এই পুঁজির সঞ্চরণ।

'নতুন ধরনে'র আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির কথা আমি বলেছিলাম। লেনিন তাঁর "পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়, সাম্রাজ্যবাদ" গ্রন্থে যে লগ্নি পুঁজির কথা বলেছেন, এই

আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি তার থেকে পৃথক। এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্য প্রাপ্ত রাষ্ট্র-ভিত্তিক লগ্নিপুঁজি যা 'শিল্প পুঁজি ও ব্যাংকিং পুঁজির সম্মিলন' প্রকাশ করে; এই পুঁজি নিজেদের মধ্য শত্রুতা বজায় রেখে সমগ্র বিশ্বে বিভাজন ও পুনর্বিভাজন সৃষ্টি করে, এমন কি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে যেতে চায়। আমি যে আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির কথা বলছি তা এই ধারণার থেকে নিশ্চিতভাবে পৃথক এবং কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে গত দু দশক ধরে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে।

রাষ্ট্রের জনকল্যানমুখী ভূমিকা লগ্নি পুঁজির বিশ্বায়নকে ভীত করে এবং পুঁজির দ্রুত নিষ্ক্রমণকে নিরস্ত করে। সমাজতান্ত্রিক ও পুনর্বন্টণবাদী সমাজব্যবস্থার সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রের একটা ভূমিকা থাকে; 'লগ্নির বিশ্বায়ন'কে ভিত্তি করে জন্ম নেওয়া এই আন্তর্জাতিক পুঁজি রাষ্ট্রের এই ভূমিকাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। একই কারণে সাধারণ কেইনসিয়ানবাদী চাহিদা প্রসারও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। চাহিদার প্রসারের কারণে উদ্ভূত মুদ্রাস্ফীতি আর লেনদেন ব্যালান্সের সমস্যাকেই (এর ফলে বিনিময় হারের অবমূল্যায়ন ঘটে যার কারণে লগ্নি পুঁজির কাছে যে কোন অর্থনীতির গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়) শুধুমাত্র নয়, আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কর্মসংস্থানের রক্ষক হিসাবে রাষ্ট্রের ভূমিকাকেও লগ্নি পুঁজি, ভয় করে। (বাস্তবে লগ্নিপুঁজি মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসকেই পছন্দ করে, কারণ এর ফলে উৎপাদনক্ষম সংস্থা ও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদ জলের দরে কেনা যায়।) ইউরোপে গণতান্ত্রিক সরকারগুলি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও তা কেউই করতে পারে নি, এবং বর্তমানে, ইউরোপের বহুদেশেই দক্ষিণপন্থীদের কাছে এরা পরাজিত হচ্ছেন; ফলত 'বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন' করার হেতু লগ্নিপুঁজির বিশ্বায়নের স্রোতে গা ভাসিয়ে, সরকার তার সমস্ত কার্যকলাপের উপর নিজেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পুণর্বন্টননীতি থেকে সরকারের কাজকর্ম পরিহার করার সাথে 'সরকারী হস্তক্ষেপের পরিবর্তে বাজারিশক্তি'র প্রকাশ বা 'সরকারের পিছু হটে যাওয়া'কে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়। গোটা বিষয়টি থেকে বোঝা যায়, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকা হ্রাস পায়নি, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের গঠনগত পরিবর্তন ঘটেছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা এখন ভিন্ন ভাবে হস্তক্ষেপ করছে ঃ 'বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন' (অর্থাৎ যাতে লগ্নিপুঁজি বাজার থেকে না চলে যায়) হেতু, পুর্নবন্টননীতির এই হ্রাস ঘটানো হচ্ছে। সাধারণভাবে এর জন্য প্রয়োজন, শ্রমের পরিবর্তে পুঁজির প্রতি মনোযোগী, ক্ষুদ্র পুঁজির পরিবর্তে বৃহৎ পুঁজির প্রতি মনোযোগী আর উৎপাদনশীল পুঁজির পরিবর্তে লগ্নি পুঁজির প্রতি মনোযোগী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। (তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিষয় হল, দেশীয় পুঁজির পরিবর্তে বিদেশী পুঁজির প্রতি মনোযোগী ব্যবস্থা)। সুতরাং আমি যে নতুন ধারার আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির কথা বলছি, তার উত্থানের প্রভাবে, বৃদ্ধির হার হ্রাস পাচ্ছে, আর্থিক মন্দা ঘটছে আর নিশ্চল অর্থনীতিতে পরিণত হচ্ছে দেশগুলি, যার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় বাৎলাতে সরকার অক্ষম। এই বিষয়টির তিনটি রাজনৈতিক নিহিতার্থ আছে।

প্রথমত, এই ব্যবস্থা সমাজের সর্বত্র ফ্যাসিবাদী মনোভাব তৈরী করে. যা নিশ্চিতভাবে অর্থনীতিতে অতি মন্দা আর চরম বেকারত্ব বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি আমাদের মতো দেশে, এই ফ্যাসিবাদী শক্তি স্বাধীন গণতান্ত্রিক কাঠামোর অবসান ঘটিয়ে, লগ্নি পুঁজির আন্তর্জাতিক দালাল বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে আমাদের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিচ্ছে (এবং এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রক প্রধান ধনতান্ত্রিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব নষ্ট করছে)। যদি মানুষকে ধর্মোন্মাদনায় অন্ধ করে রেখে, মন্দির-

মসজিদ বিতর্কে আবদ্ধ করে রাখা যায়, তবে সাধারণ মানুষের বিরোধী নব-উদারীকরণ আর্থিক নীতি নিয়েও ভোটে জিতে ৫ বছরের জন্য গদীয়ান হওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থা সমস্ত ধরনের সমাজতান্ত্রিক ও উদার পুনর্বন্টন নীতি অবলম্বী প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের করুণ পরিণতির পথে এই ব্যবস্থার একটা ভূমিকা ছিল। বস্তুতপক্ষে, যেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটেছে, তা কখনই সংঘটিত হত না, যদি বৃহৎ মাত্রায় মূলধন (লগ্নিকৃত পুঁজি) ক্ষরণ (দুর্ভাগ্যজনকভাবে, রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার দ্বারা) না ঘটত; পুঁজির এই ক্ষরণ ঘটিয়ে, গোরবাচভের আমলে যে সমাজতান্ত্রিক সংস্কার শুরু হয়েছিল তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।

তৃতীয়ত, যে সকল রাজনৈতিক দল লগ্নি পুঁজির বিশ্বায়নের স্রোতের বিপরীতে চলতে ভয় পায়, তাদের সকলকেই পশ্চাদগামী পুনর্বন্টন নীতি গ্রহণ করতে, এই ব্যবস্থা বাধ্য করে।

নিশ্চিতভাবে, এই দুর্বলচিত্ততার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে কেউ হালকা চালে দোষারোপ করতে পারে না। লগ্নিপুঁজির বিশ্বায়নের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে জনসাধারণকে অনেক কৃচ্ছসাধন করতে হবে। যদি একবার কোন রাজনৈতিক শক্তির কর্মসূচীতে লগ্নি পুঁজির বিশ্বায়নের গ্রাস থেকে দেশকে উদ্ধার করার কথা বলা হয়, তবে ঐ দল ক্ষমতার কাছাকাছি লগ্নীকৃত সমস্ত মূলধন একেবারে উঠিয়ে নেওয়া হবে যার ফলে ঐ দল তার রাজনৈতিক জয়ের সম্ভাবনা হারাবে এবং যদিও বা নির্বাচিত হয়, তবে তার জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পাবে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, লগ্নি পুঁজির বিশ্বায়ন থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা যে রাজনৈতিক শক্তি করবে তার সাহস, স্থিতিস্থাপক মনোভাব ও জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক দরকার। যাই হোক লগ্নি পুঁজির বিশ্বায়নে প্রবেশ করার পর, তা থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে কি সমস্যা ঘটে তা বড় কথা নয়, এই ব্যবস্থায় থাকার প্রয়োজনীয় শর্ত হলো পশ্চাদগামী পুনর্বন্টন নীতির প্রচলন।

'অর্থনৈতিক উদারীকরণে'র মূল কথা হল পুঁজির বিশ্বায়নের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। দুঃখের সাথে তবু বলতে হচ্ছে, এই সাধারণ বিষয়টি আমাদের দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদদের উপলব্ধিতে আসে নি। অধ্যাপক জগদীশ ভাগবতী যখন 'উদারীকরণে'র সমর্থন করে তখন তিনি নিশ্চিতভাবে হন অর্থনীতির 'উদারীকরণ' করা হলে 'জুয়াড়ি ধনতন্ত্র' ('ক্যাসিনো ক্যাপিটালিজম') অনিবার্য। অধ্যাপক অর্মত্য সেন যখন বলেন 'উদারীকরণ' আমাদের সামনে সুযোগ এনে দিয়েছে — শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ের প্রসার ঘটিয়ে আমাদের এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে তখন বাস্তবিক, তাঁর নজর এড়িয়ে যায় যে, 'উদারীকরণ' করার অর্থে সরকারের কার্যকলাপকে 'পুঁজির বিশ্বায়ন' করার উদ্দেশ্যে নিমর্জ্জিত করা, যার ফলস্বরূপ, রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজিক ক্ষেত্রে কোন কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। (বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক আনুকূল্যে প্রচলিত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীও যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার।) এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, 'উদারীকরণ' হেতু সরকার পশ্চাদমুখী পুনর্বন্টন নীতি গ্রহণ করবে, কারণ, এই মুক্ত অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির চলাচলের জন্যে অবারিত পথ সৃষ্টি করা।

পশ্চাদমুখী পুনর্বন্টন নীতির সমর্থনে বুদ্ধিজীবীরা বলে থাকেন যে এই ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি আনবে। ব্রেটন উড (সম্মেলনভুক্ত) প্রতিষ্ঠানগুলি এই বক্তব্যের প্রচার করে, কারণ তারা বিশ্বব্যাপী পুঁজি চলাচলের উপযোগী মুক্ত-অর্থনীতির স্বপক্ষে। দেশীয় পুঁজিও বিশ্ব লগ্নি পুঁজি ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এর সম্পর্কে অন্য যে কোন প্রক্রিয়াজাত পুঁজির উদ্দেশ্যগত পার্থক্য নেই; ফলে দেশীয় পুঁজিও আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি চলাচল উপযোগী উদার

অর্থনীতির পক্ষে সওয়াল করে কারণ তারা আশা করে এর থেকে উপকৃত হবে। এই কারণে, উদারনৈতিক বা সামাজিক গণতন্ত্রী সরকারও, ব্রেটন উড পথ অবলম্বন করে, তারা বলতে বাধ্য হয়, এই আর্থিক নীতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক। ফলস্বরূপ এই বক্তব্যের সমর্থনে একটি নৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠে যা গোটা সমাজব্যবস্থায় এই বক্তব্যকে কর্তৃত্বকারী বাচন রূপে প্রতিষ্ঠা দেয়।

গণমাধ্যম এই বৌদ্ধিক কর্তৃত্বের শিকার হয়ে পড়েছে। ফলত, প্রাথমিকভাবে মনে হয়, যে গণমাধ্যম গুজরাটে 'গণহত্যা'য় বা 'দুর্নীতি'র ঘটনায় 'ক্ষমতাহীন', তারাই আবার 'অর্থনৈতিক সংস্কার'-এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত 'ক্ষমতাধর'; কিন্তু এটা কল্পনামাত্র। 'অর্থনৈতিক সংস্কারে'র প্রচারক, গণমাধ্যম নয়, আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে, তার সহমর্মী ব্রেটন উড প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে এই নীতির প্রচার করছে। সুতরাং 'অর্থনৈতিক সংস্কার'কে ব্যাপক প্রচারের আলোয় আনার জন্য গণমাধ্যমের ভূমিকা সেই কুকুরের সাথে তুলনীয় যে বলদ-গাড়ির নিচ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মনে করে যে গোটা গাড়ীটা সে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এইভাবে, যখন গণমাধ্যম আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজিকে সমর্থন করে, তখন গণমাধ্যমকে শক্তিশালী মনে হয়; কিন্তু, যে ক্ষেত্রে একলা চলো নীতি অবলম্বন করে, গণমাধ্যম মানবিকগুণ প্রচারের মধ্য দিয়ে দরিদ্র হতভাগ্য মানুষগুলোর পক্ষ নেয়, সে ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে ক্ষমতাহীন বলে মনে হয়। প্রংশসাযোগ্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, গণমাধ্যম, সাধারণভাবে আত্মবিরোধিতায় মগ্ন হয়ে আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি প্রতিষ্ঠার পক্ষে সওয়াল করে; এই কারণেই মানবিক প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে অসহায় দেখায়।

যাইহোক, এটা সত্যি যে, জ্বলন্ত বিষয়ে, মানবিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে গণমাধ্যমের সমর্থন আশার আলো প্রকাশ করে। বস্তুতপক্ষে 'রাজনৈতিক শ্রেণী'কে সন্দেহের চোখে ও জটিল করে দেখার মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে জনপ্রিয় বিষয়ে সমাজের পক্ষে আলোচকের ভূমিকা পালন করার। সাধারণ মানুষের নৈতিক দায়বদ্ধতায় স্থায়ী নাও হতে পারে। কিন্তু এটা মনে করা ঠিক নয় যে, নৈতিকস্তরকে উচ্চকোটিতে ধরে রাখতে পারে এমন সংবাদ পরিবেশন জনগণ সমর্থন করবে না। এই বক্তব্যের শুরুতে আমি উদাহরণ দিয়েছি, তার জের ধরেই বলা যায়, নরেন্দ্র মোদীকে পদত্যাগে বাধ্য করানোর জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে গণমাধ্যম হয়ত সফল হবে না, তবুও, গুজরাটের নৃশংসকাণ্ডকে জনমানসে তুলে ধরার প্রচেষ্টার জন্য জনগণের কাছে গণমাধ্যম অবশ্যই প্রশংসিত হবে। এই নৈতিক মূলধনকে কাজে লাগিয়ে গণমাধ্যমকে আরও ক্ষমতাশীল করতে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, 'উদারীকরণ' আর 'বিশ্বায়ন'-এর আঘাতকে ঘিরে সংশ্লিষ্ট আলোচনায় গণমাধ্যমকে ঐ একইরকম মানবিক ও গণতান্ত্রিক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করা। অন্যথায় ১৯৯০-র দশকে গণমাধ্যমের ক্ষমতার যে অবনমন ঘটেছে, তা বাঁধাহীনভাবে চলতেই থাকবে।

ভাষান্তর ঃ জয়দীপ ভট্টাচার্য

'ফ্রন্টলাইন' সম্পাদক এন. রামের সৌজন্যে। লেখকের সম্মতিক্রমে বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত 'এশিয়ান কলেজ অফ জার্নালিজম', চেন্নাই সমাবর্তন ভাষণ 'Market, Morals and the Media' ।

বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম

রবার্ট ডব্লু. ম্যাকচেসনি

নব্বই-এর দশক অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জীবনযাত্রায় শিল্পবোধের অধঃপতনের দশক। গণমাধ্যমের জগৎ এক গভীর রূপান্তরের মুখে। যেখানে পূর্ববর্তী গণমাধ্যমের জগৎ ছিল প্রাথমিকভাবে জাতীয়, গত কয়েক বছরে একটি বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক মিডিয়া বাজার গড়ে উঠেছে। পাইনে ওয়েবার বিনিয়োগ সংস্থার মিডিয়া বিশ্লেষক ক্রিস্টোফার ডিক্সনের ভাষায় 'আপনি যা দেখছেন তা বিশ্বব্যাপী এমন এক বাজারের সৃষ্টি যেখানে পণ্যদ্রব্য সরবরাহকারী যৎসামান্য। এই শতকের গোড়াতেই তেল এবং মোটর শিল্পে এমতাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এখন এই ঘটনা ঘটছে বিনোদন শিল্পের ক্ষেত্রে।'

মিডিয়া মালিকানার নিয়মবিহীনতা, লাভজনক ইউরোপীয় ও এশীয় বাজারে টেলিভিশনের বেসরকারিকরণ এবং সংযোগের নতুন প্রযুক্তি—এইসব কিছুর সুযোগ নিয়ে গণমাধ্যমের দানবরা অন্তঃ এবং আন্তর্দেশীয় পর্যায়ে শক্তিশালী সরবরাহ এবং উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, বিশ্বব্যাপী মিডিয়া বাজার এখন একই আটটি বৃহৎ বহুজাতিক কর্পোরেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যারা মার্কিন মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলি হল : জেনাবেল ইলেকট্রিক, এটি অ্যান্ড টি, ডিজনি, টাইম ওয়ার্নার, সোনি, নিউজ কর্পোরেশন, ভিপকম এবং সিগ্রাম; এর সাথে আছে জার্মানি-জাত মিশ্র সংস্থা বারটেলস্‌ম্যান। একই সঙ্গে বহু নতুন সংস্থা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক উপাদান যুক্ত হচ্ছে বিশ্ব ব্যবস্থা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, যদিও এই নয় মিডিয়া দানব এবং তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীরাই চিত্রটা নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতই সামগ্রিক বিশ্বের ক্ষেত্রেও এটি চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীভূত একটি শিল্প। বার্ষিক আয়ের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম মিডিয়া সংস্থা টাইম ওয়ার্নার-এর (১৯৯৮ সালের আয় ২৭ বিলিয়ন ডলার) মোট আয় বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম মিডিয়া সংস্থার বার্ষিক বিক্রির তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ।

কিছু গ্লোবাল সংস্থা আবার আনুভূমিকভাবে সংহত অর্থাৎ তারা মিডিয়া ব্যবস্থার বিশেষ একটি অংশ নিয়ন্ত্রণ করে—যেমন পুস্তক প্রকাশনা, যেটি নব্বইয়ের শেষ ভাগে ভীষণভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। প্রকাশনা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন অ্যাটর্নি বলেছেন, 'এরকম কেন্দ্রীভবন আমরা আগে কখনো দেখিনি'। কিন্তু আরো বিস্ময়কর হল বিশ্বব্যাপী মিডিয়া বাজারের দ্রুত উল্লম্ব সংহতি যেখানে একই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি বিষয়বস্তুর মালিকানা

পাচ্ছে এবং তা বন্টনের উপায়ও তারাই পাচ্ছে। প্রভাবশালী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষত্ব হল নিজ মালিকানাধীন এই 'সহযোগিতা'-কে ব্যবহার করার ক্ষমতা। হলিউডের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টুডিওর মালিকানা এই মিশ্রণের অন্তর্ভুক্ত। এভাবেই তারা কেবল্ চ্যানেলগুলি এবং টেলিভিশনের সিনেমা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে। নটি মিডিয়া দানবের মধ্যে কেবলমাত্র দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-উৎপাদক (Content Producer) নয়। তারা হল এটি অ্যান্ড টি এবং জেনারেল ইলেকট্রিক। কিন্তু জেনারেল ইলেকট্রিকের মালিকানাধীন হল এন বি সি এবং এটি অ্যান্ড টি লিবার্টি মিডিয়ার সূত্রে মিডিয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই দুই প্রতিষ্ঠানই প্রয়োজনমত সম্পত্তি বাড়াতে সক্ষম।

বড় মিডিয়া সংস্থাগুলি রীতিমত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতেই বিশ্বব্যাপী তাদের জাল বিস্তার করছে। এমনকি টাইম ওয়ার্নার এবং ডিজনি যাদের মূল আয় অর্জিত হয় মার্কিন মুলুক থেকেই তারাও তাদের অ-মার্কিন বিক্রির হিসাব সবিস্তারে তুলে ধরছে যাতে এক দশকের মধ্যেই সেক্ষেত্রে তাদের মুখ্য আয় সুনিশ্চিত করতে পারে। এখানে মূল বিষয় হল বিদেশে সম্প্রসারণের সুযোগকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বারা পরিবেষ্টিত না হওয়া। এর কারণ মার্কিন বাজার যথেষ্ট উন্নত এবং একমাত্র বৃদ্ধিমূলক সম্প্রসারণই মঞ্জুর করে। ভিয়াকম-এর প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক সামনার রেডস্টোন বলেছেন, 'কোম্পানিগুলি সেই বাজারকেই কেন্দ্রবিন্দু করেছে যা তাদের সর্বোচ্চ লাভজনক মনে হচ্ছে এবং তা বিদেশে।' সিয়াগ্রামের ইউনিভার্সাল স্টুডিওগুলির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ফ্র্যাঙ্ক বিওন্ডির স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, 'এই কোম্পানিগুলির ৯৯% দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য নির্ভর করছে বিদেশে সফল কার্যক্রমের ওপর।'

আশি এবং নব্বইয়ের দশকের আগে জাতীয় মিডিয়া ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করত রাষ্ট্রশাসিত টেলিভিশন, রেডিও এবং সংবাদপত্র শিল্প (industry)।

সংবাদপত্র প্রকাশনা মূলত রাষ্ট্রীয় চরিত্র বজায় রাখলেও টেলিভিশনের রূপান্তর প্রায় অকল্পনীয়। নব্য-উদার মুক্ত বাজার নীতির ফলে যেমন টেলিভিশন কেন্দ্রের এবং কেবল্ ও ডিজিটাল উপগ্রহ টেলিভিশন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও বহুজাতিক মালিকানা তৈরি হয়েছে; তেমনি বহুজাতিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন মুনাফাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবল্ মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে। এই চ্যানেলগুলি বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির আয়ের নতুন উৎস। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হলিউডের বড় স্টুডিওগুলো ২০০২ সালে তাদের চলচ্চিত্র গ্রন্থাগারের জন্য ১১ বিলিয়ন ডলার আয় করবে শুধু গ্লোবাল টেলিভিশন স্বত্ব থেকে যা ১৯৯৮ সালে ছিল ৭ বিলিয়ন ডলার।

যদিও এই মিডিয়া মিশ্রণ সেই নীতির সপক্ষে সওয়াল করে যা তাদের বিশ্বব্যাপী বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে মিডিয়া এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলিকে সুরক্ষা দেবার ঐতিহ্য আজো বজায় আছে। নরওয়ে, ডেনমার্ক থেকে স্পেন ও মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া তাদের জাতীয় চলচ্চিত্র উৎপাদন শিল্পকে ছোট আকারে হলেও জীবিত রেখেছে সরকারি ভর্তুকি দিয়ে। ১৯৯৮-এর গ্রীষ্মে ব্রাজিল, মেক্সিকো, সুইডেন, ইটালি আইভোরি সমুদ্রতটসহ কুড়িটি দেশের সংস্কৃতি মন্ত্রীরা ওটাওয়ায় মিলিত হয়েছিলেন 'হলিউডের আগ্রাসন' থেকে তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে রক্ষা করার কিছু 'মূলনীতি' প্রণয়নের উদ্দেশ্যে। তাদের মূল সুপারিশ ছিল সংস্কৃতিকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে রাখা। ১৯৯৮ সালেই স্টকহোমে রাষ্ট্রসংঘ আহূত এক সম্মেলন সুপারিশ করেছিল বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক চুক্তিতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে বিশেষ ছাড় দেওয়া উচিত।

তবুও, প্রবাহিত ধারা স্পষ্টতই বাজার সম্প্রসারণের দিকেই নির্দেশিত।

সব দেশেই নব্য-উদারনীতির প্রবক্তারা সওয়াল করছে যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যে বাধা ও নিয়ন্ত্রণ ক্রেতাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ভরতুকি দেশের নিজস্ব প্রতিযোগিতাপূর্ণ মিডিয়া ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। দেশের মধ্যেও প্রায়শই এমন বাণিজ্যিক মিডিয়া গোষ্ঠী থাকে যারা মনে করে এক্ষেত্রে সীমা উন্মোচন করলে তারা বেশি লাভবান হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯৮ সালে ব্রিটিশ সরকার যখন ব্রিটিশ বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র শিল্পকে সহায়তা করার জন্য মূলত হলিউডের ছবির উপর শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেন তখন ব্রিটিশ বেতারজীবীরা তাদের অনুষ্ঠানদাতারা রুষ্ট হবেন এই আশঙ্কায় এই প্রস্তাবের গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বিরোধিতা করেন যতক্ষণ না তা খারিজ হয়।

বিশ্বব্যাপী মিডিয়া বাজার আবর্তিত হয় চার বা পাঁচ ডজন দ্বিতীয় স্তরের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা। এরা জাতীয় বা আঞ্চলিক শক্তির আধার, এরা নিজেদের ক্ষমতামত ব্যবসা, বাণিজ্য বা প্রকাশনার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। এই দ্বিতীয় স্তরে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রায় অর্ধেক উত্তর আমেরিকার এবং বাকিরা মূলত পশ্চিম ইউরোপ বা জাপানের। এই প্রতিটি দ্বিতীয় স্তরের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিজেদের জায়গায় অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং বিশ্বের হাজারটি বৃহত্তম কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতি বছর এক বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যবসা করে। এই দ্বিতীয় স্তরের মিডিয়া সংস্থাগুলির পর্যায়ক্রম হল : উত্তর আমেরিকার ডো জোন্স, জানেট, নাইট-রিডার, হার্স্ট এবং অ্যাডভান্স পাবলিকেশান; ইউরোপের কির্চ গ্রুপ, ফাভাস, মেডিঅ্যাসেট, হাচেটে, প্রিসা, কানেল প্লাস, পিয়ার্সন, রয়টার্স এবং রিড এলসেভিয়ার। সোনিকে বাদ দিলে জাপানি কোম্পানিগুলির অধিকাংশই আঞ্চলিক উৎপাদক।

এই দ্বিতীয় স্তরটিও বেশ তাড়াতাড়িই দানা বেঁধেছে। বিশ্ব জুড়েই জাতীয় ও আঞ্চলিক মিডিয়া বাজারে একটি বিষয়ে চাঞ্চল্য উঠেছে তা হল ছোট সংস্থাগুলোকে মাঝারি সংস্থাগুলো গ্রাস করছে এবং বড় সংস্থাগুলো মাঝারি সংস্থাগুলোকে আত্মসাৎ করছে। প্রকাশনা এবং টেলিভিশন সাম্রাজ্যের পিছনে জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও বহু সমন্বয় সৃষ্টি হচ্ছে, উদাহরণ হিসেবে ডেনমার্কের এগমন্ট-এর কথা বলা যায়। অধিকাংশ দেশের অবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই যেখানে দশ বা কুড়ি বছর আগের তুলনায় অনেক স্বল্পসংখ্যক বড় মাপের সংস্থা মিডিয়ার ক্ষেত্রকে পরিচালনা করে।

অধিকাংশ দেশ যেহেতু আকারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ছোট তাই মিডিয়ার ক্ষেত্রে স্বল্প, কতিপয় পরিচালক সংস্থার সমস্যা সেখানে আরো ভয়ঙ্কর। নিউজিল্যান্ডের অবস্থা হয়তো সবচেয়ে শোচনীয়। সেখানে সংবাদপত্র শিল্প প্রায় সম্পূর্ণত অস্ট্রেলীয়-মার্কিন রুপার্ট মার্ডক এবং আইরিশ টনি ওরিলি-র নিয়ন্ত্রণে। টনি আবার নিউজিল্যান্ডের বাণিজ্যিক বেতার সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সেদেশের পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রেও তিনিই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। মার্ডক পে (Pay) টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ করেন এবং দুটি সরকারি টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থার একটি বা দুটিকেই কিনে নেবার জন্য সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, নিউজিল্যান্ডে মিডিয়া ব্যবস্থা প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিহীন হবার পথে।

এই দ্বিতীয় স্তরের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি সর্বদাই জাতীয় সীমা অতিক্রম করতে চায়। মার্ডকের পথ ধরেই অস্ট্রেলীয় মিডিয়া-মোগলদের মন্ত্র হল 'হয় সম্প্রসারণ নয় মৃত্যু'। এক ব্যক্তির মতে 'আপনি কিছুতেই অস্ট্রেলীয় সরবরাহকারী হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় সমৃদ্ধ হবেন না।'

বার্লুসকোনির মালিকানাধীন ইতালীয় টেলিভিশন মিডিয়াসেট হিসেবে ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার বাকি অংশে সম্প্রসারিত হচ্ছে। দ্বিতীয় স্তরের বিশ্বায়নের সবচেয়ে বিস্ময়কর উদাহরণ সম্ভবত হিক্স, মিউস, টেট এবং ফার্স্ট-এর মতো মার্কিন রেডিও/প্রকাশনা/টেলিভিশন/বিলবোর্ড/চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ এবং এগুলি প্রায় রাতারাতি নির্মিত হয়েছিল।

১৯৯৮ সালে মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং ভেনিজুয়েলায় মিডিয়া-অ্যাসেট কেনার জন্য ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তরের মিডিয়া সংস্থাগুলি আর গ্লোবাল ব্যবস্থার প্রতিযোগী নয় বললেই চলে। এই বিষয়টি এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রেও সত্যি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রাজিলের গ্লোবো, মেক্সিকোর টেলিভিসা, আর্জেন্টিনার ক্লেরিন এবং ভেনিজুয়েলার সিসনেরোস্ গ্রুপ বিশ্বের ষাট বা সত্তরটি বৃহত্তম মিডিয়া কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত। এই সংস্থাগুলি তাদের নিজ নিজ জাতীয় ও আঞ্চলিক মিডিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে দ্রুত সুদৃঢ় হয়। তারা বৃহৎ বহুজাতিক মিডিয়া কর্পোরেশনগুলির সঙ্গে দ্রুত গাঁটছড়া বাঁধছে এবং তাদের পাশাপাশি ওয়াল স্ট্রিট বিনিয়োগ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগও নিচ্ছে। দ্বিতীয় স্তরের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি অন্যত্রও বিশেষ করে যে দেশগুলি এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে একমত সেখানেও গ্লোবাল ক্রিয়াকলাপ চালু করছে। ফলত তাদের রাজনৈতিক বিষয়সূচীও স্পষ্টতই বাণিজ্য-পন্থী এবং গ্লোবাল মিডিয়া বাজার সম্প্রসারণের সপক্ষে। এর ফলে তাদের নিজ নিজ দেশের অধিকাংশ জনসমষ্টির কাছেও তারা অপাংক্তেয় হয়ে পড়ছে।

বিশ্বের ষাট বা সত্তরটি প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরের মিডিয়া দানব বিশ্বের মিডিয়া ব্যবস্থা অর্থাৎ পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রকাশনা, সঙ্গীত রেকর্ড করা, টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রযোজনা, টেলিভিশন কেন্দ্র ও কেবল্ চ্যানেল, উপগ্রহ টেলিভিশন ব্যবস্থা, চলচ্চিত্র প্রযোজনা, চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ—সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু গোটা ব্যবস্থাটা এখনো গড়ে উঠছে। দ্বিতীয় স্তরের নতুন বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে উঠেছে বিশেষত লাভজনক এশীয় বাজারে এবং প্রথম স্তরের মিডিয়া দানবের তালিকায় আরো পরিবর্তন আসন্ন। শুধুমাত্র গ্লোবাল বাজারে গেলেই মিডিয়া কর্পোরেশনগুলির সাফল্য নিশ্চিত হয় না। আসলে এ সম্পর্কে তাদের দ্বিতীয় পছন্দের কোন অবকাশই নেই। কিছু সংস্থা, বোধহয় বেশ কিছু সংস্থা হোঁচট খাবে কারণ হয় তারা অধিকমাত্রায় ঋণ নিয়েছে কিংবা অলাভজনক উদ্যোগে শামিল হয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনা এমনই যে, আমরা স্থায়ী জাতীয় গ্লোবাল বাজার গঠনের প্রক্রিয়ার প্রায় শেষদিকে চলে এসেছি। এবং এই বাজার গঠন হবার সাথে সাথেই বিশ্বের এগিয়ে থাকা মিডিয়া সংস্থাগুলির ব্যাপক লাভজনক অবস্থিতির বিশেষ সম্ভাবনা আছে। তারা এটা নিশ্চিত করার জন্যেই ছুটছে।

গ্লোবাল মিডিয়া বাজার অর্থনীতির সঠিক অর্থানুসারেই মূলগতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন। বৃহত্তম মিডিয়া সংস্থাগুলির অনেকগুলিরই মূল অংশীদার অথবা পরিচালনমণ্ডলী এক। ভ্যারাইটি ১৯৯৭ সালে বিশ্বের ৫০টি বৃহত্তম গ্লোবাল মিডিয়া সংস্থার তালিকা প্রস্তুত করেছিল। এতে দেখা যায় 'একীকরণের বাতিক' এবং তির্যক মালিকানা (cross ownership) 'জটিল আন্তঃসম্পর্কযুক্ত একটি মাকড়সার জাল' তৈরি করেছে যা 'আপনাকে হতবুদ্ধি করে দেবে।' গ্লোবাল বাজার বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে জোরের সঙ্গে ইকুইটি (যেখানে সুদের হার নির্দিষ্ট নয়) যৌথ উদ্যোগ স্থাপনে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে যাতে সকল মিডিয়া দানবই একটি উদ্যোগের অংশ হতে পারে। এভাবেই সংস্থাগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিপদের সম্ভাবনা প্রশমিত করে এবং লাভের সুযোগ বৃদ্ধি করে। ইউরোপের ১২টি বৃহত্তম ব্যক্তিগত মিডিয়া সংস্থার অন্তর্গত স্পেনের মিডিয়া সংস্থা সোগেকেবল্-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ভ্যারাইটির কাছে ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'কৌশলটি আসলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা নয় বরং তাদেরই অংশে পরিণত হওয়া।' অনেকক্ষেত্রেই অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বাজারের ব্যাখ্যার তুলনায় গ্লোবাল মিডিয়া বাজার অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।

এই গ্লোবাল মিশ্রণ কখনো কখনো সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল প্রভাব সৃষ্টি করে। বিশেষ করে, যখন দুর্নীতিগ্রস্ত মিডিয়া ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন দেশে (যেমন—লাতিন আমেরিকার

অনেক দেশে) অথবা উল্লেখযোগ্য জাতীয় সেন্সরশিপের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন দেশে (যেমন—এশিয়ার কিছু অংশ) গ্লোবাল মিডিয়া মিশ্রণ প্রবেশ করে তখন এমতাবস্থা হয়।

গ্লোবাল বাণিজ্যিক মিডিয়া ব্যবস্থা মৌলিক কারণ এটি কোন ঐতিহ্য বা প্রথা মানে না, মুনাফার অন্তরায় হলে তো নয়ই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি রাজনৈতিকভাবে রক্ষণশীল কারণ বিশ্বব্যাপী বর্তমান সামাজিক গঠনে মিডিয়া দানবরা উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত এবং সামাজিক সম্পর্কের কোন পরিবর্তন বিশেষ করে তা যদি ব্যবসার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায়—তা কখনোই তাদের স্বার্থ সিদ্ধ করবে না।

বহু দেশের কাছেই যখন 'হলিউডি আগ্রাসন' এবং মার্কিন সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতাবাদের অপচ্ছায়া মূল ভাবনা তখন কর্পোরেট মিডিয়া সংস্থাগুলি যারা আসলে মার্কিন সংস্কৃতির সরবরাহকারী মাত্র এই ধারণা আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত মনে হচ্ছে ঠিক যেমন মিডিয়া ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমানরূপে কেন্দ্রীভূত, বাণিজ্যিকৃত এবং বিশ্বায়িত হচ্ছে। গ্লোবাল মিডিয়া ব্যবস্থাকে কর্পোরেট ও বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং মূল্যবোধকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা রূপেই সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই ব্যবস্থা তাদের লক্ষ্যে শামিল করা যায় না এমন সবকিছুকেই অবহেলা করে বা কলঙ্কিত করে। ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির মূল উদ্দেশ্যে কোন প্রত্যক্ষ প্রভেদ নেই—তা জাপান বা বেলজিয়ামে অংশীদারী মালিকানা-নিয়ন্ত্রিতই হোক অথবা নিউ ইয়র্ক বা সিডনিতে কর্পোরেট হেড কোয়ার্টার দ্বারা পরিচালিত হোক না কেন। ১৯৯৮ সালে কোন ব্যক্তি মন্তব্য করেছিলেন কোন জার্মান সংস্থার পক্ষে মার্কিন পুস্তক-প্রকাশনা বাজারের ১৫% নিয়ন্ত্রণ করা অনুচিত। এতে বার্টেলস্ম্যান-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক টমাস মিডেলহফ এতে ক্রোধ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমরা বিদেশী নই; আন্তর্জাতিক। এবং আমি একজন জার্মান পাসপোর্টধারী আমেরিকান।'

মিডিয়া মিশ্রণগুলি যখন তাদের বাহু সম্প্রসারিত করছে এমন কথা বিশ্বাসের কারণ আছে যে, তারা অন্তত কিছু মিডিয়ায় জনপ্রিয় রুচিকে উৎসাহ দেবে যাতে সঙ্গতি বজায় থাকে। হলিউডের বিভিন্ন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে ভ্যারাইটি-র সম্পাদক পিটার বার্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিশ্বের চলচ্চিত্র দর্শককুল দ্রুত আরো সমপ্রকৃতির হয়ে উঠছেন। নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে মারদাঙ্গার ছবিই ছিল সেরা গ্লোবাল ফর্মুলা এবং কমেডি-ছবি রপ্তানি করা হয়ে উঠছিল ক্রমশ কঠিন। সেখানে 'মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস ওয়েডিং' এবং 'দ্য ফুল মন্টি'র মতো কমেডি ছবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের বক্স-অফিসে ১৬০-২০০ বিলিয়ন ডলার ব্যবসা করেছে।

দর্শককুল যখন নিজ অঞ্চলে প্রস্তুত অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ করছেন তখন গ্লোবাল মিডিয়া কর্পোরেশনগুলি হতাশায় পলায়ন না করে তাদের প্রযোজনাকেই বিশ্বায়িত করছে।

সঙ্গীত শিল্পে (industry) সম্ভবত এটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। সঙ্গীত চিরকালই বৈদ্যুতিন মিডিয়ায় সর্বনিম্ন পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত এবং সে কারণেই তা ছিল সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার এবং নতুন ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্র। মার্কিন রেকর্ডিং শিল্পীদের ব্যবসা ১৯৯৩-সালে মার্কিন মুলুকের বাইরে ৬০ শতাংশে পৌঁছেছিল। ১৯৯৮-এর মধ্যে তা নেমে আসে ৪০ শতাংশে। তাঁবু গুটিয়ে নেবার পরিবর্তে বিশ্বের রেকর্ডিং সঙ্গীত বাজার নিয়ন্ত্রক পাঁচটি মিডিয়া বহুজাতিক কর্পোরেশন ব্রাজিলের মত কিছু দেশে আঞ্চলিক সাহায্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং একটি বাণিজ্যিক প্রকাশনায় এক লেখকের উক্তি এইসব দেশে 'মানুষ পুরোপুরি আঞ্চলিক সঙ্গীতের প্রতি দায়বদ্ধ।' বিশ্বের বিভিন্ন স্বাধীন সঙ্গীত কোম্পানিগুলির সঙ্গে বণ্টন সংক্রান্ত চুক্তি করে সোনি এবিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

অতিবাণিজ্যিকীকরণ এবং ক্রমবর্ধমান কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে মিডিয়া বিষয়ে একটি

অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বও এসে পড়ছে। পণ্যবাদ, শ্রেণী বৈষম্য এবং একা বাঁচার নীতিকে স্বাভাবিক এমনকি উপকারী হিসেবেও দেখানো হচ্ছে। অথচ রাজনৈতিক সক্রিয়তা, নাগরিক মূল্যবোধ এবং বাজার-বিরোধী কার্যকলাপকে একঘরে করা হচ্ছে। সেরা সাংবাদিকতা বাণিজ্যিক শ্রেণীকেই পছন্দ করছে এবং তাদের প্রয়োজন ও সংস্কারগুলির সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে। কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত জনসাধারণের জন্য সংরক্ষিত সাংবাদিকতা মার্কিন টেলিভিশন কেন্দ্রের মিডিয়া দানবদের দ্বারা প্রযোজিত কিছু ছেলে-ভোলানো অনুষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটি প্রায়শই খুব চতুরভাবে করা হয়। নিঃসন্দেহে বাণিজ্যিক মিডিয়া ব্যবস্থার অসাধারণত্ব হল বাড়তি সেন্সরশিপের অভাব। জর্জ অরওয়েল অ্যানিমাল ফার্মে তাঁর অপ্রকাশিত প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেছেন মুক্ত সমাজে সেন্সরশিপ একনায়কতন্ত্রের তুলনায় চরম আধুনিক এবং ব্যাপক কারণ 'জনপ্রিয় নয় এমন ধারণাকে চুপ করানো যায় এবং অসুবিধাজনক সত্যকে সরকারী বাধা ছাড়াও অন্ধকারে রাখা যায়।'

কোন বিশেষ ষড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশ্য ব্যতীত এবং নিজ অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়ে মিডিয়া মিশ্রণগুলি শুধুমাত্র অর্থ রোজগার করার জন্য লঘু পলায়নমূলক বিনোদন প্রচার করে। মেক্সিকোর টেলিভিসা কোম্পানির প্রবল ধনী কর্ণধার প্রয়াত এমিলিও এসকারাগার কথায়, 'মেক্সিকো হল বিনয়ী কিন্তু চরম নির্যাতিতের দেশ এবং তারা আজীবন নির্যাতিত হবে। টেলিভিশনের দায়িত্ব এদের মধ্যে বৈচিত্র্য আনা এবং তাদের দুঃখজনক বাস্তব এবং দুরূহ ভবিষ্যৎ থেকে তাদের সরিয়ে আনা।'

পরিবর্তনের জন্য বিশেষ আশা করা বোধহয় কঠিন। ১৯৯৭ সালে এক সুইডিশ সাংবাদিক যেমন উল্লেখ করেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত গতি-প্রকৃতিগুলি খুবই স্পষ্টভাবে প্রায় সব বিষয়েই ভুল পথে চালিত এবং বর্তমান ঘটনাবলীর গণতন্ত্র ও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ফল সম্পর্কে জনমানসে আলাপ আলোচনার মারাত্মক অভাব আছে।' কিন্তু এমন সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে যে, বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন মিডিয়া সংক্রান্ত ইস্যুগুলিকে তাদের রাজনৈতিক মঞ্চে উত্থাপন করছে। সুইডেন, ফ্রান্স, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা সর্বত্রই বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি মিডিয়ার গঠনমূলক সংস্কার করছে—বড় কোম্পানিগুলিকে ভাঙছে, অলাভজনক ও অবাণিজ্যিক সম্প্রচার ও মিডিয়াকে জোরদার করছে। তাদের আলোচনার মধ্যে এগুলিকে তারা অন্তর্ভুক্ত করেছে। তারা মনে করছে ভোটদাতাদের কাছেও এই ইস্যু গ্রহণযোগ্য হবে।

একই সঙ্গে, গ্লোবাল মিডিয়া ব্যবস্থার ভাগ্যও গ্লোবাল পুঁজিবাদের সঙ্গে জটিলভাবে জড়িয়ে গেছে। যদিও মার্কিন মিডিয়া মুক্ত বাজার সম্পর্কে আত্মঅভিনন্দনমূলক প্রচার চালাচ্ছে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় দুর্বলতার চিহ্ন দেখা দিচ্ছে। একবিংশ শতকের পুঁজিবাদের তথাকথিত বাঘ এশিয়া ১৯৭৭ সালে যে মন্দার মুখোমুখি হয়েছিল তা থেকে উদ্ধার পাওয়া আজো অনিশ্চিত। এমনকি কোন বিশ্বজোড়া মন্দা দেখা না দিলেও বিশ্বের সেই সব জায়গায় অতৃপ্তি ঘণিভূত হচ্ছে যেখানে অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই সময়েও মানুষ পিছনে পড়ে রয়েছেন। বাজার সংস্কারের আর এক দাম্ভিক সমর্থক লাতিন আমেরিকা প্রত্যক্ষ করেছে 'অসাম্যের এক বৃহৎ বৃদ্ধি'—যা নাকি একজন বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের মতামত। বাণিজ্যিক মিডিয়ার প্রভাব প্রতিরোধ করা কঠিনতর হয়েছে কিন্তু এর বিশ্বব্যাপী বিরোধিতার স্বপ্ন দেখা কঠিন নয় যা নব্য-উদার আর্থিক নীতির ফলে উদ্ভূত বিশ্বায়নকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাবে।

ভাষান্তর ঃ সান্ত্বন চট্টোপাধ্যায়

রবার্ট ডব্লু. ম্যাকচেসনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Rich Media Poor Democracy' থেকে 'The New Global Media' শীর্ষক নিবন্ধটি বর্তমান গ্রন্থের জন্য নির্দিষ্ট করে পাঠিয়েছেন।

বিশ্বায়নের গণমাধ্যম
গণমাধ্যমের বিশ্বায়ন

অঞ্জন বেরা

'বিশ্বায়ন' নিয়ে এবং সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই এখন আর শুধু বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিতর্কের ডান বা বাঁ যেদিকেই আপনি থাকুন, এমনকি বিতর্কে বিমুখ হলেও, বিশ্বায়ন আজ কাউকেই বিমুখ করতে নারাজ। আপনি বা আমি সবাই আজ বিশ্বায়নের আওতায় আছি। মোকাবিলা করছি অহোরাত্র— ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। এই প্রবন্ধে আমি 'বিশ্বায়ন'-এর সঙ্গে আজকের গণমাধ্যমের সম্পর্কের দিকটিই খতিয়ে দেখতে চেষ্টা করবো।

গণমাধ্যমের প্রসঙ্গ এলেই তা যদি কোনোক্রমে বিশ্বায়ন প্রসঙ্গের ধারপাশ দিয়ে যায়, তাহলে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে সি এন এন-এর মতো স্যাটেলাইট টিভি কিংবা মাল্টিমিডিয়া প্রণোদিত সাইবার-এজের নব্যপ্রতীক ইন্টারনেটের কথা। জাতীয়-সীমানা-অতিক্রমী জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিশ্বায়নের অনুভবযোগ্য দিকগুলির আপাত সম্পর্ক এতটাই প্রত্যক্ষ বলে মনে হয় যে, বিশ্বায়ন সংক্রান্ত যে-কোনো প্রসঙ্গে গণমাধ্যম না-এসে পারেও না। কিন্তু 'বিশ্বায়ন'-এর মতোই বিশ্বায়ন-গণমাধ্যম সম্পর্ক এরকম একমাত্রিক নয়। গণমাধ্যম কীভাবে বিশ্বায়নের আধার এবং আধেয় কিংবা উল্টোটাই বা কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা আজকের প্রেক্ষাপটে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এবং অত্যন্ত বাস্তবোচিত কারণেই, এই আলোচনার একেবারে গোড়ায় রয়েছে, বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝায় তার কথা।

বিশ্বায়নের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সত্যিই এক জটিল কাজ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বিশ্বায়নের আধুনিক ধারণার মধ্যে রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ও পক্ষের মধ্যে এক ধরনের আন্তঃসংযোগের (interconnectivity) বিষয়টি। অন্তত প্রাযুক্তিক কারণেই আজকের দিনে বিশ্বের এক প্রান্তের সঙ্গে আর এক প্রান্তের মধ্যে নিয়ত যোগাযোগ এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে। প্রাকৃতিক দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতার অনেকটাই এখন মুছে গেছে। বহু জরুরি বিষয় আছে যা বিশ্বজুড়ে এক ধরনের অভিন্ন স্বার্থ বা পরিসরের উদ্ভব ঘটিয়েছে। বিশ্বব্যাপী এই আন্তঃসংযোগের বিদ্যমান চরিত্রের সবটা ভালো এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু আধুনিকতার ধারণার সঙ্গে এই আন্তঃসংযোগ বা অভিন্ন পরিসরের একটা সম্পর্ক রয়েছে। জাতীয় ও আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা যে একটা প্রাগাধুনিক অবস্থা তা নিয়ে বিতর্ক নেই বললেই চলে।

এই আন্তঃসংযোগের দুটি দিক বা মাত্রা খুবই পরিষ্কার। (এক) আন্তঃসংযোগের প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা এবং (দুই) অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক স্তরে রাষ্ট্রসীমানা অতিক্রমী আন্তঃরাষ্ট্রীয় অথবা আন্তর্জাতিক কিছু অভিন্ন বিষয়ের উদ্ভব। যেমন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আন্তঃমহাদেশীয় টেলিগ্রাফ যোগাযোগ, যা সেই প্রথম সময় ও প্রাকৃতিক দূরত্বের বাধাকে সংকুচিত করেছিল অভূতপূর্বভাবে। এরফলে একদিকে যেমন যুগপৎ অতিদ্রুত বিশ্বের এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের সংবাদ বা তথ্য বিনিময় সম্ভব হয়েছিল, তেমনই তা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে এমন কিছু পরিসরের উদ্ভব ঘটাতে সাহায্য করেছিল, যা মূলত আন্তর্মহাদেশীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্তরেই বিবেচ্য। যা কোনো একটি রাষ্ট্র বা জাতীয় সীমানার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মূলগতভাবেই সীমাবদ্ধ নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিশ্বজোড়া টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্ককে সচল রাখতেই বিভিন্ন রাষ্ট্র যাতে অভিন্ন কিছু নিয়ম মেনে চলে সেজন্যই ১৮৬৫ সালে গঠিত হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন। বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা। এছাড়াও বিশ্বজোড়া বাজারকে ব্যবহার করার বাধ্যবাধকতাকেও নতুন সুযোগ এনে দিয়েছিল আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্ক। সেই সঙ্গে এক মহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব অন্য মহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাধারার উপরও পড়তে শুরু করেছিল ঐ সময়ই। এই প্রভাব অবাস্তব থেকে যেত যদি না দূরসংযোগ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটতো যুগপৎ।

ক্রমশই আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে, আঞ্চলিক বা রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতায় একান্তভাবে বাঁচা যায় না। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা রয়েছে এবং তা অপরিহার্য ও ক্রমপ্রসারমান। উনিশ শতকের শেষদিক থেকেই দেখা যাচ্ছিল আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মত বিনিময় যেমন বাড়ছে, তেমনই যে-কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার আলোচ্যসূচীতে অনিবার্যভাবেই গুরুত্ব পাচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় প্রসঙ্গটি। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি লিগ অফ নেশনের কথা। তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার স্ট্রাটেজিক প্রয়োগের দিক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ একটি দিক চিহ্ন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর সংগঠিত বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাষ্ট্রিয় রাজনৈতিক মঞ্চ লিগ অফ নেশনের কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়েই ছিল টেলিগ্রাফ যোগাযোগ, তথ্য ও সংবাদ বিনিময়, বহির্দেশীয় বেতার ব্যবস্থা, চলচ্চিত্র বিনিময়, আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার কাজকর্মের মতন বিষয়াদি। এর থেকে বোঝা যাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সেই সময়ও তার যাবতীয় বহুমাত্রিকতার মধ্যেও, কীভাবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সংবাদ ব্যবস্থা তথা গণমাধ্যম ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। ১৯৩২ সালে বিবিসি মূলত ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিকে লক্ষ্য রেখে চালু করেছিল 'এম্পায়ার সার্ভিস'। তার আগেই তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক চালু করেছিল মস্কো থেকে তার নিজস্ব বেতার অনুষ্ঠান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আন্তর্জাতিক বেতার ব্যবস্থা ভয়েস্ অফ আমেরিকা চালু করেছিল অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে। তিরিশের দশক জুড়ে হিটলারের জার্মানি কিংবা মুসোলিনীর ইতালিও বিশ্বব্যাপী বেতার প্রচারের সুযোগ নিতে চেয়েছিল সংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে।

এই সামগ্রিক ঘটনাধারার উন্মোচন থেকে অবশ্যই বোঝা যেতে পারে যে, গোড়ায় আমরা যে আন্তঃসংযোগের ক্রমপ্রসারণের কথা বলেছিলাম তাও ছিল বহুমাত্রিকতায় ভরা। আন্তঃসংযোগের গুণগত ও পরিমাণগত চরিত্র কোনোমতেই আন্তঃসংযোগের প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল না। অর্থাৎ প্রযুক্তিগত ভাবে সম্ভব হলেই আন্তঃসংযোগ সম্ভব হবে। এবং এই আন্তঃসংযোগ একটি গণতান্ত্রিক ও সুষম চেহারা পাবে এটা বাস্তবে সম্ভব নয়। আন্তঃসংযোগের পরিধি ও চরিত্র কেমন হবে তা নির্ভর করে বিদ্যমান

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক শক্তির ভারসাম্য, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের উপর। বিশ্বের সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির স্তর এবং আন্তর্জাতিক শক্তি ভারসাম্যের উপরই নির্ভর করে যোগাযোগ ব্যবস্থার কার্যকারিতা। ঔপনিবেশিক প্রাধান্যের যুগে স্বভাবতই উপনিবেশগুলির জনগণের পক্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গণমাধ্যম ব্যবস্থার সুষম সুযোগ নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁরা ছিলেন আন্তর্জাতিক স্তরে এক ঔপনিবেশিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার শিকার। যদিও এটা ঠিক যে ব্যাপারটা ঐতিহাসিক কারণেই একতরফা হওয়া সম্ভব ছিল না। বৈষয়িক উপকরণ ও বিষয়বস্তুর উপর ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও এর মধ্যে দিয়েই বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত জনগণ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির মধ্যেও সংযোগ বাড়ছিল। ক্রমপ্রসারিত আন্তঃসংযোগ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সঙ্গে আন্তর্জাতিক জনসমাজের মৌলিক দ্বন্দ্বই তীব্রতর করেছিল। যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে একটা নতুন মাত্রা পায়।

নানাবিধ অসংগতির মধ্যেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘ-কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কতগুলি ইতিবাচক সূত্রের উপর ভিত্তি করে যাত্রা শুরু করে। যেগুলি ছিল পূর্ববর্তী সময়ের থেকে গুণগতভাবে পৃথক। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াকে রাষ্ট্রসংঘ নতুন স্তরে উপনীত করে। যেমন, রাষ্ট্রসংঘকেন্দ্রিক ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক ভিত্তি রাষ্ট্রগুলির স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্বের প্রতি নিঃশর্ত স্বীকৃতি। প্রতিটি রাষ্ট্র স্বাধীন ও সার্বভৌমভাবে রাষ্ট্রসংঘে অংশ নেবে এই মৌলিক ধারণার উপরই রাষ্ট্রসংঘকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দু-আড়াই দশকে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ায় এবং তার আগে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সদ্যস্বাধীন দেশগুলির পাশে এসে দাঁড়ানোয় রাষ্ট্রসংঘকেন্দ্রিক ব্যবস্থার মৌল নীতিগুলিই জোরদার হয়েছিল। এবং রাষ্ট্রসংঘ কাঠামোর সঙ্গে নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদ, আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বৈষয়িক ও নৈতিক দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়েছিল। যে-কারণে দ্বন্দ্ব যত তীব্রতর হয়েছে ততই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার শিবিরের সঙ্গে শুধু সমাজতান্ত্রিক ও তৃতীয় বিশ্বের সংঘাত বাড়েনি, রাষ্ট্রসংঘকেন্দ্রিকআন্তঃরাষ্ট্রীয় কাঠামোরই সংঘাত বেড়েছে। এমনকি নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় পূর্বতন সোভিয়েত-সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের আগেও বারবার আমরা দেখেছি, কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নানাভাবে রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে অস্বস্তি বোধ করেছে।

রাষ্ট্রসংঘকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে ক্রমপ্রসারমান আন্তঃসংযোগের বিষয়টিও নতুন মাত্রা পায়। রাষ্ট্রসংঘ একদিকে যেমন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক সমাজের প্রাথমিক একক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বনির্ভরতাকে অপরিহার্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সত্য যে, ক্রমপ্রসারমান এক আন্তর্জাতিক সংহতিই আমাদের অনিবার্য ভবিষ্যৎ। রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্বার্থের মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ অনিবার্য বা স্বাভাবিক নয়, অবশ্য যদি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদ ও বৈষম্যকে নিরসন করা যায়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই নৈতিক ও বৈষয়িক ভিত্তির উপরই গণজ্ঞাপন/যোগাযোগ ও তথ্যব্যবস্থার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিকাশকে বিচার করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পর্বে ষাটের দশকের মাঝামাঝি স্যাটেলাইট-বাহিত দূর-সংযোগ ব্যবস্থা, যোগাযোগ স্যাটেলাইট, বিশেষত টিভি ও বেতার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্যাটেলাইটের ব্যবহার আন্তর্জাতিক যোগাযোগের বিষয়টিকে গুণগতভাবে বদলে দেয়। বস্তুতঃ আশির দশকের শেষ ও নব্বই দশকের গোড়ায়

স্যাটেলাইট টিভির আবির্ভাবের ভিত্তি ষাটের দশকে উদ্ভাবিত ঐ যোগাযোগ উপগ্রহই। যোগাযোগ উপগ্রহের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষসাধনের সূত্রেই আজ বাড়ির ছাদে ডিশ এ্যান্টেনা বসিয়ে স্যাটেলাইট টিভি দেখা যায়— বিশ্বের সর্বত্র যা ঘটছে তার লাইভ টেলিকাস্ট।

শুধু তাই নয়, কম্পিউটারের সঙ্গে এই স্যাটেলাইট টিভির মেলবন্ধন বিশ্বব্যাপী তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়ণ, তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য বিনিময়ের বিপুল ক্ষমতা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে। বস্তুতঃ নব্বইয়ের দশকেই টিভি বেতারের মতো চিরাচরিত বৈদ্যুতিন বিনোদন মাধ্যমের সঙ্গে চিরাচরিত টেলিকমিউনিকেশনের মেলবন্ধন, পরিভাষায় যাকে বলে 'কনভারজেন্স' বা 'সমকেন্দ্রিকতা' এবং তারই পরিণতিতে উদ্ভূত মাল্টিমিডিয়া, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও প্রান্তের সঙ্গে আন্তঃসংযোগের বিষয়টি সাধারণের কাছে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও অনেকাংশে লভ্য করে তুলেছে। অন্ততঃ প্রযুক্তিগত ভাবে, এই সাইবার যুগে মিডিয়া বাস্তবিকই গ্লোবাল। বিশ্বায়ন যদি বিশ্বব্যাপী আন্তঃসংযোগ হয়, তাহলে তার অন্যতম কেন্দ্রীয় ভিত্তি অবশ্যই যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মিডিয়া প্রযুক্তি।

কিন্তু আগেই আমরা বলেছি বিশ্বায়ন বা বিশ্বব্যাপী আন্তঃসংযোগ কখনই একমাত্রিক নয়। বিশ্বব্যাপী একলহমায় যুগপৎ সংযোগ সাধনের প্রযুক্তি হাতে থাকলেই তা আন্তঃসংযোগকে বাস্তবায়িত সুনিশ্চিত করবে তা নয়। আবার এই আন্তঃসংযোগের বিষয়টি বিশ্বায়নের বহুমাত্রিকতায় গৌণতায় পর্যবসিত এমন প্রতিপাদ্যও সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে মিডিয়ার অবস্থান বিশদ করার আগে মিডিয়ার সক্রিয়তার ভিত্তিগুলিকে চিহ্নিত করে নেওয়া যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, মিডিয়া মূলত রাষ্ট্রিক, অন্তত তার পরিচালন ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত মূল দিকটি খেয়াল রাখলে। যেমন, বিবিসি বা আমেরিকা অনলাইন। যথাক্রমে ব্রিটিশ ও মার্কিন সংস্থা। কিন্তু তার সম্প্রচার ক্ষমতা প্রযুক্তিগতভাবে গ্লোবাল। আবার তার বাজারও রাষ্ট্রীয় সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ববাজার। তার প্রভাব, গ্রহণযোগ্যতারও একটা আন্তরাষ্ট্রিক মাত্রা আছে। এই বহুমাত্রিক বাস্তবতাই একটা স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল তৈরি করে। রাষ্ট্রীয়-সীমানা-অতিক্রমী স্বতন্ত্র।

এতো গেল মিডিয়ার কথা। কিন্তু মিডিয়া স্বয়ম্ভুও নয়, একান্তভাবে স্বতন্ত্রও নয়। তা একাধিক মৌলিক ভিত্তির সাপেক্ষে ক্রিয়াশীল। যেমন, (ক) বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিকগুলির সাপেক্ষে। (খ) মিডিয়ার বৈষয়িক, আর্থিক ও বিনিয়োগ বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে। উপরোক্ত দুটি বিষয়ের সমর্থনে বলা যায়, বিশ্বব্যাপী পুঁজি চলাচল, এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের বাণিজ্য, আন্তঃরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদিই নির্ধারণ করে মিডিয়া-ভিত্তিক আন্তঃসংযোগের বিষয়গুলিকে। আমেরিকা যেহেতু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুপার পাওয়ার তাই মার্কিন মিডিয়ার বৈষয়িক ও নৈতিক দাপট বেশি। সি এন এন তাই 'গ্লোবাল নিউজ লিডার'! এছাড়াও মিডিয়ার প্রসার নির্ভর করে যুগপৎ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রসারের উপর। রাজনৈতিক তৎপরতার উপর। নইলে কীসের জন্য বা কীসের খবর মানুষ জানতে চাইবে বা মিডিয়া প্রচার করবে?

দ্বিতীয়ত, মিডিয়ার ভূমিকা নির্ভর করে মিডিয়ায় কারা বিনিয়োগ করেছে বা কারা চালাচ্ছে তাদের উপর। রুপার্ট মার্ডক স্টার চ্যানেলের মালিক হলে তার নীতি বা বিষয়বস্তু এক হবে, পল সুইজি হলে অন্য হবে। মিডিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগকারীর রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও শ্রেণীস্বার্থ মিডিয়ার অবস্থান ও ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। বিশ্বায়নের কোন চরিত্রের কোন্ পক্ষে পুঁজি বিনিয়োগকারী, তার উপরই তাঁর নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার অবস্থান ঠিক হবে এতে আর আশ্চর্য কী আছে!

এর সাথে তৃতীয় একটি বিষয়ও আছে — (গ) মিডিয়ার আপাত স্বাতন্ত্র্য। যাকে

ইংরাজীতে বলা যায় 'রিলেটিভ অটোনমি'। মিডিয়ার নীতি, অবস্থান বা ভূমিকা উপরোক্ত দুটি বিষয়ের সাপেক্ষে নির্ধারিত হলেও আধুনিক গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সঙ্গে মিডিয়ার স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্রের, ধারণাটি দীর্ঘমেয়াদীভাবে এতটাই প্রবল যে সেই ধারারও একটা নিজস্ব প্রভাব রয়েছে। মানুষের চেতনায় প্রভাব, ধ্যানধারণায় প্রভাব। প্রাথমিকভাবে, এবং এখনও একদিক থেকে, এই ধারণা আন্তঃরাষ্ট্রীয় হলেও, এখন তার একটা আন্তঃরাষ্ট্রীয় চরিত্রও গড়ে উঠেছে। যেমন ধরুন, নাগরিক স্বাধীনতা — গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর আবশ্যিক শর্ত। প্রতিটি আধুনিক রাষ্ট্রই অন্তত তত্ত্বগতভাবে নাগরিকদের বাক্ স্বাধীনতা এবং একই সঙ্গে মিডিয়া বা প্রেসের স্বাধীনতা, তার ফোর্থ এস্টেট ভূমিকাকে, স্বীকার করে নিয়েছে। আমরা জানি, রাষ্ট্রীয় চরিত্র, যে শ্রেণী রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করছে, তার শ্রেণী চরিত্রই হবে সেই রাষ্ট্রে মূলস্রোত মিডিয়ার চরিত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বাস্তবে মিডিয়া বা প্রেসকে আমরা নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরে নিই অনেকদূর পর্যন্ত। সংকটের তীব্রতা অনেকদূর না গেলে মিডিয়ার এই রিলেটিভ অটোনমি আমাদের চেতনায় প্রশ্নাতীতভাবেই নিহিত থাকে। এর ফলে প্রতিষ্ঠান হিসেবে মিডিয়া রাষ্ট্রের মধ্যেই একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পেয়ে গেছে। এখন প্রযুক্তি বিকাশের দরুন মিডিয়ার রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রমী প্রসার এই 'রিলেটিভ অটোনমি'কেও গ্লোবাল-চরিত্র দিচ্ছে। আমরা আই এম এফ-কে বা সি আই এ-কে যে চোখে দেখি সি এন এন-কে সেভাবে মার্কিন বহুজাতিক স্বার্থের শরিক হিসেবে দেখি কি? অন্ততঃ বেশির ভাগ মানুষ? এর ফলে বিশ্বব্যাপী আন্তঃসংযোগের ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা একটা বিশেষ মাত্রা পায়। বিশ্বায়নের বহুমাত্রিকতা নিয়ে বাচনেও যার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ আলোচনায় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রিক ও শ্রেণীগত স্বার্থ যে প্রত্যক্ষতায় চিহ্নিত হয়, মিডিয়ার ভূমিকা সেভাবে সবসময় হয় না। বিশ্বায়নের কোন্ মাত্রায় মিডিয়ার কোন্ অংশ কী ভূমিকা নিচ্ছে বা নেবে তা কিন্তু এই সব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে, স্বচ্ছভাবে নির্দিষ্ট করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে আমি অবশ্য স্বীকার করবো যে ইদানীং বামপন্থী তাত্ত্বিকদের আলোচনায় বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে মিডিয়ার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখিত হচ্ছে। যেমন, অধ্যাপক অমিয়কুমার বাগচী 'বিশ্বায়ন ঃ ভাবনা এবং দুর্ভাবনা'র প্রথম খণ্ডে (কলকাতা ঃ এন বি এ, ২০০২ ; পৃষ্ঠা-৬৩) বিশ্বায়নকে 'কতকগুলো নির্দিষ্ট আর্থিক বা বৈষয়িক নীতির সমাহার' বলে চিহ্নিত করে বলেছেন যে 'আর্থিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অনেকগুলো বিভাগ আছে'। আটটি বিভাগকে তিনি চিহ্নিতও করেছেন, যার 'অষ্টম ভাগে' রয়েছে 'আন্তর্জাতিক তথ্য মাধ্যমের বিস্তার এবং বিভিন্ন দেশের তথ্য মাধ্যমের উপর বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির প্রয়োগের ফল'। অধ্যাপক বাগচীর মতে, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বাকি সাতটি বিভাগ হলো — প্রথমত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে লোকজনের অভিগমন ও নির্গম ; তৃতীয়ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে টাকা পয়সা ও অন্যান্য বিনিময় মাধ্যমের সঞ্চালন; চতুর্থত এক দেশের মূলধন অন্য দেশে বিনিয়োগ করে সেখানে শিল্পদ্রব্য, কৃষিজ পণ্য অথবা পরিষেবা পণ্য উৎপাদন করে সেদেশে অথবা অন্য দেশে বিক্রয়ের প্রবাহ; পঞ্চমত, এক দেশ থেকে অন্য দেশে মহাজনী মূলধনের আদানপ্রদান; ষষ্ঠত বহুজাতিক অথবা অতিজাতিক বাণিজ্য উৎপাদনের ওপর প্রভাব; সপ্তমত বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রযুক্তির আদানপ্রদান।

এ প্রসঙ্গে আমি সামির আমিনের লেখা 'ক্যাপিটালিজম ইন দ্য এজ্ অব্ গ্লোবালাইজেশন ঃ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ কনটেম্পোরারি সোসাইটি' বইটিরও (মাধ্যম বুকস, ১৯৯৭) উল্লেখ করতে চাই। এই বইয়েই (পৃষ্ঠা - ৪) আমিন বলেছেন যে, বর্তমানে বিশ্বায়িত বিশ্ব ব্যবস্থায় ধনী দেশগুলির প্রাধান্য পাঁচটি ক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের উপর দাঁড়িয়ে — (১) প্রযুক্তিগত

ক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, (২) বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, (৩) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর একচেটিয়া অধিকার, (৪) মিডিয়া এবং যোগাযোগ মাধ্যমের ক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং (৫) গণ-বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। এই দুটি মতামত থেকেই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মিডিয়ার ভূমিকার উপর স্বতন্ত্র দৃষ্টিপাতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পেয়েছে। একই সঙ্গে এটাও স্বীকৃত হয়েছে যে, আজকের দুনিয়ায় বহুমাত্রিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এবং মিডিয়া আঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে।

মিডিয়া ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আধুনিক বৈশিষ্ট্য, মিডিয়ার বাজার এবং মিডিয়ায় নিযুক্ত পুঁজির আন্তঃরাষ্ট্রীয় চলাচল বিশ্বায়ন-মিডিয়া সম্পর্ককে ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে। একথা এখন বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, বিশ্বায়ন শুধুমাত্র আন্তঃসংযোগ নয়, এই আন্তঃসংযোগকে পুঁজিবাদের বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণের ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম ও লক্ষ্য হিসেবে ব্যবহারের আধিপত্যবাদী প্রকল্পই 'বিশ্বায়ন' নামে চিহ্নিত। ফলতঃ রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কতগুলি মৌলিক নিও-লিবারেল দাওয়াইকে রূপায়িত না করে এই 'বিশ্বায়ন' প্রক্রিয়া এগোতে পারেনা। এই দাওয়াইয়ের মূল প্রতিপাদ্যগুলিকে আমরা এভাবে সাজাতে পারি —

(১) জাতি রাষ্ট্রের অবসানের নামে রাষ্ট্রের জনকল্যাণ ভূমিকাকে অস্বীকার করা।

(২) তথাকথিত মুক্তবাজার-নির্ভর কাঠামোর উপর ভিত্তি করে নীতিগুলি পরিবর্তন করা।

(৩) ডিরেগুলেশন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বা স্বশাসিত ক্ষেত্রগুলিকে ভেঙে দিয়ে বেসরকারী বৃহৎ পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া।

(৪) অভ্যন্তরীণ বাজারকে বিদেশী বহুজাতিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে বিশ্বব্যাপী 'অবাধ বাজার' তৈরিতে সাহায্য করা।

(৫) মুনাফার কাছে ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি দায়বদ্ধতা অস্বীকার করা।

এই সব নিও-লিবারেল দাওয়াই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র বনাম নাগরিক সমাজের সম্পর্ক যেমন বিকৃত করছে তেমনই আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসংঘ-নীতি কেন্দ্রিক সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির স্বাধীন ও স্বনির্ভর সম্পর্কের মৌল নীতিগুলিকেও অস্বীকার করতে চাইছে। উভয় স্তরেই মিডিয়ার গণতান্ত্রিক ভূমিকা এর ফলে পড়েছে নেতিবাচক নানা চাপের মুখে। নিও লিবারেল বিশ্বায়ন যেমন মৌলিকভাবেই একটি আধিপত্যবাদী গণতন্ত্র-বিরোধী প্রকল্প তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মিডিয়া ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও তাই অনুরূপ কাঠামোয় পুনর্বিন্যস্ত করার উদ্যোগ এখন স্পষ্টতর হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা এবং ফাণ্ড ব্যাঙ্ক এখন সরাসরি মিডিয়ার ভূমিকা কী হবে তার নির্দেশ দিচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্ক সম্প্রতি যে 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০২' প্রকাশ করেছে তাতে 'দ্য মিডিয়া' শিরোনামে দশম অধ্যায়টি থেকে নিও লিবারেল পন্থার চূড়ামণিদের অবস্থানটি বেশ পরিষ্কার। বিশ্বব্যাঙ্ক সভাপতি জেমস্ ডি উলফেনসেন তাঁর মুখবন্ধে রিপোর্টটির মূল বিষয় কী বলতে গিয়ে লিখেছেন যে বাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তুলতে ও সবল করতে নিও-লিবারেল বাজার সংস্কার কর্মসূচীর সামগ্রিক পরিকল্পনায় মিডিয়াকে প্রোথিত করতে হবে। মিডিয়ার ফোর্থ এস্টেট সুলভ গণতান্ত্রিক ভূমিকাকে সংকুচিত করা হচ্ছে নিও-লিবারেল বাজার সংস্কার এবং তারই পরিপূরক 'পলিটিক্যাল মার্কেট' সংস্কার কর্মসূচীকে পুষ্ট করার কাজে। 'পলিটিক্যাল মার্কেট' কথাটা রিপোর্টেই বলা হয়েছে।

অর্থাৎ, নিও-লিবারেল বিশ্বায়ন প্রকল্প মিডিয়ার গণতান্ত্রিক ভূমিকাকে এই বলে অস্বীকার করতে চাইছে যে, তার দায়বদ্ধতা একমাত্র বাজারের কাছে, ক্রেতার কাছে—ক্রয়ক্ষমতা

নির্বিশেষে নাগরিকের কাছে নয়। যে যত দামি ক্রেতা তার কাছে মিডিয়া তত দায়বদ্ধ। সংবিধান মতপ্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছে সব নাগরিককে — তা সর্বজনীন অধিকার। কিন্তু নিও-লিবারেল দর্শনে মিডিয়ায় প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার অধিকার নির্ধারণ করবে তথাকথিত বাজার। মিডিয়ার পণ্যায়ন তাই বিশ্বায়ন প্রকল্পের আন্তঃরাষ্ট্রীয় নীতিমালার অন্যতম মৌলিক অংশ। এই প্রকল্প অনুযায়ীই অবাধ তথ্য প্রবাহের নীতি চিহ্নিত হয় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বহুজাতিক মিডিয়া কোম্পানিগুলির বাজার তৈরির পূর্ণ স্বাধীনতাতে এবং বহুজাতিকদের মিডিয়া বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের অবাধ স্বাধীনতাতে। এক্ষেত্রে যেখানে যা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাধানিষেধ আছে তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে বিশ্বায়নের নামে। বিশ্ববাণিজ্যের উল্লেখিত রিপোর্টেও তাই বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গত জুন মাসে ভারতীয় মুদ্রণ মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ করে দেবার যে সিদ্ধান্ত বাজপেয়ী সরকার নিয়েছে তা মনে করা যেতে পারে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, নিও-লিবারেল বিশ্বায়ন প্রকল্প সঙ্গতিপূর্ণ একটি নিও-লিবারেল বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও গড়ে নিতে চাইছে। ঘটনাক্রমে তার সহায় হয়েছে আবিশ্ব সংযোগসাধন উপযোগী মিডিয়া ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। যে প্রযুক্তিকেই বিশ্বায়নের নিও পজিটিভিস্ট ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে নিও-লিবারেলিজমের স্বতঃপ্রণোদিত নির্ধারক। যেন, প্রযুক্তি নিজেই নিও-লিবারেলপন্থী!

এ প্রসঙ্গে আমরা বিগত সত্তরের দশকে রাষ্ট্রসংঘ মঞ্চের ভিতরে ও বাইরে নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিকে আলোচনায় টেনে আনতে পারি। রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে সদ্য ঔপনিবেশিক-শাসন-মুক্ত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সার্বভৌম ও স্বনির্ভর পরিসর স্বাভাবিকভাবেই প্রণোদিত করেছিল আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কাঠামোগত ও নীতিগত সংস্কারের দাবিকে। আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কারের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চাওয়া হয়েছিল একটি ন্যায্য ও সুষম নয়া ব্যবস্থা। যা প্রতিহত করবে নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদকে। বলা হয়েছিল যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গণতান্ত্রিক সংস্কারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বভাবতই তৃতীয় বিশ্বের এই দাবির প্রধান সমর্থক ছিল। কট্টর বিরোধী ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার শরিকরা। ১৯৮৪ সালে এজন্য রেগনের আমেরিকা বেরিয়ে যায় ইউনেসকো থেকে। এবং তার সাথী ছিল থ্যাচারের ব্রিটেন।

নয়া আন্তর্জাতিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দাবি থেকেই ১৯৭৮ সালে ইউনেসকো গ্রহণ করেছিল 'মাস মিডিয়া ডিক্লারেশন' বা গণমাধ্যম সংক্রান্ত ঘোষণাবলী। ১৯৭৭ সালে ইউনেসকোই গঠন করেছিল ম্যাকব্রাইড কমিশন — আন্তর্জাতিক তথ্য ব্যবস্থার সমস্যাদি খতিয়ে দেখতে। কমিশন ১৯৮০ সালে যে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে তাতেও সমর্থিত হয় নয়া ব্যবস্থার যৌক্তিকতা।

নয়া ব্যবস্থার দাবি লক্ষ্যণীয়ভাবে শুধু আভ্যন্তরীণ তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসঙ্গই তোলেনি, যুগপৎ তা আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নীতিগুলিকেই আলোচ্যসূচীর মধ্যে টেনে এনেছিল। যার মূল কথা ছিল মিডিয়ার গণতান্ত্রিক ও জনস্বার্থমূলক দায়বদ্ধতা। তথাকথিত মুক্ত বাজারের হাতে তাকে নিঃশর্তে ছেড়ে দেওয়া নয়। স্বভাবতই আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্তরে এই দাবির অন্যতম প্রধান বক্তব্য ছিল স্বাধীন, সার্বভৌম ও স্বনির্ভর রাষ্ট্রীয় ভূমিকা এবং বহুজাতিক ও অতিজাতিক কোম্পানীগুলির উপর যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। 'অবাধ তথ্য প্রবাহ'-এর ধারণাকে তা 'অবাধ ও সুষম তথ্য প্রবাহ'-এর ধারণা দিয়ে পরিমার্জিত করতে চেয়েছিল।

যার সঙ্গে বহুজাতিক মিডিয়া মোগলদের স্বার্থের সংঘাত ছিল মূলগত।

বলাবাহুল্য, আশির দশকের শেষ দিকে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি রাষ্ট্রসংঘ মঞ্চ ও রাষ্ট্রসংঘ সনদের মৌলিক নীতিগুলিকে যেভাবে বিপন্ন করে তাতে নয়া তথ্য ব্যবস্থার দাবিও আলোচ্যসূচী থেকে হারিয়ে গেছে। ১৯৮৯ সালে ইউনেসকো আনুষ্ঠানিকভাবেই পরিত্যাগ করেছে নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দাবিকে। মার্কিন মদতপুষ্ট সরকারী বেসরকারী সংগঠনগুলির সহযোগিতায় ইউনেসকো এখন বিশ্বায়ন নীতিতে প্রাণিত হয়ে নিও-লিবারেলপন্থী 'বেসরকারী স্বাধীন' মিডিয়া 'গড়ে' তোলার কাজে হাত দিয়েছে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে। পশ্চিমী বহুজাতিকদের সাথে গলা মিলিয়ে বাজার-বান্ধব মিডিয়ার লালন পালনে নিয়োজিত রাষ্ট্রসংঘের যাবতীয় বৈষয়িক ও নৈতিক উদ্যোগ। এ প্রকল্পে ফান্ড ব্যাঙ্কের ভূমিকার প্রসার তো আগেই বলেছি।

আন্তর্জাতিক সংযোগের কথা যদি বলি, তাহলে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ফাটকা পুঁজির অবাধ চলাচল মিডিয়া-ক্ষেত্রে নিয়োজিত পুঁজির ভূমিকাকেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে প্রভাবিত করছে। নিও-লিবারেল মিডিয়ার অস্তিত্ব নির্ভর করছে নিও-লিবারেল বিশ্বায়ন প্রকল্পের উপর। আবার নিও-লিবারেল ভূমিকা মিডিয়াকে নিতে হবে তার চিরাচরিত ফোর্থ এস্টেট সুলভ গণতান্ত্রিক ও জনস্বার্থমূলক ভূমিকাকে অস্বীকার করেই। কিন্তু এক্ষেত্রে রিলেটিভ অটোনমির যে সংকোচন ঘটবে তা নতুন সংকটের জন্ম না দিয়ে পারেনা।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যদি বলেন, আমাদের মতো দেশগুলিকে একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া দুহাত তুলে বিশ্বায়নের পক্ষে জনমত গড়তে গিয়ে দুরকম চাপের মুখে পড়ছে — (এক) তার স্বাধীন ও জনস্বার্থমূলক ভূমিকার সংকোচন, যা কিনা জনচক্ষেও আর আড়াল করা যাচ্ছে না; (দুই) বিশ্বায়ন মানলে বহুজাতিক পুঁজির সামনে রক্ষা কবচ ভঙ্গুর না-হয়ে উপায় নেই। এতো গেল বেসরকারী সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে। পাবলিক ব্রডকাস্টিং-এর ক্ষেত্রে বিপদ হলো টেলিকমিউনিকেশনে বিনিয়ন্ত্রণ তার ভিত্তিকেই দুর্বল করে দিচ্ছে। মুক্ত বাজার তার জনস্বার্থমূলক ভূমিকার সামনে প্রধান প্রতিবন্ধক। আমাদের কাছে যা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান তা হলো, বিশ্বায়ন পর্বে মিডিয়ার দক্ষিণবর্তী ঝোঁক বেড়েছে। ফলত আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও তার রিলেটিভ অটোনমি ক্ষীয়মাণ।

এ অবস্থায় বিশ্বায়ন প্রকল্পের গণতান্ত্রিক প্রতিপক্ষ শিবিরকে মিডিয়ার প্রসঙ্গটিকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। মিডিয়া যেন একটি প্রান্তিক বিষয় না-হয়ে থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। মিডিয়া শুধুমাত্র উপরিকাঠামোগত বিষয় নয়। উপরিকাঠামোরও একটা ভিত্তি থাকে। যা সবসময় মূল ভিত্তির সাথে প্রত্যক্ষত যুক্ত নয়।

বিশ্বায়নের বহুমাত্রিকতার কথা মাথায় রাখলে এটা বোঝাও শক্ত হবে না যে নিও-লিবারেলিজম বিরোধিতারও বিশ্বায়ন ঘটছে। ডায়ালেকটিক্স যদি মানি তাহলে একথাও অনস্বীকার্য যে গণতান্ত্রিক বিশ্বায়নও একটি বাস্তবসম্মত প্রকল্প। প্রাক-বিশ্বায়ন পর্বের গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের চেহারা বিশ্বায়ন পর্বে অভিন্ন নাও থাকতে পারে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিরোধের নতুন বিন্যাস নির্মাণ করতে পারার উপরই বিশ্বায়ন-মিডিয়া সম্পর্কের পুনর্নির্মাণ অনেকাংশে নির্ভরশীল। কীভাবে এই নির্মাণ সম্ভব তার কর্মসূচী চূড়ান্ত করে দেবার ধৃষ্টতা দেখানো এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। প্রতিরোধ কর্মসূচীর মধ্যে দিয়েই তা চূড়ান্ত হবে।

বিশ্বায়নের যুগে সমাজতন্ত্র

সীতারাম ইয়েচুরী

আজকের দুনিয়ায় পুঁজিবাদী বিকাশের যে পর্বটিকে 'বিশ্বায়ন' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তার স্বরূপ বুঝতে ধনবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলি এবং সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাটির গতিবিদ্যা স্পষ্ট জানা প্রয়োজন। কার্ল মার্কস তাঁর সুবৃহৎ, মহামূল্যবান 'দাস ক্যাপিটাল'- গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ধনবাদের বিকাশের সাথে সাথে মুষ্টিমেয়র হাতে পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবন ঘটে থাকে। এই সূত্রের ফলে বিশাল পরিমাণ পুঁজি পুঞ্জিভূত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্ব রক্ষার কারণেই এই পুঞ্জীভূত পুঁজিকে মুনাফা অর্জনের তাড়নায় বিনিয়োগ করতে হয়।

বিংশ শতাব্দী শেষে, অথবা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে আশির দশকে, এই কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে পুঁজির পুঞ্জীভবন এক দানবীয় আকার ধারণ করে। নব্বই-এর দশকের সূচনায় ইতিমধ্যে বিরাট পরিমাণে বেড়ে যাওয়া লগ্নী পুঁজির ব্যাপক আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটে। ১৯৯৩ সালে লগ্নী পুঁজি বৃদ্ধির পরিমাণ গিয়ে পৌঁছায় ২০ মিলিয়ন ডলার-এ। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিকভাবে চলমান লগ্নিপুঁজি অভূতপূর্ব মাত্রা ধারণ করেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক লগ্নি বাজারে মোট লেনদেনের পরিমাণ ৪০০ ট্রিলিয়ন ডলার, যা বাৎসরিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য ও পরিষেবার লেনদেনের পরিমাণের (৭ ট্রিলিয়ান ডলার) তুলনায় ৬০ গুণ বেশি।

এই বিপুল পরিমাণ পুঞ্জীভূত লগ্নিপুঁজি ফাটকা বাজারে মুনাফা লুণ্ঠনের আগ্রাসী তাড়নায় তার বিশ্বব্যাপী চলাচলে কোনরূপ বিধি নিষেধের তোয়াক্কা করে না।

একই সময় বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলিতেও পুঁজির ব্যাপক পুঞ্জিভবন ঘটেছে। এদের কয়েকটির মূলধন যোগ করলে দেখা যাবে, এই মুহূর্তে বহু উন্নয়নশীল দেশের সম্মিলিত GDP-র চেয়েও তা বেশি। বহুজাতিক সংস্থাগুলির এই শক্তিবৃদ্ধির ফলে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যা শিল্প পুঁজির অতিমুনাফার জন্য প্রয়োজনীয় বাধাবন্ধনহীন চলাচলের পথকে সুগম করছে। সমস্ত ধরনের বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ এবং মাসুলগত সংরক্ষণের নীতি পরিত্যক্ত হচ্ছে।

সুতরাং পুঁজিবাদী বিকাশের ধারা সম্পর্কিত সূত্র সমূহই আজকের বিশ্বায়নের বস্তুগত শর্তগুলি সৃষ্টি করেছে, যার মূল লক্ষ্য হল অবাধ পুঁজি চলাচলের পথে সমস্ত বাধা অপসারণ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বহুজাতিক সংস্থাসমূহের অতুল মুনাফা সঞ্চয়ের পথকে প্রশস্ত

করে তাদের অর্থনীতিকে সাজিয়ে নেওয়া। এই প্রক্রিয়ার প্রধান কুশীলব 'ত্রিমূর্তি'র সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত — আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা। এদের উদ্দেশ্যটা খুবই পরিষ্কার। তৃতীয় বিশ্বের উন্নতিকামী দেশগুলির উপরে পুনরায় অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতা চাপিয়ে দেওয়া।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চলতে চলতেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতন ঘটে। যদিও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার উন্মেষ নেহাতই কাকতালীয় বিষয় নাকি তারা পরস্পর সম্পর্কিত, সেটি একটি ভিন্নতর আলোচনার প্রসঙ্গ। একথা অবশ্যই স্পষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে যে ৯০ - এর দশকের শুরুতে ঘটে যাওয়া এই দুটি প্রক্রিয়ার সম্মেলন বিশ্বের অবশিষ্ট মহাশক্তি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার আগ্রাসী রূপ বিস্তারে নতুনতর শক্তি যোগায়।

এই প্রেক্ষিতে, মার্কিন নেতৃত্বের 'নয়া বিশ্বব্যবস্থা'র পরিকল্পনা ক্রমশ উন্মেচিত হয়। বিশ্বের প্রায় সমস্তক্ষেত্রে সার্বিক মার্কিন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সচেতন প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের ফলে বহু মেরু বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার যে বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, সেই সম্ভাবনাকে বানচাল করে তার পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একমেরু বিশ্বের বাস্তবতা ক্রমশই প্রকট হয়ে ওঠে।

১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পর এই প্রক্রিয়া তার চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধকালীন পর্যায়ে তোলা 'সাম্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র জিগির আজ পর্যবসিত হয়েছে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র স্লোগানে। এই অজুহাতকে ব্যবহার করে যে কোন সার্বভৌম দেশে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিস্তারের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় সৃষ্টি হয়েছে।

তাই বিশ্বায়নের নামে আমরা পাশাপাশি দুটি জিনিস দেখতে পাচ্ছি। এক, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করার চক্রান্ত ও দুই, এমন এক পৃথিবী যা সম্পূর্ণভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

যদিও এই দুটি হল সাম্রাজ্যবাদের প্রধানতম লক্ষ্য, বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে আলোচনায় আর একটি বিষয়কে স্পষ্ট বিবেচনার মধ্যে আনা দরকার। অন্যসব প্রসঙ্গের সঙ্গে একথাটাও বোঝা ভীষণভাবে জরুরি যে মানব প্রজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় শুধুমাত্র অপরিসীম দুর্দশা ও অপরিমেয় শোষণ।

প্রথমত বিশ্বায়নের অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত যে বিপুল অগ্রগতি উপস্থিত হয়েছে, তা বেশিরভাগ মানুষেরই আওতার বাইরে। বরং বলা যায়, অতিমুনাফা লোভীদের বর্বর লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতেই তার আবির্ভাব। এ যুগের পুঁজিবাদী বিকাশ সেই সমস্ত অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল যা, মূলগতভাবে শ্রমের জগৎ থেকে মানুষকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় যন্ত্রকে বসিয়ে দিচ্ছে। তার ফলে যদিবা কোথাও সামান্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে সেই বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গটি আদৌ জড়িত নয়, বরং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি বিনাশের মধ্য দিয়েই এই বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। একেই বলা হচ্ছে কর্মসংস্থানহীন বৃদ্ধি।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন বা ILO -এর মতে এই শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বে সরকারিভাবে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ১২ কোটিতে পৌঁছেছে। এর পাশাপাশি ৭০ কোটি মানুষ আছেন যারা যোগ্যতা বা প্রয়োজনের তুলনায় নিম্নতর পেশায় নিযুক্ত। আরো আছেন ১৩০ কোটি মানুষ যারা দৈনিক এক ডলারেরও কম আয় করার দরুণ নিঃসীম দারিদ্র্যে দিন কাটান। তাছাড়াও আছেন ৩০০ কোটি মানুষ যাদের আয় দৈনিক ২ ডলারেরও কম।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়নের এই পর্বে মানব সমাজে বৈষম্য নিদারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে যেমন সত্য একইভাবে, প্রত্যেক দেশের ধনী ও দরিদ্র অংশের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। নগ্ন পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে যদি পরিস্থিতির নির্মমতাকে প্রকাশ করি তাহলে দেখব, বিশ্বের ৩৫৮ জন মহাকোটিপতি বা বিলিয়নেয়ারের মোট সম্পদ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ অর্থাৎ ২৩০ কোটি মানুষ যে গরিব দেশগুলিতে বাস করেন তাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের চেয়েও বেশি। আরোও একটি তথ্য এই বৈষম্যের নিষ্ঠুরতাকে বোঝার জন্য যথেষ্ট; ১৯৯১ সালে বিশ্ব জনসংখ্যার দরিদ্রতম ২০ শতাংশ মানুষ মোট সম্পদের শতকরা ১.৪ ভাগের অধিকারী ছিলেন। এখন তাদের ভাগ ১ শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে।

বিশ্বের সাধারণ মানুষের এই ব্যাপকতম নিঃস্বায়ন আরো একটি ভয়ংকর বিপদের দিক নির্দেশ করে। বিশ্বায়িত অর্থনীতি যে পণ্য উৎপাদন করছে দারিদ্র্য বৃদ্ধির সমানুপাতিক হারে তার ভোক্তার সংখ্যাও কমছে। এর ফলে গোটা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটাই অচলতার সম্মুখীন। এটিই হল তৃতীয় বৈশিষ্ট্য।

আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি চলাচলের ব্যাপকতম বৃদ্ধি একটা ভ্রান্ত আশার জন্ম দিয়েছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন এটা এমন একটা ফানুস যাকে অনন্ত পরিমাণ ফোলানো বা ফাঁপানো যায়। কিন্তু সে ফানুস ফেটে গেছে এবং 'অলীক সম্পদে'র সম্পর্কে বহু প্রত্যাশাও তার সঙ্গে চূর্ণ হয়েছে। তথাকথিত অতিপরিক্রমশালী NASDAQ সহ দুনিয়ার সমস্ত শেয়ার বাজারে ২০০১ সালের মাঝামাঝি থেকে ব্যাপক ধস নেমেছে। মনে রাখতে হবে, এটা ছিল ১১-ই সেপ্টেম্বরের আগের ঘটনা। ফলে যারা সন্ত্রাসবাদী হামলার সঙ্গে বিশ্বের বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দা জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তারা মোটেই সু-বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন না। বরং বলা যায় 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বেশ কিছুটা পরিমাণ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেছে, অন্তত অস্ত্রশিল্পে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্তৃত্ববাদী অভিযানের প্রেরণায়।

বর্তমানে পর্বের বিশ্বায়নের অকার্যকারিতা প্রথম ফুটে ওঠে যখন তথাকথিত 'এশিয়ার বাঘরা' ভয়ংকর অর্থনৈতিক সংকটের চাপে অসহায় মূষিকে রূপান্তরিত হয়। এরপর এই সংকট আরো বহুদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ২০০১ -এর শুরুতে এক গুরুতর বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার রূপ নেয়। OECD ভুক্ত বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ৩০টি দেশের বৃদ্ধির হার ২০০১ এবং ২০০২ সালে ছিল মাত্র ১ শতাংশ। বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধি ২০০০ সালে ছিল ৪.২ শতাংশের কাছাকাছি। বর্তমানে যা আভাষ পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় এই হার ২.৪ শতাংশে গিয়ে পৌছাবে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মন্দার আরো একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল, দুনিয়ার তিনটি প্রধান ধনবাদী কেন্দ্রই ভয়াবহ সংকটের কবলে পড়েছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ২০০০ সাল থেকে ২০০১ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মন্দাকালীন পর্বে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৩.৪ শতাংশ থেকে ১.৯ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং জাপানে ২০০১ সালের বিচারে তা ১.৮ শতাংশ থেকে ০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এই মার্কিন অধোগতির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় এমন মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলির কর জমা দেওয়ার আগে কর্পোরেট মুনাফার পরিমাণ সামগ্রিকভাবে ২৬ শতাংশ হ্রাস পায়, যা গত শতাব্দীর বিশের দশকের প্রান্তিক মহামন্দার চেয়ে গভীরতর সংকটের সাক্ষ্যবাহী। এনরন ছাড়াও ৩৫২ টি মার্কিন কোম্পানি ২০০১ সালে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। ২০০২ সালে ১৪০০টি কোম্পানি বিপজ্জনক ঝুঁকির মধ্য দিয়ে চলছে। যার মধ্যে রয়েছে ফোর্ড বা জেরক্সের মত নামী দামী সংস্থা। প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষ এ-পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি খুইয়েছেন।

একইভাবে, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ১২টি দেশে শিল্প উৎপাদন ১.৪ শতাংশ হারে হ্রাস

পেয়েছে। কর্মহীনতা ইতিমধ্যে ১.৮ শতাংশ স্পর্শ করেছে এবং দুই সংখ্যার রাশিতে পরিণত হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রতিটি ডলারের বিনিময় দেশীয় ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ঋণ ১.৮২ ডলারে পৌছেছে। জাপানের অর্থনীতি যা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে পরিচিত তা প্রায় চরম বিপর্যয়ের কিনারায় এসে পৌছেছে।

এই মুহূর্তে জাপানের ঋণ ৭.৫ ট্রিলিয়ন ডলার যা তার মোট জাতীয় উৎপাদনের ২.৪ গুণ বেশি। এর মধ্যে শুধু সরকারি ঋণের পরিমাণই ১.৩ গুণ। মন্দার ফলে মুদ্রা হ্রাসের এক অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া সচল হয়েছে। যেখানে ভোগ্যপণ্যের মূল্য অবাধ গতিতে নেমে আসছে এবং এটা চলছে গত ২৪ মাস ধরে। প্রায় ১৮,০০০ মানুষ প্রতি মাসে দেউলিয়া হয়ে পড়ছে যা, গত ১৭ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি। এবং কর্মহীনতা গত ৫৫ বছরের বিচারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে।

একমাত্র যেভাবে সাম্রাজ্যবাদ এই টিকে থাকার অযোগ্য শোষণমূলক আর্থিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায় তাহল তার রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব তীব্রতর করার মধ্য দিয়ে। অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা নিশ্চিতভাবে চাপিয়ে দেওয়া হবে সেই সব মানুষগুলির কাঁধে যারা ইতিমধ্যেই বিশ্বায়নের আগ্রাসী আক্রমণে নিপীড়িত। এই সূত্রে আর একবার স্মরণ করা যায় 'দাস ক্যাপিটালে' লেখা মার্কসের সেই অমোঘ পংক্তিগুলো ঃ 'যথেষ্ট মুনাফা পেলে পুঁজি খুবই তেজী হয়ে ওঠে। ১০ শতাংশ মুনাফা নিশ্চিত জানলে সে যে কোন জায়গায় নিজেকে নিয়োগ করবে: ২০ শতাংশ নিশ্চিত জানলে নিয়োগের আগ্রহ প্রবলতর রূপে দেখা দেবে; ৫০ শতাংশ সুনিশ্চিত হলে দেখা দেবে স্পর্ধা; আর মুনাফা যদি শতকরা ১০০ ভাগে পৌছানোর নিশ্চয়তা থাকে তবে তার জন্য মানব সমাজের সমস্ত আইনকে পদদলিত করতে সে রাজি। আর যদি সে বোঝে মুনাফা ৩০০ শতাংশে পৌছাবে তবে এমন কোন অপরাধ নেই যা করতে সে দ্বিধান্বিত হবে না। এমন কোন ঝুঁকি নেই যা সে নিতে পারবে না। এমনকি যদি তার ফলে পুঁজিপ্রভুর ফাঁসি হয় তাতেও সে রাজি।'

ফলে মানব সমাজের জন্য অপেক্ষা করছে আক্রমণ ও আঘাতের আরো নতুন নতুন পর্ব যদি না ইতিমধ্যে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন যার, ক্রমবর্ধমানরূপ আমরা বিগত বছরগুলিতে দেখছি, এমন একটি স্তরে গিয়ে পৌছায় যা এই প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দিতে পারে অথবা এর প্রবাহকে বিপরীত দিকে পরিচালিত করতে পারবে। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এমন একটি সুনির্দিষ্ট বিকল্পের উন্মেষ ঘটে যা স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্য পূরণে শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে কাজ করে। ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হয়েছে যতোই অভ্যন্তরীণ সংস্কার করা হোক না কেন বুর্জোয়া ব্যবস্থা থেকে শোষণকে নির্মূল করা যাবে না, কারণ তা এই ব্যবস্থার উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি মূলগত বৈশিষ্ট্য; শোষণমুক্ত সমাজ চাইলে গড়তে হবে একটি বিকল্প আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুতেই সম্ভব নয়। মানবতার সামনে তাই দুটি উপায় যেমন রোজা লুৎসেনবার্গ বহুদশক আগে বলেছিলেন এবং ফিদেল কাস্ত্রো আজকাল বলছেন; বেছে নিতে হবে সমাজতন্ত্র আর বর্বরতার মধ্যে একটি। তাই যতই ফ্রান্সিস ফুকুয়ামাদের মত তাত্ত্বিক প্রবক্তাদের নেতৃত্বে সমাজবাদের অপরাজেয়তা ও তার অমরত্ব নিয়ে মতাদর্শগত আক্রমণ শানানো হোক না কেন, বিশ্ব ধনবাদী অর্থনীতি আজ এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। তার মোকাবিলায় সাম্রাজ্যবাদ নেমেছে কর্তৃত্ববাদী অভিযানে পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশকে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধার প্রতিজ্ঞায়।

যাইহোক সাফল্যলাভের জন্য শুধু গণআন্দোলনের শক্তির উপর নির্ভরশীল সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামকে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ

খাইয়ে নিতে হবে। সুতরাং এই সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের ৭০-বছরব্যাপী সমাজতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার এবং সমাজবাদী চীনের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করতে হবে।

বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্র

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা মানব-ইতিহাসে সর্বপ্রথম শ্রেণী-শোষণ মুক্ত সমাজের সূচনা করে। সমাজতন্ত্রের দ্রুত পদক্ষেপসমূহ, একদা পশ্চাদপদ অর্থনীতিকে একটি শক্তিশালী অর্থনীতিতে রূপান্তর এবং সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করতে সক্ষম সামরিক শক্তি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মানব প্রয়াসের এক মহাকাব্য স্বরূপ।

এই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সমগ্র পৃথিবীর সামাজিক মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামে অনুপ্রেরণার বিরাট উৎস, ফ্যাসিবাদকে পর্যুদস্ত করতে ও তার পরিণতিতে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন দুনিয়ার দিন বদলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ফ্যাসিবাদের পরাজয় উপনিবেশের জোয়াল থেকে মুক্তিলাভের প্রক্রিয়াতে বিশেষ গতি সঞ্চার হয়। চীনা বিপ্লবের ঐতিহাসিক বিজয়, ভিয়েতনামের জনগণের সংগ্রাম, কোরিয়ার মানুষের লড়াই, কিউবার বিপ্লবের সাফল্য বিশ্ব পরিস্থিতিতে প্রবল ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাফল্য - দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কর্মহীনতার সমস্যা নিশ্চিহ্ন করা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য - আবাসনের ক্ষেত্রে এক বিরাট কার্যক্রম নির্মাণ ইত্যাদি সারা দুনিয়ার মেহনতি মানুষের লড়াইকে নতুনভাবে প্রাণিত করে।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্ব ধনবাদ যে কৌশলগুলি গ্রহণ করে তা হল নির্দিষ্ট কল্যাণকর পদক্ষেপগ্রহণ এবং এতদিন পর্যন্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে তারা যে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে তার কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা তাদের জন্য মঞ্জুর করা। যে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ধনবাদী দেশগুলি যে কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণার জন্ম দেয় এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা এই টানাপোড়েনেরই ফসল।

এই সমস্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলি মানব সভ্যতায় গুণগত পরিবর্তন আনে এবং আধুনিক সভ্যতায় স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়। সংস্কৃতি, নান্দনিক কার্যকলাপ, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব ক্ষেত্রেই এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ছায়াপাত ঘটে। এহল সেই সময় যখন আইজেনস্টাইন সিনেমাটোগ্রাফিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের সীমানা পেরিয়ে স্পুটনিক স্পর্শ করছে মহাবিশ্বকে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউরি গ্যাগারিন যখন প্রথমবার মহাশূন্যে পাড়ি দেন তখন, আতঙ্কিত মার্কিন প্রতিক্রিয়া রূপ পায় সেনেট সদস্যদের সামনে কেনেডির ভাষণে, যেখানে তিনি বলেন— আর এক দশকের মধ্যেই তারা চাঁদে মানুষ পাঠাবেন এবং একাজেই মার্কিনীরা সফল হয়েছিলেন সেই ১৯৬৯ সালে তাও একদশকের 'ওভারটাইম' গবেষণার ফলে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেকগুলি মহাকাশ অভিযান চালিয়েছে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত লাইকা নামের কুকুরকে মহাকাশে প্রেরণ।

সমাজতন্ত্রের বিপরীতে

প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিরাট অগ্রগতি সত্ত্বেও কেন সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংহত করতে ও টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়?

সাধারণভাবে বিচারে দুটি ধারায় বিভ্রান্তি ঘটেছিল। প্রথম, বিভ্রান্তিটি ঘটে সাম্প্রতিক বিশ্ব

বাস্তবতার মূল্যায়নের প্রকৃতি সম্বন্ধে এবং সমাজতন্ত্রের মৌল ধারণা সম্পর্কে। দ্বিতীয় বিভ্রান্তিটি ঘটেছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময়কালে প্রয়োগের বাস্তব সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে।

ভ্রান্ত মূল্যায়ন

বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের অভূতপূর্ব এবং নজিরহীন অগ্রগতি সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি (পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশছাড়া) মূলত সংগঠিত হয়েছিল অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে। এক দিক দিয়ে এ ঘটনা যেমন লেনিনের সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের দুর্বলতম গ্রন্থিতে আঘাত করার তত্ত্বকে সপ্রমাণিত করে, অপরদিকে এর ফলে বিশ্ব পুঁজিবাদের পক্ষে সুযোগ ঘটেছিল তার উন্নত উৎপাদিকা শক্তিসমূহের উপর দখলকে বজায় রাখা এবং ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনা রক্ষা করার। একথা ঠিক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিশ্ববাজারে একতৃতীয়াংশ ধনবাদীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব পুঁজিবাদ ইতিমধ্যে তার উৎপাদিকা শক্তির ক্ষেত্রে যে বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে কাজে লাগিয়ে অদূর ভবিষ্যতে যে সুবিশাল অগ্রগতি ঘটানোর ক্ষমতা সে রাখে, দুটোর কোনোটাই ক্ষুণ্ণ হয়নি। সেজন্য বিশ্ব পুঁজিবাদের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবজনিত বিপর্যয়কে মোকাবিলা করে উৎপাদিকা শক্তি সমূহের বিকাশ ও ধনবাদী বাজারের বিস্তৃতি ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। শ্রেণীশক্তি সমূহের তৎকালীন আন্তর্জাতিক বিন্যাসের বিচারে সাম্রাজ্যবাদী নয়া-ঔপনিবেশিকতার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী বাজার বিস্তারে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে যে গতিতে এবং গুণগত পর্যায়ে নিজেদের অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল (মনে রাখতে হবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদী সামরিক যন্ত্রকে মোকাবিলা করার শক্তি অর্জন করে এক দশকের কম সময়ে অর্থাৎ পুঁজিবাদ যে জায়গায় পৌঁছতে ৩০০ বছর সময় নিয়েছিল সমাজতন্ত্র সেই কাজ ৩০ বছরে সম্পন্ন করে)। তার ফলে অনেকের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে এই অগ্রগতি অপরিবর্তনীয়। সেই চিরায়ত লেনিনীয় সতর্কবাণী, অর্থাৎ পরাজিত বুর্জোয়া শ্রেণী শতগুণ শক্তি নিয়ে প্রত্যাঘাত করবে আর ধর্তব্যের মধ্যে রাখা হয়নি।

ধনবাদের পতনের অনিবার্যতা কোন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয়। ধনবাদের উচ্ছেদ ঘটাতে হবে। এটা নিজে নিজে ঘটবে না। আমরা যদি তার শক্তিকে খাটো করে দেখি তবে তা, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী মতাদর্শগত সংগ্রামকে অনবরত শক্তিশালী ও তীক্ষ্ণ করার কাজকে ব্যাহত করবে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত পার্টির নেতৃত্বে সময় উপযোগী হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে (অর্থাৎ যে বিষয়গত উপাদান ছাড়া কোন বিপ্লবী রূপায়ণ অসম্ভব) আমূল পরিবর্তনের কাজকে বিঘ্নিত করবে।

ফলে সমাজতন্ত্রের শক্তির অতিমূল্যায়ন এবং ধনবাদের শক্তির অবমূল্যায়ন বস্তুগত বিশ্লেষণের বিরোধী চর্চা হয়ে দাঁড়ায়। ফলত তা আসন্ন বিশ্ব পরিস্থিতির সঠিক বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেয়।

তাছাড়াও সমাজতন্ত্রকে একটি একরৈখিক গতিধারা বলে ভাবা হয়েছিল। তত্ত্বগত প্রাপ্তির কারণেই এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল যে একবার সমাজতন্ত্র অর্জিত হলে বাকি প্রক্রিয়াটুকু সরলরেখা বরাবর, কোনো বাধাবিপত্তি ছাড়াই চলবে যতদিন না শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিজ্ঞতা আমাদের একথাই শিখিয়েছে যে সমাজতন্ত্র একটি ক্রান্তিকালীন পর্যায়, বা মার্কসের ভাষায় সাম্যবাদের প্রথম পর্ব—অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত শোষণমূলক ধনবাদী ব্যবস্থা এবং শ্রেণীহীন সাম্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যবর্তী একটি স্তর। ফলত, সংজ্ঞা থেকেই এটা পরিষ্কার

যে এই ক্রান্তিকালীন পর্যায়ে শ্রেণীগুলির মধ্যে সংঘাতের অবসান ঘটার পরিবর্তে তা আরো তীক্ষ্ণ ও প্রবল হবে এবং বিশ্ব পুঁজিবাদ সর্বশক্তি দিয়ে তার হারানো জমি পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হবে। স্বাভাবিক ভাবেই এই পর্যায়টিকে হতে হবে প্রলম্বিত ও জটিল এবং বহু আঁকাবাঁকা, উঁচুনীচু এলোমেলো গতিপথের মধ্যে দিয়ে সঞ্চারমান। এই বিষয়টি আরো নির্দিষ্টভাবে সেইসব দেশগুলির ক্ষেত্রে বলাই যায় সেগুলিতে বিপ্লবের সময় ধনবাদী বিকাশ ছিল অনুন্নত। (চীনের সংস্কার কর্মসূচী নিয়ে আলোচনার সময় আমরা সমাজতন্ত্র গঠনের এই প্রলম্বিত ক্রান্তিকালীন পর্যায় প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসব)।

এই সংগ্রামের যে কোন কালবিন্দুতে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শক্তির জয় বা পরাজয় নির্ভর করেছে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার ওপর, এবং আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শ্রেণীসমূহের বিন্যাস এবং তাদের অবস্থানগত মূল্যায়নের যথার্থতার ওপর। ভুল বিশ্লেষণ থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশের আভ্যন্তরীণ ও বর্হিবস্তুর উন্মতাকে খাটো করে দেখা এবং নিজেদের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে ভাবার ফলে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যেখানে একদিকে যেমন দেশগুলির সামনে উপস্থিত বাস্তব সমস্যাগুলোকে খতিয়ে দেখা হয়নি, অপরদিকে বিশ্ব পুঁজিবাদের অগ্রগতি এবং তার নিজস্ব শক্তিকে সংহতকরণের বিষয়গুলিকেও উপেক্ষা করা হয়েছিল।

লেনিন কিন্তু বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে দ্বন্দ্বতত্ত্বের সজীব নির্যাস হল নির্দিষ্ট অবস্থার বস্তুগত বিশ্লেষণ। যদি বিশ্লেষণ ত্রুটিযুক্ত হয়, কিংবা বাস্তব পরিস্থিতির প্রকৃত বিচারে যদি কোন ভুল থেকে যায় তবে তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ও বিকৃতি দেখা দেয়।

এই সমস্ত বিকৃতি এবং আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের বিপ্লবী মর্মবস্তু থেকে বিচ্যুতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ পর্যায়কে (বিশেষত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসের পর থেকে) আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরই সাথে যুক্ত হয় সোভিয়েত দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ প্রক্রিয়ার কিছু অমিমাংসিত সমস্যা। মুখ্যত এই দুই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয় ঘটে।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে গুরুতর ত্রুটি

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রক্রিয়ায় চারটি ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করা যায় যেখানে গুরুতর ত্রুটি ঘটেছিল। সেগুলি নিয়ে আলোচনার আগে আরো একবার উল্লেখ করা দরকার যে সমাজতন্ত্র প্রকৃত পক্ষে মানব সভ্যতার অগ্রগতির এক অজানা পথে তার যাত্রা শুরু করেছিল। এই পথযাত্রীদের সামনে কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রম বা ফর্মুলা ছিল না। এই বাস্তবতাই বেশ কিছু অংশে এই ত্রুটিগুলির জন্য দায়ী ছিল।

রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র

প্রথম আলোচ্য ক্ষেত্রটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কিত। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্র হল যৎসামান্য শোষক শ্রেণীভুক্ত সংখ্যালঘু মানুষের উপর বিপুল সংখ্যাগুরু মানুষের একনায়কতন্ত্র অর্থাৎ মুষ্টিমেয় কেন্দ্রিক একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র।

অবশ্য শ্রেণী শাসনের এই রূপটিরও সমাজতন্ত্রের বিকাশের বিভিন্ন পর্বের সাথে সাথে বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। ধরা যাক পুঁজিবাদী অবরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিংবা গৃহযুদ্ধকালীন পর্বে সর্বহারার শ্রেণী শাসনের যেরূপ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতেও যখন সোভিয়েত সমাজতন্ত্র নিজেকে সংহত করছে তখনও সেই রূপটি যে অভিন্ন থাকবে এমনটা ভাবার প্রয়োজন

ছিল না। সমাজতান্ত্রিক দেশে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা আমরা প্রথম খুঁজে পাই ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে স্টালিন তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্নাবলী শীর্ষক এই প্রসঙ্গে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। কিন্তু সঠিক সময়ে রূপের এই পরিবর্তন যদি না ঘটানো হয় (এখানে রূপের পরিবর্তন বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপে জনগণের উত্তরোত্তর অধিকতর সংখ্যায় অংশগ্রহণ) তবে মানুষের ক্রমবর্ধমান আকাঙক্ষাগুলির গতিরুদ্ধ হয় এবং তার ফলে জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষোভ। তাছাড়াও শ্রেণী শোষণের একটাই রূপ সব সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে একই ভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এই রূপ নির্ধারণের প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত নির্দিষ্ট দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সুনির্দিষ্ট আর্থসামাজিক পরিস্থিতি।

লেনিন রাষ্ট্র ও বিপ্লব গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে, ঠিক যেমন বিভিন্ন বুর্জোয়া রাষ্ট্রে রূপের মধ্যে ভিন্নতা আছে, তেমনই ধনবাদ থেকে সাম্যবাদে ক্রান্তিকালীন পর্যায় 'অবশ্যাত রাজনৈতিক রূপে বিপুল বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য দেখা দেবে'। কিন্তু তিনি একথাও বলছেন যে রূপের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এদের মর্মবস্তু হবে অভিন্ন অর্থাৎ সর্বহারার একনায়কতন্ত্র। 'বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির রূপের মধ্যে অতীব বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু তাদের মর্মবস্তু এক, বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র। রাজনৈতিক রূপের সুবিপুল বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য দেখা দেবে, কিন্তু মর্মবস্তু অনিবার্যভাবে থাকবে একটাই সর্বহারার একনায়কতন্ত্র'।

তাই যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোওর পরিস্থিতিতে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ সোভিয়েত রাষ্ট্রের রূপটি গ্রহণ করেছিল। তার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ দেশের বাস্তব আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ চেকোস্লোভাকিয়ায় বিপ্লবের আগে থেকেই বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কমিউনিস্টরা সংসদে নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর বহুদেশীয় ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিকে তাই অনেকেই ভেবেছিলেন পশ্চাৎগতির লক্ষণ। এর ফলে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এবং ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ দেখা দেয়।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

দ্বিতীয় যে প্রধান ক্ষেত্রটিতে গুরুতর ত্রুটি দেখা দিয়েছিল তা ছিল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সম্পর্কে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে হতে হবে গভীরতর ও সমৃদ্ধতর। একদিকে যখন ধনবাদ মানুষকে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের অধিকার দিলেও বিশাল অংকের মানুষকে সেই অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাখে (ধনতন্ত্রে দোকানে থরে থরে সাজানো থাকে বিক্রয়ের দ্রব্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই ক্রয়ের ক্ষমতা থাকে না।) তখন সমাজতন্ত্রে মানুষকে সে অধিকার দিতেও হবে এবং যাতে সে তা প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তারও ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবে কিন্তু বহুদেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ প্রক্রিয়ায় দুই ধরনের গুরুতর ত্রুটি লক্ষ করা যায়। প্রথমত, একটা নির্দিষ্ট কালপর্ব জুড়ে শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের কথা আমরা জানি তা পর্যবসিত হয় শ্রেণীর অগ্রগামী অর্থাৎ পার্টির একনায়কতন্ত্র তা আবার কিছুদিন বাদে রূপান্তরিত হয় পার্টি নেতৃত্বর একনায়কতন্ত্র যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গোটা শ্রেণী ও শ্রমজীবী সমাজের প্রতিনিধিত্ব হওয়ার কথা ছিল তা পার্টি নেতৃত্বের এক ক্ষুদ্র অংশে প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সৃষ্টি হয় এক অদ্ভুত পরিস্থিতি যেখানে ধরা যাক পার্টি পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্তসমূহ সাধারণ নাগরিকদের উপর বলবত করা হয়।

এই সবই করা হয় হুকুমদারির মাধ্যমে। পার্টি বহির্ভূত জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে যুক্তির

মধ্য দিয়ে আশ্বস্ত করার কাজ বাদ দিয়ে, সোভিয়েত সমূহের মত গণতান্ত্রিকভাবে প্রস্তুত সংস্থাগুলিকে এড়িয়ে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। পার্টির সিদ্ধান্তকে গণতান্ত্রিক মানুষের মধ্যে কার্যকরী রূপ দেওয়ার লেনিনবাদী নীতিকে উপেক্ষা করে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পার্টির নেতৃত্বদানকারী ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ উপেক্ষিত হয়, তার পরিবর্তে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে হুকুমজারি করে সিদ্ধান্ত প্রতিপালনের ধারা প্রাধান্য পায়। স্বভাবতই এর ফলে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী বোধ শক্তিশালী হয়।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় আন্তপার্টি গণতন্ত্রের বিষয়টি নানাসময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অপরদিকে কেন্দ্রীকতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এই ঘটনা আমরা দেখেছি। ফলে গড়ে ওঠে আমলাতন্ত্র যা, গণতন্ত্রের বিপরীত একটি ধারণা। সমাজতন্ত্র বিরোধী আরো বেশ কয়েকটি প্রবণতা যেমন, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি মাথাচাড়া দেয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক বিরাট অংশের বাড়তি বহু সুযোগ সুবিধা ভোগ করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। অন্যান্য শাসক কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে এই একই কথা বলা যেতে পারে। এর ফলে বিপ্লবী নীতিগুলির সজীবতা হারিয়ে যেতে থাকে। পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, পার্টি কর্মীবৃন্দ তার নেতৃত্ব থেকে আলাদা হয়ে যায়।

এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সম্পর্কিত এই সব বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করার পরিবর্তে গরবাচেভ ও তার সহযোগী নেতৃমণ্ডলী শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার মৌল নীতিগুলি পরিত্যাগ করার পথে এগিয়ে যান। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বিপ্লবী পার্টিকে নিরস্ত্র করা হয়, তাকে প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, যার চূড়ান্ত পরিণতিতে সমাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নির্মাণ

তৃতীয় যে ক্ষেত্রটিতে গুরুতর ত্রুটি দেখা দেয় তাহল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নির্মাণ প্রক্রিয়া। যতই উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানার ফলে এবং কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সাহায্যে উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে, ততই অর্থনৈতিক প্রশাসনকে অবিরাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময়োপযোগী করে তোলার বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে নতুন এবং উচ্চস্তরে যাওয়ার অক্ষমতা বা পরিবর্তন বিমুখতা এক অর্থনৈতিক বদ্ধ দশার সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ কৃষিউৎপাদন যোগ্য সমস্ত জমি ব্যবহার করার পরও যদি উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি হতে পারে একমাত্র উপায়। যথাসময় সেই পরিবর্তন ঘটানো না হলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৭০ এবং '৮০ দশকে ঠিক এই সমস্যাটি দেখা দেয়।

আবার পরিবর্তন করার পরিবর্তে গরবাচেভের নেতৃত্বে উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানা এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পথকেই পরিত্যাগ করার দিকে এগিয়ে যায়। 'বাজার অর্থনীতির বুর্জোয়া দেবতা'র প্রভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিকেই ক্রমান্বয়ে দুর্বল করার পদক্ষেপগুলি গৃহীত হতে থাকে, পরিণামে সমাজতন্ত্র বিপর্যস্ত হয়। গরবাচেভ ও কমিউনিস্ট পার্টির বিধ্বংসী নেতৃত্ব এইভাবে নিজেদেরকে সংশোধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অবৈধ সম্পর্কজাত সন্তানসন্ততিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মতাদর্শগত চেতনার অবহেলা

চতুর্থ যে ক্ষেত্রটিকে আমরা আলোচনায় আনতে চাই তা হল সমাজতন্ত্রে মানুষের সমষ্টিবাদী মতাদর্শগত চেতনা শক্তিশালী করার বিষয়ে গুরুতর দুর্বলতা। সমাজতন্ত্র টিকে থাকবে এবং বিকশিত হবে শুধুমাত্র মানুষের সামগ্রিক চেতনার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে। এই কাজ আবার পার্টির দৃঢ় মতাদর্শগত অবস্থান ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই কাজ সুদীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হয়। এই সমস্ত ত্রুটি দুর্বলতার কারণে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেখানে, বাইরের ও ভিতরের প্রতিবিপ্লবী শক্তি একজোট হয়ে সমাজতন্ত্রকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়।

সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয় তাই কোন মতেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল নীতিগুলির অপূর্ণতার ফলে ঘটেনি বরঞ্চ এই বিপর্যয় ঘটেছে প্রধানত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী মর্মবস্তু থেকে বিচ্যুতির কারণে; বিশ্ব পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের তুলনামূলক বিচারে ভ্রান্ত মূল্যায়নের কারণে; মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার সম্পর্কে যান্ত্রিক ও সংকীর্ণতাবাদী অপব্যাখ্যার কারণে; এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ধারায় কিছু গুরুতর ত্রুটি দুর্বলতার কারণে।

বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নির্দিষ্ট দেশের পরিস্থিতি উপযোগী সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিশেষকরে বর্তমান অবস্থায় যেখানে আন্তর্জাতিক শক্তির বিন্যাস সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে, এবং পুঁজি ও প্রযুক্তির উভয়ের উপরেই সাম্রাজ্যবাদ প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করেছে সেখানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রকে সংহত করার কথা ভাবতে হচ্ছে। এই সমস্ত প্রয়োগ কৌশল নিয়ে দুনিয়াজুড়ে সমাজতন্ত্রের শুভার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ ও বিতর্কের শেষ নেই। যদিও এই সংস্কারের ফলে চীনসহ কয়েকটি দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি দেখা দিয়েছে। এর ফলে নতুন সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে। চীনের বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক আলোচনা করা যাবে।

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের (এবং পরবর্তীকালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ফলে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ পূর্ব ইউরোপে, আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক চীনে, উত্তর কোরিয়ায়, কিউবা বা ভিয়েতনামে বিপ্লবের সাফল্য) কখনই কোনভাবে এই দেশগুলির অনুন্নত অর্থনীতি এবং উৎপাদিকা শক্তির নিম্নদশাকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উচ্চতর স্তরে অর্থাৎ ধনবাদের থেকে উচ্চতর পর্যায়ে রূপান্তরের কোন ইঙ্গিত বহন করেনি।

তবে আমাদের আলোচনার প্রয়োজনে একথা উল্লেখ করতে হবে প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই বাস্তব অবস্থার বস্তুগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উৎপাদিকা শক্তি দ্রুত বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়। একাজে কি করতে হবে তা অবশ্যই নির্ভর করে প্রতিটি বিপ্লবের নির্দিষ্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতার নিরিখে। লেনিন নিজেই অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকীতে বলেন : 'প্রথমে মানুষের রাজনৈতিক উৎসাহ এবং পরে তার সামরিক উৎসাহ জাগিয়ে তোলার উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তরঙ্গশীর্ষে ভাসতে ভাসতে আমরা আশা করেছিলাম যেভাবে উৎসাহের জোরে আমরা রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তব্যগুলি সাধন করেছি, একইভাবে এই উৎসাহের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক কর্তব্যগুলিকে আমরা সমাধা করতে পারব। আমরা আশা করেছিলাম বা বলা ভাল উপযুক্ত বিবেচনা ছাড়াই আমরা অনুমান করেছিলাম যে এই গরিব চাষির দেশে রাষ্ট্রীয় উৎপাদন এবং পণ্যের রাষ্ট্রীয় বন্টনের সাম্যবাদী ধারাকে সংঘটিত করার মাধ্যমে সর্বহারার রাষ্ট্রগঠনের কাজে আমরা সফল হব। অভিজ্ঞতা আমাদের ভুল প্রমাণ করছে। এখন মনে হচ্ছে একাধিক অন্তরবর্তী পর্বের প্রয়োজন আছে। —রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মত — যার মধ্য দিয়ে সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য প্রস্তুতি—সুদীর্ঘ কালব্যাপী প্রস্তুতি গড়ে তোলা যায়। ঠিক একইভাবে আমরা

আমাদের সামনের অর্থনৈতিক কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করতে সফল হব। আমরা আশা করেছিলাম বলা ভালো আমরা যথেষ্ট বিবেচনা ছাড়াই অনুমান করেছিলাম— গরিব কৃষকের দেশে সর্বহারা রাষ্ট্র গড়তে সাম্যবাদী ধারায় রাষ্ট্রীয় উৎপাদন এবং পণ্যের রাষ্ট্রিক বণ্টন ব্যবস্থা সংগঠিত করা সম্ভব হবে। অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে, যে আমরা ভুল ভেবেছিলাম এখন মনে হচ্ছে সাম্যবাদে পৌঁছানোর জন্য কয়েকটি অন্তর্বর্তী ধাপের প্রয়োজন আছে।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র— যার মধ্যে দিয়ে আমরা সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য প্রস্তুতি— এবং এক সুদীর্ঘকালের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি। সরাসরি উদ্দীপনার ওপর ভরসা করে নয়, বরং মহানবিপ্লবজনিত উৎসাহের সাহায্য নিয়ে ও ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত পারিতোষিক এবং বাণিজ্যিক নীতিসমূহের ভিত্তিতে আমরা এই গরিব কৃষকের দেশে **রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের পথ ধরে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোবার মজবুত সড়ক নির্মাণ করব।** তাছাড়া অমরা কিছুতে সাম্যবাদে পৌছতে পারবো না। লক্ষ লক্ষ মানুযকে সাম্যবাদে নিয়ে যেতে পারবনা। বিপ্লবের বিকাশের বস্তুগত গতিধারার অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে।' (লেনিন রচনাবলী, ৩৩ খণ্ড,পৃঃ ৫৮, মোটা হরফ লেখকের)।

তিনি আরো বলেন, "সমাজতন্ত্রের তুলনায় ধনতন্ত্র একটি অভিশাপ। আবার মধ্যযুগের সঙ্গে কিংবা ক্ষুদ্র উৎপাদনের সঙ্গে বা ক্ষুদ্র উৎপাদকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার ফলে যে অভিশপ্ত আমলাতান্ত্রিকতা জন্ম নেয় তার সঙ্গে তুলনায় ধনতন্ত্র একটি আশীর্বাদ। যেহেতু আমরা এখনো ক্ষুদ্র উৎপাদন থেকে সরাসরি সমাজতন্ত্রে পৌছতে পারছি না। ক্ষুদ্র উৎপাদন এবং বিনিময়ের প্রাথমিক ফলস্বরূপ কিছুটা ধনতন্ত্র যেহেতু এখন অনিবার্য সেহেতু আমাদের ধনবাদকে ব্যবহার করতে হবে (বিশেষত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের খাতে তাকে চালনা করে) ক্ষুদ্র উৎপাদন এবং সমাজতন্ত্রের অন্তর্বর্তী যোগসূত্র রূপে, একটা উপায় বা পথ হিসাবে, এবং উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির একটি পদ্ধতি রূপে। (লেনিন রচনাবলী ৩২খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫০)। কিন্তু এর মানে কি পুঁজিবাদের প্রত্যাবর্তন? এই প্রশ্নের উত্তর 'নয়া অর্থনৈতিক নীতির (NEP) পর্বে খোলাখুলিভাবে বলেন ঃ (এর মানে হল, কিছুটা মাত্রায় আমরা ধনতন্ত্রকে পুনঃসৃজন করছি। এটা আমরা করছি খুব খোলাখুলিভাবে এটা হল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। কিন্তু পুঁজির ক্ষমতাই যেখানে চূড়ান্ত সেইরকম একটা সমাজের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, আর সর্বহারার রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ দুটি মূলগত পৃথক ধারণা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বলতে বোঝায় যেটা রাষ্ট্রের দ্বারা অনুমোদিত এবং নিয়ন্ত্রিত ও পুঁজিপতিদের সেবায় ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে নিয়োজিত। সর্বহারার রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ শ্রমিকশ্রেণীর উপকারে নিয়োজিত। তার লক্ষ্য হল এখনও ক্ষমতাশালী পুঁজিপতিশ্রেণীকে প্রতিহত করা এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। এটা বলাই বাহুল্য যে আমাদের বিদেশী পুঁজিপতি শ্রেণীকে, বিদেশী পুঁজিকে বিভিন্ন ছাড় দিতে হবে। কোনরকম বিরাষ্ট্রীয়করণ না করে ঘটিয়েই আমরা আমাদের খনি; বনাঞ্চল, তৈলক্ষেত্র বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে লিজ দেব এবং তার বিনিময় প্রস্তুত পণ্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদি গ্রহণ করব এবং তার মাধ্যমে আমাদের শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করব।' (লেনিন রচনাবলী ৩২ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯১)।

সংস্কার পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক চীন

সংস্কার পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক চীনে আজকে আমরা যা দেখছি তা বেশ কিছু পরিমাণে 'নয়া-অর্থনীতি' নীতির পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সম্পর্কিত লেনিনের তাত্ত্বিক অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। যে মূল প্রশ্নটি এখানে জড়িত তা হল একটি পশ্চাৎপদ অর্থনীতিতে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিকে

এমন এক স্তরে উত্তরণ ঘটাতে হবে যার মধ্য দিয়ে ব্যাপকমাত্রায় সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকে সচল রাখা যায়। লেনিন তার সময়ে অভ্যন্তরীণ এবং বিশ্ব পরিস্থিতির ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে সচেষ্ট থেকেছেন কি করে পশ্চাৎপদ উৎপাদিকা শক্তি এবং উন্নত সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের মধ্যে ফাঁকটিকে পূরণ করা যায়। অবশ্য সোভিয়েত দেশের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ইতিহাস এক ভিন্নতর আবহে পরিচালিত হয়েছিল। বিদেশী শক্তির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবরোধ, গৃহযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদী শক্তির পরিচালনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি ইত্যাদি প্রতিকূল ঘটনা কখনই সোভিয়েত দেশকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদিকা শক্তির সংহতিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রলম্বিত ক্রান্তিকালীন পর্বের কোন শান্তিপূর্ণ অবকাশ দেয়নি। উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াকে, সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে অতিদ্রুত গতিতে সম্পন্ন করতে হয়েছিল। শুধু যেভাবে 'সমষ্টিকরণে'র মধ্য দিয়ে উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণের কাজ সফল হয়েছিল বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আগ্রাসী ফ্যাসিবাদের গতিরোধ এবং পরাজয় ঘটানো সম্ভব হয়েছিল — বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় প্রেরণার উৎস।

চীনেও আজ সমাজতন্ত্রের অধীনে উৎপাদিকা শক্তির স্তর এবং উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস চালানো হচ্ছে। উৎপাদিকা শক্তি নিম্নস্তরে থাকলে তাকে দিয়ে উন্নত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। উৎপাদিকা শক্তি সুদীর্ঘ দিন ধরে নিম্নস্তরে থাকলে তা সমাজতান্ত্রিক মানুষের প্রতিদিন বর্ধমান বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলির সঙ্গে সংঘাতে আসতে বাধ্য। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (C.P.C.) এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে যদি দ্বন্দ্বটিকে বেশিদিন জিইয়ে রাখা হয় তবে তা সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করবে।

'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' সময়কালে রাজনৈতিক গোলযোগ এবং 'দুষ্ট চতুষ্টয়'-এর ক্ষমতাচ্যুতির পর চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গভীর গুরুত্ব সহকারে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রসঙ্গগুলি পুনর্বিবেচনা করে। ১৯৭৮ সালে সমস্ত ধরনের ভ্রান্তিমূলক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ও অনুশীলনকে দূরে সরিয়ে রেখে পার্টি একটি সামগ্রিক মতাদর্শগত লাইন গ্রহণ করে, যাকে চূড়ান্ত বিচারে তারা 'একটি কেন্দ্রীয় কর্তব্য এবং দুটি মূল বিষয়' বলে থাকেন। কেন্দ্রীয় কর্তব্যটি হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর, দুটি মূল বিষয় হল (ক) চারটি মৌল নীতি (অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারা, জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক পথ এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং (খ) সংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণ ও মুক্তদারনীতি।

১৯৮২ সালে সংস্কার কর্মসূচী শুরুর কিছুদিন পরে কিম ইল সুং এর সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে দেং জিয়াও পিং বলেন ঃ 'আমাদের মত একটি বিশাল ও গরিব দেশে যদি আমরা উৎপাদন না বাড়াই তবে আমরা কেমন করে বাচব? আমাদের দেশের মানুষের জীবনে এত দুঃখ ও কষ্ট থাকে, তবে সমাজতন্ত্র কীকরে তার শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করবে? 'দুষ্ট চতুষ্টয়' বারবার গরিব সমাজতন্ত্র ও গরিব সাম্যবাদের বুলি আওড়াত, বলত সাম্যবাদ মূলত একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এসব তে নিছক আবোল তাবোল কথা, আমরা বলি সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের প্রথম স্তর, যখন একটা পিছিয়ে পড়া দেশ সমাজতন্ত্র গড়তে চায়, তখন এটা স্বাভাবিক যে সুদীর্ঘ প্রাথমিক পর্যায়ে তার উৎপাদিক শক্তির চেহারা কখনই উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সমান হবে না; এবং তার পক্ষে দারিদ্র্য দূ করাও সম্ভব নয়। তাই সমাজতন্ত্র গড়তে গেলে আমাদের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের জন্য য যা করা দরকার তা করতে হবে এবং ধাপে ধাপে দারিদ্র্যকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। প্রতিমুহূ মানুষের জীবনযাত্রার মানকে বাড়িয়ে যেতে হবে, তা না হলে সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের উপ কীভাবে তার জয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে? দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ সাম্যবাদের উন্নত পর্যা যখন অর্থনীতি ভীষণ উন্নত হবে এবং চতুর্দিকে অতুলনীয় বৈষয়িক প্রাচুর্য দেখা দেবে, তখ

আমরা 'প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী দেবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নেবে নীতি' কার্যকর করতে পারব। যদি এখনই আমরা উৎপাদন বাড়ানোর যা যা করা দরকার তা না করি, তবে অর্থনীতির বিস্তার ঘটাবো কি করে? কি করে বা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের সামনে তুলে ধরব। আমাদের কয়েকযুগ লেগেছে বিপ্লবকে সফল করতে। আর প্রায় দশক ধরে আমরা সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে আছি। তা সত্ত্বেও ১৯৭৮ সালে আমাদের শ্রমিকদের গড় মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৪৫ য়ুয়ান। আমাদের গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ দারিদ্র্যে ডুবে আছে। একে কি সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বলা যায়? সেইজন্য আমি জোর দিয়ে বলেছি যে আমাদের কাজের কেন্দ্রবিন্দুকে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্নে নিয়ে যেতে হবে। একাদশতম কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। সেইদিন থেকে আমাদের অনুশীলন প্রমাণ করেছে গৃহীত নীতির সঠিকতা এবং গোটা দেশটার চেহারা পাল্টে গেছে।' (দেং জিয়াও পিং নির্বাচিত রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১-২২)।

মূলত এই ধরনের বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তর সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা গড়ে তোলা হয়। এটা অবশ্য স্বয়ং মার্কস ও এঙ্গেলস্ যা বলেছেন এবং পরবর্তীকালে সব মার্কসবাদী যা মেনে নিয়েছেন তার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ : সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে অন্তবর্তী ক্রান্তিকালীন পর্যায় এবং সেই কারণে সাম্যবাদী সমাজের প্রথম পর্যায়। অবশ্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছে যে এই ক্রান্তিকালীন স্তরের মধ্যেই থাকবে আরও কয়েকটি স্তর এদের সংখ্যা নির্ধারিত হবে বিপ্লবের সময় উৎপাদিকা শক্তি কোন পর্যায়ে ছিল তার ভিত্তিতে। পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসে এই ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হয়। মূলত এ কথার অর্থ হল চীন যেহেতু বিপ্লবের সময় একটি পশ্চাৎপদ আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-উপনিবেশিক দেশ ছিল, ফলে তার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটাতে গেলে খুবই নিম্নতর স্তর থেকে শুরু করতে হবে। বিশ্বব্যাঙ্ক ১৯৮০ সালে চীনে একটি তদন্তকারী দল পাঠায়, যারা হিসাব করে বলে ১৯৫২ সালে মাথা পিছু মোট জাতীয় উৎপাদন ছিল ৫০ মার্কিন ডলার, যা ভারতের চেয়ে কম এবং ১৯২৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের গড় জাতীয় উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশের চেয়ে সামান্য বেশি। বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যা বিশিষ্ট এরকম একটি দেশের অর্থনীতিকে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা এক দুঃসাধ্য কাজ। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়নে এই প্রক্রিয়া বিপ্লবের পর ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলবে। একে তারা নাম দিয়েছে 'চীনা বৈশিষ্ট্য সহ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রক্রিয়া।'

এই রূপান্তর সাধনে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আরো একটি তাত্ত্বিক প্রস্তবনা হাজির করে, যাতে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি। এর মধ্যে অভিজ্ঞতায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যতদিন পর্যন্ত পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া থাকবে ততদিনই এই নির্মিত পণ্য বিনিময়ের জন্য বাজারেরও প্রয়োজন থাকবে। সি পি আই (এম) তার চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে মতাদর্শগত প্রস্তাবে উল্লেখ করে সমাজতন্ত্রে বাজারের প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে এটা ভাবা ভুল হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্য উৎপাদন চলে, বাজারও টিকে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি বাজার বনাম পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে নয়। বরং কে কার উপর আধিপত্য করবে প্রশ্ন সেটাই। সমাজতন্ত্রে বাজার সামাজিক পণ্য বন্টনের অন্যতম মাধ্যম। বাজারের শক্তি ও বাজারের সূচক কাজে লাগিয়ে যদি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তবে তা উৎপাদিকা শক্তির কার্যকরী উন্নতি ঘটাতে পারবে এবং মানুষের প্রয়োজনীয় কল্যাণকর চাহিদাগুলিও মেটাতে পারবে। ফলে বাজারের সূচকগুলিকে অবহেলা করলে সম্পদের উপযুক্ত করার কাজ ব্যবহৃত হয়, যা পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকেই বিঘ্নিত করে। চীনে যা সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে তা-হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পণ্যবাজার অর্থনীতি, যার মূলভিত্তি হবে

উৎপাদনের উপকরণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মতে এর অর্থ হল প্রথমত, রাষ্ট্রীয় পুঁজি মোট সামাজিক পুঁজির বৃহত্তর অধিকার করবে; দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হবে মূল অর্থনৈতিক জীবন রেখা এবং তা দেশের অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় স্থানে থাকবে। এর মধ্য দিয়ে তারা ব্যক্তি মালিকানাধীন বাজার অর্থনীতি সৃষ্ট অর্থনৈতিক মেরুকরণ ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে প্রতিহত করতে চায় এবং খেটে খাওয়া মানুষের সাধারণ সমৃদ্ধি সনিশ্চিত করতে চায়।

এই সমস্ত সংস্কারের ফলে গত দুই দশকে চীন অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। মানুষের বৈষয়িক জীবনযাত্রার মান বিপুলভাবে বেড়ে গেছে ; দারিদ্র্যসীমাভুক্ত মানুষের আয়তন হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য, উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিগত বিকাশের ক্ষেত্রে চীনের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। এ সবই সম্ভব হয়েছে চীনের 'মাওবাদী অতীত পরিত্যাগ করা'র কারণে নয়, বরং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার প্রথম তিন দশকে যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাগুলি পরিচালিত হয়েছিল তাদেরই দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে।

অবশ্য এই বিকাশের ফলে নতুনতর সমস্যারও উদ্ভব ঘটেছে। এগুলি হল ক্রমবর্ধমান বৈষম্য কর্মহীনতা ও দুর্নীতি। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই বিপদগুলি সম্পর্কে সচেতন এবং এই সমস্যাগুলি মোকাবিলায় তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাস্তব এটাই, যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলির রূপান্তর ঘটানোর মধ্যে দিয়ে প্রতি বছর কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, যদিও রাষ্ট্র একটি ন্যূনতম ভাতা যোগানোর মাধ্যমে ও ছাঁড়াইকৃত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে কিছুটা সুরাহা করার চেষ্টা করছে, কর্মহীনতা এই মুহূর্তে একটি গুরুতর সমস্যা।

ফলে যে মূল প্রশ্নটি দেখা দিচ্ছে তা হল ক্রমবর্ধমান বৈষম্য কি একটি নতুন পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম দেবে? লেনিন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিস্তারের কথা বলতে গিয়ে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই ধরনের ক্রান্তিকালীন পর্যায় কি কি ঝুঁকি বহন করে সে সম্বন্ধেও সতর্ক করেছেন। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ নির্মাণ প্রক্রিয়াকে একটি যুদ্ধ বলে বর্ণনা করে লেনিন বলছেন ঃ 'এই যুদ্ধের মূল প্রসঙ্গ হল কে জিতবে, কে প্রথম পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে? পুঁজিপতি, যাকে আমরা একটা দরজা খুলে, কখনও অনেকগুলি দরজা খুলে কখনও আমরা জানিনা এমন অনেক দরজা যা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বাদ দিয়েও আপনা-আপনি খুলে যায়, তার ভিতর দিয়ে ডেকে এনেছি।' (লেনিন রচনাবলী ৩৩ খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা)।

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের এই প্রসঙ্গটি সোজাসুজি মোকাবিলা করতে হবে কে উপরে উঠে আসবে, হয় পুঁজিপতিরা প্রথমে নিজেদের সংগঠিত করতে সফল হবে এবং সেক্ষেত্রে তারা কমিউনিস্টদের তাড়িয়ে দেবে অথবা সর্বহারার রাষ্ট্রশক্তি কৃষক সমাজের সহায়তায় এইসব ভদ্রলোকদের, পুঁজিপতিদের লাগামে ধরে রাখতে সক্ষম হবে, যার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে রাষ্ট্রীয় খাতে পরিচালিত করা সম্ভব হবে এবং এমন এক পুঁজিবাদকে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে, যা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত হবে।' (লেনিন রচনাবলী ৩৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬)।

একইভাবে দেং জিয়াও পিং দক্ষিণ চীন সফরকালে আয়োজিত এক বক্তৃতায় বলেন ঃ 'পথটা পুঁজিবাদী না সমাজবাদী এটাই মূল প্রশ্ন। সেই বিচার করার প্রধান শর্তই হল এই পথে সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদিকা শক্তির উন্নতি ঘটার সহায়ক কিনা; সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামগ্রিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক কিনা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক কিনা।' (সোস্যাল সায়েন্সেস ইন চায়না, ২০ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা পৃষ্ঠা ২৯)।

আবারও ১৯৮৫ সালে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের ফলে জনমানষে উদ্বেগ দেখা দিলে দেং

ালেন ঃ 'কোন মেরুকরণ (পড়ুন ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য) যাতে না দেখা দেয়, সেজন্য ামাদের নীতিগুলি প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা এই প্রশ্নের উপর গভীর গুরুত্ব দিয়েছি। াদি মেরুকরণ ঘটে, তবে সংস্কার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এক নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটা ক আদৌ সম্ভব? হাতে গোনা কয়েকজন বুর্জোয়া হয়ত দেখা দেবে, কিন্তু তারা শ্রেণীর রূপ পাবে া।

সংক্ষেপে সংস্কার সফল করার জন্য আমাদের রাষ্ট্রীয় মালিকানার ব্যবস্থা, যাতে আধিপত্য বস্তার করতে পারে, তার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে এবং মেরুকরণ যাতে না ঘটতে পারে সেজন্য তর্ক থাকতে হবে। শেষ চার বছরে আমরা এই নীতি নিয়ে এগোচ্ছি। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের পদ্ধতি লছে।'(দেং জিয়াও পিং নির্বাচিত রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৩)।

স্পষ্টত, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই মুহূর্তে চীনা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ প্রক্রিয়ায় গুরুতরভাবে প্রয়োগরত। চীনের পার্টি তার দেশের সংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির বস্তার ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রকে সংহত ও শক্তিশালী করার কাজে গভীরভাবে সচেষ্ট। অপরদিকে যকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এমন নির্দিষ্ট প্রবণতা যা মাজতন্ত্রকে দুর্বল এমনকি ধ্বংসও অবধি করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিরোধী ভাবনা ও ূল্যবোধের জন্ম দিতে পারে। চীনে যে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি আছে, তার লক্ষ্য সমাজতন্ত্রকে ক্তিশালী করা না, সে চায় মুনাফা; এবং আরও চায় এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে যা সমাজতন্ত্রের প্রতিকূল। লগ্নিপুঁজির প্রভুরা বৃহত্তর মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকে দুর্বল এমনকি উৎখাত করতে চাইবে। সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের এই সংগ্রাম আজ চীনের রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এই সংগ্রামে সমাজতন্ত্রকে সংহত ও শক্তিশালী করার যে কোন প্রয়াসের সারা বিশ্বের কমিউনিস্টদের সাথে আমরাও সৌভ্রাতৃত্ব জ্ঞাপন করছি।

সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ

আজ যখন মানব সমাজ তৃতীয় সহস্রাব্দে পা রেখেছে, আমরা এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন যখানে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর নতুন উদ্যোগে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সাম্রাজ্যবাদের এই চক্রান্তের ফলে গোটা বিশ্বে প্রধান চারটি দ্বন্দ্ব — সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব — সাম্রাজ্যবাদ বনাম তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার শ্রম ও পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর আকার ধারণ করেছে।

এদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় স্থানে রয়েছে, কারণ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের একমাত্র বিকল্প সমাজতন্ত্র। যতই সংস্কার করা হোক না কেন, পুঁজিতন্ত্রকে কখনই শোষণমুক্ত একটি ব্যবস্থায় পরিণত করা যাবে না। শোষণমুক্তির একমাত্র পথ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

অবশ্য আশু প্রেক্ষাপটে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ নতুন যুদ্ধাভিযানে উদ্যত সেখানে, সাম্রাজ্যবাদ বনাম তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির দ্বন্দ্ব অতিদ্রুত তীব্রতা অর্জন করবে এবং সামনে চলে আসবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় পরিচালিত মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে বিশ্বায়িত প্রতিবাদের ক্রমবর্ধমানরূপ দেখা যাচ্ছে। সিয়াটেল থেকে জেনোয়ার পথে এই বিশ্বায়িত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বিরোধী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির আন্তর্জাতিক আহ্বানে সাঁড়া দিয়েছেন প্রতিবাদী মানুষ। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে সংগ্রাম ও মিলিত প্রতিরোধ নতুন অভিজ্ঞতার উন্মেষ ঘটিয়েছে। ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে সংগ্রামের নবতর রণক্ষেত্র।

উদাহরণস্বরূপ লাতিন আমেরিকায় গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। ভেনেজুয়েলার 'বলিভারীও বিপ্লব' আধিপত্যকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি এবং তাদের পচে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলির উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল, যার সাক্ষ্য আমরা পাই হুগো স্যাভেজকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করার মধ্য দিয়ে। কলম্বিয়ায় বিদ্রোহী আন্দোলন শক্তিশালী আকার ধারণ করেছে। উরুগুয়েতে সমস্ত বামপন্থীশক্তি একত্রিত হয়ে মহাজোট গঠনের মাধ্যমে নিজেদেরকে দেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পেরুতে স্বেচ্ছাচারের পতন ঘটেছে। আর্জেন্টিনায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জনপ্রিয় সংগ্রাম ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। অল্প কিছুদিনে মধ্যেই এক অস্থিতিশীল সরকারের শাসনাধীন চূড়ান্তভাবে আর্থসামাজিক সংকটগ্রস্থ এই দেশে শ্রমজীবীদের লড়াই ভয়ংকর আকার ধারণ করতে পারে। নিকারাগুয়ায় সান্দিনিস্তা বাহিনী এবং এল সালভাদোরে ফারাবুন্দো মাতৃজোট মধ্য আমেরিকার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। মেক্সিকোতে ইন্ডিয়ানদের আন্দোলন ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করছে, বামপন্থীরাও তাদের শক্তিকে সংহত করছে। ক্যারিবিয়ান উপনিবেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে, বিশেষত মার্টিনিক এবং গুয়াদালুপ দ্বীপে এই লড়াই তীব্র আকার ধারণ করেছে। উত্তর আমেরিকানদের পানামা খাল থেকে পশ্চাত অপসরণের সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের দেশপ্রেমিক আন্দোলনে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

এই সময় সারা বিশ্ব জুড়ে কমিউনিস্ট শক্তির একজোট হওয়ার প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয়েছে। বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট, বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের প্রাদেশিক ভিত্তিতে জোট বাধার প্রক্রিয়া (যেমন, দুই আমেরিকার বামপন্থী শক্তির মিলিত মঞ্চ সাওপাওলো ফোরাম গঠন) শক্তিশালী হয়েছে। তাছাড়াও এই সময় বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতামত বিনিময় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মেলনের সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটেছে।

এই যা ঘটেছে তার অনেকটাই রক্ষণাত্মক প্রকৃতির। যে অধিকারগুলি অতিদ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে সেগুলিকে রক্ষা করার জন্যই মুখ্যত এদের আয়োজন। পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আরও প্রখর ও বিকশিত করে তুলতে হবে। একথা অবশ্য বোঝাতে চাইছি না কমিউনিস্ট শক্তিগুলির অগ্রগতি কোন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ঘটবে। কিন্তু বস্তুগত অবস্থানই এমন সব সম্ভাবনার জন্ম দেয় যেগুলিকে ব্যবহার করে কমিউনিস্টরা মানুষের উপর মানুষের শোষণ ভিত্তিক এই অন্যায় ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে তীব্র করে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে বিষয়ীগত উপাদান — অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের অন্যান্য শোষিত শ্রেণীগুলির সঙ্গে মৈত্রীর ভিত্তিতে পরিচালিত বিপ্লবী মতাদর্শগত সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং মার্কসবাদ - লেনিনবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঠিক সময়ে চূড়ান্ত হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে এই নিষ্ঠুর সমাজটার পরিবর্তন করার দায় আমাদের উপর বর্তেছে। আমাদেরকে বস্তুগত পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে হবে এবং মানবমুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য হস্তক্ষেপ করতে হবে।

বর্বরতার আগ্রাসনের হাত থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করবার একটিমাত্র পথ খোলা রয়েছে যারা বলে থাকেন বিশ্বায়নের কোন বিকল্প নেই (সেই সুবিখ্যাত TINA – There is no alternative) তাদের মুখের উপরে আমাদের স্পষ্ট জবাব হল TINA নয়, SITA (Socialism is the alternative) সমাজতন্ত্রই একমাত্র বিকল্প-এটাই ভবিতব্য।

ভাষান্তর : বিপুল ভট্টাচার্য

এই সংকলন গ্রন্থটির জন্য লিখিত রচনাটির শিরোনাম 'Socialism in the Era of Globalisation'।

জন্মেই প্রবীণ

অশোক মিত্র

ইংরেজিতে 'Climacteric' বলে একটি শব্দ আছে। কিছুটা জটিল বিষয় হলেও শব্দটি ইংরেজি অভিধানে আছে এবং এর অর্থের একটি সামাজিক মর্ম নিহিত রয়েছে। এটি বিভিন্ন জীবজন্তুর জীবনের একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণকে নির্দিষ্ট করে যখন তার শারীরিক ক্রিয়াকর্মে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। পুঁজিবাদের যেন সেইরকম এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত।

পুঁজিবাদের চলার পথ শুরু হয়েছিল মুক্ত প্রতিযোগিতার সত্যনিষ্ঠ আদর্শ থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগপুরুষ অ্যাডাম স্মিথ্ শিল্প বিপ্লবের সূচনা পর্বে একচেটিয়া উদ্যোগীদের কর্তৃত্ব নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। এই অসাধারণ মনীষীর মতে এই ধরনের উদ্যোগীরা সমাজে যে অন্যায় চাপিয়ে দেয় তা দূর করা সম্ভব। তিনি এক চিন্তার কাঠামো সৃষ্টি করেন সেখানে পণ্য ও পরিষেবার অসীম সংখ্যক ক্রেতা এবং বিক্রেতা থাকবে। তাঁর মতে এই বিপুল সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতাই, প্রথমত বিভিন্ন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এবং ফলত এইসব ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ সুনিশ্চিত করবে। এই মুক্ত প্রতিযোগিতাই সমস্ত সামাজিক শোষণের অবসান ঘটাবে। কারণ ধরা যাক বিক্রেতা a_1 ক্রেতা b_1 কে ঠকায় সেক্ষেত্রে b_1 এর কাছে এই পথ খোলা থাকছে যে সে a_1 এর কাছ থেকে পণ্য বা পরিষেবা না কিনে a_2 বা a_3 অথবা a_4 বা এরকম কোন বিক্রেতার কাছে যেতে পারে। অন্যদিকে b_1 যদি কোনভাবে a_1 কে ঠকায় সেক্ষেত্রেও b_1 কে পরিত্যাগ করে b_2, b_3, b_4 এরকম অসংখ্য বিকল্পের সাথে কেনাবেচা করার সুযোগ a_1 পাবে। এই রকম একটি ব্যবস্থাপনা থাকলে কেউই একতরফাভাবে অন্যের স্বার্থে আঘাত হানতে পারবে না।

এই কাল্পনিক আদর্শ জগতের যে স্বপ্ন অ্যাডাম স্মিথ্ তুলে ধরেছিলেন তাই ছিল ধনবাদী উদ্যোগের ভাবাদর্শের উৎস। স্মিথ্ আসলে স্কট্ল্যান্ডের চার্চের অনুগামী ছিলেন যেখানে ক্যালভাঁর* ধর্মতত্ত্বের গভীর প্রভাব ছিল। এই ধর্মতত্ত্বের দুটি প্রধান মূল্যবোধ হল (১) মিতব্যয়িতা ও সরল জীবনযাপন (২) এক দৃঢ় বিশ্বাস যে পৃথিবীতে কৃতকর্মের জবাবদিহি ভগবানের কাছে করতেই হবে। পুঁজিবাদের উষালগ্নে মুক্ত প্রতিযোগিতা ও পুঁজিবাদ ছিল

জাঁ ক্যালভাঁ (Jean Calvin) ছিলেন প্রোটেস্টান্ট ধর্মবিপ্লবের একজন যুগপুরুষ। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ছিল তাঁর কর্মকেন্দ্র।

সমার্থক, সঞ্চয়ের জন্য নিষ্ঠা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ এই ছিল তার মূল কথা। শোষণকে মনে করা হত অন্যায়, তাই মুক্ত প্রতিযোগিতা যা সমাজের এক সদস্যের দ্বারা অন্য সদস্যের শোষণের সমস্ত সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, তাকে মনে করা হত এক অতীব ধর্মপ্রাণ বোধের মর্মবস্তু। উপরন্তু ঈশ্বরের সম্পর্কে একটা ভীতির মনোভাব সামাজিক শোষণের বাড়তি বাধা হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল।

এই প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের অবসান ঘটেছে। এখন হল সেই সন্ধিক্ষণ। পরিণত পুঁজিবাদ যার দ্বারা আমরা প্রত্যেকেই আক্রান্ত, তা এখন ক্যালভাঁ ধর্মতত্ত্বের ব্যঞ্জনা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। মুক্ত প্রতিযোগিতার যুগ শেষ হয়েছে বহুকাল আগে, এখন এসেছে একচেটিয়া কারবারের নানা রূপ—duopoly, oligopoly, polipoly, আমরা এমন একটি বিশ্বে বসবাস করি যেখানে হয় একচেটিয়া ক্রেতা আছে অথবা একচেটিয়া বিক্রেতা আছে অথবা দুজনেই আছে। একচেটিয়া ব্যবস্থা মানেই শোষণ। উন্নত পুঁজিবাদ সমস্ত নৈতিকতা থেকে পূর্ণ মুক্তি লাভ করেছে। আদি যুগের মূর্ত প্রতীক মুক্ত বাজারের দর্শন আজ বিস্মৃতির অতলে, যা টিকে আছে তা হল সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। শুধু টিকে আছে নয় বিকশিত হয়েছে। সমস্ত বিবেচনা ভুলে যাও; বেঁচে থাকার শুধু একটাই লক্ষ্য টাকা, টাকা এবং আরও টাকা।

যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ মুনাফা প্রসারের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা এই মাটিতে সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। রিচার্ড নিক্সনের এক বন্ধু একসময় খুব সাবলিলভাবে এই মনোভাবকে তুলে ধরেছিলেন ঃ সে তার ঠাকুমাকে চাপা দিতেও পিছুপা হবে না, যদি একাজ করে সে অতিরিক্ত দশ হাজার ডলার রোজগার করতে পারে। যেভাবে পর পর আর্থিক কেলেঙ্কারি আমেরিকার অর্থনীতিকে গ্রাস করছে তাতে বলা যায় শুরু হয়েছে এক পতনোন্মুখ হাহাকার—নেমেসিসের যুগ। একজন শুধু কর্পোরেট খাতে অর্থ উপার্জন করছে তাই নয় ব্যক্তিগত খাতেও সম্পদ বৃদ্ধি করছে—কিভাবে অর্থ রোজগার করা হল সেটাও বড় কথা নয়—শুধু চাই আরও টাকা। বিভিন্ন আমেরিকান সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা আনন্দের সঙ্গে নিজেদের সম্পদ স্ফীত করছে। তাঁদের সহযোগী হয়েছেন অডিটর, ব্যাঙ্কার অথবা সরকারি আধিকারিক। শুধু এইটুকু করতে হবে, এই অন্যায় প্রাপ্তি যেন ভালোভাবে ভাগবাঁটোয়ারা করা হয়। এই লুঠের অংশ সময় মত পৌঁছে যায় সাংসদ, অথবা সিনেটরদের কাছে এমনকি White House-এও। এই সবই হল এনরন, জেরক্স, ওয়ার্ল্ডকম অথবা এই ধরনের সংস্থাগুলির পরিণতির পেছনের কাহিনী।

দয়া করে এ ধারণা থেকে বিরত থাকুন যে এগুলি আর কিছুই না। কর্পোরেট দুর্নীতির কিছু দৃষ্টান্ত মাত্র। টিপট ডোম হল সেই পুরোহিত যার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বোলভিন বালিজের রক্ষিতার কথা জানা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের এই দীর্ঘ দুর্নীতির ঐতিহ্য আজও পর্যন্ত চলে আসছে। মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যদের অথবা সেনেটরদের নিজেদের নির্বাচকমণ্ডলীকে হাতে রাখার প্রচলিত 'pork barrel' পদ্ধতিটিও দুর্নীতির এক সূক্ষ্ম সংস্করণ। বিভিন্ন প্রদেশের সরকারগুলিও এই সংক্রমণ থেকে বাইরে নয়। সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে নিউ জার্সি সর্বদাই পথপ্রদর্শক। সাম্প্রতিককালে যে দুর্নীতির ঘটনা রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা হল পেনসনের অর্থ লুঠ। নিউজার্সির মহিলা গভর্নর ও তাঁর বন্ধুরা মিলে প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার পেনসনের অর্থ চুরি করেছেন।

এখানেই শেয কেন, এই ব্যাধি শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছে। প্রিন্সটন, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ঢুকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে নিউ হেভেন ক্যাম্পাসের কিছু ভালো ছাত্রকে ভাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ এখন সবার জন্য মুক্ত এবং দুর্নীতির সীমা আকাশ ছুঁয়েছে।

ভারতের সমস্যা হল এর ফলশ্রুতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা অনুসরণ করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্পোরেট জগতে দুর্নীতির যে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে আমরা যথেষ্ট দ্রুততার সাথে এর কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আমাদের মধ্যে এখন প্রায় নিয়মিত ভাবেই নানা দুর্নীতির ঘটনা বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে—কখনও অসাধু ব্যবসা, নিজের লোক বসানো, অথবা শেয়ারের দামে কারচুপি—এসব প্রায়শই ঘটে চলেছে।

ইউনিট ট্রাস্ট অফ্ ইন্ডিয়া এখন গভীর সঙ্কটে। ওই সংস্থার বেশ কিছু প্রভাবশালী বিনিয়োগকারী, যাদের রাজনীতি ও প্রশাসনিক স্তরে ভালো যোগাযোগ আছে তারা জনগণের প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা নিয়ে চলে গিয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আরও কঠিন অবস্থায় পড়েছে—প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার সমমূল্যের সম্পদ এইসব ব্যাঙ্কগুলিতে অনাদায়ী। বৃহৎ ব্যবসায়ীরা যারা এই অর্থ ঋণ নিয়েছে অথচ শোধ না দিতে বদ্ধ পরিকর, সেই ধনী দোষীদের দিকে আঙুল তোলার ক্ষমতা সরকারের নেই। পেট্রোল পাম্প, গ্যাস ও কেরোসিনের লাইসেন্স সংক্রান্ত সাম্প্রতিক কালের দুর্নীতির ঘটনাবলি, এসবই-একই গোত্রের সরকারের মধ্যেকার কিছু ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ও আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধবের সম্পদ বৃদ্ধি করতে সদা তৎপর।

চুরি করা আজ কোন সামাজিক অসম্মানের ব্যাপার নয়। গরিব শ্রমিক কর্মচারীদের জমানো প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা নিয়োগকারী আত্মসাৎ করছে, আয়কর এবং আন্তঃশুল্ক ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে, বিক্রয়কর ক্রেতার কাছ থেকে তোলা হচ্ছে কিন্তু সঠিক ভাবে জমা পড়ছে না।

ভারতে পুঁজিবাদ যদিও জায়মান, কিন্তু ইতিমধ্যেই তা যথেষ্ট জংলি হয়ে উঠেছে। মার্কিন দৃষ্টান্তের ছায়াও পড়ছে এদেশে। একে বলা যেতে পারে ভারত-মার্কিন যৌথ দুর্নীতির মহড়া চলছে। দাভোল-কর্পোরেশনের দুর্নীতির সাম্প্রতিক ঘটনা এরকমই একটি দৃষ্টান্ত যার মধ্যে দিয়ে ভারত ও মার্কিন দুই দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা যেমন লাভবান হয়েছে উভয় দেশের রাজনীতিবিদদেরও অর্থ সমাগম ঘটেছে। বোফর্স থেকে তেহেলকা, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের সব দূর্নীতির ঘটনাই আন্তর্জাতিক স্তরের দূর্নীতির যৌথ উদ্যোগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—কমিশন ও ঘুষের অর্থ ভাগ হচ্ছে ভারত ও বিদেশী কমিশন এজেন্টদের মধ্যে যার একটা অংশ সংশ্লিষ্ট দেশদুটির রাজনীতিবিদের ঘরেও যাচ্ছে।

একথা বলাটা যদিও যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত হবে না যে এই সমস্ত অনাচার আসলে মার্কিন দৃষ্টান্ত অনুসরণের ফল। প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা প্রায় পাঁচ হাজার বছরের— তার অবদানও এক্ষেত্রে প্রায় সমতুল্য। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে কিভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে অন্যায় পথে রাজনৈতিক অথবা আর্থিক প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে হবে। আমরা আসলে যা দেখছি তা হল দুর্নীতির ক্ষেত্রে আর্য ও মার্কিন সংমিশ্রণ—এযেন কু-ক্লাক্স-ক্ল্যান ও বিশ্ব হিন্দুপরিষদ হাতে হাত ধরে চলেছে। এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আর রুখবে কে?

ভাষান্তর ঃ সাত্যকি রায়

ঋণ-যুদ্ধ

দেবু দত্তগুপ্ত

যেন মাতৃগর্ভের যমজ সহোদরের মতই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বাঁধনে যুদ্ধ আর ঋণ আবহমানকাল জড়িয়ে আছে। যদিও গাছ আগে, না ফল আগের বিতর্কে এগিয়ে আছে যুদ্ধই। যুদ্ধই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিবার্য ভবিতব্যের মত বাড়িয়ে চলে ঋণকে। এই অবিভাজ্য সম্পর্কটা জটিল নানা আঙ্গিকে জাড়িয়ে থাকে। কখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাবার রসদটা আসে ঋণ থেকে। কখনও ঋণের জন্যই অনিবার্য হয়ে পড়ে যুদ্ধটা।

১৯৮২ সালে ডেট ক্রাইসিসের সূচনা থেকে যুদ্ধের ঘটনাবলী তৃতীয় বিশ্বে কিভাবে পরিবর্তিত চেহারায় ঘটে চলেছে, তার মধ্যে কোনো আন্তঃসম্পর্ক আছে কিনা, দেখা যাক।

৮০-র দশকের আগেও যুদ্ধ আর ঋণের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটা পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের কাছে বিবেচ্য বিষয় বলে গণ্যই হত না। ফলে যুদ্ধের সূত্র ধরে ঋণ, আবার ঋণশোধের দায় থেকে যুদ্ধ; এই একই বৃত্তে আবর্তন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার দায়ও ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের ওপর ঋণের প্রবল অভিঘাতকে কেউ অস্বীকার করতে পারতো না। কেননা, এই কালচক্রের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তীব্র ভাবে। যুদ্ধ আর সংঘর্ষের জমি তৈরি করতো ঋণ। এই জমির ফসল হিসাবে মাথা তুলতো ভয়ঙ্কর যুদ্ধোন্মাদনা।

সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে হিংস্র, আগ্রাসনবাদী উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণও ছিল ঋণ। যুদ্ধ আর ঋণের পারম্পর্যে এ যেন এক ধ্রুপদি উদাহরণ। বিপুল ঋণের কারণ হিসাবে প্রথমে যুদ্ধ প্রধান ইন্ধনের কাজ করলো, যুদ্ধে ঋণকে ব্যবহার করা হল অমোঘ হাতিয়ার হিসাবে। ঋণের যাত্রাপথ পৌঁছাল সরাসরি যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

(২)

যুদ্ধের কার্যকারণ সম্পর্কে সার্বজনীন একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। হলিউডে যুদ্ধের ছবিগুলি যে অতিমানবিক শৌর্যে, বীর্যে, দেশপ্রেম আর সাহসের গরিমাদীপ্ত চেহারায় আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ করে রাখে, প্রকৃত যুদ্ধটা মোটেই তেমন রোমাঞ্চকর নয়। যদিও পুঁজির দর্শনে যুদ্ধ এমনই মহান। পুঁজির বিকাশ আর পুষ্টির প্রয়োজনে যুদ্ধ তাই মাতৃদুগ্ধের মতই অপরিহার্য।

যুদ্ধ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে। আর সেই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তৈরি অগণন চলচ্চিত্র থেকে। কিংবা কিছু ব্যতিক্রমী যুদ্ধ, সংঘর্ষের যে ঘটনাগুলিকে গণমাধ্যম ব্যাপক কভারেজ দিয়েছে, যার থেকে হলিউড ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রি যুদ্ধকে রোমাঞ্চকর বীরত্বের

মহিমায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারিকুরিতে বিনোদন শিল্পের উপাদান হিসাবে পরিবেশন করেছে। যার কেন্দ্রীয় বক্তব্য ঃ এই পৃথিবীটা শুধুই বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

অথচ যুদ্ধ আর তার অপরিমেয় ধ্বংসের নেপথ্যে রক্তমাংস চুষে খাওয়ার সর্বগ্রাসী ঋণ-যুদ্ধ-ঋণের চক্রবৃদ্ধির আবর্তনটা লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়। সাধারণভাবে বর্তমানকালের যুদ্ধ সম্পর্কে জানা যায় খুবই কম। অবশ্য ১৯৯০-এর উপসাগরীয় যুদ্ধ আর ৬০-এর দশকের ভিয়েতনাম যুদ্ধ সর্বাত্মক যুদ্ধের ইতিহাস নিরঙ্কুশভাবে ব্যতিক্রমী ঘটনা।

বেশিরভাগ যুদ্ধই পাশ্চাত্যের নিজেদের ভূখণ্ড থেকে বহুদূরে ছোট ছোট দেশে সংঘটিত হয়ে চলে। ফলে সেইসব রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সম্পর্কে তারা উদাসীন থাকে। এগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধের বীজও ঋণদাতাদের দাক্ষিণ্যে বপন করা হয় সুকৌশলে।

এই সংঘর্ষগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে, যথার্থ কার্যকারণকে ভিত্তি করে শুরু হয় না। যুদ্ধ শুরুর যেমন নির্দিষ্ট দিন থাকে না, তেমনিই থাকে না যুদ্ধ শেষের নির্দিষ্ট মুহূর্ত । দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চলে। বর্তমানে বিশ্বে এধরনের যত যুদ্ধ চলছে তার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই চলছে প্রায় দীর্ঘ এক যুগ ধরে। যদিও যুদ্ধের তীব্রতা সব সময় এক থাকে না। কখনও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলে, কখনও স্তিমিত হয়ে থাকে ছাই চাপা আগুনের মত। আবার বর্ধিত হিংস্রতায় নেমে পড়ে। কখনও ধ্বংসের ব্যাপকতা কমে, কখনও তীব্র হয়। ফলে এটা একই যুদ্ধের ধারাবাহিকতা, না নতুন যুদ্ধ — এটা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

যেভাবে গণমাধ্যম বা হলিউডে যুদ্ধের প্রচলিত ছবি দেখতে আমরা অভ্যস্ত, আজকের যুদ্ধের সাধারণভাবে তেমন নাটকীয় উত্তেজনায় অস্থির কোনো সার্বজনীন চেহারা নেই। আজকের গৃহযুদ্ধ বহু বছর ধরে চলে, চূড়ান্ত ফলাফলের কোনো মুহূর্তকে তেমনভাবে নির্দিষ্ট করা যায় না, ফলে গণমাধ্যমের কাছে উত্তেজক সংবাদ হয়ে ওঠে না। একই কারণে এই যুদ্ধের চরিত্র বোঝাও কঠিন হয়ে পড়ে। চেনা গণ্ডির বাইরে এই সংঘর্ষগুলি যত দীর্ঘই হোক, নেপথ্যে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে যুদ্ধের সঞ্জীবনী ইন্ধন, ঋণ। আর মহাজনরা দুপক্ষকেই উৎসাহিত করে অব্যাহত রাখে ধ্বংস যজ্ঞের জ্বালানি।

কার্যত আজকের যুদ্ধের কোনো সার্বজনীন সংজ্ঞা নেই। একট সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করে নেওয়া হয় খুব অনির্দিষ্টভাবে। কোনো সংঘর্ষকে যুদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত করার এক পদ্ধতি হচ্ছে যুদ্ধে মৃতদের সংখ্যা বিচার করা। কেন্দ্রীয়ভাবে সংঘটিত দুটি বাহিনীর মধ্যে হিংস্র সংঘর্ষ কিংবা মৃতদের সংখ্যা হাজার অতিক্রম করা— এমন এক বিচিত্র ভিত্তিকে ধরে যুদ্ধকে বিচার করা করা হয়।

এই প্রচলিত সংজ্ঞাতেই ১৯৯১-এর সূচনায় তৃতীয় বিশ্বের ৩৯টি দেশে ৪৮টি যুদ্ধ চলছিল। তার মধ্যে ৪৬টি ছিল গৃহযুদ্ধ। মাত্র ২টি ছিল আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং দ্বিতীয়, পশ্চিম সাহারায় মরক্কোর যুদ্ধ। ৬টি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলছিল একাধিক গৃহযুদ্ধ। এই ৪৮টি দেশের মৃতদের সংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ লক্ষ।

(৩)

এই শতাব্দীর সংঘর্ষের ইতিহাসে যুদ্ধ-মৃতদের মধ্যেও একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের মধ্যে ৯০ শতাংশই ছিল সামরিক বাহিনীর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অর্ধেক ছিল অসামরিক জনগণ। এর মধ্যে ছিল ডেথক্যাম্পে হৃত অসামরিক যুদ্ধবন্দী। নির্বিচারে বোমা বর্ষণে নিহত শহরের সাধারণ মানুষ। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে নিহত দুই- তৃতীয়াংশই হচ্ছে অসামরিক জনগণ। উদ্বাস্তুসহ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের ৯০ শতাংশই অসামরিক ক্ষেত্রের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিটি যুদ্ধেই ১০ লক্ষের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। ১৯৫০-৫৩

কোরিয়ার যুদ্ধে যুদ্ধহতদের সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ। ১৯৪৬-৫০ চীনে নিহতের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। ১৯৬০-৭৫ নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া. কম্বোডিয়া ইত্যাদি যুদ্ধে মৃতদের সংখ্যা এবং ধ্বংসের ব্যাপকতা এত তীব্রভাবে সর্বাত্মক ছিল যে, এই সময়কালের ছোট ছোট যুদ্ধগুলিতে হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান কোনো গুরুত্বই পায়নি।

যুদ্ধ যাদের হত্যা করে ক্ষতি শুধু তাদের নয়। ১৯৯০ সালের হিসাব পর্যন্ত সারা বিশ্বে যুদ্ধে বাস্তুহীনদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ কোটি। এর বাইরে ছিল যুদ্ধের কারণে নিজ ভূমে পরবাসী হওয়া ছিন্নমূল ২ কোটি জনগণ। যুদ্ধের ফলে গৃহহীনদের সর্বোচ্চ সংখ্যাটা আফগানিস্তানে। সমগ্র বিশ্বের যুদ্ধ-উদ্বাস্তুদের ২৩ শতাংশ। সংখ্যার বিচারে ৮০ লক্ষ। যদিও যে কোনো মহাদেশের তুলনায় আফ্রিকার উদ্বাস্তুসংখ্যা সর্বোচ্চ। জনসংখ্যার তুলনায় মধ্য আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ-উদ্বাস্তুদের সংখ্যাও কম নয়। ২৫ লক্ষ ও ৭০ লক্ষ। শুধুমাত্র ১৯৮৯ সালেই বিশ্বের ৩ কোটির বেশি মানুষ যুদ্ধবিধ্বস্ত বিভিন্ন দেশে বাস্তুহীন হয়েছে। যুদ্ধের কারণে প্রত্যক্ষ উদ্বাস্তু হয়েছে আড়াই কোটি মানুষ। আফ্রিকায় উদ্বাস্তু হয়েছে ২ কোটি। এশিয়ায় ১ কোটি ২০ লক্ষ।

যুদ্ধে মৃতদের বাইরে আছে শারীরিক, মানসিক বিকলাঙ্গদের সংখ্যা, কয়েক কোটি। এই অংশের মধ্যেই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধ-শিকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ কিশোর সৈনিক। সারা দুনিয়ায় যুদ্ধরত, সেনাবাহিনীর মধ্যে ৫ লক্ষের বেশি ১৫ বছরের কমবয়সী কিশোর-কিশোরী। যদিও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংগৃহীত এইসব পরিসংখ্যানের তুলনায় সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রকৃত সংখ্যাটা বহু গুণ বেশি।

(৪)

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম এলিজাবেথের শাসনাধীন ইংল্যান্ড এবং দ্বিতীয় ফিলিপের শাসনে স্পেনে সরকারি ব্যয়ের ৭৫ শতংশই খরচ হতো যুদ্ধের জন্য। এবং আগেকার যুদ্ধের প্রয়োজনে নেওয়া যুদ্ধ ঋণ শোধ করার জন্য। যুদ্ধের ব্যয় মেটানোর জন্য ঋণের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেত যে, যুদ্ধ জয়ের সাফল্যও অতিরিক্ত ঋণ নেওয়ার সর্বগ্রাসী পরিমাণের ক্ষতিপূরণ করতে পারতো না।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ১৭৭৮-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ বছরের যুদ্ধের ঐতিহাসিক সাফল্য সত্ত্বেও নিজস্ব সম্পদের অপুরণীয় ক্ষয়, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে হস্তক্ষেপ সুদীর্ঘকালের সঞ্চয়কে এত নির্দয়ভাবে ক্ষইয়ে দিয়েছিল, যে যুদ্ধ-ঋণের অপরিমেয় অভিঘাত ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের নেপথ্যে অন্যতম মাত্রা যুক্ত করেছিল বলে অনেক ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

গত শতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন ছিল বিজয়ী পক্ষের অন্যতম শক্তি। কিন্তু দুটি যুদ্ধ জয়ের মূল্য দিয়ে গিয়ে যে ব্রিটিশ সূর্য কখনও অস্ত যেত না, সেই মধ্যগগনের সূর্যও বিপুল যুদ্ধ-ঋণের রাহুগ্রাসে হারিয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপরিমেয় প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়েছিল নিদারুণভাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ১৯৪৫ সালে বৃটেন বাধ্য হয়েছিল ঋণ গ্রহণ করতে। তীব্র বিরক্তিতে 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা লিখেছিল যে — 'It is rather aggravating to find that the reward for losing a quarter of our national wealth in the common cause is to pay tribute for half a century to those who have been enriched by the war.'

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বৃটেনেও এই ঋণ নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ ছিল। যদিও বৈদেশিক ঋণের কোনো

শর্তই মার্কিনীরা বৃটেনের ওপরে চাপায়নি। সুদের হার ছিল মাত্র ২ শতাংশ। তাও যে বছর ব্রিটেন মার্কিনী রপ্তানি বাণিজ্যের ২ শতাংশের বেশি পণ্য কিনবে সে বছর সুদ মুকুব করা হবে।

(৫)

নিঃসন্দেহে যুদ্ধে বিবদমান দেশগুলির সাফল্যের অন্যতম শর্ত ছিল যুদ্ধ-ঋণ কে কত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারছে। বিংশ শতাব্দীতেও ঋণ নেবার ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত দক্ষতা ছিল ব্রিটেনের। কিন্তু ঋণশোধের ক্ষমতা কমে আসছিল দ্রুত।

সম্ভবত বুশ প্রশাসনও বুঝেছিল যে, যুদ্ধের জন্য যে ঋণ হয় তা অতি বড় ক্ষমতাবানদেরও দুর্বল করে দেয়। তাই গালফ্ ওয়ারে ঋণ না নিয়ে অন্যের অর্থে যুদ্ধ চালিয়েছিল মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র।

এই যুদ্ধের সিংহভাগ খরচই যুগিয়েছিল সৌদি আরব, কুয়েত, জাপান, জার্মানি। ৪২ দিনের যুদ্ধে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়েছিল ৫ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। যুদ্ধের ইতিহাসে এই প্রথম ঋণ নয়, অন্য দেশের পয়সায় এক সার্বিক যুদ্ধ লড়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

শুধু মার্কিন বি-৫২ এয়ারক্র্যাফটগুলি ইরাকের ওপরে যে বোমা বর্ষণ করেছিল তার জন্য মার্কিনীদের দিতে হয়েছিল ৬ কোটি ২০ লক্ষ ডলার। ইরাক যুদ্ধে যে পাঁচটি ব্রিটিশ টর্নাডো এয়ারক্র্যাফট ধ্বংস হয়েছিল, হয়তো ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাওয়া ইরাকি ফাইটারের গুলিতে বিদ্ধ হয়েই, তার ক্ষতিপূরণবাবদ ব্রিটেনকে দিতে হয়েছিল ১০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড। শুধু তাই নয়; প্রতিটি টর্নাডো পাইলটের ট্রেনিং-এর খরচ ৩০ লক্ষ পাউন্ড। সাকুল্যে দেড কোটি পাউন্ড, এই অর্থও ক্ষতিপূরণবাবদ দিতে হয়েছিল। যুদ্ধ আর ঋণের ইতিহাসে এটা সম্পূর্ণত নতুন এক পদ্ধতি।

যদিও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বিনিময়োগের এই সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত নয়। যে সরকার একটি যুদ্ধ চালাতে চায়, অসংখ্য খাতে তাকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই অর্থ তার নিজের দেশের জনগণের সঞ্চয় থেকে আসে, ঋণ হিসাবে আসে দেশী-বিদেশী ব্যাঙ্কারদের কাছে থেকে। যুদ্ধ শুধু ঋণগ্রস্ত করে না, ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাও ক্ষইয়ে দেয়। বিশেষ করে, যখন নিজেদের দেশে যুদ্ধটা চলে। যুদ্ধ আর্থিক সম্পদ ধ্বংস করে। অস্ত্র, গোলাবারুদ অন্যান্য সরঞ্জাম আমদানির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়কে গিলে খায়। আর্থিক কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করে। উৎপাদন কমে। ফলে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাও দ্রুত হ্রাস পায়। ঋণ-যুদ্ধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কার্যত কোনো আড়াল নেই। বরঞ্চ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেড়ে চলে।

বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে ঋণী ২৫টি দেশের ১২টি ১৯৯০-৯২ এ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সর্বোচ্চ পরিমাণ ডেট-সার্ভিস রেশিরও পীড়নে (সুদ পরিশোধের সঙ্গে রপ্তানি আয়ের অনুপাত) কোমর ভেঙে আসা ২৭টি দেশের মধ্যে ১২টি দেশই যুদ্ধে জড়িত ছিল। শীর্ষে থাকা ঋণী দেশগুলি ৫টির মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়েছিল. ৪টি দেশ।

অন্যদিক থেকে বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে। যে দেশের সরকারগুলি যুদ্ধে লিপ্ত, সর্বাধিক ঋণের বোঝা তারাই বহন করছে। এরাই আবার ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আই এম এফ-এর কাছে বিশেষ ঋণের আবেদনকারী। এই আবেদন করে যুদ্ধে জড়িত দেশের সরকারগুলি। যারা যুদ্ধের কারণে ঋণ পরিশোধে অক্ষম, যে কোন শর্তে ঋণ নেবার আবেদন নিয়ে হাজির হয় মহাজনদের কাছে। আবার এসব ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আই এম এফ-ই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় পরোক্ষ উৎসাহদাতা।

১৯৯০-৯১ সালে যুদ্ধরত ছিল ৪১টি দেশ। তার মধ্যে ২৫টি দেশ তখনই বন্দী ছিল ঋণদাসত্বে। দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে ঋণ আর সুদের পরিমাণও পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী আর এক যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করে দেয়। ৪১টির মধ্যে ২৭টি দেশ এক যুগের বেশি সময় ধরে যুদ্ধে জড়িয়ে

ছিল। যুদ্ধের সঙ্গে ঋণের সম্পর্ককে আন্তর্জাতিক সমস্ত আর্থিক সংস্থাই আড়াল করে রাখার চেষ্টা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই যুদ্ধের মূল প্ররোচক। অথচ তার কোনো পরিসংখ্যান সহজে পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় তাতে ১৯৯০-৯২ এ দেখা যায় ২৪টি দেশের মধ্যে ১৮টি দেশ; তিন-চতুর্থাংশই ঋণভারে জর্জরীত।

এর মধ্যে অন্তত ১২টি দেশের ক্ষেত্রে যুদ্ধই লাগামছাড়া ঋণের প্রধান কারণ। এল সালভাদর, ইথিওপিয়া, গুয়াতেমালা, ইজরায়েল, মোজাম্বিক, মরক্কো, মায়ানমার, নিকারাগুয়া, সোমালিয়া, শ্রীলঙ্কা, সুদান এবং উগান্ডা। আবার বেশকিছু দেশ আছে, যেমন অ্যাঙ্গোলায় যুদ্ধ শেষ হয়েছে ১৯৯১ সালে, লাওস এবং ভিয়েতনাম কয়েক দশকের যুদ্ধ শেষ হয়েছে ৮০-র দশকে — এরা বর্তমানে ঋণের ভারে নুব্জা দেশগুলির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু পুনর্গঠনের চূড়ান্ত সমস্যার মধ্যেও যুদ্ধকালীন বিপুল ঋণের বোঝা এখনও তারা টেনে চলেছে। আবার বেশকিছু দেশ আছে যারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের প্রস্তুতিতে বিপুল প্রতিরক্ষা ব্যায়ে ঋণগ্রস্ত। তাদের মধ্যে মিশর, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, তুরস্ক ইত্যাদি, ভবিষ্যৎ যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে সামরিক ব্যায় যাদের বিপুলভাবে ঋণগ্রস্ত করে তুলেছে।

(৬)

দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিধর সামরিক মাতব্বর হবার চেষ্টায় সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস থেকে জাতীয় ঋণ প্রায় সাড়ে চার ট্রিলিয়ন ডলার। বার্ষিক বাজেটের পর্যায়ক্রমিক ঘাটতি এবং ঘাটতি পূরণে পর্যায়ক্রমিক ঋণ গ্রহণই এর কারণ।

প্রেসিডেন্ট রেগনের শাসনকালে ১৯৮১-৮৮. এই ৮ বছরে বাজেট ঘাটতি ভিয়েতনাম যুদ্ধের কারণে বিপুল ঘাটতির পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যায়। কারণ, রেগন-প্রশাসন রাজস্ব বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সামরিক ব্যায়ভারে বিপুল বৃদ্ধির চাহিদা মেটাতে পারেনি। যদিও মার্কিন বিপুল ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয় কিছুটা থিতু হয় ১৯৮৫-তে। কেননা, মার্কিন কংগ্রেস সর্বগ্রাসী সামরিক ব্যায়ের চাহিদাকে আর বাড়তে দেয়নি। এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর সামরিক ব্যয় সঙ্কুচিত করে। কিন্তু সামরিক খাতে ২৯০ বিলিয়ন ডলারের বার্ষিক ব্যয় অব্যাহত থাকে। মানে দৈনিক ৮০০ মিলিয়ন ডলারের সামান্য কম। যদিও সামরিক ব্যয়ের এই পরিমাণের মধ্যে গালফ্ ওয়ারের দৈনিক খরচ দেখানো হয়নি। এই যুদ্ধের প্রাথমিক খরচ করা হয়েছিল দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ডলার থেকে ১ বিলিয়ন ডলার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক খাতে বিপুল ব্যয় বৃদ্ধি শুরু হয় জিমি কার্টারের শাসনকালের শেষে। কার্যত অবিশ্বাস্য মাত্রা পেয়েছিল রেগনের আমলে। তখন থেকেই ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে ঘাটতির অঙ্ক। মার্কিন ফেডারেল বাজেটের কাঠামোয় দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা তীব্র হতে শুরু করে। ফলে অন্যান্য খাতে সরকারি ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে। জাতীয় ঋণ বাড়তে থাকে তীব্রভাবে। বহু কারণের মধ্যে যার অন্যতম কারণ মাত্রাতিরিক্ত সামরিক ব্যয়ের বৃদ্ধি। ৮০-র দশকে শেষ ভাগে সামরিক ব্যয়ে লাগাম টানা হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল গভর্নমেন্টের মূল ব্যয়ের এক চতুর্থাংশই তখন সামরিক ব্যয়। ৮০-র দশকের দীর্ঘ সময়ে মোট জাতীয় উৎপাদনের একটা ভাল অংশ যেত সুদ মেটাতে। রেগন প্রশাসনের যুদ্ধ খাতে ঋণ নেওয়ার আতঙ্কজনক প্রবণতাই এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হত।

৮০-র দশকের প্রথমে বাজেট ঘাটতি পূরণে ঋণ নেবার প্রয়োজনীয় দুনিয়ার নানা প্রান্তে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করেছিল। বিশেষত ব্রিটিশ ডাচ জাপানের ব্যাঙ্কগুলিকে

কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদের হার ছিল অনেক বেশি। এই ঋণ দিতে হত মার্কিন ডলারে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্রাতিরিক্তভাবে। উচ্চহারে সুদ এবং ডলারের মূল্যবৃদ্ধি অন্যান্য দেশের ঋণ শোধের মূল্যমানকেও বাড়িয়েছিল বিপজ্জনক মাত্রায়। এইভাবে রেগনের নেতৃত্বে অস্বাভাবিক সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি শুধু মার্কিনীদের ঋণের বোঝাকেই বাড়ালো না, বিশ্বের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও বিপর্যয়কর প্রভাব ফেললো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদের হারবৃদ্ধি ঋণ সঙ্কটকে বাড়িয়ে তুললো বহুগুণ। যুদ্ধে যেমন প্রতিটি মৃত্যু ডেট ক্রাইসিসকে বাড়িতে তোলে, এক্ষেত্রে মার্কিনীদের অত্যাধুনিক পুঁজিনিবিড় যুদ্ধ প্রস্তুতি তৃতীয় বিশ্বের জনগণকে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই হত্যা করল শুধুমাত্র ডেট ক্রাইসিসের মারণাস্ত্রে।

(৭)

তৃতীয় বিশ্বের যে দেশগুলিকে উচ্চ এবং মধ্য আয়ের উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়, শুধু সেই দেশগুলি নয়, নিম্ন আয়ের সমস্যা জর্জরিত দেশগুলিও অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের সম্ভারে শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিপুল ঋণ করে।

প্রথমে যুদ্ধাস্ত্রের প্রধান ক্রেতা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি তেল রপ্তানিকারি দেশগুলি। ১৯৭৪ সালে জ্বালানি তেলের মূল্যের আচম্বিত উল্লম্ফনের ফলে যাদের সম্পদ রাতারাতি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্যদেশগুলির যুদ্ধাস্ত্র আমদানিও সমানতালে বেড়েছিল মূলত ঋণের টাকায়।

১৯৬০ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের সরকারগুলি শিল্পোন্নত দেশগুলির কাছ থেকে শুধুমাত্র যুদ্ধাস্ত্র কেনার জন্য ঋণ নিয়েছিল ৪০০ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য ছিল তৃতীয় বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধাস্ত্র আমদানিকারি অঞ্চল। কিন্তু ৮০-র দশকে বিশ্বের মোট আমদানি মূল্যের অবনমনের পর, দক্ষিণ এশিয়ার অস্ত্র আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল সর্বোচ্চ মাত্রায়।

এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল ভারতবর্ষ। ১৯৮০-র দশকের শেষে ইরাককে পেছনে ফেলে ভারতবর্ষই ছিল তৃতীয় বিশ্বের যুদ্ধাস্ত্রের সর্বোচ্চ পরিমাণের ক্রেতা। ১৯৮৫ থেকে '৮৯ এর মধ্যে ভারতবর্ষ, ইরাক এবং সৌদি আরব সম্মিলিতভাবে তৃতীয় বিশ্বের মোট অস্ত্র আমদানির এক-তৃতীয়াংশের ক্রেতা ছিল। তৃতীয় বিশ্বের অস্ত্র আমদানির চরিত্রও ছিল চূড়ান্ত কেন্দ্রীভূত। মাত্র ১৫টি দেশ ছিল এইসময়ের সমস্ত মারণাস্ত্রের আমদানির ৮০ শতাংশের ক্রেতা।

(৮)

ঋণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিংস্র ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয় খাতক দেশকে — যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ গালফ্‌ওয়ার। সর্বাত্মকভাবে না হলেও গালফ্‌ওয়ারের অন্যতম কারণও সুপ্ত ছিল ঋণের মধ্যেই।

ইরানের বিরুদ্ধে ১৯৮০-৮৮, দীর্ঘ ন'বছরের যুদ্ধে ইরাককে অর্থ যুগিয়েছিল অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলি। কিন্তু এই বিপুল যুদ্ধ-ঋণকে সাহায্য হিসেবে ধরে ঋণ পরিশোধের দায়কে অস্বীকার করেছিল সাদ্দাম হোসেন। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সরকারিভাবে ইরাকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল 'কোয়াদিসিয়াট সাদ্দাম'। পার্শিয়ানদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ইরাকের কোয়াদিসিয়ায় ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে আরবদের ঐতিহাসিক বিজয়কে স্মরণে রেখে আরব জাতীয় আবেগকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাবার জন্যই এই যুদ্ধকে অতীত গরিমায় মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেছিল সাদ্দাম হোসেন। যদিও এই যুদ্ধকে ইতিহাসের এক গৌরবজনক অধ্যায়ের সঙ্গে সমার্থক করে তোলার

বুদ্ধিটা এসেছিল পাশ্চাত্যের মহাজনদের কাছ থেকেই।

সাদ্দামের যুক্তি ছিল—সুদূর অতীত থেকেই ইরাক পারস্যের শত্রু, যার বিরুদ্ধে আরব জাতিরাষ্ট্রগুলির গৌরবজনক ঐতিহ্য এবং শ্রেষ্ঠত্বকে রক্ষার জন্যই ইরাক যুদ্ধ করেছে। স্বভাবতই অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে ইরাককে অর্থ সাহায্য করাটা বাধ্যতামূলকভাবেই বর্তায়।

এই যুক্তির সঙ্গে অনেকের মতই কুয়েত একমত হয় না। যুদ্ধের পরে কুয়েত ঋণ পরিশোধের দাবি জানায়। সেই ঋণের পরিমাণ ছিল ১২০০ কোটি ডলার। এই দাবি আজকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়কর ভেদশক্তির বিধ্বংসী যুদ্ধকে ডেকে আনে। কিন্তু ইরাক শুধুমাত্র ঋণ পরিশোধের দাবি জানানোর 'অপরাধে' কুয়েতে অনুপ্রবেশ করে না। ঋণ থেকে যুদ্ধের স্বপক্ষে নতুন যুক্তি হাজির করে।

সাদ্দাম হোসেনের বাথ পার্টির সরকার কুয়েতের ভূখণ্ড দাবি করে এই যুক্তিতে যে, 'কুয়েত ইরাকের অবিভাজ্য অংশ। বর্তমান দেশভাগ ব্রিটিশরা কৃত্রিমভাবে করেছিল নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে।'

যদিও স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে ইরাকের জন্মও হয়েছিল একই প্রক্রিয়ায়।

১৯৬১ সালে যখন কুয়েত স্বাধীন হয় তখনও কুয়েতের ভূখণ্ড আত্মসাৎ করার ইরাকি প্রচেষ্টা বানচাল করে দেয় ব্রিটিশ বিমানবাহিনী। পরে সীমিত আকারে সাদ্দাম কুয়েতের দুটি জলাজমি, ওয়ারবা এবং বাবিইয়ান অঞ্চল দাবি করে পারস্য উপসাগরে পৌঁছানোর নৌপথের সুবিধা নেবার প্রয়োজনে। খুব স্বল্পমেয়াদেই ইরাক আর্থিক এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগও তুলতে শুরু করে ইরাকের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে যুক্ত হয় ঋণ সম্পর্কিত অভিযোগ।

তেল রপ্তানিকারি দেশগুলির সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে কোটার চাইতে অতিরিক্ত তেল উৎপাদনের অভিযোগও আনা হয় কুয়েতের বিরুদ্ধে। কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকের এই অভিযোগটি যথার্থ ছিল। এই অতি উৎপাদনের ফলে তেলের দাম পড়তে শুরু করে।

ইরাকের অর্থনীতির ৯৫ শতাংশই ছিল জ্বালানি তেলের রাজস্ব-নির্ভর। ইরানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সাড়ে আট বছরের যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্ত হবার জন্য ইরাকের প্রয়োজন ছিল উচ্চহারে তেলের দামকে বেঁধে রাখা। কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকের এই অভিযোগ ছিল ন্যায়সঙ্গত। যদিও তেল রপ্তানিকারি দেশগুলির নির্দেশিত কোটা ভঙ্গকারিদের মধ্যে কুয়েত একা ছিল না।

ইরাকের রুমেইলা অয়েল ফিল্ডের অবস্থান ছিল কুয়েত সীমান্তের লাগোয়া। সীমান্তের উভয় দিকেই ছিল মাটির তলার এই অয়েল ফিল্ডের মজুত ভাণ্ডার। কুয়েত ইরাকি অয়েলফিল্ড থেকে নিয়মিত তেল চুরি করতো — সাদ্দামের এই অভিযোগ সম্পর্কেও কুয়েত কর্ণপাত করেনি।

এমন অভিযোগ প্রতি অভিযোগ এবং ইরাকের কুয়েতের অনুপ্রবেশের নেপথ্যে বহু কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল ঋণ। এমনকী ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অ্যালায়েড ফোর্সের বিমান হানার সময় যখন সাদ্দাম হোসেন কুয়েত থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তখনও ইরাকের ঋণ পরিশোধের দায় অস্বীকার করাটা অন্যতম শর্ত হিসেবে হাজির করেছিল। ইরাকের বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল দাবি জানিয়েছিল যে — 'All debts owned to aggressor Gulf and foreign countries by Iraq... should forgiven'.

উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও ঋণ একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করেছিল।

গাল্ফ ওয়ারে ইরাকের বিরুদ্ধে ১০ হাজার কিলোমিটার দূরের শত্রু, যার সঙ্গে কুয়েতের অনুপ্রবেশ কিংবা ঋণ পরিশোধের কোনো সম্পর্কই ছিল না, বিশ্বের সবচেয়ে হিংস্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন, যারা আবার ইরাক-ইরানের যুদ্ধে অস্ত্র, ঋণ সবকিছু দিয়ে ইরাকের পক্ষ অবলম্বন করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে সাদ্দাম হোসেনের অভিযোগ শোনা যেতে পারে — '...in the lead-up to the war, the US exploited the power of debt and found in it an asset as valuable as strategic raw materials.'

সৌদি আরব, জর্ডন, মিশর-সহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলি ইরাকের কুয়েতে অনুপ্রবেশকে তেলচুরির বিরুদ্ধে কিছুটা কঠোর সতর্কতা জারি করার পদক্ষেপ হিসেবেই দেখেছিল। এই দেশগুলির কাছে ইরাকি অনুপ্রবেশের প্রকৃত তথ্য ছিল এই যে, শুধুমাত্র তেলচুরি আটকানোর জন্য ইরাক-বাহিনী ঝড়ের গতিতে কুয়েতের অভ্যন্তরে সামরিক সতর্কতা জারি করে দ্রুত সেনা প্রত্যাহার করে ফিরে আসবে নিজেদের ভূখণ্ডে। এভাবেই মীমাংসার আলোচনায় বসতে বাধ্য করবে কুয়েতকে।

এই নির্দিষ্ট প্রামাণ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে সৌদি আরবের রাজা ফাদ, মিশরের রাষ্ট্রপতি হোসনি মুবারক এবং জর্ডনের রাজা হুসেন সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, এই অনুপ্রবেশকে প্রকাশ্যে সরকারিভাবে বিরোধিতা বা নিন্দা করা হবে না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মিশরের রাষ্ট্রপতি মুবারক এই সমঝোতা ভেঙে প্রকাশ্যে ইরাকি অনুপ্রবেশকে নিন্দা করেন। জর্ডনের রাজা হুসেন কৈফিয়ৎ তলব করলে মিশরের রাষ্ট্রপতি মুবারক জানিয়েছিলেন যে — 'পশ্চিমের মাতব্বরের প্রবল চাপের মুখেই তাঁকে এ কাজ করতে হয়েছে।'

যদি মুবারকের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে সম্মিলিতভাবে গৃহীত নীতি পরিবর্তনে তাঁকে বাধ্য করা হয় এবং যাতে কুয়েত থেকে দ্রুত সৈন্য প্রত্যাহার ইরাকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে — সেই কারণেই আরব রাষ্ট্রগুলির মিলিত সিদ্ধান্ত অমান্য করে মিশরকে দিয়ে এই ফাঁদ পাতা হয়েছিল বলে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁদের স্পষ্ট অভিমত ছিল 'এটা বিপুল অর্থ ঘুষ দিয়ে রাজনৈতিক চাপকে সহনীয় করে তোলার নতুন কৌশল।'

(৯)

মুক্ত বাজার অর্থনীতির এই সময়ে যুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমতকে ঋণ-মূল্যে কেনা কিংবা ঋণ মুকব করার শর্তে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থনে জমায়েত করার এক ভয়ঙ্কর কৌশল উপসাগরীয় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল। আন্তর্জাতিক স্তরে 'Counting on New Friends'-এর নামে শুরু হল হর্স ট্রেডিং। মিশর থেকে 'তিয়েনান মেন স্কোয়ারের গণহত্যার আসামী চীন' — কেউ বাদ গেল না। মার্কিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ ঘুষ, খয়রাতি আর ঋণ মুকুবের ঢালাও মহানুভবতা নিয়ে শুরু করল নতুন অভিযান। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির সমস্ত প্রতিরোধ ভাঙতে শুরু করল নির্দয় দাক্ষিণ্যের প্রবল অভিঘাতে।

মার্কিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধের ইতিহাসে এ এক বিরল অধঃপতিত উদ্যোগ। জর্জ বুশের 'New World Order'-এর অভ্যন্তরীণ নগ্ন নীতিহীনতার এ এক আগাম ইঙ্গিত।

টার্কিশ এয়ারফোর্সের রানওয়ে থেকে উড়ে গিয়ে সীমান্তবর্তী ইরাকে মার্কিন বোমারু বিমানগুলি খুশিমত বোমাবর্ষণ করতে পারবে — এই সুযোগের বিনিময়ে মার্কিনী ঘুষের অর্থ আর পণ্য সামগ্রীতে ভরে উঠল তুরস্কের সরকারি তহবিল।

তুরস্কের অমেরুদণ্ডী রাষ্ট্রপতি তারগাস ওজাল দারুণ আহ্লাদে জাতির উদ্দেশ্যে নভেম্বর ৩, ১৯৯০, এক ভাষণে বলেছিলেন — 'এই সংকট থেকে আমরা লাভবান হব। আমাদের শিল্পে

আধুনিকীকরণ আর সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিবৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে এই যুদ্ধ'। ওজাল খুব গর্বের সঙ্গেই দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন — 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ৮ বিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্রের উপহার তাঁরা খুব কৃতজ্ঞ চিত্তেই গ্রহণ করছেন। ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ বিমান, জাহাজ, হেলিকপ্টার — এই সব মহার্ঘ উপহারের বিনিময়ে মাত্র কিছুদিনের জন্য নিজেদের পিতৃভূমিকে মার্কিনি সামরিক স্বার্থে ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেওয়া এমন কী আর গর্হিত কাজ।'

'Middle East International' পত্রিকা এই প্রসঙ্গে জানিয়েছিল যে — 'তুর্কিদের চিরশত্রু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিক-লবি ফ্যান্টম বমার প্লেন সরবরাহ কৌশলে বিলম্বিত করার চেষ্টা করলে; জর্জ বুশের ব্যাক্তিগত উদ্যোগ তা দূর করা হল।'

কোনো গ্যারান্টি ছাড়াই মার্কিনী এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্কগুলি তুরস্কে হেলিকপ্টার তৈরির কারখানায় ঢালাও বিনিয়োগ করে। 'তুরস্কের পণ্যের জন্য নতুন বাজার, শিল্পের জন্য নতুন বিনিয়োগ এখন আর কোনও সমস্যা নয়' — কৃতজ্ঞচিত্তে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি একথা জানিয়েছিলেন।

তুরস্কের এয়ারবেস ব্যবহারের চুক্তির ৫ দিনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুর্কি কাপড়ের রপ্তানি ৫০ শতাংশ বেড়ে যায়। দেড় বিলিয়ন ডলারের আই এম এফ ঋণ নামমাত্র সুদে কোনো শর্ত ছাড়াই দেওয়া হল।

মধ্যপ্রাচ্য আর আফ্রিকার সবচেয়ে ঋণী দেশগুলির অন্যতম ছিল মিশর। বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টে প্রেসিডেন্ট হুসনে মুবারকের সরকারের ঋণ ৫০ বিলিয়ন ডলার।

জর্জ বুশ শুধু ইরাক যুদ্ধে মার্কিনীদের সমর্থন করার পুরস্কার হিসাবে ১৪ বিলিয়ন ডলার মুকুব করে দেন। শুধু তাই নয়, মার্কিনী চাপে কানাডা এবং সৌদি আরবও মিশরের ঋণের সিংহভাগ আর্থিক সাহায্য হিসাবে ছাড় দেয়।

লেবাননে সিরিয়ার দখলদারির বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের মার্কিনী বৈরিতার অবসান ঘটে 'ইরাক যুদ্ধ' সমর্থনের মূল্যে। ১০০ কোটি ডলারের সমরাস্ত্রের উপঢৌকন শুধু নয়; 'সন্ত্রাসবাদের সমর্থক এবং আশ্রয়দাতা দেশ' হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালো তালিকা থেকে নাম কেটে 'বন্ধুদেশ' হিসাবে সিরিয়াকে গ্রহণ করা হয়।

আরব রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে ইজরায়েলের বিক্ষোভ উপশম করতে গ্রহণ করা হয় সম্ভাব্য সমস্ত উদ্যোগ।

বাৎসরিক ৫ বিলিয়ন ডলারের অনুদান ছাড়াও ইজরায়েলি অর্থমন্ত্রী ইয়াটজেক মেদাই দর কষাকষির মধ্য দিয়ে ১৩ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য আদায় করে নেন। প্যালেস্টেনিয়ানদের তাড়িয়ে রাশিয়ান-ইহুদিদের পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে মার্কিন হুমকিও প্রত্যাহৃত হয়।

ইরাক অবরোধের সিদ্ধান্ত সমর্থনের বিনিময়ে বিশ্বব্যাঙ্কে পড়ে থাকা ইরানের আবেদনপত্র সম্পর্কে মার্কিন অবরোধ তুলে নেওয়া হয় অতি দ্রুত।

১৯৭৯-এর 'ইসলামিক বিপ্লবে'র দীর্ঘ ১২ বছর পর, ইরানকে ২৫ কোটি ডলারের ঋণ মঞ্জুর করা হয় ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন স্থলবাহিনীর আক্রমণের ঠিক আগের দিন।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে দিশেহারা সোভিয়েত ইউনিয়নের নাকের ডগায় ঝোলানো হয় বিশাল অঙ্কের ঋণের টোপ। কাঠখড় না পুড়িয়ে সুদীর্ঘ ৭ দশকের মরণপণ বৈরিতারও অবসান ঘটানো হয় মোটা টাকা ঘুষের বিনিময়ে। একই সঙ্গে সৌদি আরব আর মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক-বিরোধী রাষ্ট্রগুলির মাধ্যমে ৪ বিলিয়ন ডলারের বিনা সুদে সহজ কিস্তির ঋণও

দেওয়া হয়েছিল ভাঙনের মুখে দাঁড়ানো সোভিয়েত ইউনিয়নকে।

Resolution–678 সমর্থন করার পরের দিনই জর্জ বুশ সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট গর্বাচভকে জানিয়েছিলেন — 'খাদ্য এবং কৃষি ঋণ বাতিল করার মার্কিন সিদ্ধান্তে দু'এক দিনের মধ্যেই বাতিল করা হবে।'

Resolution–678 সমর্থনের শর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের কূটনৈতিক স্বীকৃতি ফিরিয়ে দিয়েছিল। তিয়েনান মেন স্কোয়ারের ছাত্র বিক্ষোভের পর এই প্রথম বিশ্বব্যাঙ্কে বাতিল হয়ে যাওয়া ঋণের আবেদন মঞ্জুর করার জন্য আন্তরিক তদবির শুরু করলো মার্কিনীরাই। রাষ্ট্রসংঘে ভোটাভুটির ঠিক পরের দিন, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ১১ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ব্যাঙ্ক অফ বেজিং-এ জমা দেয়।

শুধু মার্কিনী হামলায় সমর্থনের জন্য ঘুষ নয়; চীনারাও মেনে নিল ইয়াঙ্কি সন্ত্রাসবাদীদের দাবি। বিক্ষুব্ধ চীনা ছাত্রনেতাদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হল আরও ঘুষের আশ্বাসে।

রাষ্ট্রসঙেঘর নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য-দেশগুলির স্বাধীন মতামতও কেনা হল উচ্চমূল্যে। প্রয়োজনে রক্তচক্ষু দেখানো হল।

ইথিওপিয়ায় মার্কিনী বিনিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষরিত হল রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভোটের পরেই। বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ-এর ঋণের ব্যবস্থা করার আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করল মার্কিনীরাই।

জায়েরের জন্য সমারাস্ত্রের উপহার, ঋণ মুকুব এবং নতুন ঋণের ব্যবস্থা করা হল বিসদৃশ দ্রুততায়।

বিশ্বায়নের অভিযানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের হাতে ঋণও একটা অস্ত্র। যুদ্ধ-ঋণ সম্ভবত ভয়ঙ্করতম অস্ত্র।

বিশ্বায়ন ও নারী

যশোধরা বাগচী
শুভাশীষ গুপ্ত

বিশ্বায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন

যশোধরা বাগচী

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটির সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আমাদের বসবাস গত বছর বারো ধরে। তারও আগে ভারত সরকারের কিছু কিছু কাজকর্ম লাতিন আমেরিকার কিছু কিছু আন্তর্জাতিক স্তর থেকে চাপিয়ে দেওয়া অনুসৃত নীতির কুপ্রভাব আমাদের গোচরে এসেছে। সম্ভবত ১৯৯৩ সালে কানাডার টরন্টো শহরে কানে এসেছে NAFTA, we don't hafter! অর্থাৎ উত্তর আমেরিকার মুক্ত অবাধ বাণিজ্যের নীতি আমাদের গ্রহণ করবার প্রয়োজন কি?

সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে পুঁজিবাদী শক্তি যে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করে বসলো তারই সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতীয় উদ্যম ও উদ্যোগগুলিকে পুরোপুরি ধ্বংস করবার জন্য নয়া মন্ত্র হল বিশ্বায়ন — এরকম একটা মানসিকতা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয় বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জতিক পুঁজি ভাণ্ডারের মাধ্যমে। বিশ্বের পুঁজি এক হও, এই শ্লোগানে সামিল হয়ে বিশ্বায়ন তার আগ্রাসী নয়া অর্থনীতির প্রবর্তন করলো যার মূলমন্ত্র হলো যে 'বাজারে'র মুক্ত বাতাসে সমাজের সমস্ত স্তূপীকৃত আবর্জনা দূর হয়ে যাবে। সমস্ত বৈষম্যের মূলে আঘাত হানবে বাজারের প্রতিযোগিতার 'মুক্ত' বায়ু। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই হবে সেই প্রতিযোগিতার মূলমন্ত্র এবং বহুবছর আগে সি বি ম্যাক্‌ফারসনের মতো চিন্তাবিদ যাকে Possesive Individualism আখ্যা দিয়েছিলেন, তারই এক নয়া অবতাররূপে আবির্ভূত হবে এই বাজারি উদারনীতির বাহন বিশ্বায়ন।

যদিও এই প্রক্রিয়াটির বাইরের আস্তরণটি পুরোদস্তুর অর্থনৈতিক, কিন্তু পুঁজিবাদের এই 'রুদ্রমুখ' কিন্তু অর্থনীতিতেই সীমাবদ্ধ রইল না। গণমাধ্যম হয়ে উঠলো এর একটি অন্যতম হাতিয়ার। দৃশ্য ও শ্রাব্য, বিশেষ করে দৃশ্য মাধ্যমগুলি কতকগুলি স্বপ্নময় দুরাকাঙ্খার চাবিকাঠি দিয়ে সমাজের 'মগজ ধোলাই'এর কাজে মেতে উঠলো। যাতে করে অনেকেই মনে করছেন যে সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটছে খুব দ্রুত গতিতে। রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের দাবিগুলি সমাজের বিকাশের জন্য অপরিহার্য মনে করার যে রীতিটি এখনও পুরোপুরি ত্যাগ করা যায় নি, সেটিকে বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে অপ্রয়োজনীয়ই শুধু নয় অবাঞ্ছিত মনে হতে থাকলো। এমনিতেই মানবাধিকারের জায়গাটিকে সুরক্ষিত করার জন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ শক্তির দমন-নিপীড়নের সম্ভাবনাকে খুবই গুরুত্ব দিতে হয়। কাজেই রাষ্টের অধিকার খর্ব করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হাত শক্ত করার যে প্রস্তাবটি আমাদের নাগরিকত্বের প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে, সেই দ্ব্যর্থতাকে কাজে লাগাতেও ছাড়ে না বাজারকেন্দ্রিক ব্যক্তিসর্বস্বতা।

বিশ্বায়নের বহুরূপী চেহারা নিয়ে অনেক লেখাই উল্লেখযোগ্য এবং আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এখন আমি যে প্রসঙ্গটির উত্থাপন করবো সেটিকে আমরা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি রেখে বিচার করবো। প্রসঙ্গটিকে সাধারণত নারীর 'ক্ষমতায়ন' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিশ্বায়নে যেমন একটি বাইরের শক্তি এসে 'বিশ্ব'কে (ঘাড় ধরে) সকলের কাছে পৌঁছে দেয় তেমনি করেই সামাজিক ক্ষমতাকে টেনে এনে মেয়েদের জীবনে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। প্রশ্ন থেকে যায়, বিশ্বায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন কি প্রায় একই প্রক্রিয়ায় একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠবে?

(দুই)

বলাই বাহুল্য জোর করে চাপানোর একটা কৃত্রিম পরিস্থিতিকে আমরা আমাদের নিজেদের কাজের সূত্রে খাড়া করেছি। এর পেছনের ঘটনাটির দিকে একবার মনোনিবেশ করা যাক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বলেছিলেন,

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার।

তখন কোনও বিমূর্ত বিধাতাপুরুষের চাইতে আমাদের শাস্ত্রকার মনুর চেহারার আদলই বেশি মনে পড়ে। শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থেকে নারীর ক্ষমতার সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনাটি প্রথম থেকেই খুব ক্ষীণ। আপন ভাগ্য জয় করবার ক্ষমতাটি নারীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে প্রথম দিন থেকে। এই অধিকার হরণ শুধু প্রাচীন সমাজব্যবস্থাতেই নয় 'আধুনিক' সমসাময়িক যুগেও তা পুরোদস্তুর বর্তমান। নারীর যৌনতা এবং নারীর শ্রম, এই দুই-ই তার একান্ত নিজস্ব এবং যার ওপরে তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ সবচাইতে কম। অর্থাৎ, সন্তান ধারণের যে অসামান্য ক্ষমতা জৈবিক নিয়মে নারীর একান্ত নিজের, সমাজকে পিতৃতান্ত্রিক ধাঁচে গড়ার উদ্দেশ্যে তার সেই নিজস্ব ক্ষমতাকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পুরুষ শাসকের কুক্ষিগত করা হয়েছে। এই কুটিল সামাজিক প্রক্রিয়ার দিকেই অঙ্গুলি হেলন করে এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন 'World historic defeat of the female Sex' অর্থাৎ 'বিশ্বের ইতিহাসে নারীজাতির চরমতম পরাজয়'। এরই উৎস খুঁজতে গিয়ে এঙ্গেল্‌স্ পৌঁছেছিলেন কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মালিকানাতেই নয়। রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে পরিবারের গাঁটছড়াতেও। এইসঙ্গেই বাঁধা পড়ে নারীর শ্রম। নারীর সামাজিক পরিচয় নির্নীত হয় কেবলমাত্র তার পুনরুৎপাদনের (reproductive) ক্ষমতা দিয়ে, যাকে সুসংহত করে রাখার জন্য তৈরি হয় পরিবারের চার দেওয়াল। তার শ্রমের যে উৎপাদিকা শক্তি, তার ওপরে চেপে বসে পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসন। অর্থাৎ পুরুষের শ্রমই একমাত্র সমাজে স্বীকৃত পারিশ্রমিকের অধিকারী। যে উদাহরণ আমরা হামেশাই দিয়ে থাকি যে রোজকার রান্নাবান্না পরিবারের মেয়েরা ছাড়া কেউই বড় একটা করে না। কিন্তু তার কোনও পারিশ্রমিক মূল্য নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে আনুষ্ঠানিক ভোজে পুরুষেরা রান্না করে, তার মূল্য ধরা হয় মোটা টাকার অঙ্কে।

সামাজিক মূল্যবোধের এই পিতৃতান্ত্রিক দ্বিমুখীনতার মধ্যেই মেয়েদের জীবন দোদুল্যমান। পরিবারের মধ্যে পুরুষকে আশ্রয়দাতা প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে নারীকে 'অক্ষম' ও 'অবলা' বলে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। সামাজিক জীবনের অধিকাংশ সম্পদের নিজস্ব হক্ থেকে সে বঞ্চিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সম্মানের অধিকারী হয়ে নিরাপদভাবে বাঁচার ন্যূনতম সম্ভাবনা থেকে সে নির্বাসিত। শ্রেণী জাতপাত, ধর্মীয় সম্প্রদায় অনুসারে নারীর সামাজিক অবস্থানের বেশ

খানিকটা হেরফের হলেও দ্বিতীয় সারিতে থেকে যাবার দায় থেকে সে কখনই মুক্ত হতে পারে না।

(তিন)

মেয়েদের সামাজিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার দিকে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কাজ জোর কদমে শুরু হল নয়া অর্থনীতির জন্মলগ্নে। কিন্তু এই প্রশ্নটি এমনভাবে তোলা হল যেন প্রশ্নটি নতুন। যে ইতিহাসের ধারা বেয়ে নারীর ক্ষমতার ক্রমবিকাশ এবং তার দরুন দেশের মধ্যে যে লিঙ্গসমতা ও সামাজিক ন্যায়ের পরিবেশ সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াস চলেছে — কত বিচিত্র ধারার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা নিত্য প্রবহমান। এরই ফলে আমাদের গণতন্ত্রের ভিত তৈরি হয়েছে, তা যত আংশিকভাবেই হোক না কেন। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাকে প্রায় মুছে দিয়ে আজকাল নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়।

সুতরাং এই ধুয়োটির মোকাবিলা করবার আগে আমাদের একবার দেখা দরকার নারীর ক্ষমতা সম্পর্কে কী ধরণের পরম্পরার উত্তরাধিকারী আমরা। কেননা, আগেই বলেছি যে এমনভাবে নারীর 'ক্ষমতায়ন' প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা হয়েছে যেন বিশ্বায়নই একমাত্র তৈরি করতে পারে নারীর ক্ষমতার উপযুক্ত বাতাবরণ। এই 'মিথ'টির আসল চেহারাটি বুঝবার জন্য আসুন একটু তাকাই নারী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের দিকে। এই চিন্তার দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে একটি কথা বারে বারে মনে হচ্ছে যে সেখানেও কিন্তু 'জাতীয়' দেওয়ালগুলি ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টা আমরা দেখি, কিন্তু বিশ্বায়নের ভাষার সঙ্গে সেই আন্তর্জাতিকতার কত তফাৎ! আমাদের আধুনিকতার জন্মলগ্নে মানুষের বিচারবুদ্ধি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, দুটিরই মুক্তির বাণী বয়ে এনেছিল ইউরোপের Enlightenment; সুকুমারীদি (সুকুমারী ভট্টাচার্য) যে কথাটাকে আমার জন্য অনুবাদ করে বলেছিলেন 'উদ্দীপন'। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মেরী উলস্টোনক্রাফ্‌ট্ (Wollstonecraft) ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিক রুশো-এর শিক্ষাবিষয়ক উপন্যাস Emile নারীর শিক্ষাকে স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রতিবাদে লেখেন 'A Vindication of the Rights of Women'। সেখানে তিনি সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তোলেন, চিন্তা ও মননের জগৎ থেকে সযত্নে মেয়েদের ইচ্ছাকৃতভাবে অপাংক্তেয় করে রেখে তারপর তাদের ওপরে চিন্তাহীন প্রবৃত্তি-সর্বস্বতা আরোপ করে সামাজিক ন্যায়বোধ কি বিঘ্নিত হচ্ছে না?

'আধুনিকোত্তর' চিন্তাভাবনায় যখন আধুনিকতাকে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে, তখন অনেক সময়ই বলা হয়ে থাকে যে বিচার ও যুক্তিই পৃথিবীকে বশ করে রেখেছে তার অধিপত্যের চক্রব্যূহে। ঔপনিবেশিকতা ও যুক্তিবাদকে সমার্থক করে ফেলে এরা যুক্তিকেই 'শৃঙ্খল' বলে মনে করে থাকেন। মনে করা হয় যে যুক্তিবাদ মাত্রেরই জন্ম শ্বেতাঙ্গ ইউরোপে। কিন্তু সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদেও অবারিত প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর 'তুহ্‌ফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন' লেখাতে ইসলামীয় যুক্তির মধ্য দিয়ে। কাজেই মেরী উলস্টোক্রাফ্‌টের বক্তব্যের দুই দশকের মধ্যেই রামমোহনের কাছ থেকে আমরা যে যুক্তিভিত্তিক প্রতিবাদ শুনতে পাই তাঁর সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক বিবর্তক সংবাদের মাধ্যমে, এই দুইয়ের মধ্যে সাযুজ্য কিন্তু ইংরেজি ঔপনিবেশিকতা দিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যাবে না।

তোমরা কি কখনও পরীক্ষা করে দেখেছো যে নারী সত্যিই বুদ্ধির অধিকারী নয়? প্রায় গোটা উনিশ এবং বিশ শতক ধরেই ধ্বনিত হয়েছে এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, মেয়েদের ক্ষমতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তারপরে তাদের 'অক্ষম' বানিয়ে রাখার বিরুদ্ধে। এবং যেটা

লক্ষণীয় যে, এই প্রতিবাদ কোনও ভৌগোলিক অঞ্চল বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল না এবং সুযোগ পাওয়ামাত্র মেরী উলস্টোনক্রাফ্‌টের মতই নারীকণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে এই প্রতিবাদ

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সদ্যোমুক্তিপ্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস Sojourner Truth আমেরিকায় নারী সম্মেলনে গিয়ে যখন শুনলেন যে মেয়েদের ঠাট্টা করে বলা হচ্ছে তোমাদের তো হাত ধরে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে হয়, তোমাদের আবার ক্ষমতার বড়াই কিসে! Sojourner Truth তখন তাঁর শ্রমপুষ্ট পেশীওয়ালা হাত দুটো সকলের সামনে উঁচিয়ে ধরে প্রশ্ন করেন

> 'Ain't I a woman?' "আমি কি মেয়ে নই? সমাজে এমন কোনও কাজ নেই যা আমাকে করতে হয়নি। কাজ করতে করতে যে তেরটি সন্তানের জন্ম দিয়েছি তাদের আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু শোক করবারও সময় পাইনি। আমি কি মেয়ে নই?"

বিশ শতকের গোড়াতে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, যিনি 'Sultana's Dream' নামে নারীকেন্দ্রিক উল্টোপুরাণ লেখেন 'জেনানা'র জায়গায় 'মরদানা'কে অন্তঃপুরবাসী করে রাখলে কেমন হয় এই প্রক্রিয়াটি বোঝাবার জন্য, তাঁর লেখনীও গর্জে উঠেছিল নারীর মনুষ্যত্ব আহরণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে।

> বুক ঠুকিয়া বল মা। আমরা পশু নই। বল ভগিনী। আমরা আসবাব নই। বল কন্যে জড়োয়ার অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই। সকলে সমস্বরে বল আমরা মানুষ।

কিছুদিনের মধ্যেই আমরা শুনতে পাই শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনী জ্যোর্তিময়ী দেবীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ঃ

> মহিলা শিক্ষার কথা উঠলেই পুরুষেরা ভয় পেয়ে যান, পাছে ওই উৎপীড়িতেরা উৎপীড়ন বুঝতে পারেন। পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, যথেচ্ছাচার সহ্য না করেন। তাই কতরকম করে বলা হয়, ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমরা পবিত্র ভারতবর্ষের পুণ্য আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছি। সৌভাগ্যক্রমে মহিলারা এখনও পাশ্চাত্য শিক্ষা পাননি তাই সনাতন হিন্দুধর্মের কঙ্কালটা আছে (কঙ্কালই বটে)। অতএব তোমরা আর শুদ্ধান্তঃপুরে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিও না।

নারীর অন্দরমহলের বরাদ্দ চৌহদ্দিটুকু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের রাস্তা প্রশস্ত করেছিল কিন্তু শ্রমজীবী মেয়েরা চিরকালই বাইরে বেরিয়ে কাজ করেছে এবং করেছে অসংগঠিত শ্রমে বেশি। তাদের ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে কারও কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকলেও, সেই ক্ষমতার সামাজিক স্বীকৃতির জন্য, তাদের দাবি আদায়ের লড়াইতে নেতৃত্ব দিয়েছেন সন্তোষকুমারী দেবী প্রভাবতী দেবী মতো শ্রমিক নেত্রীরা। ইলা মিত্র বা সদ্যোপ্রয়াত বাণী দাশগুপ্ত লড়াই করেছেন তেভাগায় কৃষকদের দাবি নিয়ে। তাঁদের সঙ্গে ছিল কৃষক মেয়েরাও।

অর্থনৈতিক লড়াই পর্যবসিত হয়েছে রাজনৈতিক লড়াইয়ে এবং সব সময়ে নারী ক্ষমতাকে এসব আন্দোলনে যতটা ব্যবহার করা হয়েছে, সে পরিমাণে কিন্তু তার সামাজিক স্বীকৃতির দিকে নজর দেওয়া হয়নি। সেজন্য ১৯৭৪ সালে যখন বিশ্বপুঞ্জের আবেদনে সাড়া দিয়ে ফুলরেণু গুহ এবং বীণা মজুমদারের নেতৃত্বে *'Committee on the Status of Women in India Towards Equality'* নামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের নারী আন্দোলন তখন থেকে এক নতুন মোড় নিতে শুরু করে। জাতীয় স্তরে যে সব তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের নীতি নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে নারী পুরুষকে আলাদা করে তাদের অংশগ্রহণ নথিভুক্ত হয় না— ফলে, মেয়েদের সামাজিক অধিকার সুরক্ষার কাজ এইসব হিসাব নিকাশের নিরিখে ক্রমাগত ব্যহত হতে থাকে। যেমন ১৯০১ Census থেকে male-female যে Se

atio র ক্রমশ কমে যাওয়া বাঁকা লাইনটি এখন আমাদের মনে গেঁথে গেছে ১৯০১ থেকে ১৯৭১-র Census এর ভিত্তিতে সেটিকে লোকচক্ষুর সামনে প্রথম তুলে ধরে এই Status Committee রিপোর্টটি। এছাড়াও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার সম্ভাবনার বেশ কিছু দিক বেরিয়ে আসে এই রিপোর্ট থেকে, কেননা এই বিভিন্ন টাস্কফোর্সে কাজে নেমে পড়েন তদানীন্তন বেশ কিছু প্রভাবশালী শিক্ষক ও গবেষক।

শিক্ষাকে আমরা মেয়েদের ক্ষমতার একটি অন্যতম সোপান বলে গণ্য করি, কিন্তু উচ্চশিক্ষার আলোতে শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরকার এবং বাহিরের অনেক ত্রুটি বেরিয়ে আসে, যাতে করে আমাদের সমাজে মেয়েদের সামর্থ ও স্বাচ্ছন্দ্য দুই-ই ব্যাহত হবার কারণগুলি ফুটে ওঠে। নতুনভাবে জানা বোঝার দাবীতে যে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে তারই ফলে মানবী বিদ্যাচর্চা বা Women's Studies-এর গোড়াপত্তন হয়। আন্তর্জাতিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এর শাখা প্রশাখা বিস্তার হতে থাকে। লিঙ্গ বৈষম্যের সম্পর্কে সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী জাতপাত বর্ণ ও ধর্মগত সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে যেমন বৈষম্য সমাজের বুকে গেঁড়ে বসেছে সেগুলি সম্পর্কেও আমরা সচেতন হতে থাকি। সমাজে যে ক্ষমতার বিন্যাস এইসব বৈষম্যগুলিকে জাগিয়ে রাখছে, অথবা নতুন করে তৈরি করছে গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের মারফৎ সেগুলি পরিবর্তনের দাবি উঠতে থাকে।

(চার)

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন বা empowerment-এর দাবিটি এক বিশেষ চেহারা নিয়ে উঠে এল— যে কথাটা আমি আগেই বলেছিলাম। মনে রাখতে হবে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতার স্বীকৃতির অভাব প্রসঙ্গেই 'empowerment' শব্দটি প্রথম ব্যবহার হয়। অর্থাৎ মেয়েরা কেবল কল্যাণমূলক দান খয়রাতির প্রাপক হিসাবেই নয়, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তার পুরো ক্ষমতাকে নিজস্ব মর্যাদায় স্থাপিত করবার জন্য কারও দাক্ষিণ্যে নয় নারীর নিজের কর্মসূত্রেই সে এই ক্ষমতার বিন্যাসকে স্থানচ্যুত করতে পারে, কারণ সে নতুনভাবে ক্ষমতার অংশীদার হতে প্রস্তুত। এইরকম একটি সচেতন মনোভাব নিয়ে সমাজের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর অন্তদ্বর্ন্দ্বগুলোকে সমাজে তুলে ধরতে পারলে তবেই মেয়েরা যথার্থভাবে এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশীদার হতে পারেন।

কিন্তু বিশ্বায়নের তথাকথিত উদারনীতির প্রভাব পৃথিবীর তৃতীয় বিশ্বের ওপরে কেমনভাবে পড়বে এ বিষয়ে মনে হয় বেশ কিছু উদ্বেগ কোথাও কোথাও বেশ ভালোরকমেই জমা ছিল। নারীর 'ক্ষমতায়ন' বা 'empowerment'-যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে সেটি ছিল গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের একটি অঙ্গাঙ্গী অংশ। তৃতীয় বিশ্বের উপনিবেশিক সমাজব্যবস্থার বৈষম্যগুলির বিষয়ে সচেতনতা এবং একে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত করবার একটি সংকল্পের ওপরে এটি প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বায়ন ও তথাকথিত অর্থ সংস্কারের প্রায় পূর্বশর্ত হিসাবে যেভাবে নারীর 'ক্ষমতায়ন'কে ব্যবহৃত হতে দেখা গেল তাতে নারী আন্দোলনের উদ্বেগের প্রচুর কারণ বেরিয়ে এলো।

আন্দোলনের তাগিদে নারীবাদী তত্ত্বর মধ্য থেকে নারীর 'empowerment' কথাটির মধ্যে একটা রাজনৈতিক ঐতিহাসিক চেতনা সঞ্চালিত হতে শুরু করেছিল। আমাদের ১৯৭৪ সালের 'Towards Equality' থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপুঞ্জের নারীদশকের শেষ অর্থাৎ ১৯৮৫ তে নাইরোবি বিশ্ব নারী সম্মেলনের 'এগিয়ে-চলার-নীতি' পর্যন্ত যার গতি অব্যাহত ছিল। কিন্তু

নারীর 'ক্ষমতায়ন' তত্ত্বর মধ্যে সমাজবদলের জন্য সমবেত আন্দোলনের যে ধারাটি ছিল সেটি আস্তে আস্তে ভোঁতা হয়ে এল এবং নীতি নিয়ামকদের হাতে একটি অন্তঃসারশূন্য ফর্মুলার মতো হয়ে দাঁড়ালো। ক্ষমতায়ন কেবলমাত্র উন্নয়নের একটি লেজুড় হয়ে রইলো, যে উন্নয়নের সংজ্ঞার মধ্যেই লুকিয়ে রইলো একটি অসম আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা। অর্থাৎ পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দ্বারা সমৃদ্ধ G7 বা G8 নামক মুষ্টিমেয় দেশগুলি একদিকে আর শোষিত নিংড়ে নেওয়া দেশগুলি অন্যদিকে এরকম বৈষম্যমূলক বিশ্বের বিশ্বায়ন যখন নারী ক্ষমতায়নের ওপরে এত জোর দিতে থাকে, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে আসে, এই ক্ষমতার উৎস কোথায়?

ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে যে দেবীর অকালবোধনের কথা আছে যেখানে দেবীর কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেবগণ তাঁদের নিজের নিজের অস্ত্র দিয়ে দেবীকে সাজিয়ে দিয়ে বললেন যাও আমাদের শত্রুকে মারো, কেননা আমরা তাকে মারতে পারছি না। এইরকম ধরণের 'ক্ষমতায়ন' কি তৃতীয় বা শোষিত বিশ্বের মেয়েদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া তার নিজের পথ পরিষ্কার করে নিচ্ছে? ক্ষমতায়ন যদি একটি World Bank ফর্মুলায় পর্যবসিত হয় তাহলে কতকগুলি অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। একটা খুব সাধারণ কথা, গরীব দেশের খেটে খাওয়া মেয়েরা যাদের শ্রমের ওপরে এই সমাজগুলি নির্ভরশীল, তারা কিন্তু এখনও সাধারণ শিক্ষা বা ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতার মধ্যে আসতে পারে নি। এর মধ্যে বিশ্বায়নের ফলে ক্রমাগত চাপ আসছে রাষ্ট্রকে তার জনগণের (বিশেষ করে যে অংশের সুযোগ সুবিধা এখনও খুবই সীমিত) প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সরে আসবার জন্য। ব্যক্তিগত প্রয়াস ও উদ্যমের অজুহাতে বাজারের খেয়ালখুশির ওপরে সাধারণ মানুষের জীবনকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তাদের অবস্থা কী দাঁড়ায় ভেবে দেখুন? 'ক্ষমতায়ন' প্রসঙ্গটির ভেতরের শাঁস বের করে নিয়ে কেবলমাত্র খোলসটিকে নীতি নির্ধারণের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার ফলে কিন্তু সহায় সম্বলহীন খেটে-খাওয়া মেয়েদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ভদ্র সুস্থ স্বস্তিকর জীবন যাপনের জন্য যে ন্যূনতম প্রয়োজন সেগুলি যেখানে গ্রামে গঞ্জে বস্তিতে বাস করা মেয়েদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ফর্মুলা-ভিত্তিক সশক্তিকরণও এক ধরণের প্রহসনে পর্যবসিত হতে বাধ্য।

নারীর 'ক্ষমতায়ন' World Bank-IMF-এর Structural Adjustment নীতির গোড়া থেকেই একেবারে চিচিং ফাঁকের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। যেন ওই একটি কাজ হলেই উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলি আপনা থেকেই মিলিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৮৯ সালের Commonwealth Expert Group এর একটি দলিলে বলা হচ্ছে যে এই নয়া আর্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থার কুফলগুলি রুখবার জন্য একমাত্র দাওয়াই হলো নারীর ক্ষমতায়ন। অর্থাৎ আজও যেমন নারীকে সাক্ষর করবার প্রয়োজন তার মাতৃত্বের কর্তব্যের সুবাদে, তেমনি Structural Adjustment নীতিকে রূপায়িত করতে পারে একমাত্র নারীর সক্রিয় অনুমোদন ও অংশগ্রহণ। নারী এবং নারী সংগঠনগুলিকে যথাসম্ভব উৎসাহ দিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গাগুলিতে পৌঁছে দেবার কারণ হলো সবকটি অর্থমন্ত্রকের স্টিয়ারিং কমিটিতে তাঁদের বুঝিয়ে এই কাঠামোগত রদবদলের অনুমোদন করানো!

জাতীয় সরকারি স্তরে এগুলির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে দ্রুতবেগে। ১৯৯২ সালে জাতীয় Perspective প্ল্যানের কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম হল নারীর ক্ষমতায়ন। কীভাবে নারী ক্ষমতায়িত হবে? তা-ও বলা আছে—

— আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের আত্মবিশ্বাস অর্জন করে
— বিশ্লেষণী চিন্তার ব্যবহার দিয়ে

— সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে
— সমান অংশীদার হয়ে সমাজ পরিবর্তনের কাজে সামিল হয়ে
— আর্থিক স্বনির্ভরতার পরিকাঠামো তৈরি করে।

সৈয়দ মুজতবা আলির ভাষায় স্বপ্নে যদি পোলাউ খাওয়াতে হয় তাহলে ঘি ঢালতে কার্পণ্য কেন? আর্থসামাজিক প্রক্রিয়াগুলির কদর্য চেহারাটি চোখের আড়ালে রেখে মেয়েদের ওপরে শক্ত শক্ত কাজ চাপিয়ে তাদের 'ক্ষমতায়িত' করলেই তো কেল্লা ফতে।

এরপরে আরও প্রায় দশবছর কেটে গেছে। সমাজের বুকে বিশ্বায়নের তাণ্ডব আমরা প্রত্যক্ষ করছি। প্রত্যক্ষ করছি ধনীদরিদ্রের ফারাক কীভাবে হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে; বাজারের ক্রীতদাস হয়ে গণমাধ্যম কীভাবে বিজ্ঞাপনের খোয়াবে নিমজ্জিত হয়ে পড়ছে। জীবনের স্থিতিশীলতাকে হেয় প্রতিপন্ন করে চতুর্দিকের অস্থিরতাকে প্রায় একটি জীবনদর্শনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দুর্বৃত্তায়ন চোখের ওপরে বেড়ে যাচ্ছে — রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে এর অনুপ্রবেশ আসল জীবন ও সিনেমা টেলিভিশনের জগৎকে একে অন্যের পরিপূরক করে তুলছে। উৎপাদিত খাদ্য মজুত হয়ে পচ্‌ছে এদিকে মানুষ ক্ষুধার্ত কারণ গণবন্টন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। পুঁজিবাদীর স্বর্গ গুজরাট রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রাষ্ট্রসঞ্চালিত নর-নারীমেধযজ্ঞের শিকার হয়েছেন মাসাধিককাল ধরে।

এমতাবস্থায় জাতীয় স্তরে একটি নারীর ক্ষমতায়ন নীতি গৃহীত হয়েছে কোনও মহিলা সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ না করেই। এই দলিলটি আগের সব দলিলকে হার মানায়, কারণ আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে ভারত সরকার যে নারীর ক্ষমতায়নকে রূপায়িত করতে বদ্ধ-পরিকর এই কথাটা বারে বারে উচ্চারণ করেই যেন একে সত্যের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সব থেকে উদ্বেগজনক হচ্ছে দলিলটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অংশটি। কেননা বর্তমান বিশ্বায়নের নীতির ফলে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার মোকাবিলা কীভাবে করা যাবে সে বিষয়ে প্রায় কোনওরকম উল্লেখ না করেই বলা হচ্ছে যে এই দলিলটির লক্ষ্য হল নটি —

(১) সদর্থক আর্থ-সামাজিক নীতির প্রবর্তন করে মেয়েদের নিজেদের ভেতরকার সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশ।

(২) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নাগরিক জীবনে আইনী এবং প্রত্যক্ষ সমস্ত মৌলিক স্বাধীনতা ও মানসিক অধিকার যাতে নারী-পুরুষ সমানভাবে ভোগ করতে পারে।

(৩) জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্তরে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাতে নারীর পূর্ণ অধিকার।

(৪) স্বাস্থ্য পরিষেবা, উচ্চমানের শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কর্মসংস্থার সমান মজুরি, কর্ম অনুযায়ী স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় সব কিছুতে সমান অধিকার।

(৫) আইনী পরিষেবার উন্নতি এবং নারীর বিরুদ্ধে সবরকমের বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

(৬) সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে আচরণের পরিবর্তন ঘটানো।

(৭) লিঙ্গ বৈষম্যের দূরীকরণকে উন্নয়নের সামনের সারিতে রাখা।

(৮) নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সবরকম হিংসাত্মক আচরণের অবসান ঘটানো।

(৯) Civil Society-র সঙ্গে সমান অংশীদার হওয়ার জন্য নারী সংগঠনগুলির সঙ্গে সংযোগ।

এইরকম একটি জাতীয় দলিলের প্রেক্ষাপট হচ্ছে বিশ্বায়ন। সমাজ পরিবর্তনের, গণতন্ত্রের

প্রতিষ্ঠার সমস্ত প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নকে এইভাবে তুলে ধরে বিশ্বায়নের প্রবক্তারা যদি মনে করে থাকেন যে লিঙ্গ-শ্রেণী-জাতপাত-ধর্মীয় সম্প্রদায়·বিভক্ত সমাজকে সুন্দর করে তোলা যায় তবে তা হবে 'Fair and Lovel' নামক প্রসাধনের সাময়িক সৌন্দর্যের সমগোত্রীয়। নারী আন্দোলনের মধ্য থেকে এই নিয়ে জোর প্রতিবাদ উঠে এসেছে।

সম্প্রতি মালিনী ভট্টাচার্যের পরিচালনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বিশ্বায়নে নারীর অবস্থান' নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনাগুলি শীঘ্রই বই আকারে বেরোবে। Indian Association of Womens' Studies গত এক বছর ধরে ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের বিভিন্ন অঞ্চলে যে কর্মশালাগুলি করেছে তাতে এই প্রসঙ্গটি এসেছে বারে বারে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বিশ্বায়ন সম্পত্তির অধিকার, সম্পদের ভাণ্ডার জাতপাত-শ্রেণী ও লিঙ্গ চেতনাতে বিধ্বংসী আঘাত হেনেছে। ক্রমবর্ধমান হিংসা, বৈষম্য ও অপসূয়মান রাষ্ট্রশক্তি, আগ্রাসী বাজার এবং পরিবার ও সম্প্রদায়গত জীবনের অনিশ্চয়তা মেয়েদের জীবনকে চরম বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এছাড়া গত জুলাই মাসে পূর্ব আফ্রিকার উগাণ্ডা রাজ্যে অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলনে পৃথিবীর ৯৪টি দেশের থেকে আসা সংগ্রামী মেয়েরা বিশ্বায়নের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আপত্তি জানালেন। একের পর এক আলোচনাতে এটাই বেরিয়ে এল যে বিশ্বায়নের নামে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশের স্বাতন্ত্র্য ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ওপরে নামিয়ে আনা হয়েছে শোষণের করাল ছায়া। শিক্ষা, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপরে আলোচনাগুলিতে বর্তমান বিশ্বে খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তার অভাবের ফলে মূলত মেয়েদের জীবনের অসুবিধার বিশ্লেষণ বিশেষ স্থান পেয়েছে।

(পাঁচ)

নারীর ক্ষমতায়নের ধোঁয়াশা দিয়ে বিশ্বায়নের কুকীর্তিগুলো একটু আড়াল করার চেষ্টাটি বিপজ্জনক। অতএব এই সমস্যাটির বিভিন্ন দিক নিয়ে ভেবে দেখতে আপনাদের অনুরোধ করবো। এর অনেক দিক নিয়ে উঁচু মানের গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে। আমি এর একটি মাত্রার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম মাত্র।

সবশেষে মনে করিয়ে দিই আধুনিকতার পর্যায়ে গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়ের আন্দোলনগুলি ছিল আন্তর্জাতিক। বিশ্বায়নের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার প্রসার নেই। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদের সঙ্গে এর কোন স্ববিরোধ নেই। এই ব্যবস্থার মধ্যে নারীর ক্ষমতারোহণ কিন্তু দুর্গা-বাহিনীর ক্ষমতার তাণ্ডবে পর্যবসিত হবে। নারীশক্তিকে আমরা ক্রমাগত প্রত্যক্ষ করবো 'সতী' ও 'ডাইনী'রূপে। বিশ্বায়নকে বিশ্বের সভ্যতার বাহক বলে মনে করার কোনও কারণ নেই।

দেহোপজীবিনী ও দেহ-বিপণনের বিশ্বায়ন

শুভাশীষ গুপ্ত

বিশ্বায়ন বিষয়ক প্রথাগত আলোচনাতে বারাঙ্গনা, তথা চলিত কথায় বেশ্যা, বিষয়ক আলোচনা অভিনব বলে মনে হতে পারে। তবে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার অন্যতম এক মাত্রা হলো 'সেক্স-সেকটর' বা বারবিলাসিনী ক্ষেত্রের উদ্ভব ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার। 'গ্লোবালাইজেশন-সিনড্রোম' বা বিশ্বায়নের বিভিন্ন লক্ষণসমূহের বিদ্যমানতার মধ্যে একই সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরকে আবৃত করে বর্তমানে নানাবিধ দিক গঠিত হচ্ছে। সেগুলির অন্যতম হলো সেক্স-সেকটর। অর্থনৈতিক স্তরে 'হিডেন ইকনমি'র এক বিস্তৃত ও শক্তিশালী অস্তিত্ব নির্মিত হয়েছে। তাতে পুঁজি সঞ্চালনের এক দিক হয়ে উঠছে 'সেক্স-সেকটর'। যদিও ধ্রুপদী অর্থনৈতিক ধারণাতে 'সেক্স-সেকটর' নামে কোন ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ও ভূমিকা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়নি।

বেশ্যাবৃত্তি ঃ মানব-সমাজ ও সভ্যতায় অর্থ বা বস্তুগত সামগ্রীর বিনিময়ে যৌন-পরিষেবা প্রদানের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে অসম সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত এই প্রথা। এটির রয়েছে প্রশস্ত ও সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি। একই সাথে গভীর সামাজিক বুনিয়াদও। এ এক এমন ক্ষেত্র, যাকে এক ধরনের ইনডাসট্রি বা শিল্প বলেও চিহ্নিত করা চলে। এই ক্ষেত্রটি এখন যথেষ্ট সুসংহত। ক্রমবর্ধমানভাবে আধুনিক ও নিপুণভাবে এটি গঠিত হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাধারণ অর্থনীতির সাথে রয়েছে এটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণিকা-বৃত্তিতে যুক্ত, বর্তমানকালের কমার্শিয়াল সেক্স-সেকটর বা বাণিজ্যিক যৌন-ক্ষেত্র তাদের জন্য উপার্জন এবং বৃত্তিতে নিয়োগকে নিশ্চিত করে। পাশাপাশি, এই ব্যবস্থা উপার্জনকে পুনর্বণ্টনও করে থাকে যেমন শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে এবং যে বারবণিতারা বিদেশে কাজ করে তাদের উপার্জন পুনর্বণ্টনও করে থাকে (যেমন শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে এবং যে বারবণিতারা বিদেশে কাজ করে তাদের উপার্জন স্বদেশে প্রেরণের মাধ্যমে।) এই বৃত্তির সাহায্যে বিশ্বের বহু সংখ্যক দেশের এক উল্লেখযোগ্য অংশের নারীর নিজেদের বা পারিবারিক দারিদ্র থেকে পরিত্রাণের এক 'মেকানিজম' সেক্স-সেকটরের মাধ্যম তৈরি করেছে। অধিকাংশ দেশে ও সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যূনতম উপার্জনের গ্যারান্টিবিশিষ্ট সর্বজনীন কর্মসূচী বর্তমানে প্রায় নেই বললেই চলে। যেটুকু বা অতীতে ছিল তা এখন দ্রুত লুপ্ত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির অন্যতম পরিপূরক হিসাবে বারবধূবৃত্তিকে গ্রহণ করছে বিপুল অংশের অসহায় নারী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসা। এই বৃত্তিকে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের এক তাৎপর্যপূর্ণ

সূত্রে পরিণত করা হয়েছে বহু সংখ্যক রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক মহল থেকে। এই ক্ষেত্রটির বৃদ্ধি ও বিকাশের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে নিপুণ কাঠামোর দ্বারা গঠিত মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন তথা বহুজাতিক সংস্থার বিভিন্নমুখীন বাণিজ্যের। যদিও প্রকাশ্যে এই তৎপরতার স্বীকৃতি নেই। তাছাড়া গণিকা-বৃত্তির ক্ষেত্রটি বিকাশ-সম্পন্ন হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে পর্যটন শিল্পের প্রসারের দ্বারাও। শ্রমজীবীদের দেশান্তরের অঙ্গাঙ্গী হয়ে উঠেছে গণিকা-বৃত্তির জন্য বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশুকে রপ্তানির ব্যবস্থা।

কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে বারবিলাসিনী বৃত্তির অর্থনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবনে সেক্স-সেকটরের বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ককে উপেক্ষা করা যায় না। এদিকটি এক গভীর আলোচনার বিষয়। কেন বেশি বেশি নারী, শিশু ও পুরুষরা যৌন-পরিষেবার বাণিজ্যিকীকরণে যুক্ত হচ্ছে, কেনই বা যৌন পরিষেবার চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে— গভীর আর্থ-সামাজিক সমীক্ষার প্রসঙ্গ এগুলি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশের সেক্স-সেকটরের বৃদ্ধি ঘটেছে দ্রুত ও বিপুলভাবে। এই দেশগুলির আর্থনীতিক অগ্রগতি ও আধুনিকীকরণে গণভোগ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে সেক্স-সেকটরের অপরিমেয় অবদানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ঐসব দেশগুলির সরকার অভ্যন্তরীণ নীতির মধ্যে বারাঙ্গনা বৃত্তিকে এক অর্থনৈতিক তৎপরতা হিসাবে, অঘোষিতভাবে, গণ্য করে। অথচ এই ধরনের বহু দেশেই বারবধূ-বৃত্তি আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু সরকারের নীতি হিসাবে পর্যটন শিল্পের বিকাশ, বৃত্তির সংস্থানে দেশান্তরী হওয়ার জন্য উৎসাহ দান এবং নারীদের বিদেশে প্রেরণের বিপুল সুযোগ দিয়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের প্রচেষ্টা কার্যকালে পরোক্ষে রূপোপজীবিনী বৃত্তিকে উৎসাহিত করছে। এমন কি নারী-পাচারের ব্যবসাকেও সক্রিয় করেছে। বর্তমান বিশ্বায়নের ব্যবস্থায়, অর্থনীতির মুক্তবাজারমূলক নীতিসমূহও সেক্স-সেকটরের এবং সেটির বহুমুখীনতা গঠনে প্রভাব ফেলেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় কম শিক্ষিত বা অদক্ষদের জন্য কার্যকরী তথা অর্থকরী নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করছে এই সেকটর। শ্রম-বাহিনীর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রান্তিকীকরণ, শহর ও গ্রামের মধ্যে বর্ধমান বৈষম্যমূলক বাণিজ্য, উপার্জনের স্তরে বর্ধমান বৈষম্য ও তারফলে ক্রমপুঞ্জীতে আর্থ-সামাজিক ফলাফলসমূহ এবং পূর্বে উল্লেখিত সামাজিক-নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে দরিদ্র পরিবারসমূহের বাঁচার জন্য এই ধরনের পন্থার (বারাঙ্গনা-বৃত্তি) গণ-অবলম্বন ঘটছে। এমন কি কসমোপলিটন বা গ্লোবাল সিটিগুলিতে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে নারীরা 'কম্পানিয়ান'-ধর্মী ভূমিকার আবরণে বিপুল সংখ্যাতে এই বৃত্তিতে নিযুক্ত।

বারবণিতা বৃত্তির অর্থনৈতিক বুনিয়াদের দিকটি বর্তমানকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা কেবল ব্যক্তিবারাঙ্গনারা এবং তাদের পরিবারসমূহের সেক্স-সেকটরের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার প্রসঙ্গ নয়। প্রায় সমস্ত ধরনের বাণিজ্যিক দিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই শিল্পের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ছে। সেক্স-সেকটরের অভ্যন্তরের পরিকাঠামোগুলির দ্বারা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ব্যবস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট সমাজের ক্ষমতাশালী অংশের স্বার্থকে সংরক্ষণ করে। এসব দিক নিয়ে দেশভিত্তিক নানান সমীক্ষা ও গবেষণাও হয়েছে। সেগুলি থেকে দেখা যায় যে, যে সমস্ত সংকুল কারণের জন্য সেক্স-সেক্টরের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে তাতে লগ্নী-পুঁজির বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন প্রত্যক্ষভাবে ইন্ধন জোগাচ্ছে। সেক্স-সেকটরের বিস্তার ও সংরক্ষণে এবং সমর্থনের পেছনে রয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদরা, পুলিশ, সশস্ত্রবাহিনী এবং সিভিল সার্ভেন্টরা। শেষোক্ত অংশগুলি ব্যাপকভাবে ঘুস নিতে অভ্যস্ত। তাঁরা যৌন-সুবিধাও নিয়ে থাকে। তাছাড়া বহু ক্ষেত্রে নিজেরা যৌন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ভোক্তা। এমন কি তারা অংশীদার বা মালিক

সেক্স-সেকটরের সুগঠিত কাঠামো ও সংগঠিত চরিত্র এবং এটির উপর নির্ভরশীল অংশের বিশাল জাল এবং শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থের যোগাযোগ দেখিয়ে দেয় এই সেকটরকে নিয়ন্ত্রণে সমস্যার কাঠিন্যকেও। এই সেক্স-সেকটরের সাংগঠনিক কাঠামো যতই জটিল থেকে জটিলতর ও বিস্তৃত হচ্ছে, ততই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আর্থনীতিক প্রণালীর সাথে সেকটরটির ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। এর দ্বারা বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থ ও নির্ভরশীল অংশগুলি ক্রমশ বেশি বেশি করে এর সাথে যুক্ত হচ্ছে। সেক্স-সেকটর এইভাবে 'স্নো-বলিং' প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে। যেসব দেশগুলিতে সেক্স-সেকটরের বেশি বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে, সেখানে অর্থনীতির বুনিয়াদ ধনতান্ত্রিক। কিন্তু এই ধরনের দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল। দ্রুত উন্নতির অন্যতম পন্থা হিসাবে সেক্স-সেকটরের বৃদ্ধিকে ও ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে। সেক্স-সেকটরের প্রকৃতি ও বিকাশের গতি উভয়ত প্রভাবিত হচ্ছে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নারীর (এক্ষেত্রে সেক্স-ওয়ার্কারস) সরবরাহ এবং চাহিদা পূরণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার দ্বারা। সেক্স সেকটরের আর্থনীতিক ফাটকাবাজির সুযোগও বিপুল। এই প্রবণতা যেন বর্তমানে লগ্নী-পুঁজির বিনিয়োগের চরিত্রের মত। 'হটম্যানি'-এর সহযোগী হয়েছে সেক্স-সেকটর। সেক্স-সেকটর, এক ধরনের ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টের মতই, তবে অনেকটাই মাইগ্রেটারী চরিত্রের। অধিক লাভের জন্য এটি এক দেশ থেকে কখনো অন্য দেশে ডেরা বাঁধছে। এজন্যই কোন কোন মহল থেকে, বিশেষত এই সেকটরে যাদের কায়েমী স্বার্থ রয়েছে, বলা হয় যে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই, বাণিজ্যিক যৌন-ব্যবসার ধারায় যুক্ত বিপুল সংখ্যক মানুষ লাভজনক সুবিধা পাচ্ছে। বিশ্বায়নের ব্যবস্থায় লগ্নী-পুঁজির বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্পর্কে মানুষের সামনে প্রচারও অনুরূপ।

অর্থনৈতিক পূর্বোক্ত ভিত্তিসমূহ ছাড়াও, বারবণিতা বৃত্তির শক্তিশালী সামাজিক ভিত্তি রয়েছে। অনন্তকাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও, তা প্রায় অপরিবর্তিতই রয়েছে।

ইতিহাসে মানব-সভ্যতা ও বারাঙ্গনা বৃত্তি সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বলা যায় এখনও পর্যন্ত তথাকথিত সভ্যতার অবিভাজ্য অঙ্গ এই বৃত্তি। সমাজ ও ধর্মে গণিকাদের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকায় ব্যাপক স্ব-বিরোধিতা ও দ্বন্দ্ব প্রথমাবধি থেকেছে। কোন কোন সভ্যতার কালে দেহ-উপজীবিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কার্যকালে তাদের সব সময়ে অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে সমাজ-মানস ও ব্যবহারে। অনৈতিকতা ও পাপের মূর্ত রূপ বলে অভিযুক্ত বেশ্যাবৃত্তি অপাংক্তেয় হয়ে থাকলেও এহলো নীলকণ্ঠ-রূপী প্রথা। প্রথাটির অব্যাহত উপস্থিতি স্বয়ং সমাজের গোপন ও চাপা যৌন-অনৈতিকতাকে সামাল দিতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছে। অর্থাৎ রূপোপজীবিনী বৃত্তিকে সমাজ-প্রধানরা অচ্ছুৎ করে রাখা বা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চালালেও, সমাজ এই বৃত্তিকে ত্যাগ করেনি। মিশর, ব্যাবিলন, ভারত, চীন, গ্রীস, রোমক প্রভৃতি সভ্যতার নগরবিন্যাসে বারবণিতাদের জন্য গুরুত্ব দিয়ে নির্দিষ্ট বসত এলাকার ব্যবস্থা ছিল। আরও লক্ষণীয় দিক হলো, ইতিহাসের বহু প্রধান প্রধান ঘটনাবলীতে এই বৃত্তির নারীদের ইতিবাচক ভূমিকা জানা যায়। ধর্ম ও ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিপ্লব, সংগ্রাম, সমরাঙ্গন, কূটনীতি, গুপ্তচর বৃত্তি ইত্যাদিতে গণিকারা কোন কোন সময়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। ফলে, সংশ্লিষ্ট সময়ে বিশেষত, সমাজ বাধ্য হয়েছে তাদের ভূমিকার অন্তত তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি দিতে।

গণিকা-প্রথার এক অতুলনীয় ও সর্বকালের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৃত্তি প্রায় নিরঙ্কুশভাবে সংরক্ষিত থেকেছে নারীদের জন্য। বিশ্ব-মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পতনের পর, (মর্গান ও এঙ্গেলস যেভাবে জানিয়েছেন) সমগ্র নারী-জাতির উপর আরোপিত নিপীড়ন ও অবমাননার অন্যতম প্রতিফলন, মাত্রা ও দিক হলো একাংশ নারীকে গণিকাবৃত্তিতে বাধ্য করা। তাই ঐতিহাসিকভাবে এই প্রথা হলো প্যাট্রিআর্কাল সিসটেম বা পুরুষ-প্রধান সমাজ ব্যবস্থার

অন্যতম প্রতীক। প্রকাশ্যে যে ধরনের বিরোধিতাই করা হোক না কেন, গণিকাবৃত্তিকে সর্বকালে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে টিকিয়ে রাখা শুধু নয়, বাড়বাড়ন্ত করিয়েছে প্রত্যেকটি শোষণ-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজ স্বয়ং। এই ব্যবস্থা ছিল পুরুষের কাম-উগ্রতাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য কেবল নয়। পরিবারের অভ্যন্তরে যেকোন যৌন-দুর্ঘটনায় পতিত নারীর, সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থাবলী-বহির্ভূত, বিকল্প জীবনধারণের সংস্থানের অন্যতম পরোক্ষ ক্ষেত্র হিসাবেও গড়ে তোলা হয়েছিল বেশ্যাবৃত্তিকে। গৃহস্থালি শ্রমে বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ নারীদের একাংশকেও নিম্নস্তরের প্রকাশ্য শ্রমের নিযুক্তির অন্যতম ব্যবস্থা হিসাবে এই প্রথাকে করা হয়েছে। এঁদের প্রতি ঘৃণা ও ব্যবহারিক জীবনে এঁদের অপাংক্তেয়তা পরিকল্পিতভাবে এবং আশ্চর্যজনক ভাবে প্রধানত তৈরি করা হয়েছিল গৃহস্থালি নারীদের মধ্যেই। অন্যদিকে এঁদের সামাজিক, দৈহিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ও নিষ্পেষণ করা এবং অবমাননার দায়িত্ব বহন করতো পুরুষেরা। এইভাবে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি কালের উৎপাদন ও সমাজ-ব্যবস্থায় শোষণের অন্যতম ভুক্তভোগী হিসাবে এঁরা ছিলেন শোষিত জনগণের অন্যতম অংশ। নারীর গৃহস্থালি শ্রমকে সামাজিক ও মূল্য সৃষ্টিকারী শ্রমের স্বীকৃতি না দেওয়ার যে নীতি অতীত থেকে বহাল ছিল, তার অন্যতম অংশ হয়েছিল বেশ্যাবৃত্তি। দেহ-শ্রম বিক্রয়কে সামাজিক উৎপাদনমূলক শ্রমের স্বীকৃতি কখনো দেওয়া হয়নি। এইভাবে শোষণভিত্তিক প্রত্যেকটি সমাজ-ব্যবস্থায়, দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই সংশ্লিষ্ট সমগ্র অর্থনীতির অংশ হিসাবে এই বৃত্তির পরোক্ষ অংশীদারিত্ব ও বিশ্বায়িত চরিত্র ভ্রূণাকারে গঠিত হয়েছিল।

বারবণিতাদের দেশভিত্তিক প্রচলিত সামাজিক গঠন ও সংস্কৃতি এখনও পর্যন্ত বেশ কিছুটা ভিন্ন। প্রায় অধিকাংশ দেশে বেশ্যাবৃত্তি কলংকজনক বলেই চিহ্নিত। বৃত্তির চরিত্র হলো গোপনীয়তামূলক, তবে নিজেদের পরস্পরের মধ্যে গভীর সংযুক্তিময়। পেশা থেকে কারও নিবৃত্ত হওয়া বা পরিত্রাণ পাওয়া প্রায় সম্পূর্ণ দুষ্কর। অনেকটা ক্রীতদাসের মত পরিস্থিতি। সর্বত্রই আইন প্রয়োগকারীদের বৈষম্যমূলক আচরণের সম্মুখীন হয় বেশ্যারা। আরও বিশেষত এই কারণে যে, অধিকাংশ দেশে বারবণিতা-নিরোধক আইন বৈষম্যমূলক। দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে প্রচলিত আইনগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। আইনী অবৈধতার সুযোগকে ব্যবহার করে বারবণিতাদের কয়েদের হুমকি দিয় ইচ্ছামত ও নিয়মিত অর্থ নিংড়ে নেয় পুলিশ। তাছাড়া 'আন্ডারওয়ার্ল্ড' বা সমাজ-অন্তরালের দুষ্কর্মের জগতের প্রান্তে এঁদের অবস্থান। এই সুযোগে পুলিশ এঁদের বাধ্য করে দুষ্কৃতকারীদের তথ্য নিয়মিত সরবরাহ করতে ও চিহ্নিতকরণের কাজে। এসবের ফলে তাঁরা সমাজ থেকে আরও বিছিন্ন হয়। সমাজ এঁদের দুষ্কৃতকারী বলে মনে করে। এইভাবে, বিপরীত ক্রিয়ায়, এঁদের মানসিকতায় ও কাজে দুষ্কৃতি গড়ে ওঠে। এরা দুষ্কৃতি জগতের অংশ হয়ে পড়ে। সমাজের এই ধরনের চক্রাবর্ত প্রক্রিয়া, বেশ্যাবৃত্তির অবসানের পরিবর্তে, কার্যকালে এটিকে স্থায়ী করতেই সাহায্য করে। বর্তমান বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দুষ্কৃতির বহুমুখী ধারার প্রসার ঘটছে। নানা চরিত্রের দুষ্কৃতি 'পার্ট অব দা গ্লোবালাইজেশন সিসটেম' হয়ে পড়েছে। প্রচলিত বেশ্যাবৃত্তি, সেটির অন্তর্লীন উপাদান নিয়ে বর্তমানের বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় স্থান করে নেবার প্রথম শর্ত তৈরি রেখেছিল আগে থেকেই।

বেশ্যালয়ে ও পট্টিতে একজন দেহোপজীবিনী দিন কাটায় দৈহিক নির্যাতন ও আক্রমণের মধ্যে। এসব আক্রমণ ও অত্যাচার প্রধানত ঘটে সেই সমস্ত অংশের দ্বারা যারা নারীটিকে ব্যবসার জন্য সংগ্রহ করে এনেছে (প্রকিওরার), বেশ্যালয়ের দালাল (পিম্প), মাসি (বেশ্যালয়ের মালিক, প্রাক্তন একজন নারী বেশ্যা, ম্যাডাম), অন্ধকার জগতের গুন্ডারা (মিসক্রিয়েন্টস) এবং ভোক্তারা (কমিউটার)। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দেহ-ক্রেতা সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঐ নির্যাতনের অবস্থা তাঁদের ভাগ্যে জোটে। শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের 'অক্যুপেশনাল হ্যাজার্ড অ্যান্ড ডিজিজ'-এর মতো, বারাঙ্গনাদের যৌন-শ্রমেও রয়েছে বৃত্তিগত ঝুঁকি ও রোগের ভয়ঙ্কর

প্রাবল্য। বারবার গর্ভসঞ্চার ও গর্ভপাত ছাড়াও রয়েছে যৌন সম্পর্কের দ্বারা সংক্রমিত রোগসমূহ যেমন সিফিলিস, গনোরিয়া প্রভৃতি যৌন রোগ, টি.বি. ইত্যাদি। তার সাথে বর্তমানে মারাত্মক 'এইডস' রোগ এঁদের জীবনের ঝুঁকি তীব্রভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। নিরোধক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বারবণিতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যবহারের চেষ্টা সত্ত্বেও, তথ্য থেকে জানা যায় যে, ভোক্তারা সেইসব নিরোধক ব্যবস্থা ব্যবহারে বেশ্যাদের জবরদস্তি বাধা দেয়। ফলে রোগ প্রতিরোধ করার সুযোগটুকুও এঁরা অধিকাংশ সময় নিতে পারে না। বেশির ভাগ দেশে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ায়, সরকার নিয়ন্ত্রিত বেশ্যালয় এবং রেজিস্টার্ড বেশ্যাদের জন্য ছাড়া, নিয়মিত ও উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ বাকিদের কার্যত নেই। ক্রমাগত গর্ভপাত ঘটানো, মৃত সন্তান প্রসব, ব্যবসার স্বার্থে নিজ সন্তানকে গোপন রাখার বাধ্যতা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা, অবৈধ সন্তানের জন্মদান ও সেই সন্তান প্রতিপালনের প্রবল সমস্যা প্রভৃতি এঁদের সর্বক্ষণ তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও উদ্বেগের মধ্যে রাখে। এঁদের সন্তানদের জীবন হয় দুর্বিষহ এবং ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ও অন্ধকারময়। শেষোক্ত দিকটিও বাড়িয়ে চলে গণিকাদের জীবন-যন্ত্রণার মাত্রাকে। বৃত্তি পরিত্যাগ করা বা বৃত্তি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা সর্বক্ষণ এঁদের তাড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু বৃত্তি ছাড়লে বিপদ ও অনিশ্চয়তার ভয়ও সমানভাবে গণিকাদের মন ছেয়ে থাকে। মনস্তাত্ত্বিক স্তরে আধুনিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার এ হলো আর এক অলঙঘনীয় উপাদান ও দিক।

কিছু সমাজতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন যে আর্থনীতিক কারণের মতই পরিবেশগত ও মনস্তাত্ত্বিক কারণও এই বৃত্তিতে নিযুক্ত হওয়ার পেছনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ষিতা হওয়া, প্রাক্-বিবাহ গর্ভবতী হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পুরুষের সাথে বিবাহ না হওয়া, বিবাহিতা বা বিধবা নারীর অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্কের ফলে গর্ভবতী হওয়া এবং তার ফলে পরিবার থেকে বহিষ্কার, যে পরিবারের পিতা বা মাতা উভয়েই অন্যের সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ও সেগুলি জানার সুযোগ ঘটেছে বাড়ির যে কন্যার, কারখানা বা অফিসে কাজ করতে গিয়ে সহকর্মী, কর্তৃপক্ষ বা মালিক প্রভৃতির দ্বারা বারবার যৌন-লাঞ্ছিত হওয়া, গৃহস্থালী পরিচারিকার উপর যৌন-নিপীড়ন ও তার ফলে এক বা একাধিকবার গর্ভবতী হওয়া এবং গর্ভপাত ঘটানো, পিতা-মাতা বা বাড়ির অভিভাবকদের ক্রমাগত দুর্ব্যবহার প্রভৃতি ঘটনাবলী থেকে বারবণিতা বৃত্তি গ্রহণের পরিবেশগত কারণগুলি পাওয়া যায়। এমনকি পিতা কর্তৃক কন্যা, ভ্রাতা কর্তৃক ভগ্নী বা পরিবারের নিকট পুরুষ আত্মীয় কর্তৃক নারীকে ক্রমাগত যৌন-সম্পর্কে বাধ্য করার ফলে সমাজ, পরিবার ও নৈতিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়ে এই বৃত্তিতে যোগদানের নজিরও রয়েছে। স্বামীর নৃশংস অত্যাচার, বিশেষত যৌন-উৎপীড়ন, শাশুড়ী, ননদ প্রভৃতির অত্যাচার, অল্প বয়সে বৈধব্য ঘটলে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার বা অন্য উদ্দেশ্যে সেই নারীর চরিত্র সম্পর্কে অপবাদ অথবা বিধবা নারীকে অন্য পুরুষের ভোগে বাধ্য করে পরিবারের অর্থ উপার্জন ইত্যাদিও কারণ হিসাবে কখনো কাজ করে। তথাকথিত আধুনিক যুগব্যবস্থা এ জাতীয় পরম্পরা থেকে নারীকে পরিত্রাণ দেয়নি। বরং প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে এগুলি বর্ধিষ্ণু।

উন্নত-অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে; প্রধানত দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক-সামাজিক বঞ্চনা এই বৃত্তিতে যুক্ত হতে বাধ্য করে নারী ও শিশু-কন্যাদের। কোন কোন দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা বেশ্যা পরিবারের মেয়েদের বংশ পরম্পরায় এই বৃত্তিতে আবশ্যিকভাবে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য করে। অনুন্নত বহু দেশে নারী সন্তানকে মনে করা হয় অপ্রয়োজনীয় বা বোঝা হিসাবে। তাছাড়া দারিদ্রের জন্য কন্যাসন্তানকে বিক্রি করা হলে, ক্রয়কারীরা বহুক্ষেত্রেই গণিকাবৃত্তিতে ব্যবহার করে ঐ নারীকে। দরিদ্র নারীদের চাকুরী বা বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করে এনে 'চরিত্র নষ্ট' করার পর, লোকলজ্জার ভয় দেখিয়ে, তাঁদের বাধ্য করা হয় বারবণিতা বৃত্তিতে। এই পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিভাবকহীন, আধা-অভিভাবকহীন ও বাড়ি থেকে

পালানো শিশু-কন্যা, বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে ভগ্নদশা পরিবারের সন্তান, অবৈধ সন্তান, পরিত্যক্ত সন্তান, রাস্তার ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত শিশু-নারী এবং ছোটখাটো দুষ্কর্মে যুক্তদের এই বৃত্তিতে নিয়োগ। সারা বিশ্বে ১২ বছরের কম বয়েসী রাস্তায় বাস করা শিশুর সংখ্যা ১৯৯২ সালে ছিল ১৪৫ মিলিয়ন। এই বিশাল সংখ্যক ফুটপাতবাসী শিশুর বিপুল অংশের পরিণাম কি তা কিছুটা অনুধাবনের জন্য একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে। ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ১২৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত ব্রাজিলে যে ২৫ মিলিয়ন শিশু রাস্তায় বা ফুটপাতে বাস করে তার ৩-৫ মিলিয়ন বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত।

এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ স্বয়ং বেশ্যাবৃত্তিকে দারুণভাবে ছড়িয়ে দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রধানত কেবল ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর আফ্রিকা ও এশীয় ভূখণ্ডে। সমগ্র সমর ব্যবস্থার অংশ তথা যুদ্ধ- সামগ্রী যোগানের অন্যতম অংশ হয়ে ওঠে সামরিক বাহিনীর জন্য বারবণিতা সরবরাহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদ যেসব দেশে সামরিক অভিযান বা দখলদারী করেছে সেইসব দেশে ব্যাপকভাবে বেশ্যাবৃত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছাড়াও আমেরিকান সৈন্যদের স্থায়ী ছাউনীগুলির জন্য জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপাইনস, মালয়েশিয়া, হংকং প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে গণিকাবৃত্তির প্রসার হয়। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ পুঁজি ও যুদ্ধের সাথে গণিকাবৃত্তির বিশ্বায়নও শুরু করেছিল।

চরম দারিদ্র্য ছাড়াও সমাজতাত্ত্বিক ও বিশেষজ্ঞরা আরও বিশেষ কারণ লক্ষ্য করছেন এই বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হওয়ার পিছনে। কেননা হতদরিদ্র হলেও এখনও পর্যন্ত ব্যাপকতম অংশের নারী এই বৃত্তিতে যায় না। তাই আর্থিক দারিদ্র্যজনিত বা পূর্বোক্ত নানা সামাজিক প্রথা ও কারণের বাইরে, ক্রেতার চাহিদাও বর্তমানকালে যৌনবাজারে নিযুক্তির পিছনে অন্যতম কারণ। দারিদ্র্যের পরিসরে নারীদের মধ্যেই দারিদ্র্যের প্রকোপ বেশি। তাই চাহিদার তুলনায় ধনী-দরিদ্র দেশ নির্বিশেষে যৌন-বাজারে নারী সরবরাহ কিছুটা বেশিই বলা চলে। ফলে এখানেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল। তবে প্রচলিত যৌন-বাজারের চাপ বর্তমানে ক্রমশ কমেছে। কিন্তু তা' এজন্য নয় যে মানুষের মধ্যে পরিবার-বহির্ভূত যৌনতার প্রবণতা নিম্নগামী হচ্ছে। আসলে পরিবার-বহির্ভূত যৌন-চাহিদা ভিন্নভাবে অনেকটা পূরণ হয়ে যাচ্ছে যৌন-বাজার ও ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে সমাজে দ্রুত ও বিপুলভাবে মুক্ত তথা উদারীকরণ হওয়ায়।

বিশ্বায়নের মুক্ত-বাজার ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে নতুন ধরনের বারবণিতা বৃত্তির উদ্ভব ঘটতে শুরু করছে। পৃথিবীব্যাপী দ্রুত ও ব্যাপক নতুন ধরনের শিল্পায়ন ও নগরায়ন, সেগুলির উপকণ্ঠে বৃত্তির সন্ধানে বহিরাগতদের দ্বারা নতুন নতুন বস্তি অঞ্চল গড়ে ওঠা, শহরগুলিতে বিভিন্ন দেশের ও চরিত্রের মানুষের ভিড়, গায়ে গায়ে লাগানো ফ্ল্যাট বাড়ি, বাণিজ্যের নানা প্রয়োজনে বিদেশীদের, বিশেষত বিজনেস এক্সিকিউটিভ, প্রফেশনাল, এডভাইসর, ফিনানশিয়্যার, প্ল্যানার, টেকনিশিয়ান, এডভারটাইজার, মার্কেট-সার্ভেয়ার, ভ্রমণকারী, সেলসম্যান প্রভৃতি অংশের বৃত্তিগত কারণে আন্তর্জাতিক গমনাগমন, পরিবারের ব্যবস্থায় মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিতে ভাঙ্গন, এক অভিভাবক পরিবারের ব্যাপক প্রসার, বিলম্বে বিবাহ, নারী ও পুরুষের মধ্যে অতি-অবাধ মেলামেশা, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুযোগের ফলে গর্ভসঞ্চার সম্পর্কে আশঙ্কা দূরীভূত হওয়া, গর্ভপাতের সপক্ষে অধিকাংশ দেশে আইন, নারীদের মধ্যে নেশাগ্রস্ততার প্রসার, সমাজে লজ্জা ও গোপনীয়তার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ক্রমাগত ক্ষয়, প্রকাশ্য যৌনতা সম্পর্কে নতুন নতুন মতবাদ, সংগঠন ও আন্দোলনের আবির্ভাব ইত্যাদি দিকগুলি প্রচলিত বারবণিতা বৃত্তির চরিত্রকে ব্যাপকভাবে বদলে দিচ্ছে। বৃত্তিটির বিকাশে এখন নতুন নতুন কারণ সৃষ্টি হচ্ছে। গোপন ও ঘেরাটোপ চরিত্র

থেকে পরিবার-বহির্ভূত ও অর্থবিনিময় যৌনতা এখন মুক্ত-বাজার ব্যবস্থা নিচ্ছে। তার সাথে বর্তমানকালে চোরাচালান, মাদকদ্রব্য পাচার ও মাদকাসক্তি, খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, গুণ্ডামি, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও সমাজের উচ্চমহলে দুর্নীতি, সিনেমা, টি.ভি, ভি.ডি.ও' তে প্রকাশ্য যৌনতা প্রদর্শন, যৌন-বিষয়ক পত্র-পত্রিকা, ক্যাসেট প্রভৃতির বিক্রির প্রসার, বিষাদগ্রস্ততা থেকে মানুষের মধ্যে নানা মরিয়া মানসিকতা ও তৎপরতা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলি একক বা ক্রমান্বিতভাবে গণিকা বৃত্তির বিকাশে অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে পতিতাবৃত্তি স্বয়ং হয়ে উঠেছে এগুলির অনুষঙ্গ। বারবণিতা-বৃত্তির উন্মুক্ত-বাজার-চরিত্র গঠনে এগুলিও অবদানমূলক উপাদান।

শিল্প ও কৃষি ও পরিষেবা ক্ষেত্রের চাইতে বর্তমানে 'আন-অরগানাইজড সেকটর' বা অসংগঠিত ক্ষেত্রের দারুণ দ্রুত ও ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। বেশ্যা-বৃত্তি প্রসারিত হওয়ার অন্যতম কারণও এটি। অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্যতম অংশ হয়ে উঠেছে যৌন-ব্যবসায় স্ব-নিযুক্তি; অন্যদিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নারীদের অংশগ্রহণ বা ব্যবসা, নিযুক্তি প্রভৃতির ফলে অল্প-বয়সী মেয়ে থেকে মধ্যবয়সী নারীদের মধ্যে মুক্ত-যৌনতা ও ক্ষেত্রবিশেষে বেশি লাভজনক বারবণিতা-বৃত্তি গ্রহণে প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে শেষোক্ত কারণগুলি বিশেষত উদ্ভূত হচ্ছিল। শহর, বিশেষত মেট্রোপলিস, শিল্পাঞ্চল, সমুদ্র-বন্দর, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (ই পি জেড) ইত্যাদি এলাকায় এই বৃত্তির কেন্দ্রীভূত উপস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখন অন্যত্রও তা প্রসারিত হচ্ছে। তাছাড়া বাণিজ্যিক যৌন-ক্ষেত্রের বাজারকে সর্বময় করার জন্য এটির আঙ্গিককেও পরিবর্তন করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। সেক্ষেত্রে সরকারি আইনের বাধা-নিষেধের জালকে এড়াতে এখন ব্যাপকভাবে ও নতুন রূপে গড়ে উঠেছে ব্যবসায়িক প্রণালী; বার, নাইটক্লাব, মাসাজ পার্লার, বিউটি পার্লার, জিম, কল-গার্লস, ইরোজ সেন্টার, মক্ ম্যারেজ ও ম্যারেজ ব্যুরো, একসকর্ট সার্ভিস, ট্যুরিস্ট গাইড, সেক্স বার ও রেস্টুরেন্ট, হোটেল অ্যাটেনডেন্ট, ট্রানশ্লেটার সার্ভিস, ওয়েসাইড রিসর্ট ও মোটেল, সেক্স-সুইমিং পুল, দক্ষিণ কোরিয়াতে 'কিসায়েং-গার্ল হোটেল', সেক্স ট্যুরিজম, চাইল্ড সেক্স ট্যুরিজম, মেল প্রস্টিটিউশন, পর্ণ গার্ল, সেক্স এনটারটেনমেন্ট ইত্যাদি নামের অজস্র ব্যবস্থা। এই সমস্ত প্রথায় জড়িত মানুষের সংখ্যার কোন সঠিক ও সুনির্দিষ্ট তথ্য না পাওয়া গেলেও পৃথিবীতে মোটামুটি ১ কোটির বেশি নারী ও শিশু-কন্যা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে এগুলিতে জড়িত বলে অনুমান করা হয়। এই ব্যবসায়ে বার্ষিক (১৯৯৬ সাল)টার্নওভার ছিল প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বে যৌন-বাণিজ্যে লাভের পরিমাণ বিপুল এবং দ্রুত অগ্রসরমান। সুতরাং বর্তমানে এর টার্নওভার কত বিশাল তা সহজেই অনুমেয়।

যৌন-বাজারে যৌন শ্রমিকদের প্রবেশ ব্যাপক হয়ে উঠছে সত্তরের দশকের পর থেকে। তৃতীয় দুনিয়ার এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশ কার্যত এক ধরনের বিনা-পুঁজি বা নিম্ন-পুঁজি বিনিয়োগে অন্যতম লাভজনক বাণিজ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে যৌন আমদানি ও রপ্তানির বাণিজ্যকে। অন্যদিকে উন্নত দুনিয়াতে একই সাথে পুঁজির অভ্যন্তরীণ পুনরুৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম উপাদান হয়ে উঠেছে যৌন-ব্যবসা। সত্তরের দশক থেকে পশ্চিম জার্মানিতে নারীদেহ ব্যবসার পাশাপাশি অনুরূপ মেয়েদের দিয়ে পর্ণগ্রাফিক (যৌনকর্মের উন্মুক্ততা-ভিত্তিক) পত্রিকা, ছবি, ফিল্ম, ভি ডি ও, ক্যাসেট, সেক্স-শপ প্রভৃতির ব্যবসা দেশের ভিতরে এবং রপ্তানি বাণিজ্যের বিশিষ্ট উপাদান হয়ে ওঠে। দুই জার্মানির মিলনের পর প্রাক্তন পূর্ব-জার্মানিতে বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার ছাঁটাই নারীরা, এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব-ইউরোপের প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভাল সংখ্যক নারীরা এবং ঐসব দেশের স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা দারুণ আর্থিক সংকটের কারণে জার্মানিতে এসে এই ব্যবসায়ে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে যুক্ত হচ্ছে। জার্মানি ও

ইটালিতে এই ব্যবসার মালিকরা প্রধানত অন্ধকার জগতের মাফিয়া ডন, যারা ভুয়া কোম্পানির নামে এগুলি চালায়। এদের অকাতরে ঋণ দিয়ে থাকে ইতালি ও জার্মানির ব্যাংকগুলি। ফরাসি দেশে এই ব্যবসা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে বেশ কয়েকটি সুবৃহৎ কোম্পানি, ট্রাস্ট বা হোল্ডিংস। হল্যান্ডসহ স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলিতে গণিকাবৃত্তি কার্যত আইনি বলে স্বীকৃত। এদের মধ্যে রোগ বিষয়ক ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নেই। স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলি, জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় প্রতিটি শহরে দৈনিক গড়ে ৪০ থেকে ৫০ হাজার ভোক্তা গণিকালয়ে যায়। ফরাসী সংবাদপত্র 'লা মঁদে'র রিপোর্টে জানা যায় যে আমেরিকাতে ১৯৭০ সালে পর্ণগ্রাফিক ইন্ডাস্ট্রির বাজেট ২.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১৯৮০ সালে ৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল, যদিও আমেরিকার ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৪৯টিতে (নেভাদা রাজ্য বাদে) গণিকাবৃত্তি আইনত নিষিদ্ধ। অন্যান্য উন্নত দেশগুলির পরিস্থিতি কম-বেশি একই রকম।

আন্তর্জাতিক যৌন ব্যবসার অপর একদিক হলো যৌন শ্রমিকা সংগ্রহ, তাঁদের দরদাম নির্ধারণ ও চুক্তিবদ্ধ করা এবং বিদেশে প্রেরণের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেওয়া প্রভৃতির জন্য বড় বড় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 'এজেন্সি' প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুযায়ী যৌন কর্মী সরবরাহ করে। তাছাড়া নিজেরা যৌন কর্মীদের মজুত রাখে প্রয়োজনমতো সরবরাহের জন্য। এইসব প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখার ব্যাপ্তিও অবিশ্বাস্য ধরনের বিরাট ও বিপুল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চোরাচালান ও ড্রাগের ব্যবসার সাথে স্বভাবতই এই ব্যবসা বহুক্ষেত্রে জড়িত। সংগৃহীত নারীদের কাছ থেকে এরা যেমন কমিশন নেয়, অন্যদিকে প্রেরিত দেশের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও বিশাল অংকের অর্থ নিয়ে থাকে। 'হিডেন ইকনমি'র এখন অন্যতম বড় উপাদান হলো 'আন্ডারওয়ার্ল্ড'। অতীতের প্রধান সূত্র গ্যাম্বলিং বা জুয়ার পরিবর্তে স্মাগলিং, ড্রাগ ট্রাফিকিং ও সেক্স ট্রেড এখন মূল বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে আধুনিক আন্ডারওয়ার্ল্ড ইকনমির।

কম পুঁজি বিনিয়োগ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মুনাফা ও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ট্যুরিজম বা ভ্রমণ, হোটেল-মোটেল-রিসর্ট-স্যানেটোরিয়াম-ক্লাব-বার-রেস্তোরাঁ, ট্যুরিস্ট গাইড, ইন্টারপ্রিটার প্রভৃতির ব্যবসা ও পরিষেবা। জল-আবহাওয়া-নৈসর্গিক পরিবেশ প্রভৃতির চেয়েও ট্যুরিজম ব্যবসাতে বিদেশী আকর্ষণের প্রধান বিষয় হলো 'হসপিটালিটি গার্লস' বা ভ্রমণ-পিপাসুদের তথাকথিত সেবাপরায়ণ রমণীর সঙ্গ। এই ব্যবসাতে তৃতীয় দুনিয়ায় অগ্রগণ্য হিসাবে, বিশেষত দ্বীপময় দেশগুলির মধ্যে, ফিলিপাইন্স, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, হাইতি, শ্রীলঙ্কা, মাল্টা, সাইপ্রাস, মালদ্বীপ প্রভৃতির নাম করা যায়। এই ব্যবসায় রয়েছে আরও বহু দেশ যার অন্তর্গত ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, মেক্সিকো, ব্রাজিল, চিলি, ইক্যুয়েডর, গুয়াতেমালা প্রভৃতি ছাড়াও প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে পোল্যান্ড, রোমানিয়া, স্লোভাক রিপাব্লিক ইত্যাদি। প্রকাশ্যে ঘোষিত নয় কিন্তু অনুন্নত আরও বহু দেশে এই ব্যবসা এখন বাড়বাড়ন্ত। দেশভিত্তিক আংশিক তথ্য যেটুকু পাওয়া যায় তা প্রধানত লাইসেন্স-প্রাপ্ত বা আইনী পথে বিদেশাগত নারীর সংখ্যা। আসল সংখ্যা তার চেয়ে বেশ কয়েক গুণ বেশি। জাপান, তাইওয়ান, ফিলিপাইন্স ও দক্ষিণ কোরিয়ার ট্রাভেল এজেন্সী, প্যাকেজ ট্যুর ও হোটেল ব্যবসায়ে মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন ও মালটিন্যাশনাল ব্যাংক ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ করছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী হসপিটালিটি ব্যবসার সাহায্যে সারা পৃথিবীতে মোট লাভের পরিমাণ ২-৫ বিলিয়ন ডলার (১৯৯২ সালের হিসাবে)। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক প্রচার-মাধ্যমে সরাসরি রমণীয় নারীর সর্বক্ষণের সান্নিধ্য দেবার বিজ্ঞাপন দিয়ে ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করে। ইন্টার-নেটে এই ধরনের বহু ওয়েব

সাইট রয়েছে। পছন্দমত নারীর সাথে ইনটার-নেটে 'চ্যাট'-এর ব্যবস্থা এবং এইভাবে অর্থ উপার্জনের প্রণালী গড়ে উঠেছে। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে যৌন-শ্রমিকাদের নগ্ন দেহ প্রদর্শনের বাণিজ্য ছাড়াও যৌন ব্যবসার অন্য বিজ্ঞাপনও এখন ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। শেষোক্ত দিকগুলি বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রণালীতে সম্পূর্ণ নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে। হোটেলে ছাড়াও ট্যুরিস্ট গাইড বা ইন্টারপ্রিটার হিসাবে রমণী সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ব্যবসায়ে যুক্ত মেয়েদের বলা হয় 'কিসায়েঙ্গ'। তার ভিত্তিতে কিসায়েঙ্গ ট্যুরিজম, কিসায়েঙ্গ পার্টি, কিসায়েঙ্গ রেস্তোরাঁ, কিসায়েঙ্গ হাউস প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। ফিলিপিনসের রাজধানী ম্যানিলাতে অনুরূপ কাজে যুক্ত নারীর সংখ্যা লক্ষাধিক। কার্যত দেহদানের এই বৃত্তিতে বিদেশ থেকে নারী সংগ্রহ করা ছাড়াও এই ধরনের শ্রমে যুক্ত আছে ফ্যাক্টরির শ্রমিকা, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, গৃহস্থ মহিলারা পর্যন্ত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সর্বক্ষণ বা আংশিক সময়ের জন্য, হোটেল ট্যুরিস্ট এজেন্সি প্রভৃতিকে সরবরাহ করে এইসব নারীদের। তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৩ বছরের কিশোরী থেকে শুরু করে ৫০ বছরের মহিলা পর্যন্ত এই বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। এই জাতীয় বৃত্তিতে দৈনন্দিন মজুরির হার অন্য যেকোন বৃত্তি থেকে যথেষ্ট উন্নত হওয়া সত্ত্বেও, নিয়োগকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কমিশন বাদ দেবার পর, মজুরির ২০-২৫ শতাংশের বেশি এই নারীদের ভাগ্যে জোটেনা। বৃত্তির অনিশ্চয়তা, কাজের অনিয়মিত চরিত্র, মজুরির স্বল্পতা, কোন ধরনের শ্রম-আইনের সুযোগের অভাব, সামাজিকভাবে হীন অবস্থা, কাজে নিযুক্ত হলে দিনের পর দিন বাড়ির বাইরে সর্বক্ষণের কাজ, দেহদান জনিত অস্বাস্থ্য, অন্যের দ্বারা সংক্রমিত রোগ ইত্যাদি হলো এই বৃত্তির সর্বক্ষণের পরিস্থিতি। এই ব্যবস্থা পরম্পরাগত রূপোপজীবিনী বৃত্তির আধুনিক ও সংগঠিত সংস্করণ মাত্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে স্বল্প-মজুরিতে শ্রমিক , বিশেষত নারী শ্রমিক সরবরাহের ম্যাকুইলাডোরা নামে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে। সেগুলির শ্রমিকদের 'ম্যাকুইলা উইমেন' বলে অভিহিত করা হয়। আধুনিক শিল্প ও শ্রম-ব্যবস্থায় সাব-কন্ট্রাক্টিং একসপোর্ট প্রসেসিং জোন, ম্যাকুইলাডোরা প্রভৃতিতে প্রধানত কর্মরত নারীরা। কার্যত ব্যারাকের বিচ্ছিন্ন জীবন ও দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর তাদের কাজ করতে হয়। অবদমিত যৌন-তৃষ্ণা নিবারণে ও অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনে মুক্ত যৌনতাকে ব্যাপকভাবে আশ্রয় করতে শুরু করেছে এইসব ক্ষেত্রের শ্রমিকারা। যৌন-বাজারে, স্থানীয় চরিত্রের হলেও, এই অংশ এখন নগণ্য নয়।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে দেহদানবৃত্তি পরিচালনার জন্য পরিকল্পিতভাবে বিপুল সংখ্যাতে নারী বিদেশে চালান দেওয়া এক ধরনের বাণিজ্য হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে দেশে দেশে এইসব ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে ব্যক্তি-মালিকানাধীন এক ধরনের বৃহৎ শিল্প হিসাবে। এইসব নারীরা নিযুক্ত হয় দৈনিক/মাসিক বেতনের ভিত্তিতে। যেকারণে এখন এরা 'সেক্স-ওয়ার্কার' বা যৌন-শ্রমিকা নামে পরিচিত হচ্ছে। অর্থাৎ যৌন-সঙ্গদানকে পরিণত করা হচ্ছে এক ধরনের শ্রমে এবং তার বিনিময়ে মজুরিপ্রাপ্তি। অন্যদিকে শ্রম-শক্তি শোষণ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির অন্যতম অংশ হয়ে উঠেছে নারীর যৌন-শক্তি শোষণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মজুরি-দাসত্বের অভ্যন্তরে এখন যুক্ত হয়েছে 'ফিমেল সেক্স স্লেভারি' বা নারীর যৌন দাসত্ব। গণিকাবৃত্তি এখন এক ধরনের মজুরি-দাসত্বে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এই ব্যবসা এক ইকনমিক সেকটরে পরিণত হচ্ছে যেন। কোন কোন শহর বা নির্ধারিত কেন্দ্রে ব্যক্তি মালিকানার অধীন কারখানার ছাউনির মত পর পর সাজানো ঘর বা অ্যাপার্টমেন্ট-এ এই ব্যবসা চলছে। এগুলিকে এখন এক প্রকারের সেক্স-কারখানা বলা চলে। তাছাড়া ব্যক্তি বা কর্পোরেট চরিত্রের মালিকানাধীন কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন হোটেল, বার, রেস্তোরাঁ, নাইট ক্লাব, থেকে শুরু করে পূর্বোক্ত ধরনের অজস্র ব্যবসায়ে

বা সাধারণ ব্যবসার অংশ হিসাবে চাহিদা মত নারী সরবরাহ করা হচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে বা আন্তর্জাতিকভাবে এই সরবরাহের ব্যবসা চলে। এইভাবে এই বৃত্তি শিল্পে পরিণত হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে মালিক বা শ্রমিকের ভাগাভাগির মত এই ক্ষেত্রেও বুনিয়াদি ভাগাভাগি তথা দুই পরস্পর বিরোধী শ্রেণী সৃষ্টি হচ্ছে— পণ্য-রূপী যৌনতা উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা বনাম যৌন-শ্রম। পণ্য-রূপী যৌনতাকে উৎপাদন করার ক্ষেত্রে যৌন শ্রমশক্তি দানকারী হলো যৌন-শ্রমিকারা। সারা বিশ্বে লাইসেন্সপ্রাপ্ত যৌনকর্মীর সংখ্যা ১/২ কোটিরও অধিক। কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে আধুনিক ব্যবসায়িক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুরবস্থাপূর্ণ ও ঝুঁকিসম্পন্ন এই বৃত্তি, যার দ্বিতীয় কোন নজির নেই। যৌন-গ্রাহকের শোষণের চেয়ে নারীকে যৌন-বৃত্তিতে নিয়োগকারী মালিকের শোষণ এখন সর্বাপেক্ষা নির্মম। এই নারীদের উপর কোন ধরনের চরম অন্যায় ঘটলেও তার সামান্য প্রতিকারের সুযোগ পর্যন্ত নেই।

যৌন-সেকটরটি এখন চরিত্রের দিক থেকে দেশীয় নয়; বহু দেশের মধ্যে আন্তর্সম্পর্কযুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে পড়েছে। নারীদের যৌন-বৃত্তির জন্য স্বেচ্ছায় দেশান্তরী হওয়া ছাড়াও নারী ও শিশুকে যৌন-ব্যবসায়ে ব্যবহারে বিদেশে পাচারের মধ্য দিয়ে এই আন্তর্জাতিকতা গড়ে উঠছে। যেসব দেশ থেকে ব্যাপক সংখ্যায় যৌন শ্রমিকা বিদেশে প্রেরণ করে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেগুলির অন্যতম হলো নেপাল, মেক্সিকো, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, উপসাগরীয় দেশগুলি, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, চিলি, ঘানা, পানামা, ডোমিনিকান রিপাব্লিক প্রভৃতি দেশ এবং অংশত ভারত। তৃতীয় দুনিয়ার এই ধরনের কতকগুলি দেশ যৌন-কর্মীদের উভয়ত আমদানি ও রপ্তানি করে থাকে। এইভাবে দুই দিক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা করছে এরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৯৬ সালে ফিলিপিনস তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বোচ্চ লাভ করেছিল এই ক্ষেত্রে। অপ্রাপ্ত বয়স্কা আদিবাসী নারী, পার্শ্ববর্তী দেশগুলি থেকে, বিশেষত মায়নমার, চীন, লাওস ও কাম্পুচিয়া থেকে আনা হয় থাইল্যান্ডে, অন্যদিকে থাইল্যান্ড থেকে নারীদের বিপুল সংখ্যায় পাঠানো হচ্ছে জাপান ও পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। এইসব দেশে সরকারি বা আধা-সরকারি এক ধরনের এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে দেহোপজীবিনীদের নাম রেজিস্ট্রিভুক্ত করার এবং তাদের এবিষয়ে আইডেন্টিটি কার্ড ও সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যেমন দক্ষিণ কোরিয়াতে 'সাউথ কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন' (কে আই টি এ বা কিটা) 'সার্টিফিকেট অব এমপ্লয়মেন্ট ইন দ্য এন্টারটেইনমেন্ট সার্ভিস' দপ্তর সরকারিভাবে এগুলি বণ্টন করে। তাছাড় যৌন ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য 'কনসালটেন্সি সার্ভিস' বা 'প্রমোশনাল সার্ভিস'ও চালু হয়েছে কোন কোন দেশে। ১৯৯৩-৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী ১,৪০,০০০ জন থেকে ২,৩০,০০০ জন রূপোপজীবিনী রয়েছে ইন্দোনেশিয়াতে, ৪৩,০০০ - ১,৪২,০০০ জন মালয়েশিয়ায় ১,০০,০০০ থেকে ৬,০০,০০০ (খুব সম্ভবত ৪,০০,০০০ থেকে ৫,০০,০০০) জন রয়েছে ফিলিপাইনে, ১,৫০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ (সম্ভবত ২,০০,০০০ থেকে ৩,০০,০০০) থাইল্যান্ডে। ১৯৯৫ সালে 'কোয়ালিশন এগেনস্ট ট্রাফিকিং অব ইউমেন' (ক্যাটো) প্রদত্ত হিসাব অনুসারে অস্ট্রেলিয়াতে যৌনকর্মীরা বছরে ঐ সময় ৩০ মিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছিল বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে ১৯৯৩-৯৪ সাল পূর্ববর্তী ১০ বছরে নারী পাচার হয়েছিল প্রায় ২,০০,০০০; ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতের ছটি শহরে নারীপাচার করা হয়েছিল ২০,০০০ জন। নেপাল থেকে ভারতে সর্বাধিক সংখ্যক নারী প্রেরিত হয়। ভারতকে ব্যবহার করা হয় ট্রানজিট কেন্দ্র হিসাবে। এখান থেকে বিভিন্ন দেশে মেয়েদের পাঠানো হয়। পূর্ব-ইউরোপের প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে হংকং ও ম্যাকাউতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীকে বারবণিতা বৃত্তির জন্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। ভারতে ১০০০-এর বেশি বৃহৎ

আকারের বেশ্যা-পল্লী (রেড লাইট এরিয়া) রয়েছে; দেশে অনুমিত বারবণিতার সংখ্যা ২৩ লক্ষ, যার ১/৪ অংশ অপ্রাপ্ত বয়স্কা। জাপানের গ্রস ন্যাশানাল প্রোডাকট (জি এন পি)-এ সেক্স-ইনডাসট্রির অবদান ১ শতাংশ। অজাপানী বারবণিতার সংখ্যা জাপানে ১,৫০,০০০ জন। এশিয়ার সেক্স-ট্যুরিস্টদের মধ্যে জাপানীদের সংখ্যা সর্বোচ্চ।

মায়নামারে ২০,০০০ - ৩০,০০০ বারবণিতা থাকলেও এ থেকে ঢের বেশি নারীকে তারা গণিকা বৃত্তির জন্য পাঠায় অন্য দেশে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার আমেরিকান সামরিক ছাউনিগুলির আশেপাশে রেজিস্টার্ড বারবণিতার সংখ্যাই হলো ১৮,.০০০ (১৯৯৮)। এশীয় দেশগুলির বাইরে বারবণিতা বৃত্তিতে নিযুক্তির সংখ্যার বহু তথ্য রয়েছে নিম্নোক্ত দেশগুলির প্রসঙ্গে : আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, কলোম্বিয়া, ইক্যুয়াডোর, ঈজিপ্ট, এল. সালভাডোর, ফ্রান্স, জার্মানি, ঘানা, গ্রীস, আয়ারল্যান্ড, লেবানন, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পকিস্তান, পানামা, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেট বা সি আই এস (রাশিয়া), রাওন্ডা, সেনেগাল, সোমালি, স্পেন, শ্রীলংকা, টিউনিসিয়া, ইউ. কে, ইউ.এস.এ প্রভৃতি । উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে স্বদেশী বারবণিতা ছাড়াও, বিদেশ থেকে ব্যাপক সংখ্যায় সেক্স-ওয়ার্কারদের আনা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ থেকে এবং ইউরোপের জার্মানি ও স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলিতে আনীত এশীয় মেয়েদের ব্যবহারের সংখ্যা বিপুল। ফ্রান্সে বহু সংখ্যক দেশ থেকে নারী সংগ্রহের প্রবণতা বেশি। যেমন ঘানা, ক্যামেরুন, কোটে ডি লভোয়রী, সেনেগাল, নাইজেরিয়া, মালি, লাইবেরিয়া, টোগো, জায়রে, বারকিনা ফাসো, কংগো, গিনী, বেনিন, লিবিয়া, গ্যাবন, সুদান, চাদ প্রভৃতি দেশের বারবণিতারা রয়েছে ফ্রান্সে। তাছাড়া রয়েছে মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের নারীরাও। সরকারের পক্ষ থেকে সর্বক্ষণ তৎপরতা সত্ত্বেও কিউবাতে স্বদেশীয় কৃষ্ণাঙ্গ, মুলাটো (মিশ্র বর্ণ) ও শ্বেত নারীদের বারবণিতা বৃত্তি পুরোপুরি বিলোপ হয়নি।

উন্নত দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যে জার্মানি, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি এবং অনুন্নত দেশগুলি যেমন ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, শ্রীলঙ্কা, ব্রাজিল, পেরু, আর্জেন্টিনা প্রভৃতিতে স্বদেশীয় ছাড়াও বিদেশাগত যৌন-কর্মীদের দিয়ে ব্যাপক ব্যবসা চালানো হচ্ছে। উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে বিদেশী যৌন-শ্রমিকদের ব্যবহারের প্রধান কারণ হলো অভ্যন্তরীণ ক্রেতা-চাহিদা মেটানো শুধু নয়, ক্রেতার বিভিন্ন রুচি পূরণের ব্যবস্থা করে যৌন ব্যবসাকে সর্বক্ষণের জন্য আকর্ষণীয় করে বজায় রাখা। অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য অনুন্নত দেশগুলিতে সাধারণভাবে উন্নত দেশ থেকে যৌন-কর্মী আমদানি করা হয় না। কিন্তু তৃতীয় দুনিয়ার যেসব দেশে যৌন-কর্মী আমদানি করা হয় তার কারণ হলো স্বল্প-মূল্যের বিদেশী যৌন-কর্মীদের দিয়ে দেশীয় যৌন বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি করা। এর মধ্য দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে দেশীয় যৌন-কর্মীদের কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করা। তাছাড়া বিদেশী যৌন কর্মীদের ব্যবহার করে, বিদেশী ভ্রমণকারীদের দেশে আকৃষ্ট করে, কম ব্যয়ে বেশি উপার্জনের উদ্দেশ্যও থাকে। সরাসরি যৌন ব্যবসার জন্য না হলেও, গৃহের পরিচারিকা বা অন্য গৃহস্থালী কাজের জন্য তৃতীয় দুনিয়া থেকে নারী এনে ব্যাপক যৌন শোষণের ঘটনা ঘটছে তৈল-সমৃদ্ধ মধ্য-প্রাচ্যের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে। কয়েক লক্ষ বিদেশী নারী কার্যত ব্যক্তিগত যৌন শ্রমিকা হিসাবে কাজ করে এইসব দেশে।

এসব হলো বারবিলাসিনী বৃত্তির বিশ্বায়নের কিছু দিক। কিন্তু সেক্স-ওয়ার্কারদের ভূমিকার

অপর গুরুত্বপূর্ণ দিকও রয়েছে। যদিও এই বৃত্তি সম্পর্কে প্রচলিত আলোচনাতে আক্রান্তদের ব্যক্তিজীবনের সমস্যা, শিক্ষা, চিকিৎসা, পুনর্বাসন, এদের বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, সরকারগুলির দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক-মানবতাবাদী সংগঠনগুলির ভূমিকা, সংশ্লিষ্ট দেশে এদের প্রতি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও আকর্ষণ ইত্যাদি এযাবৎকাল প্রধান গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। কিন্তু এখন আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয়েছে। প্রথমটি হলো বারবণিতা সমাজের নিজেদের শ্রমজীবী শ্রেণী হিসাবে আত্মপরিচিতির জন্য অনুসন্ধান (সার্চ ফর সেলফ আইডেনটিটি) ও অভিযান এবং সেই লক্ষ্যে নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং সংগ্রাম; দ্বিতীয়টি হলো নারী-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে এবং বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্তর্জাতিক গণসংগ্রামগুলিতে গণিকাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অংশগ্রহণ।

গত শতাব্দী থেকে উন্নত দেশগুলিতে বারাঙ্গনা বৃত্তির অবলুপ্তির দাবিতে নানা ধরনের বুর্জোয়া-উদারনীতিবাদী সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক নন-গভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনগুলির মধ্যে স্যালভেশন আর্মি'র ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় দুনিয়ায় জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে বারবণিতারা যেমন অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের সামাজিক, আর্থিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা নিয়ে মানবতাবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের প্রয়াসের ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষণের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে এই অংশের নারীদের উপরও। পুঁজিবাদী নতুন উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় শ্রমের রূপান্তর, বিস্তার ও বিভাজনের প্রভাব পড়েছে গণিকাবৃত্তির চরিত্রে ও রূপে। পূর্বে সেগুলির কিছু চিহ্ন উল্লেখ করা হয়েছে। তাই লক্ষ্য করা যায় যে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, শোষিত জনগণের অন্যতম অংশ হিসাবে, শোষণ-বিরোধী নানা আন্দোলনে প্রায় প্রথম থেকে গণিকাসমাজের ইতঃবিক্ষিপ্ত, এমনকি কখনও বা সবল উপস্থিতি ঘটেছে। প্রথমাবধি কারখানার শ্রমিকদের জন্য যেমন স্বতন্ত্র বসবাসের ব্যবস্থা ছিল, গণিকাদের জন্যও ছিল অনুরূপ ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তীব্র শোষণে ও পরিবেশে শ্রমিক-বস্তি এলাকায় ও শ্রমিকদের পরিবারের মধ্যে গণিকাবৃত্তি প্রসারিত হওয়ার উপাদানটি গ্রাহ্যের মধ্যে নিয়ে এলে, শ্রমিক আন্দোলনে এঁদের ভূমিকা গ্রহণের অন্যতম স্বাভাবিক কারণ অনুধাবন করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে, বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী, পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণীর বিবাহ, পরিবার, বাসস্থান ও সমাজের পরিবর্তন ও বাস্তবতা থেকে বোঝা যায় বারাঙ্গনাবৃত্তির প্রসার ও চরিত্রের পরিবর্তনগুলি। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-বিপ্লবী বিভিন্ন আন্দোলনে রূপোপজীবিনীদের ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। অষ্টাদশ শতকে শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের শ্রমিকদের প্রথমদিকের সংগ্রামগুলিতে — বিশেষত হাঙ্গার রায়ট, মেশিন ব্রেকিং প্রভৃতি আন্দোলনগুলিতে — দেহোপজীবিনীরা প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতেন। ১৭৮৯ সাল থেকে ফরাসী বিপ্লবের সমগ্র কালপর্ব জুড়ে, ১৮৩০ -এর দশকে প্যারিস ও লিঁয় শহরে ব্যারিকেড লড়াইগুলিতে, ১৮৪৯-৫০-এর 'কনটিনেন্টাল রেভোলিউশনে', ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনে, ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবে, '৩০ ও '৪০-এর দশকের চীনের বিপ্লবে এঁদের অসামান্য বিপ্লবী ভূমিকা ছিল। ভারতের ক্ষেত্রেও জনৈকা গণিকার সন্তানকে হিন্দু স্কুলে ভর্তি করতে অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে কলকাতায় ১৮৪৮ সালে ১২০০ বারাঙ্গনার মিছিলের ঘটনা দেশের শ্রমজীবীদের আন্দোলনের ইতিহাসের প্রথম প্রতিবাদ মিছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী মহাবিদ্রোহে কানপুরসহ বেশ কয়েকটি শহরে ছাউনির সেনানীদের 'বিদ্রোহে' যোগ দিতে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করেছিলেন বারবণিতারাই। বিদ্রোহের শেষ-পর্বে ব্রিটিশ

সেনাবাহিনীদের হাতে অবরুদ্ধ দিল্লী শহর রক্ষায় হাতাহাতি লড়াইতে অকাতরে প্রাণ দিয়েছিলেন কয়েকশত বারাঙ্গনা। সাম্রাজ্যবাদ-পদানত দেশগুলির স্বাধীনতা বিপ্লবে এঁদের অনুরূপ ভূমিকার অজস্র ও উল্লেখযোগ্য নজির রয়েছে, বিশেষত আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামে। ভারতেও জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী, সশস্ত্র বিপ্লবী ধারার সংগঠক, কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট প্রমুখ অংশের মানুষদের পুলিশী অনুসরণ বা হামলা থেকে রক্ষা ও নিরাপদ আশ্রয় দান, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাসহ আত্মগোপন করে থাকার সময় রক্ষণাবেক্ষণ, বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজ প্রভৃতি অজস্র ধরনের ভূমিকা নিয়েছেন এই নারীরা। এই মনোভাব ও ভূমিকা কোন খণ্ড উদাহরণ নয়, অব্যাহত প্রবাহ।

এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে 'লীগ অব নেশনস' ও পরবর্তীকালে 'ইউনাইটেড নেশনস', আই. এল. ও, হু, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা এদের বিষয়ে এবং এই ব্যবস্থা বিলোপের জন্য নানা ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 'ইউনাইটেড নেশনস এগ্রিমেন্টস্, কনভেনশনস্ অ্যান্ড রেজোলিউশনস্'-এর ১০টি ধারা অধিকাংশ দেশ স্বীকার করে নিয়ে নিজ নিজ দেশে বারবণিতা বৃত্তি নিরোধমূলক বহু আইন রচনা ও গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা তৎপর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হলো 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাবলিশনিস্ট ফেডারেশন' (আই. এ. এফ.), যারা নিয়মিতভাবে দেশে দেশে ও সারা বিশ্বে গণিকাবৃত্তির অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহণ ও ব্যাবস্থটির বিলোপ এবং সংশ্লিষ্ট মেয়েদের পুনর্বাসনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এইসব তৎপরতার ফলে কোন কোন বিশেষ ধরনের দেহোপজীবিনী ব্যবস্থা (যেমন ভারতে দেবদাসী প্রথা) বন্ধ হয়েছে বটে, তথাপি এই প্রথা লুপ্ত হওয়া দূরের কথা, (সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বাদে) বরং বেড়ে চলেছে।

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশে দেহোপজীবিনীদের বিশিষ্ট সর্বজনীন সমস্যার বিষয়ে অজস্র এন. জি. ও. গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক এবং সমাজতাত্ত্বিকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ এদের জন্য কাজ করছেন। শেষোক্তরা বারবণিতা-কেন্দ্রিক এন. জি. ও-গুলির সংগঠন, দাবি-দাওয়া, প্রচার প্রভৃতির বিষয়ে পরামর্শদাতার ভূমিকাও নিচ্ছেন। শতাধিক আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে যেগুলি দেশে দেশে এই ধরনের সংগঠনগুলির সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা করা ছাড়াও বারবণিতাদের জন্য সামাজিক প্রকল্প যেমন পুনর্বাসন, হস্তশিল্পের ট্রেনিং, দেহোপজীবিনী নারী ও তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, কনডোম সরবরাহ, এইডস সচেতনা সৃষ্টি ইত্যাদির জন্য অর্থ সাহায্য করে। রাষ্ট্রসংঘের পরামর্শদাতা সংগঠনের স্বীকৃতি আছে গণিকা-সমস্যা-কেন্দ্রিক এমন ধরনের সংগঠনগুলি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মঞ্চেও ভূমিকা নিচ্ছে।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশে, খণ্ড খণ্ড ছাড়াও, গণিকাদের জাতীয় সংগঠন গড়ে উঠেছে। নিয়মিত ব্যবধানে এগুলির সম্মেলন, সভা, মিছিল, আন্দোলন ইত্যাদি হয়। বহু দেশে জাতীয় বা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে এরা অংশ নিচ্ছে। নিকটবর্তী দেশগুলি নিয়ে এদের বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক কো-অর্ডিনেশনও গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বিগত ১০ বছরের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এদের ৪টি বিশ্ব-সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলিতে ৭০ থেকে ১১০টি পর্যন্ত দেশ অংশ নিয়েছে। এই পটভূমিকায় গণিকাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে বর্তমানে যেসব দাবি উত্থাপিত হচ্ছে, তা' মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

১. বেশ্যালয়ে, রাস্তায় ও বাড়িতে গণিকাদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে ; তাদের ওপর আক্রমণ বন্ধ ও হামলাকারীদের প্রতিহত করার আইনি ও কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. বারাঙ্গনা ও বেশ্যালয়গুলিকে, অন্যান্য ব্যবসার মতো, সরকারী লাইসেন্স দিতে হবে; এজন্য রাষ্ট্রীয় বা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু অন্যান্য বাণিজ্যের

মতো এই প্রথাকে ব্যবসা হিসাবে স্বীকৃতি এবং অনুমোদিত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

৩. সরকারিভাবে এবং ভরতুকিমূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যে রোগের চিকিৎসা, বিনামূল্যে কনডোম সরবরাহ, সন্তান-সন্ততিদের জন্য শিক্ষা, ব্যবসা ছেড়ে যাঁরা চলে যেতে চান তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসন এবং স্বাভাবিক সমাজ জীবনের প্রবাহে যুক্ত হতে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. বিদেশে নারী ও শিশু যৌন-কর্মীদের রপ্তানির কাজে দালালদের ভূমিকা বন্ধ, বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির সময় সরকারি কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি ও গ্যারান্টি, বিনা হয়রানিতে পাসপোর্ট ও ভিসা পাওয়ার ব্যবস্থা, বিদেশে বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকার সময় মজুরি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এবং নির্বিঘ্নে ও ইচ্ছামতো দেশে প্রত্যাবর্তনে স্বদেশীয় রাষ্ট্রদূত অফিসের সর্বক্ষণের ও উপযুক্ত নজরদারী ও সহায়তা দান।

৫. বারাঙ্গনাবৃত্তির সমস্যাকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের এবং অনুরূপ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাজের স্থায়ী বিবেচনার বিষয় হিসাবে গ্রহণ; গণিকা ও গণিকাবৃত্তির বিষয়ে নিয়মিত রিপোর্ট প্রকাশ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে, বিশেষত রাষ্ট্রসংঘ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, হু, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ প্রভৃতির এদের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন প্রভৃতি।

এদের র‍্যাডিক্যাল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ যৌন কর্মীদের দেশীয় সমস্ত ধরনের শ্রম-আইনের অন্তর্গত করা; উপযুক্ত মজুরি; দৈনিক কাজের নির্দিষ্ট সময় ও সপ্তাহে ছুটির দিনের ব্যবস্থা; উন্নত কর্ম-পরিবেশ; মালিকের সাথে বিরোধে সরকারের হস্তক্ষেপ এবং মালিক ও যৌন-শ্রমিকার মধ্যে বিরোধ লেবার কোর্টের আওতাভুক্ত করা; সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিনামূল্যে বীমা, পেনশন বা এককালীন থোক অর্থ দান; যৌন-শ্রমিকদের সংগঠনের স্বীকৃতি প্রদান; মিউনিসিপ্যাল বা প্রাদেশিক নির্বাচনে এঁদের জন্য আসন সংরক্ষণ; গণিকাবৃত্তির বিষয়ে জাতীয় সমস্ত আইনের পুনর্মূল্যায়ন ও নতুন করে রচনা প্রভৃতি।

উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত দেশে গণিকাদের সংগঠনগুলি এখন প্রকাশ্যে মিছিল-সমাবেশ, বিশেষ বিশেষ ঘটনায় বা মুহূর্তে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, থানা ঘেরাও, পথ অবরোধ টর্চলাইট মার্চ প্রভৃতি নানা ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচী পালন করে। কোথাও কোথাও এদের ভূমিকা অধিক আন্দোলনধর্মী তথা জঙ্গী হয়ে উঠছে।

গণিকা-প্রথার অবসানের জন্য সামাজিক সংস্কার এবং গণিকাদের সংগঠিত করে তাঁদের নিজস্ব দাবি উত্থাপনের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৮৬০-এর দশকে ইংলন্ডের লিভারপুলের শ্রীমতী জোসেফাইন বাটলারের দ্বারা। বর্তমানকালে সংস্কার আন্দোলনের ধারা প্রধানত বহন করছে এন. জি. ও'গুলি। কিন্তু নিজেদের বৃত্তিগত সমস্যার সমাধানের ভার তুলে নিয়েছেন বারাঙ্গনারাই, নিজেদের আন্দোলনের ও সংগঠনের মাধ্যমে। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর দেশে দেশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে গণিকাদের যে সংগঠনগুলি সেগুলির কয়েকটি হলো ঃ আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোর 'কল অফ ইওরটাইরেড এথিকস বা 'কয়টে'। এদের চাঁদা সংগ্রহের পদ্ধতির নাম 'হুকার্স বলস' ও মুখপত্রের নাম 'কয়টে হাউলস'। তাছাড়া রয়েছে নিউইয়র্কের 'পনি', ম্যাসাচ্যুসেটস-এর 'পুসা', কানসাতে 'কিট্টি' ফ্লোরিডাতে 'কয়টি', লস এঞ্জেলসে 'কাট', নিউ আর্লিয়েন্সে 'প্যাশন', ক্যালিফোর্নিয়াতে 'কয়োটি', মিনিয়াপোলিসে 'হুইস্পার' ও 'প্রাইড' প্রভৃতি। বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে তাদের জাতীয় সংগঠনটি হলো ইউ.এস.পি.আর.ও.এস বা 'আসপ্রোস'। ব্রিটেনে অনুরূপ সংগঠন হলো 'পি.এল.এ.এন', 'পি.আর.ও.এস', 'ই.সি.পি' ইত্যাদি। ইতালিতে 'সি.সি.আর.পি', 'লুসিওলা ইত্যাদি, স্পেনে 'ক্যারিটাস এসপানোল', নেদারল্যান্ডস-এ 'রেড থ্রেড' ও 'পিঙ্কথ্রেড'

কানাডাতে 'পাওয়ার' ও 'কয়োটি', সুইজারল্যান্ডে 'এস.এস.পি.এ.এস.আই.ই', 'এস.ও.এস.ফেন্মিস', জার্মানিতে রয়েছে ৩৭টির মতো বড় সংগঠন। ফিলিপিনসে ৭১টি সংগঠনের মধ্যে প্রধান দু'টি হলো 'স্টপ' এবং 'টি.ডব্লু.এম.এ.ই.ডব্লু'। লাতিন আমেরিকার সহস্রাধিক সংগঠনের মধ্যে বৃহত্তম হলো ব্রাজিলের 'বারুয়েল ডি লাগেনসেট'। থাইল্যান্ডে রয়েছে ৪৪টি সংগঠন প্রভৃতি। তাছাড়া ফ্রান্স, নরওয়ে, মেক্সিকো, চিলি, পানামা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এবং ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে, পর্তুগাল এবং সাম্প্রতিককালে পোলান্ড, চেক রিপাব্লিক ও রোমানিয়াতে বেশ কিছু সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছে।

পশ্চিমী কমিউনিস্ট, সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক, অ্যানার্কিস্ট ও ট্রটস্কাইট পার্টিগুলি এবং ব্রিটেনে লেবার পার্টি এবং বামপন্থী বা লিবারাল নির্বিশেষে ট্রেড ইউনিয়নগুলি বারবণিতাদের সংগঠিত করা, তাঁদের দাবি উত্থাপন এবং ট্রেড ইউনিয়ন বা সামাজিক আন্দোলনে সাধ্যমত তাদের যুক্ত করার কাজ, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে শুরু করেছিল। আসলে এ বিষয়ে স্বীয় উদ্যোগের চেয়ে, পরিস্থিতির বাধ্যতাই ছিল এই প্রচেষ্টা গ্রহণের পিছনে প্রধান কারণ। মহাযুদ্ধে অধিকৃত এলাকাগুলিতে বিদেশী সৈন্যদের এবং রণাঙ্গনের কাছাকাছি এলাকাগুলিতে স্বদেশীয় সৈন্যবাহিনীর ধর্ষণের ঘটনা ও তার ফলে বিপুল সংখ্যায় অবৈধ মাতৃত্ব এবং যুদ্ধ শেষে ব্যাপক দুর্দশা দেখা দিয়েছিল, সে কারণে পতিতাবৃত্তির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। এই বাস্তবতা সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে বারাঙ্গনাদের সমস্যা তুলে ধরতে বাধ্য করেছিল। আরও বিশেষত এই কারণে যে প্রধানত মেহনতি অংশগুলি এই পরিস্থিতিতে সর্বাধিক আক্রান্ত হয়েছিল। বর্তমানেও বামপন্থীদের মধ্যে এঁদের বিষয়ে যে নূতন ভাবনার উদয় দেখা যাচ্ছে তাও অনেকটা পরিস্থিতির চাপেই। সেক্ষেত্রেও অন্যতম মানসিক প্রতিবন্ধকতা হলো যে উন্নত-অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে, অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গটিকে নিছক যৌন-বিষয়ক ও সামাজিক সমস্যা বলে মনে করে; এটিকে শ্রেণী-সমস্যা তথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল সমস্যার অন্যতম অংশ হিসাবে বিবেচনা ও তদনুযায়ী তেমন ভূমিকা গ্রহণ এখনও শুরু করেনি তারা।

পূর্বোক্ত দাবিগুলি প্রতিষ্ঠায় বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের অংশীদার হওয়ার জন্য স্ব স্ব দেশে গণিকাদের কার্যকরী আন্দোলন, ৭০-এর দশকের প্রথমার্ধ থেকেই গড়ে উঠেছিল। আন্তর্জাতিক নারী বিষয়ক সমস্ত ইস্যুকে তারা নিজেদের ইস্যু হিসাবে বিবেচনা করা শুরু করে এই সময় থেকেই। নারীদের সর্বজনীন প্রসঙ্গগুলির মধ্যে নিজেদের সমস্যাকে যুক্ত করার উদ্যোগও নেয়। শেষোক্ত প্রচেষ্টার মাধ্যম হিসাবে বিশ্বায়নমূলক ভাবে গণিকা সমস্যার প্রচার এবং বিশ্বব্যাপী আন্দোলনগুলির সক্রিয় সদস্য হওয়ার উদ্যোগ নেয় তারা।

১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক স্তরে নারীদের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তাগুলি কিছুটা নতুন বাঁকের মুখে এসে দাঁড়ায়। তখন নতুন পটভূমিকাও সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রেটন-উডস ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট বিশ্ব-পুঁজিবাদের তথাকথিত স্বর্ণযুগ এই সময়ে ভেঙে পড়ছে — সৃষ্ট হচ্ছে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে গভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট। সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য নানাবিধ ও ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে বিশ্ব-পুঁজিবাদ। কার্যত তারই অংশ হিসাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বব্যাপী নারীদের নিজস্ব উদ্যোগের আহ্বান জানায়। 'এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন' তথা নারীদের ক্ষমতাধর করার এক তত্ত্ব হাজির হয়। নারীদের আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক স্তরে নারীদের

বৃহত্তম অংশগ্রহণের সুযোগ দেবার প্রস্তাব করা হয়। রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৭৫ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মেক্সিকো শহরে। ১৯৭৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় ১৯৭৫ সাল থেকে ১০ বছরের জন্য 'বিশ্ব-নারী-দশক' পালনের। ঐ সম্মেলন নারীদের সমানাধিকার এবং উন্নয়ন ও শান্তির ক্ষেত্রে তাদের অবদান প্রসঙ্গে 'ঘোষণাপত্র' (ডিক্লারেশন) গ্রহণ করে। গৃহীত হয় এক দশকব্যাপী (১৯৭৬—১৯৮৫) নারীদের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে 'ওয়ার্ল্ড প্ল্যান অব অ্যাকশন'। রাষ্ট্রসংঘ ও আই.এল.ও.'র গৃহীত সিদ্ধান্তমত এই 'প্ল্যান অব অ্যাকশন' বহুবিধ কর্মসূচীও গ্রহণ করে। বিশ্বের রাষ্ট্র ও সমাজগুলির উদ্দেশ্যে নারী প্রসঙ্গে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায় এই ঘোষণা। ঘোষণাপত্রে বলা হয়, পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে সমান অংশীদার করা এবং উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির সুফল যাতে পুরুষদের মতো সমানভাবে সমস্ত নারী ভোগ করতে পারে তার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক, আইনগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত জরুরি; সমতা (ইক্যুয়ালিটি) বিষয়ক আইনের অন্তর্গত করতে হবে তেমন সমস্ত দিক যা নিশ্চিত করবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নারীদের সমান সুযোগ প্রাপ্তি এবং একই সাথে চাকুরীর সমান শর্তাবলী — যার অন্তর্গত হবে সমান মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তাও।

১৯৭৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্স গ্রহণ করে 'ডিক্লারেশন অন ইক্যুয়ালিটি অব অপরচ্যুনিটি অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট ফর উইমেন ওয়ার্কার্স'। এর সাথে পূর্বোক্ত 'ওয়ার্ল্ড প্ল্যান অব অ্যাকশন'-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারী করে গৃহীত হয় আরও দুটি প্রস্তাব। একটি প্রস্তাব হলো বৃত্তি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ প্রসঙ্গে, অপর প্রস্তাবটি হলো প্ল্যান অব অ্যাকশন কার্যকরী করার বিষয়ে। এই প্রস্তাব দুটিতে কর্মসূচী কিভাবে রূপায়িত হবে সেসব বিষয়ের বিভিন্ন দিকের সংজ্ঞা নিরূপণ ও রূপায়ণের কার্যকরী দিকগুলি বলা হয়।

মেক্সিকো সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৫০টির বেশি বারবণিতাদের নিজস্ব সংগঠন এবং রূপোপজীবিনীদের নিয়ে কাজ করছে এমন প্রায় আরও ৪০টি এন.জি.ও. উপস্থিত হয়ে নিজেদের দাবি ও বক্তব্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে কার্যকরীভাবে প্রথম পেশ করা শুরু করে।

আই.এল.ও.'র মধ্যবর্তীকালীন (১৯৭৬-৮১) পরিকল্পনায় (মিড-টার্ম প্ল্যান) অগ্রাধিকার স্থির করা হয় এবং বৈষম্য দূর করার বিষয়ে প্রাথমিক কাজগুলি নির্দেশ করে দেওয়া হয়। মেক্সিকো সম্মেলনের পরবর্তী পাঁচ বছরে 'ইউনাইটেড নেশনস ডিকেড ফর উইমেন'-এর অন্তর্গত ওয়ার্ল্ড প্ল্যান অব অ্যাকশনের অগ্রগতি নিরূপণ ও পরবর্তী স্তরের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে — কোপেনহাগেন শহরে। এই সম্মেলন থেকে নারীদের কাজে নিয়োগ, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের 'প্ল্যান অব অ্যাকশন' গৃহীত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত থেকে এটা বোঝা যায়, অতীতের তুলনায় জাতীয় স্তরের পরিকল্পনা নারীদের বিষয়ে কিছুটা সংবেদনশীল ও অনেকটা সক্রিয় হলেও, নারীদের উন্নয়নের প্রশ্নে অগ্রসর হওয়া আরও অনেক দূর বাকি রয়েছে। এই সম্মেলন ঘোষণা করে পরিবারের সংরক্ষণ ও সন্তান-সন্ততিদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান দায়িত্বের কথা। এ কাজে নারীদের একমাত্র দায়িত্ববদ্ধ করার চিরন্তন ব্যবস্থা ও অভ্যাসের পরিবর্তনও দাবি করা হয়। কর্মসূচীতে সরকারগুলির উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অংশীদার করতে হবে নারীদের। নারীদের নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি পূর্বাবস্থা সৃষ্টি ও প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয় এই প্ল্যান অব অ্যাকশন।

এখানেও অধিক সংখ্যায় গণিকা ও তাদের সংগঠনগুলি উপস্থিত হয়েছিল। নারীদের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তগুলি গণিকাদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য — এই দাবি তারা

তোলে। বহু দেশ ও এন.জি.ও.'গুলি তাদের এই দাবিকে সমর্থন করে। এরপর, নারী দশকের সমাপ্তিতে, কেনিয়ার নাইরোবিতে ১৯৮৫ সালে আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার গণিকাদের বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ। অংশগ্রহণ এখানেই থেমে থাকেনি। গণিকা, তাদের সংগঠনগুলি এবং বারবণিতা সমস্যা ভিত্তিক এন.জি.ও.'গুলির আন্তর্জাতিক ভূমিকা ও অংশগ্রহণ এর পর থেকে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। কেননা গণিকাদের বিশিষ্ট সমস্যা ছাড়াও, নারীদের বিপুল সর্বজনীন সমস্যা যে তাদেরও সমস্যা তা ধীরে ধীরে গণিকাদের ধারণায় প্রসারিত হতে শুরু করেছিল।

১৯৯২ সালে রিও-ডি-জেনেরিওতে বিশ্ব-পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার সম্পর্কে বিশ্ব সম্মেলন, ১৯৯৪ সালে কায়রোতে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কে বিশ্ব সম্মেলন এবং ১৯৯৫ সালে কোপেনহাগেন-এ সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বজনীন চরিত্রবাহী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্বোক্ত সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হলেও, এগুলির প্রত্যেকটিতে নারীদের প্রসঙ্গ বিশেষ স্থান পেয়েছিল। পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে বনাঞ্চলের ও নদী বা সমুদ্রের মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল নারীদের সমস্যা, কায়রোর জনসংখ্যা সম্মেলনে পরিবার নিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাতে নারীর অধিকার বা তার আগের মানবাধিকার সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক নারী-নির্যাতনকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত হিসাবে চিহ্নিত করে প্রত্যেকটি বিষয়ে ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের কোপেনহাগেন সম্মেলন দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দারিদ্র্যের স্তর থেকে উন্নয়ন, উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান ও সামাজিক সংহতি সাধনের কাজকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে ঘোষণা করে নারীকে সেগুলির সীমানার অন্তর্গত করেছিল। এই শীর্ষ সম্মেলন থেকে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছিল পরিকাঠামো, নীতি, লক্ষ্য ও অর্জনযোগ্য স্তরকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সমস্ত ক্ষেত্রের সিদ্ধান্তে যাতে অধিকতর ভারসাম্য ও সমতা অর্জন করা যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে নারীদের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সুযোগ ও স্বাধীনতা প্রসারিত করা সম্ভব হয় এবং প্রতিষ্ঠা করা যায় নারীদের ক্ষমতাধর হিসাবে। এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় এজাতীয় সম্মেলনগুলিতে বারবণিতা সংগঠন এবং গণিকাদের প্রসঙ্গে গঠিত এন.জি.ও'দের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। এবং সম্মেলনগুলিতে গৃহীত নারী বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলির কোন কোনটি বারবণিতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়ার কথা।

১৯৯৫ সালে চীনের বেজিং-এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে। এই সম্মেলনে গ্রহণের জন্য রচিত খসড়া দলিলগুলি প্রায় দেড় বছর ধরে বিভিন্ন কমিটি ও সরকারগুলির স্তরে আলোচিত হয়ে পাঠানো হয়েছিল বিশ্বের নারী সংগঠনগুলির কাছে। আই.এল.ও. স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র বক্তব্য সম্মেলনের জন্য পেশ করে। এই সম্মেলনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শ্রম-ব্যবস্থা, প্রশাসনিক, আইনী, পারিবারিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, প্রচার-মাধ্যম প্রভৃতি সুবিস্তৃত দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল নারী প্রসঙ্গের আলোচনা। সম্মেলনটিতে যে দুটি দলিল গৃহীত হয় তাতে পূর্বে গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির ফলাফল এবং আধুনিক বাস্তবতার নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে। সিদ্ধান্তের মুল কথা হলো উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিশ্ব-তৎপরতায়, সমতার ভিত্তিতে নারীদের সামিল করা। এই সম্মেলনেই গণিকাদের অংশগ্রহণ ছিল সর্বাধিক। সম্মেলনের প্রত্যেক দিন তারা স্বতন্ত্রভাবে সেমিনার, গ্রুপ ডিসকাশন, ভিডি.ও. ও ফটো প্রদর্শনী, মিছিল প্রভৃতি অনুষ্ঠান করে। তাদের দাবি ও বক্তব্য সম্মেলনে ব্যাপকভাবেই আলোচিত হয়। নারী-বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণে তাদের বক্তব্যের মর্মবস্তুও গৃহীত হয়েছিল।

লগ্নি-পুঁজির বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন যেসব সামাজিক শক্তিগুলির বিশেষ উত্থান ঘটছে — তার অন্যতম হলো বেশ্যা, হিজড়া ও সমকামীরা। সিয়াটেল, দাভোস, ব্যাঙ্কক, ওয়াশিংটন থেকে শুরু করে সম্প্রতি জেনোয়ার বিশ্বায়ন বিরোধী বিক্ষোভেও গণিকারা বিপুল সংখ্যায় এসেছিল। এসেছিল ব্যক্তিগত ও সংগঠনগত ভাবে। বিশ্বায়ন-বিরোধী এইসব আন্দোলনের চরিত্র নিঃসন্দেহে গণ-আন্দোলনের। কিন্তু আন্দোলনগুলি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এখন পর্যন্ত পরিচালিত নয়। কিন্তু শ্রেণী-আন্দোলনের সম্ভাবনা সুপ্ত আছে এই ধরনের সংগ্রামগুলির মধ্যে। এই সমগ্র পটভূমিকায় এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, গণিকারা কি একটি শ্রেণী? সর্বোপরি প্রশ্ন হলো একটি শ্রমজীবী শ্রেণী কি? এ নিয়ে সংশয় বা বিতর্ক থাকতে পারে। থাকাই স্বাভাবিক। সেই বিতর্কে প্রবেশ না করেও, এই প্রসঙ্গে গড়ে ওঠা দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লক্ষণীয়। প্রথমত, লগ্নিপুঁজির সর্বব্যাপী ও তীব্র আক্রমণের ফলে সামাজিক নতুন অংশও জড়িয়ে পড়ছে বিশ্বায়ন-বিরোধী সংগ্রামগুলিতে। বিশ্বায়ন-মূলক পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের সাথে এবং প্রত্যক্ষভাবে শ্রমশক্তি শোষণের পরিসরের অন্তর্গত হচ্ছে ঐসব নতুন নতুন সামাজিক অংশ বা বর্গগুলি। অতীতে এগুলি সাধারণভাবে শ্রেণী-বিরোধে সরাসরি অংশীদার হতো না। বর্তমানে লগ্নী-পুঁজির বিশ্বায়নের লক্ষ্যে রুচি, চাহিদা ও ভোগের বিশ্বায়নের তৎপরতায়, অতীতের তুলনায় উৎপাদনের প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হচ্ছে নতুন নতুন উপাদান। এখন কেবল ভোগবাদী বিলাসসামগ্রীর উৎপাদন করা হচ্ছে না। ভোগবাদিতা উৎপাদনের সামাজিক পরিসরকে প্রসারিত করার প্রয়াসও নেওয়া হচ্ছে। তার অন্যতম হলো যৌনতার উদারীকরণ বা মুক্ত-বাজার গঠন। একদিকে পিতৃতান্ত্রিকতার যৌনতার পুরানো কাঠামোর বি-পিতৃতান্ত্রিকীকরণ (এক ধরনের বেসরকারীকরণ) এবং অন্যদিকে নারী বিষয়ক প্রাপ্ত ধারণার পুনর্কাঠামোকরণ (রিস্ট্রাকচারিং) যৌনতাকে বিশ্বায়ন উপযোগী রাইট সাইজিং করে আন্তর্জাতিকভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। কমার্শিয়াল সেক্স-সেক্টর, সেক্স-ইনডাস্ট্রি এবং ইনটারন্যাশনাল সেক্স ট্রেডিং শেষোক্ত দিকগুলির অন্যতম সর্বজনীন ফলাফল। অপর একদিক হলো নতুন 'প্রোডাকশন-প্রসেস' তথা উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং 'লেবার-প্রসেস' বা শ্রম-প্রক্রিয়া গঠনের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর দৃশ্যমান রূপের বিপুল পরিবর্তন ঘটছে। এটা নিছক শিল্প উৎপাদনের লীন-প্রোডাকশন, জাস্ট-ইন-টাইম, টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির পরিসরে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত অংশের জন্যই কেবল সত্য নয়। এখন বহু ক্ষেত্রে নতুন ধরনের সামাজিক-উৎপাদন এবং উৎপাদনের সামাজিক-সম্পর্ক গঠিত হচ্ছে। এইভাবে এক বিপুল নতুন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেক্স-ওয়ার্কার বর্গের বিস্তার এবং নানাভাবে বাজারীকরণ তারই এক ফলাফল। একথা ঠিক যে নিজেদের সেক্স-ওয়ার্কার বলে দাবি করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তারা শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়বে না। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে, তথাকথিত হলেও, এক ধরনের নিউ ওয়ার্কিং ক্লাস-এ গণিকারা পরিণত হচ্ছে কিনা, তা বামপন্থীদের গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত। লগ্নি-পুঁজির বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় শ্রেণীর স্তরে দৃশ্যমান পরিবর্তন ও প্রসারের অন্যতম এক লক্ষণ পূর্বোক্ত সমগ্র ঘটনাবলীতে উদ্ভূত হচ্ছে বলে মনে করা হলে, তা আলোচনার জন্য অ্যাজেন্ডাভুক্ত হতে পারে। নানা নতুন প্রসঙ্গ নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা শুরু করার মুহূর্ত এখন গঠিত হয়েছে। কেননা বিশ্বায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তা 'ফেট অ্যাকমপ্লি' (অবধারিত)—এমন ধারণা যে ভ্রান্ত, তা স্পষ্ট হচ্ছে। বিশ্বায়ন এখনও এক শুরুর পর্বের গঠনাত্মক স্তরের প্রক্রিয়া। তাছাড়া এর ভবিষ্যৎ সাফল্য নির্ধারকভাবে দাবি করার মানুষ কমছে। সংকট পিছু ছাড়েনি ধনতন্ত্রের — খোলস বদলে বিশ্বায়নরূপী হওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও। তাই বিশ্বায়নের ভবিষ্যতকে সাবজেকটিভলি তথা সংগঠন-আন্দোলনের দ্বারা যেসব শক্তি অনিশ্চিত করে তুলছে, তাদের প্রত্যেকের বিষয়ে নতুন করে মূল্যায়ন যথার্থ সমাজ-বিজ্ঞানী তথা বামপন্থীরা না করে পারে না।

ধর্ম সংস্কৃতি মৌলবাদ

এজাজ আহমেদ
মালিনী ভট্টাচার্য
অরুণ চৌধুরী
মইনুল হাসান
এলেন মেইকসিন্স উড
কে. এন. পানিক্কর

সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন

এজাজ আহমেদ

'বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি' শব্দ দুটি বিষয়ে ব্যাপক এবং বহুমাত্রিক অর্থ বহন করে। প্রাসঙ্গিক এই আলোচনায় বোঝা যাবে সাংস্কৃতিক চিন্তা ও চর্চার উপাদানগুলি কীভাবে ধীরে ধীরে নানা পদ্ধতি আশ্রয় করে, বিশ্বায়নের মুখোশে সজ্জিত হয়।

সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেই কারণেই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিপজ্জনক দিকটি নিয়ে শুরু করতে চাই। কেননা এটি আধিপত্যের আদর্শ (dominant ideology) থেকে উদ্ভুত। আমরা বামপন্থীরা অবশ্যই শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতি ও প্রলেতারিয় সংস্কৃতির কথা বলি এবং সঠিক ভাবেই বলি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক আঙ্গিকের কথা, যার থেকে আমাদের সাংস্কৃতিক চর্চা প্রেরণা পায়। যাকে আমরা উচ্চমার্গীয় সংস্কৃতি বলি তার সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক ভাবে ধ্রুপদি সাহিত্য, মার্গসঙ্গীত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চতর শিক্ষাচর্চা, দর্শন, বিজ্ঞান, সেকস্‌পিয়ার ও কালিদাস— অন্যভাবে বলতে গেলে এ হল এক ধরনের জ্ঞান ও পারদর্শিতা, যাকে সাংস্কৃতিক পুঁজি বলা যেতে পারে। যা আর্থিক পুঁজির মতই উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন ও সঞ্চয় করা যায়।

এই অর্থে 'সংস্কৃতি' সবসময়ই সংখ্যালঘুর সংস্কৃতি হবে। এলিট সংস্কৃতি বনাম সাধারণ মানুষের জনপ্রিয় সংস্কৃতি, সংস্কৃত ভাষা বনাম প্রাকৃত ভাষা, মহৎ মানুষের উত্তরাধিকার বনাম নিচু তলার মানুষের উত্তরাধিকার, ধ্রুপদি সংস্কৃতি বনাম লোকসংস্কৃতি— এ সব লড়াই চলে।

আসলে উচ্চবর্গীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাঁদের সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলির সাহায্যে সমাজের বিরাট অংশের মানুষকে বলতে চায়— তোমরা ব্রাত্য, অপাংক্তেয়, তোমাদের সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমগুলি অপরিশীলিত, অর্বাচিনসুলভ, অপ্রাসঙ্গিক, কেননা আমাদের ঠিক করে দেওয়া সাংস্কৃতিক মানের অনেক তলায় এগুলির ঠাঁই। এটিই উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতির প্রথম কৌশল; সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতির চেয়ে সংখ্যালঘু উচ্চবিত্ত মানুষের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা।

শুধু তাই নয়, স্বল্পসংখ্যক মানুষের সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রে সমাজের বৃহৎ অংশের মানুষের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। অর্থাৎ শক্তিশালী এবং সুবিধাভোগী শ্রেণীর সংস্কৃতি দাবি করে যে, সেটিই হলো সমাজের বুকে একমাত্র সজীব এবং ক্রিয়াশীল, সে কারণেই সমাজের সমস্ত মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনার একমাত্র প্রতিনিধি।

যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে বর্ণভেদ প্রথা বর্তমান, সে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের সংস্কৃতি

অবশ্যই নিম্নবর্ণের থেকে পৃথক হবে। যদিও উচ্চবর্ণের মানুষেরা তাঁদের সংস্কৃতির বাইরে, অন্য কোনো সংস্কৃতির অস্বিত্বকে স্বীকৃতি দেয় না এবং তাঁদের কাছে, তাঁদের নিজেদের সংস্কৃতিই হলো সর্বোৎকৃষ্ট। এই ভাবে, সামাজিক বৈষম্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকেও আক্রমণ করে এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর সংস্কৃতিকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে তুলে ধরে।

উদাহরণ হিসাবে সংঘ পরিবারের নীতি ও আদর্শের কথা বলা যেতে পারে— যেখানে ধর্ম ও সংস্কৃতি একসাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণের আচরণীয় 'ব্রাহ্মণ্যধর্ম'কে এদেশে 'হিন্দুধর্ম' হিসেবে প্রচার করা হয় এবং এরপরই বলা হয় যে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দুধর্মাবলম্বী।

এই ভাবে 'হিন্দুধর্ম' একাত্ম হয়ে মিশে যায় ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে এবং অচিরেই জাতীয় সংস্কৃতি হিসাবে তা নিজেকে প্রকাশ করে। এই ভাবেই 'ধর্ম' নিজে সংস্কৃতি আর 'সংস্কৃতি' নিজে ধর্মের অধিকার পেয়ে যায়। ধর্ম ও সংস্কৃতি উভয়েই এরপর জাতীয়তাবাদের মর্যাদা ও অধিকারে ভূষিত হয়। অর্থাৎ আপনি যদি ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা না করেন, তবে তৎক্ষণাৎ সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের মোহনার ত্রিকোণ থেকে ছিটকে পড়বেন। আজকের ভারতে রাষ্ট্রশক্তি ধর্মের সাথে রাজনীতিকে এবং এই দুইয়ের সাথে জাতীয়তাবাদকে একই সংজ্ঞায় ভূষিত করেছে।

এখন এই উদাহরণ আরো অনেকগুলি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারে। প্রথমত, যখন আপনি কোনো সংস্কৃতি কিভাবে প্রধান হয়ে উঠল সে সম্পর্কে অলোচনা শুরু করবেন, তখনই আপনি দেখবেন, সেই আলোচনা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক অলোচনায় পর্যবসিত হচ্ছে, সে রাজনীতি নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সৌখিন রাজনীতি নয়, একেবারে বিশুদ্ধ ও খাঁটি রাজনীতি, যা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক আন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করবার কর্মসূচী অনুসরণ করে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আর এস এস নিজেকে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করে, একই সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হলে যে রাজনৈতিক পথ ধরে চলতে হবে, অবিকল সেই পথ অনুসরণ করে।

অর্থাৎ, এটি একটি বিশেষ ধারার সংস্কৃতি যার উদ্দেশ্য—নানান উপকরণের সাহায্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনীতির প্রতি মানুষের আস্থার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করা। আমি মনে করি না যে, শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দাবিদার হওয়ার মধ্যে কোনো অসম্ভব বা গোপন চুক্তি লুকিয়ে থাকে বরং বিপরীতটিই সত্য, আধুনিক রাজনীতি সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং সরাসরিভাবে থিয়েটারের সাথেও তার যোগ রয়েছে। থিয়েটার শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও এই যোগাযোগের বিষয়টি সত্য। যখন আমি প্রথম টেলিভিশনে উন্মত্ত তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবার ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করি, তখন আমার একটি বিরাট প্রদর্শনী, একটি ফ্যাসিস্ট ধর্মাচরণ বা একটি বিশাল ও সুপরিচালিত থিয়েটার দেখার মতই মনে হয়েছিল।

এখন এই ব্যাপারটা সত্যিই বিস্ময়কর যে কেবলমাত্র বামপন্থীরাই সংস্কৃতি ও শিল্পক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাজনীতি অনুপ্রবেশ করানোর দোষে দুষ্ট হ'ন। বারংবার শিক্ষা ও সংস্কৃতির নান্দনিক উৎকর্ষতাকে রাজনীতিকরণে কলুষিত করার দোষ দিয়ে তাঁদের অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। শাসক শ্রেণীর তুলনায়, বামপন্থীরা সংস্কৃতি ও শিল্পক্ষেত্রে অনেক কম নজর দিয়েছেন। এবং ঐ দুটি ক্ষেত্রে তাঁদের যেটুকু হস্তক্ষেপ করতে দেখা গেছে, তার উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা। উচ্চবিত্ত ও বর্ণ থেকে জন্ম নেওয়া শাসক-প্রতিনিধিদের আধুনিক রাজনীতির ধ্বজাধারী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র, যাকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও

বিরাট ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত করা হয়েছে, এবং যা শ্রমজীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে হিংসা ও আগ্রাসনের অস্ত্র হিসাবে শাসকশ্রেণী ব্যবহার করছে, তাকে শাসকশ্রেণীর প্রভাবমুক্ত করবার উদ্দেশ্যেই বামপন্থীরা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হাত বাড়িয়েছেন।

'কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি' বলতে আমি শুধুমাত্র প্রথাগত ফিল্ম, টেলিভিশন, জনপ্রিয় সঙ্গীত, জনপ্রিয় কলাসংস্কৃতি বা সংবাদ মাধ্যমকে বোঝাচ্ছি না, বোঝাতে চাইছি আরো সূক্ষ্মতর সামাজিক চর্চার ব্যবস্থাপনা, যার মধ্য দিয়ে প্রাত্যহিক জীবনে কোনো না কোনো ধরনের সচেতনতা তৈরি হয়, এবং তা দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক ঝোঁকের মধ্যে মানুষকে ঠেলে দেয়। এভাবেই সংস্কৃতি একটি রাজনীতির বিষয় হিসাবে বহু আগে থেকেই প্রতিভাত হত। বামপন্থীরা হালে এটির মধ্যে প্রবেশ করেছে।

অসংখ্য প্রশ্ন উঠবে এই প্রসঙ্গে, কিন্তু প্রথমেই আমি বলতে চাই যে সংস্কৃতি বলতে সাধারণত যে বিরাট চিন্তাধারার আলোকবৃত্ত অথবা আত্মিক পরিশীলনকে বুঝি— প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃতি তার চেয়ে বহু দূরে। সংস্কৃতি, ঐতিহাসিকভাবে, একটি ভীতিপ্রদর্শনের বা সন্ত্রাসবাদের অস্ত্র হিসাবে কাজ করে এসেছে। এই সন্ত্রাসে যারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদের কাছে সংস্কৃতির ধারণাটিই সর্বদা একটি ভীতির উৎস হিসাবে কাজ করছে। সংস্কৃতি তাদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন লড়াই ও বিবাদের ক্ষেত্র যার অবসান হবে যে কোনো এক পক্ষের বিজয়ে। সংস্কৃতি তাদের কাছে এমন একটি প্রতিযোগিতাক্ষেত্র যেখানে বিজিত পক্ষকে সবসময় নিজের ব্যবহারিক সংস্কৃতি চর্চাকে প্রাণপণে রক্ষা করতে ও ব্যাখ্যা করতে হবে।

এখন যখন আপনি সংস্কৃতিকে নিয়ে বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে ভাবতে শুরু করেছেন, তখন সব থেকে প্রথমে যে বিষয়টি আপনাকে ধাক্কা দেবে, তা হ'ল এই যে, যে কোনও প্রভাবশালী সংস্কৃতি—তা সে হিন্দু-বা মুসলমান-বা ভারতীয় সংস্কৃতি যাই হোক না কেন—সব সময়েই নিজেকে অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যশলী বলে দাবি করে; অন্যদিকে বিশ্বায়নের দাবি হচ্ছে যে তা সম্পূর্ণতই অভিনব, নতুন, ইতিহাসের যার কোন পূর্বসূচী নেই। এটাও লক্ষ্য করবেন যে, ভারতের শাসকশ্রেণী সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে সংঘ পরিবার এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রের এলিটদের বৃহদংশ— তাঁরা 'হিন্দুত্ব' রাজনৈতিক দর্শনের ধ্বজাধারী হতে পারেন বা নাও পারেন—একইসাথে ঐতিহ্যবাহী আদর্শ, জাতীয় ও ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে, উত্তর-আধুনিক বিশ্বায়নের ধারণা এবং নয়া উদারনৈতিক আদর্শের মেলবন্ধন ঘটাতে প্রয়াসী। বিশ্বায়িত সাম্রাজ্যবাদের কাছে সঙঘ পরিবারের সানন্দ আত্মসমর্পণ এবং বাজার-মুখী বৈদ্যুতিন মাধ্যম প্রণোদিত সনাতনী হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস—এই দুয়ের অদ্ভুত সংমিশ্রণ বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করব।

বিশ্বায়নের আদর্শগত ক্রিয়াকলাপ বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির বলয়ে এমন এক অসহায়ত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে চায়, যাতে প্রত্যেকেরই মনে হবে, বিশ্বায়নের বিকল্প বুঝি সত্যিই কিছু নেই। বিশ্বায়নের আগ্রাসনের সামনে বড় বড় জাতি ও দেশগুলিও অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। ভারত ও চীন পৃথিবীর এই দুটি দেশে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ বাস করে, এই দুটি দেশও বিশ্বায়নের সামনে নতজানু, তাই ওহে— শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা, গণসংগ্রামের সংস্কৃতিকর্মীরা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই-এর সৈনিকরা তোমরা কিভাবে কল্পনা কর যে বিশ্বায়নের বিপুল ক্ষমতাকে তোমরা প্রতিহত করতে পারবে?

বিশ্বায়নের আদর্শগত কর্মপদ্ধতি, বিশ্বায়নকে একটি প্রাকৃতিক নিয়মের মত অমোঘ হিসেবে প্রতিভাত করতে চায়, যা সমগ্র মানবজাতিকে তীব্র ঝঞ্ঝার মত আঘাত করবে। এই আদর্শ

বিশ্বায়নকে সম্পূর্ণভাবে অখণ্ড একটি বিষয় হিসাবে দেখাতে চায়, যার তীব্র শক্তিমত্তা উৎসারিত হয়েছে প্রযুক্তি ও অর্থের বলে এবং যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের অতীত। একে বর্জন করলে পৃথিবীর যে কোনো শক্তিশালী জাতি প্রগতির পথ থেকে ছিটকে সরে যাবে, এবং অবিলম্বে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। বিশ্বায়নের আদর্শ যে প্ররোচনার সৃষ্টি করে তা হল একদিকে বিশ্বায়নের সাথে যুক্ত হতে না পারলে, পিছনে পড়ে থাকবার ভীতি, অপরদিকে প্রযুক্তিকে সর্বশক্তিমান হিসাবে ধরে নেবার মানসিক অবস্থান। এই দুই সহাবস্থানে মনে হয়, সর্বশক্তিমান প্রযুক্তির রথ যেহেতু বিশ্বায়নের পথ ধরে চলে সেহেতু বিশ্বায়নকে গ্রহণ না করার অর্থ হল, প্রযুক্তিকে কাজ করতে না দেওয়া এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল পেছনে পড়ে থাকা।

এটি হ'ল ব্যপক অর্থে ইনফরমেশন টেকনোলজি বা তথ্য প্রযুক্তি। বিশ্বায়নের সূর্য শুধু তাদের ওপরেই আলো দেবে, যারা একে গ্রহণ করেছে। এখন, আগ্রহের বিষয় হল এই যে, তথ্যপ্রযুক্তি যা এক সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়েছে, তা-ও লগ্নিপুঁজিকে, তা শুধু এক ধরনের প্রযুক্তি, এবং এটিই যোগাযোগ ও সংস্কৃতির প্রধান মাধ্যমগুলিকে চালায়। উদাহরণস্বরূপ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (ডব্লু ডব্লু ডব্লু) ই-মেল, ই-কমার্স, টিভি নেটওয়ার্ক প্রভৃতির কথা বলা যায়। ফলত একটি স্বতঃসিদ্ধের মত মনে হয় যে, যে মানুষ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সোনার ফসলগুলিকে ব্যবহার করে না, তাঁরা আদিম পরিত্যক্ত এক অতীতকে আঁকড়ে প্রত্নজীবের মত নিজেরাও বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। আদর্শগতভাবে সৃষ্ট এই অনিবার্যতা বোধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এবং শ্রমজীবী জনগণের পার্টির সেইসব যোদ্ধাদের মনেও এক ধরনের অসহায়তা ফুটিয়ে তোলে, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ওপর যাঁদের কোনো দখল নেই।

এইসব সাধারণ মন্তব্যের সূত্রগুলি হাতে নিয়ে আরো নির্দিষ্টভাবে দেখা যাক 'সংস্কৃতি' ও 'বিশ্বায়ন' শব্দদুটি কি অর্থ বহন করে।

'সংস্কৃতি' সম্পর্কে আলোচনা সত্যিই খুব কষ্টসাধ্য, কারণ অনেকগুলি পৃথক অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আমি আগেও বলেছি 'সংস্কৃতি' শব্দটি উঁচুশ্রেণীর বৌদ্ধিক পারদর্শিতা এবং আত্মিক শুদ্ধির প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। সে কারণেই একজন সংস্কৃতিবান মানুষ বলতে আমরা শিক্ষিত, পরিশীলিত, নান্দনিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন সুচারু ও ভদ্র কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করি। কিন্তু 'সংস্কৃতি' বলতে আবার জীবনচর্যার একটি প্রক্রিয়াও নির্দেশিত হয়, মানুষ নিজের জীবনে যার ব্যবহারিক চর্চা করে থাকে। যদিও সে চর্চা জাতীয়তাবাদী এককে সংগঠিত নাও থাকতে পারে এ জন্যই 'হিন্দু সংস্কৃতি', 'ভারতীয় সংস্কৃতি', 'বঙ্গ সংস্কৃতি' প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ আমরা ব্যবহার করি। তৃতীয়ত আমরা এটাও মনে করি যে, সমগ্র জীবনদর্শন হিসাবে সংস্কৃতির পদ্ধতিগুলি শিক্ষা ও সূক্ষ্ম বোধের অগ্নিতে পরিশুদ্ধ হয়ে স্ফটিকের চেহারা ধারণ করে সেজন্য যে দেশে বৃহৎ সংখ্যক পণ্ডিতব্যক্তি লেখক, বিজ্ঞানী, স্থপতি—এসব শ্রেণীর মানুষ বেশি সংখ্যায় বসবাস করেন, সে দেশের সংস্কৃতিকে খুব উচ্চশ্রেণীর বলে ধরা হয়, এটা মনে করা হয় যে বিরাট পণ্ডিত মানুষ বা বিরাট শিল্পী মানুষরাই কোনো দেশের সংস্কৃতিকে সবচেয়ে ভাল ভাবে উপস্থিত করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অত্যন্ত উজ্জ্বল অবদান রেখেছে কেননা, এক বিরাট সংখ্যক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী এই রাজ্যে জন্ম নিয়েছেন এবং এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের উন্নত সাংস্কৃতিক জীবনের সাক্ষ্য দেয়।

আমার মনে হয় যে নানা ধরনের সামাজিক সংঘাত বর্ণভেদ, শ্রেণীভেদ, লিঙ্গভেদ বা গোষ্ঠী-পরিচয়ভেদ সংস্কৃতিকে জীবনচর্যার অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করতে বাধা দিয়েছে কেননা সামাজিক বৈষম্য সংস্কৃতি চর্চার উপাদানগুলিকে সমস্ত মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছে দেয় না। সংস্কৃতি চর্চার উপাদান-ভেদের কারণে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংস্কৃতিও ভিন্ন হয়

উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃতি' ও 'নিম্নশ্রেণীর সংস্কৃতি', 'লেখ্য সংস্কৃতি' ও 'কথ্য সংস্কৃতি', 'বৃহৎ ঐতিহ্য' ও 'ক্ষুদ্র ঐতিহ্য', 'ধ্রুপদি সংস্কৃতি' ও 'লোক সংস্কৃতি'— এ সবই এই বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট। এই বৈষম্য একটি বর্ণভেদ-জর্জর, শ্রেণীবিন্যাসযুক্ত সমাজের মধ্যে বেঁচে থাকা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বগুলিকে দ্বন্দ্ব-মুক্ত বহুত্ববাদী ও বহুমাত্রিকতার আড়ালে সংগোপনে বিন্যস্ত হতে সাহায্য করে। অর্থাৎ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তখন এমন একটি সমতার কথা বলা হয়, যেখানে শিক্ষার আলোক বঞ্চিত কৃষকশ্রেণীর কথ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি উচ্চ শিক্ষিত, বিত্তশালী, চলচ্চিত্র বা টিভি সিরিয়াল নির্মাতার কলাকৃষ্টির সাথে একই মাপকাঠিতে বিচার্য হয়ে ওঠে। এই সামাজিক প্রেক্ষিতের মধ্যে উচ্চ বিত্ত, বর্ণ ও শিক্ষার অধিকারী, সংস্কৃতিগরিমা-আলোকিত সমাজের মানুষেরা কখনোই স্বীকার করেন না, যে তাদের সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞা বা চর্চার উৎকৃষ্টতা সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের সর্বপ্রকার সামাজিক বঞ্চনাকে মূলধন করেই বিকশিত হয়েছে —- এবং চূড়ান্ত শ্রেণীবৈষম্যময় একটি সমাজে অতিভোগ আর অতি বঞ্চনার এই সম্পর্ককেই 'অখণ্ড জীবনচর্যা' হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এবং এই বৈপরীত্যের বাস্তবতা আর সংহত রূপকেই বলা হচ্ছে 'জাতীয় সংস্কৃতি'।

আমার মনে হয় সংস্কৃতিকে কঠোর ভাবে কলাচর্চা ও নান্দনিকতার সাথে একত্রে সংজ্ঞায়িত না করাটাই বাঞ্ছনীয়। বরং সংস্কৃতি বিষয়টিকে প্রধানত একটি বস্তুবাদী চর্চার ক্ষেত্র হিসাবে আলোচনা করাই শ্রেয়, শেষ পর্যন্ত যা সামাজিক ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হয়ে উঠবে।

আমার মনে হয় আধুনিক সময়ে যে ভারতীয়রা পৃথিবীর প্রধানতম ইংরেজি ভাষায় লেখকদের মধ্যে স্থান করে নিচ্ছেন, এবং বিশ্বের বাজারে, লন্ডন বা নিউইয়র্কের মতোই, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় শিল্পকৃতির চর্চা ও বাণিজ্যভূমি হিসাবে মুম্বাই শহরও প্রাধান্য পাচ্ছে— এই বিষয় দুটিকে যথাযথ মর্যাদা সহকারে বিচার করা উচিত। তবে এই দুটি উদাহরণের সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতিচর্চার ঔৎকর্ষকে প্রমাণ করতে চাইলে খুবই ভুল হবে, কেননা মনে রাখতে হবে পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের অর্ধেক ভারতে বাস করে এবং একুশ শতকে পা দেবার সময়ে ভারতের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের পড়তে বা লিখতে পারার ক্ষমতা ছিল না। আমার মনে হয় গুটিকতক বিশ্বমানের উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচয়িতা বা উঁচুদরের শিল্পীর বর্ণময় উদাহরণের সাহায্যে নয়, আজও এই পঞ্চাশ কোটি মানুষের নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে থাকার উদাহরণের সাহায্যেই ভারতের প্রকৃত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের চেহারাটা ফুটে উঠবে।

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমি কবি-সাহিত্যিক বা শিল্পীদের সংস্কৃতিক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অবদানকে ছোট করে দেখাতে চাইছি না। আমি বলতে চাইছি যে, একদিকে তাঁদের শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষতা এবং অন্যদিকে সীমাহীন অন্ধকার— এই দুটি বৈপরীত্য, আমাদের দেশের সামাজিক শোষণ, বৈষম্য ও উৎপীড়নের ছবি তথা বুর্জোয়াধাঁচের গঠনটিকে আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। সুতরাং 'সংস্কৃতি' শব্দটি শুধুমাত্র এক জাতীয়তাবাদী সমবেত সঙ্গীতের অটুট বলয়কে উন্মোচিত করে না,বা শুধুমাত্র শিল্পকৃতির বা নান্দনিকতার মনোহর ডালি সাজানোই এর একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়। এটি হল বস্তুত একটি দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় ক্ষেত্র যেখানে শ্রেণী সংগ্রাম ও অন্যান্য সামাজিক শক্তিগুলির মধ্যে অবিরত সংগ্রাম ঘটে চলে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। সে জন্য প্রতিটি জাতিসত্তার মধ্যে একই সাথে বহু ধরনের সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকে, সমগ্রভাবে থাকে বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা— একথা বললেই কাজ ফুরিয়ে যায় না, বাস্তবিকভাবে

'বৈপরীত্যের মধ্যে একতা'— এই শব্দবন্ধের সাহায্যেই একে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায়। *(আগস্ট ৯-২২, ১৯৭৭ এর ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা 'সংঘাতের সংস্কৃতি' — প্রবন্ধ থেকে উপরের তিনটি অনুচ্ছেদ গৃহীত হয়েছে—এজাজ আহমেদ)।*

আমি যে বিষয়টি নির্দেশ করতে চাইছি তা হল, সংস্কৃতি বিষয়টি যেহেতু প্রকৃতিগত ভাবে বস্তুতান্ত্রিক, সেহেতু জাতীয়তাবাদ, ঐতিহ্য বা ধর্মের চাইতে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে এটি শ্রেণীবিভাজনের সাথে সম্পর্কিত।

আমাদের দেশের মত একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে 'হিন্দু সংস্কৃতি' হিসেবে কোনো বৈষম্যবিহীন সাধারণ সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, কেননা হিন্দু সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, তাহল আদতে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদের সংস্কৃতি। যতই আমরা সেটির মধ্যে উদারতা অথবা নমনীয়তার দাবি তুলি না কেন।

প্রথমতঃ প্রকৃত ঐতিহ্য বলে কিছু নেই কিংবা ঐতিহ্য বলে যা বলা হচ্ছে, তা সব সময়েই সাম্প্রতিক হুজুগ—এই অন্তঃসারশূন্য দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমি মোটেই সহমত পোষণ করি না।

অন্য সমস্যাটি হল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের প্রশ্নটি প্রায় সব সময়ই সংরক্ষণ কিংবা পুনঃপ্রবর্তনের প্রসঙ্গে ওঠে। পুনঃপ্রবর্তনের প্রসঙ্গটিও আবার ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী, পুঁজিবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশিত হয়। বরঞ্চ আমার মনে হয় যে, কৃষিভিত্তিক সমাজে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা বহু পুরুষ বা যুগ যুগান্ত ধরে একই রকম ভাবে চলে আসছে। এখানে সমস্যা হ'ল দুটি পৃথক প্রকৃতির। প্রথম, জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে যা চালানো হয় তা যতটা অতীত পরিপ্রেক্ষিত থেকে আবিষ্কার করা, তার চাইতে বেশি নির্বাচিত এবং পুনঃসূত্রায়ন: ক্ষমতাশালীরা এভাবেই সাজিয়ে নেয় তাদের ঐতিহ্যকে। অন্যদিকে বঞ্চিত-নিপীড়িতদের ঐতিহ্য অপরিবর্তিত রয়ে গেছে তাদের ভাগ্যের মতোই— আঞ্চলিকতায় অবরুদ্ধ এবং খণ্ডিত অবস্থায়। আদর্শগত আধিপত্যবাদের মর্মই হচ্ছে এটা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল এই যে, বঞ্চিত শ্রেণীর ঐতিহ্যকে শুধুমাত্র রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে একটি ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রসঙ্গে লেনিনের সেই বিখ্যাত উক্তিটিকে স্মরণ করা যেতে পারে,—সত্যিই এমন কোনো চীনের প্রাচীর নেই, যা শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত সচেতনকে সামাজিকভাবে প্রাধান্যভোগী শ্রেণীর আদর্শ থেকে পৃথক করতে পারে এবং সে কারণেই ব্যাপক সংখ্যক জনগণের ঐতিহ্যকেও অতিসূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে নেওয়া প্রয়োজন। তৃতীয় সমস্যাটি হ'ল, ঐতিহ্যের প্রশ্নটি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তখনই উঠে থাকে, যখন ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গটিকে ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং পুঁজিবাদের এক বিরুদ্ধবাদী আন্দোলন হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

আমার নিজের মত হল এই যে, সংস্কৃতির প্রসঙ্গটিকে অতীতের সাথে নয়, যুক্ত করতে হবে ভবিষ্যতের সাথে। যা ছিল, তাকেই শুধুমাত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না করে যা কখনো করা হয়নি সেটি তৈরি করবার চেষ্টা করাই হল সাংস্কৃতিক চর্চা এবং সেই সমস্ত প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাগুলিকেই পুনরুদ্ধারেব জন্য বিবেচনা করতে হবে, যেগুলির মধ্যে ভবিষ্যতের বার্তা লুকিয়ে রয়েছে। সবশেষে বলি, দূর অতীতের মধ্যেই শুধু ঐতিহ্যকে খোঁজা—এই দৃষ্টিভঙ্গিরও আমি সমর্থক নই। ভারতবর্ষে আধুনিকতার ইতিহাসটাও কম পুরনো নয়। এবং এই আধুনিকতা বিপুল ও বিচিত্র সাংস্কৃতিক উৎসের সন্ধান দিয়েছে আমাদের, সংস্কার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, কমিউনিস্ট আন্দোলন; প্রাচীনের তুলনায় সাম্প্রতিক এই ঐতিহ্যগুলি আমাদের স্পষ্ট পথনির্দেশ করতে পারে।

আমি আগেই বলেছি, সংস্কৃতির প্রসঙ্গটি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বা ঐতিহ্যের সাথে অনেক কম

সম্পর্কযুক্ত, বরং শ্রেণীর সাথে সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। কিন্তু দেখা যায় যে ভারতের মত একটি দেশে সংস্কৃতি বা শ্রেণী, দুটি প্রশ্নই মূলত গভীরভাবে নির্ধারিত হয় সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের প্রাসঙ্গিকতায়। এই পরিস্থিতির স্ববিরোধিতা হচ্ছে যে, যে সংস্কৃতি দেশের অন্তরঙ্গকে শাসন করছে, তাকে আবার নিয়ন্ত্রণ করছে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি। খুব নরমভাবে অভিহিত করলে 'বিশ্বায়ন' বলা হচ্ছে এটাকেই। সুতরাং বলা যায় যে যতদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রাধান্য থাকবে, ততদিন আমাদের দেশের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী, আমাদের 'জাতীয় সংস্কৃতি' হিসাবে কোনো সংস্কৃতির অধিকার দিতে পারবে না। এখন যেহেতু ঘটনাচক্রে সংস্কৃতি বর্তমানে নির্ধারিত হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা, সেজন্য আমি এবার 'বিশ্বায়ন' প্রসঙ্গে আসব।

এই প্রসঙ্গে প্রথমে যা করতে হ'বে তা হ'ল এই যে, 'বিশ্বায়ন' শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ, তার প্রকৃত চেহারা অনুসন্ধান ও অনুধাবন, রহস্যময় জটিলতার খোসা ছাড়িয়ে প্রকৃত অন্তর্বস্তু বা সার-সংক্ষেপকে বুঝতে চাইব। বিশ্বায়ন বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে আর কিছুই নয়, সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রতিকতম এবং সর্বোচ্চ স্তরের পর্যায়, যে সাম্রাজ্যবাদের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, এবং যে সাম্রাজ্যবাদ বিগত এক দশকের মধ্যেই তার চূড়ান্ত এবং পরিপূর্ণরূপ ধারণ করেছে। বিশ্বায়ন কীভাবে সংস্কৃতিক্ষেত্রকে প্রভাবিত করছে, তা আলোচনা করার আগে, বিশ্বায়নের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আমি মন্তব্য করতে চাই।

মার্কসই প্রথম দেখিয়েছিলেন সূচনা থেকেই এক অখণ্ড বিশ্ব বাজারের প্রতি তাড়না জন্মসূত্রে পুঁজিবাদের নিয়মের মধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল এবং সেই বিশ্ববাজার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা ছিল ঔপনিবেশিকতাবাদের। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এই পদ্ধতি শুরু হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে, প্রকৃত ঔপনিবেশিকতাবাদ আমেরিকার বুকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে এবং উনবিংশ শতাব্দী থেকেই এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি নিবিড় উপনিবেশে পরিণত হয়, ফলত সারা পৃথিবী দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে থাকে স্বল্প সংখ্যক শিল্পোন্নত কতগুলি অগ্রণী রাষ্ট্র এবং অপর দিকে থাকে এক বিপুল সংখ্যক পিছিয়ে পড়া শিল্পায়ন-বিহীন দেশ, যাদের মধ্যে অনেকগুলিই হয়ত নামে স্বাধীন, কিন্তু শিল্পোন্নত দেশগুলির কাছে প্রতিটি বিষয়ে নির্ভরশীল এবং এছাড়াও অসংখ্য পরাধীন দেশ। অন্যভাবে বলা যায় যে, যদিও উপনিবেশবাদ বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ অর্থনীতি গড়ে তুলতে চেয়েছে, তবুও এটি একটি বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা, প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অর্থনীতির জটিল বুননে যা তৈরি এবং যার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন উপনিবেশের শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সুতরাং উপনিবেশের অন্ত্যেষ্টি হবার আগে বিশ্বায়ন তার পূর্ণ পরিণত রূপ ধারণ করতে পারেনি। পুঁজিবাদের উত্তরোত্তর বিকাশের জন্য এবং নতুন যুগে বিশ্বঅর্থনীতির সংহত রূপ হিসাবে পুঁজিবাদের আত্মপ্রকাশের জন্যই উপনিবেশগুলির মুক্ত হবার প্রয়োজন ছিল। যতদিন পর্যন্ত না ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি, যেগুলি আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাদের উপনিবেশ বা ঔপনিবেশিকতার কর্মসূচীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, ততদিন অবধি আমেরিকা স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিহিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। বিশ্ব ইতিহাসের বিরাট প্রেক্ষাপটে, উপনিবেশবাদের পতন হলেও পুঁজিবাদের অবসান ঘটায়নি, প্রকৃতপক্ষে তা একটি নতুন এবং হিংস্র আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের বিকাশে সহায়তা করেছে। পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য ছোট বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরিবর্তে এখন পৃথিবী পরিচালনা করছে মাত্র একটি অমিত শক্তিধর সাম্রাজ্যবাদী দেশ।

দ্বিতীয়ত, আমি আগেও বলেছি, ধ্রুপদি সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর দেশগুলিকে অগ্রণী শিল্পোন্নত এবং শিল্পবিহীন পশ্চাদপদ এই দুটি মূলভাগে ভাগ করেছিল। একটি সার্বজনীন ব্যবস্থাপনা হিসাবে পুঁজিবাদের উত্থান শুরু হবার আগে, পৃথিবীকে নতুন ধরনের বিন্যাসে বিভাজিত করবার প্রয়োজন ছিল। এই বিভাজনের বিন্যাস ছিল, অগ্রণী পুঁজিবাদী ও পিছিয়ে থাকা পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির বিলুপ্তির সাথে সাথে, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে কিছুটা শিল্পায়নের সম্ভাবনা জন্ম নিল, এবং এইভাবেই পুঁজিবাদের বিকাশের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রটিতে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল।

পৃথিবীর বুকে এই নতুন ব্যবস্থাপনাকে রূপায়িত করতে প্রধান অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও সামরিক শক্তি হিসাবে এমন ভাবে আমেরিকা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলো, যা কখনো কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশ করতে পারেনি।

তৃতীয়ত, বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পৃথিবীতে যে বিপুল প্রযুক্তিগত উন্নতি হয়েছে, নতুন বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে খুবই জরুরি উপাদান হিসাবে কাজ করেছে— যেমন দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব কাজ করেছিল ঔপনিবেশিকতাবাদের বিজয়ের ক্ষেত্রে। সারা পৃথিবী জুড়ে একটি মাত্র অর্থনীতির বাজার তৈরিতে এই নতুন প্রযুক্তিগুলি কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়েছে ও সহায়তা করেছে।

চতুর্থত, সোভিয়েত ব্লক এবং পূর্ব এশিয়ার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উপস্থিতি বিশ্বায়নের প্রসারকে তিনভাবে বাধা দিয়েছে। পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ ছিল সব অর্থেই এই দেশগুলির অন্তর্গত এবং সেই একভাগ বিশ্বায়ন তথা পুঁজিবাদের কবলমুক্ত ছিল। এই দেশগুলি পুঁজিবাদকে আদর্শগত ভাবে সব সময় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জন্য প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, অর্থ ও সামরিক শক্তির বিকল্প উৎস হিসাবে এই দেশগুলি কাজ করেছে। সোভিয়েত ব্লকের পতন এবং বিশ্ব বাজারে চীনের অর্থনৈতিক নীতির আত্তীকরণের সাথে সাথে পুঁজিবাদ বিশ্বব্যাপী প্রাসারিত হতে পেরেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছর ধরে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

এইগুলিই ছিল মূল কারণ। এরই সাথে নতুন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিল নতুন ধরনের সামরিক-প্রযুক্তির, যেগুলির সাহায্যে অসংখ্য ছোট ছোট শত্রু যারা সারা বিশ্বে ধীরে ধীরে সংখ্যায় বাড়ছে বলে মনে করা হয়, তাদের অত্যন্ত দ্রুততর সাথে এবং কার্যকরীভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব। এর সুস্পষ্ট উদাহরণ হল ইরাক ও প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া। চূড়ান্ত ভাবে নৈতিক চাপ, এই সামরিক আগ্রাসনের মতাদর্শগত বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতির জন্য প্রয়োজন ছিল একটি জটিল কাঠামোর। যার মধ্যে সমস্ত ধরনের এন জি ও থেকে শুরু করে তত্ত্ববিলাসী উত্তরাধুনিকতাবাদ এবং ইতিহাসের অবসানের তত্ত্বও একত্রিত হতে পেরেছে।

সীমারেখার দিক থেকে এই নতুন সাম্রাজ্য সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশই এই সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের বাইরে নেই। বাজারের এই ধরনের বিপুল বিস্তার এক অতলান্ত গভীরতার সাথে যুক্ত হয়েছে। এবং এর সাহায্যে পুরনো উপনিবেশের আংশিক শিল্পায়ন পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ পুরনো কৃষিক্ষেত্রের বিলীন হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে একটিমাত্র মূল নিয়মের মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে টেনে এনেছে। এই নিয়ম অবশ্য বিশ্বের বিভিন্ন অংশে স্থানীয় ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মজুরি ও মূল্য হিসাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

নিউইয়র্কের সাথে ওয়াশিংটন ডি সি এই সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে কাজ করে, তার

কারণ হ'ল এই যে, ঐ দুটি শহর শুধুমাত্র আমেরিকার প্রধানতম শহর নয়, নয়া উপনিবেশবাদের মুখ্য প্রতিষ্ঠানগুলি, যেমন বিশ্বব্যঙ্ক, আই এম এফ, ওয়াল স্ট্রিট, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, রাষ্ট্রসংঘ— এ সবই ঐ দুটি শহরে অবস্থিত। নতুন এই বিশ্বের আর্থিক সংহতির রূপরেখা যে কেবলমাত্র আংশিকভাবে সংহত, স্বশাসিত, পারস্পরিকভাবে যুক্ত জাতীয় বাজারগুলির সংহতির ওপর নির্ভর করে তা নয়, বরং এগুলি পৃথিবীর আর্থিক বাজারে এক এবং একমাত্র প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, কারণ আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের এমন ক্ষমতার অধিকারী করেছে, যার সাহায্যে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তেও, কেন্দ্রীয়ভাবে ঠিক করা মুখ্য আর্থিক নীতির নতুন তথ্য ও সিদ্ধান্তসমূহ তাৎক্ষণিক ভাবে জানিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। এই সম্পূর্ণ নির্মিতিকে তুলে ধরা হয় আইন এবং পরিচালনব্যবস্থার একটি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। যার দুটি ভাগ বা পর্যায় বা দৃষ্টিকোণ রয়েছে এবং এই পর্যায় দুটি, একে অপরের আংশিকভাবে পরিপূরক। বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ, ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল ইন্‌স্টিটিউশন প্রভৃতি সংস্থা একসাথে দ্রুত নতুন পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে বলা যেতে পারে আন্তর্জাতিক সরকারের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করছে।

এদের কাজই হল বিশ্বজুড়ে এক অখণ্ড নীতি, দায়বদ্ধতা এবং শর্তাবলি চাপিয়ে দেওয়া বিশেষ করে, নয়া ঔপনিবেশিক দেশগুলির ওপরে। আন্তর্জাতিক সংস্থা— যেমন আই এম এফ, এই ব্যবস্থাপনাকে ঠিকভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়েছে এবং তাদের একটি অতি জটিল বৈধ কাঠামো ও পরিচালন-বন্দোবস্ত রয়েছে যা মেনে চলা বিশ্বের প্রতিটি দেশের জন্য ব্যধ্যতামূলক। এই বিশ্বায়নের মধ্যে একটি একই ধরনের সঙ্কটময় পর্যায় রয়েছে যা প্রতিটি দেশের আইন ও সার্বভৌমত্বকে আক্রমণ করে, এ দেশগুলিকে বাধ্য করছে সার্বভৌমতা বিসর্জন দিয়ে এবং নিজেদের আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে, মার্কিন আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আইন প্রবর্তন করতে। বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলি, সেইসব দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে না, যেসব দেশের আইন মার্কিন আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এই সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাপনার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত পর্যায়গুলি সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যায়। পুরনো পৃথিবীর আন্তর্জাতিকতাবাদের স্থান, আজ নতুন পৃথিবীতে 'বিশ্বায়ন' অধিকার করেছে। আধুনিক সময়ে বিশ্ববাজার হিসাবে বিশ্বায়ন এমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, অনির্দিষ্ট এবং অন্তহীন প্রতিযোগিতাই যার মূল কথা। অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতাবাদ, যা বিপ্লবী আদর্শের একটি স্বপ্ন, এমন একটি ব্যবস্থাপনার কথা বলে যেখানে প্রতিটি দেশ তার অন্তর্গত জাতিসত্তা, ধর্ম বা জাতীয়তাবাদের পৃথক ক্ষুদ্র পরিচিতিকে অতিক্রম করে একটি সাধারণ মানবিকতার সমুদ্রে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এই সবের উপরে বিশ্বায়নকে একটি প্রযুক্তির ফসল বলা যেতে পারে, যা আর্থিক লেনদেনকে আলোর গতি দেয়, যেটি পৃথিবীকে পালটে ফেলার ক্ষমতা রাখে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতাবাদ কিন্তু মানবিকতায় পরিপূর্ণ। জাতির সাথে জাতির সরাসরি সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত একটি সার্বজনীন বিষয়ের কল্পনা।

পৃথিবীতে সব ধরনের বৈষম্যের অবসানই আন্তর্জাতিকতাবাদের মূল্যবোধের ভিত গড়ে তুলেছে। বিশ্বায়নের সার্বজনীনতা কিন্তু শুধুমাত্র সঠিক বাজার গড়ে তোলার ভেতরেই সীমাবদ্ধ, সেই বাজার যা পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে বদলে দিতে পারে। সমস্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পণ্যে পরিণত করতে পারে এবং সেই পণ্যকে ক্ষুদ্র স্থানীয় ও বৃহৎ বিশ্ববাজারে বিক্রি করে দিতে পারে। মনে রাখতে হবে, এই 'বিক্রির' বাজার হ'ল বিশ্বজোড়া, যদিও পণ্যের উৎপাদন

সর্বদাই স্থানীয় ভাবে হয়ে থাকে। বিশ্বায়নের মূল আদর্শ কখনোই সমবন্টন তথা সামাজিক সুসম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তোলার কথা বলে না, এই আদর্শ বৈষম্য ও বিভেদ তৈরির জন্যই কাজ করে যেতে চায়। একটি সুন্দর ও সার্বজনীন বিভেদবর্জিত সমাজ গঠনের স্বপ্নকে সফল করার লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে অন্তহীন দুঃস্বপ্নের বিভীষিকায় পৌঁছে দিতে বিশ্বায়ন মানুষের সাথে মানুষের তীব্র প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটায়।

ধর্ম, আঞ্চলিকতা, ভাষা, বর্ণভেদ, আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো, জাতীয়তাবাদ— এই সবগুলিই কখনো একসাথে, কখনো বা আলাদা ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, শ্রমজীবী শ্রেণীর সংগ্রাম ঐক্যকে ভেঙে দেবার অথবা এই ঐক্য উন্মেষিত হতে না দেবার কাজে শ্রমজীবী মানুষের কাজের ক্ষেত্র অথবা সেই ক্ষেত্রের বাইরে তাঁদের বিশ্রাম ও বসবাসের স্থান— এই দুই জায়গাতেই আঘাত হানা হয়েছে উল্লিখিত অস্ত্রগুলি দিয়ে। প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে, ধর্মীয় বা জাতিগত বিভেদ এবং ঘৃণা যা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেগুলিকে বহু যত্নে খুঁচিয়ে জাগানো হয়েছে এবং সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদী সমাজে প্রত্যাবর্তনে এই ধর্ম জাতি-বৈরিতা হিংসা ও ঘৃণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বা বলা ভাল জরুরি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

নির্বোধ যুক্তিহীনতাই আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য, কারণ মানুষের যুক্তিহীনতা বাজারের যুক্তিহীন ব্যবস্থাপনাকে সমর্থন করবে। বিশ্বায়ন, পৃথিবীর বাজারকে সংহত করে পৃথিবীর মানুষদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়, কেননা, তবেই মানুষকে স্বতন্ত্র ক্রেতা হিসাবে ব্যবহার করে বিশ্ববাজারে মুনাফা লোটা যাবে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে যদি ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকে, তবে স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিটি মানুষের ক্রেতা হবার সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ে।

শ্রেণীসচেতনতাকে গোষ্ঠীচেতনা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার বাতাবরণকে অন্তহীন প্রতিযোগিতা, সমানাধিকার ও সমবন্টনের আদর্শকে বৈষম্য ও পক্ষপাতের হীন-আদর্শে রূপান্তরিত করার যুদ্ধে বিশ্বের পটভূমিকায় উত্তর-আধুনিকতা এবং তৃতীয় বিশ্বের পটভূমিকায় উত্তর-উপনিবেশিকতা মূল অস্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। মানুষের মধ্যে যদি বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশ্বাস থাকে তবে ঐ অস্ত্রগুলি কাজ করতে পারে না । বিশ্বায়নের আদর্শ, সমাজবাদের বিশ্বাস ও স্বপ্নকে ধ্বংস করে। উত্তর-আধুনিকতাবাদ এই ধ্বংসের কাজ কিছু পরিমাণে সম্পন্ন করে। যদি পৃথিবীর ছোট গোষ্ঠী ও দেশকে পারস্পরিক পরিচয় চিহ্নের পার্থক্যগুলিকে বড় করে দেখিয়ে, প্রত্যেককে প্রত্যেকের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে বিপ্লব সংঘটিত করার মতো কোনো বৃহৎ মানবগোষ্ঠী আর পৃথিবীর বুকে উপস্থিত থাকবে না। এখন ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক পুঁজি ক্রমশ স্ফীত হতে থাকবে এবং পুঁজিবাদ যাদের ওপর আক্রমণ হানে, সেই মানবগোষ্ঠী ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর উপগোষ্ঠীতে ভেঙে যেতে থাকবে। বিশ্বায়ন তথা সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শ —'ইতিহাসের অবসান' —এই তত্ত্বের সাহায্যে মানবগোষ্ঠীর বিভাজনের বাকি কাজগুলি সুচারুভাবে সম্পন্ন করে। 'ইতিহাসের অবসানে'র তত্ত্ব ঘোষণা করে যে---বিপ্লব এক অসম্ভব অবান্তর স্বপ্ন, সমাজবাদ পরাভূত। পুঁজিবাদের বিজয়ই চূড়ান্ত সত্য।

বিখ্যাত মার্কিন লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের কলম হ'ল এই আদর্শের উদ্‌গাতা, কিন্তু আমাদের কাছে সরাসরি যেহেতু ঐ সব বুদ্ধিজীবীরা আবেদন জানাতে পারেন না, তাই যতদিন পর্যন্ত আমাদের নিজেদের দেশের নেতারা ঐ সব বুদ্ধিজীবীদের বস্তাপচা আদর্শের ধুয়ো ধরে, দিনরাত একই কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা না করেন, ততদিন আমাদের কিছু যায় আসে না। যখন যশোবন্ত সিংহ আমাদের জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে অক্লেশে 'নষ্ট

সময়ের অতীত ইতিহাস' বলে চিহ্নিত করেন, তখন অবশ্যই তিনি মনে করেন স্বাধীন জাতীয়তাবাদী উন্নয়নের চিন্তাধারা নিছকই অলীক কল্পনা এবং আমাদের সকলকেই বিশ্ববাজারের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা স্বীকার করে, সমগ্র জাতিকে তার পদতলে পিষ্ট করার অন্যতম একটি পদ্ধতি হল উদারনৈতিক নীতিকে দরজা খুলে দেওয়া, এই পদ্ধতিদ্বয়ের অপর পৃষ্ঠে যা থাকে তা হল সমগ্র জাতিকে ধর্ম ও গোষ্ঠীর সংকীর্ণ মেরুকরণের মধ্যদিয়ে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার চক্রান্ত।' *(ফ্রন্টলাইন অক্টোবর ১৩, ২০০০-এ প্রকাশিত ও আমার রচিত 'বিশ্বায়ন— শ্রেণী বিভক্ত একটি সমাজ?'— প্রবন্ধ থেকে উপরের অনুচ্ছেদটি গৃহীত হয়েছে— এজাজ আহমেদ)।*

বিশ্বায়ন যে ইনফরমেশন টেকনোলজি বা তথ্যপ্রযুক্তিকে নিয়ে এত মাতামাতি করে, সেটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলিকে কিভাবে প্রভাবিত করে, তা দেখা যাক। এ বিষয়ে আলোচনার সময় আমি ফিল্ম, টিভি বা অডিও ও ভিডিও ক্যাসেটের বৃহত্তর ক্ষেত্র যেগুলি বর্তমানে প্রযুক্তিগত ভাবে তুলনায় কিছুটা পুরনো হলেও খুবই উন্নত এবং বর্তমানে সাংস্কৃতিকভাবে বহুল প্রসারিত, সেগুলিকে বাদ দেব। 'ইন্টারনেট' সম্পর্কে আমার কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথাই আমি বলব। কেননা আমরা প্রায়শই শুনি যে ইন্টারনেটের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে একই সাথে সমস্ত তথ্য বিপুলভাবে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিল গেট্‌সের অবিস্মরণীয় ভাষায়, 'ভার্চুয়াল রিয়ালিটি'তে সকলেই সমান।

আনন্দের কথা, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হল এই যে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ সারা জীবনে একবারও টেলিফোন ব্যবহার করার সুযোগ পেল না, এবং নিউ ইয়র্কের মানহাটান দ্বীপে যতগুলি টেলিফোন আছে, সারা আফ্রিকা মহাদেশে টেলিফোনের সংখ্যা তার চাইতে অনেক কম। তাহলে বাস্তব সত্য থেকে 'ভার্চুয়াল রিয়ালিটি'তে কিভাবে উত্তীর্ণ হবেন? পৃথিবীর ৭০ শতাংশ উৎপাদক এবং ভোক্তা মাত্র ১৫ শতাংশ মানুষ এবং এই স্বল্পসংখ্যক মানুষই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করেন। উত্তর আমেরিকা ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ বসবাস করেন, কিন্তু এরা পৃথিবীর মোট আয়ের ৭০ শতাংশ ভোগ করে থাকেন, এবং এরা পৃথিবীর মোট টিভি ও রেডিও সেটের তিনভাগের দু'ভাগ ব্যবহার করেন। পৃথিবীর মোট সংবাদপত্রের ৫০ শতাংশই প্রকাশিত হয় এই অঞ্চল থেকে।

অন্যদিকে আফ্রিকা বিশ্বের উৎপাদিত নিউজপ্রিন্ট কাগজের মাত্র ১ শতাংশ ব্যবহার করে। এবং এই বন্ধ্যাত্বও দীর্ঘ দিনের। ১৯৯৪ সালে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় রাজস্বের ৬৯ শতাংশ সংগৃহীত হয়েছে উঃ আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে, আর আফ্রিকা মহাদেশ ঐ রাজস্বের মাত্র ১ শতাংশ দান করেছে। যখন পৃথিবীর ৬ জন মানুষের মধ্যে একজন ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, তখন আফ্রিকায় এমন অনেক দেশ রয়ে গেছে যেখানে ইন্টারনেটের কোনো সুযোগই নেই। ভারত বাস্তব বুদ্ধির চূড়ান্ত অভাব দেখিয়ে নিজেকে তথ্য-প্রযুক্তির উদীয়মান ক্ষমতা হিসেবে ঘোষণা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করেছি। আসল পরিস্থিতি হল এই যে, একশ কোটি মানুষের দেশে, মাত্র ১৪ লক্ষ ইন্টারনেট যুক্ত কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে অর্ধেকই আবার সরকারি দপ্তরে।

একটি শিল্পোন্নত দেশের পরিমণ্ডলেও ইন্টারনেট ব্যবহার করাটা, তুলনায় একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীরই বৈশিষ্ট্য। কেননা তথ্যপ্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, এটিকে ব্যবহার করাটা ততই ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে, প্রাথমিকভাবে প্রায় ২০০০ মার্কিন ডলারে অত্যাধুনিক, আরও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা বাড়িতে বসানো যায়, এরপর রয়েছে নিয়মিত

ঐ ব্যবস্থাপনাকে উন্নতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক, আরও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ক্রমোন্নত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ব্যয়। সে কারণেই ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কিত সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে অতি উচ্চ আয় করেন এমন শ্রেণীর মানুষের হাতেই ইন্টারনেটের সুবিধা রয়েছে — এই তথ্যে বিস্মিত হবার কিছু নেই। ব্রিটেনে যে সব মানুষ বছরে ২৫,০০০ পাউন্ডের ওপর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় যাঁরা বছরে ৮০,০০০ ডলারের ওপর আয় করেন তাঁদের এক তৃতীয়াংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন।

একথা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে ইন্টারনেট প্রযুক্তি মাত্র এক দশকের পুরনো, কিন্তু এটি ইতিমধ্যেই বহুল ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। সুতরাং আশা করা যায় যে, আগামী দু দশকে এটি পৃথিবীর একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশেও পৌঁছে যাবে। ইন্টারনেট যে অনতিবিলম্বে এবং দূর ভবিষ্যতেও ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রতিটি মানুষ তো বহু পরের বিষয়, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যে অদূর ভবিষ্যতে ইন্টারনেটের সুবিধাভোগ করার সুযোগ পাবেন, এই অলীক কল্পনায় আমার কোনো আস্থা নেই। পৃথিবীতে প্রথম টেলিগ্রাফের লাইন পাতা হয়েছিল ১৮৩০ সালে আর লন্ডন ও বোম্বের মধ্যে টেলিগ্রাফিক সংযোগ ১৮৬৫ তে স্থাপন করা হয়। আজ পাশ্চাত্যের প্রতিটি মানুষের কাছে এবং তৃতীয় বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির নগরবাসী মধ্যবিত্তের প্রায় সবার কাছে টেলিফোন ব্যবহার করার সুযোগ সুবিধা রয়েছে, কিন্তু মানবসমাজের বৃহৎ অংশ আজ অবধি এমনকি কোনো টেলিগ্রাম হাতে পায়নি, আর পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ আজও কখনো কাউকে ফোন করেনি অথবা কারো ফোন পায়নি।

ভবিষ্যতের যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, তাতে মনে হয় যে আগামী দিনেও ইন্টারনেট একটি সংখ্যালঘু সুবিধাভোগী শ্রেণীর সংস্কৃতি চর্চার যন্ত্র হিসাবেই কাজ করার সুযোগ পাবে। এটি হবে একটি বিশেষজ্ঞদের জন্য তৈরি সংস্কৃতি চর্চা, যে বিশেষজ্ঞরা ব্যক্তিগত অথবা প্রতিষ্ঠানগত ভাবে এটি ব্যবহারের সুযোগ পাবেন এবং বিরাটভাবে উপকৃত হবেন। গবেষণা এবং তার ফলাফল সারা বিশ্বে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আর সংক্ষিপ্ততা একসাথে যুক্ত হবে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় এবং যোগাযোগের অতি সহজ পদ্ধতি সারা বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের গোষ্ঠীকে সারসরি যুক্ত করবে। এই বিশেষজ্ঞদের দলই মনে করবেন যে তথ্যপ্রযুক্তির এমত সহজলভ্যতা হল গণতান্ত্রিকতার একটি মহৎ পর্যায়, কেননা এর সাহায্যে সমস্ত মানুষের সকল তথ্য জানাবার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। বাস্তব অবস্থা অবশ্য ভবিষ্যতে যা দাঁড়াবে তা হল এই যে বিশেষজ্ঞ তৈরি করার সংস্কৃতি এতটাই সংহত এবং বিস্তৃত হবে যে তার বিশালতা এবং তাৎক্ষণিক গতি প্রিন্ট মিডিয়া কখনো অর্জন করতে পারবে না এবং একই সাথে বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ফারাকও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। আধুনিক সময়েই আমরা দেখছি যে, পৃথিবীতে যাঁরা ই-মেল পাঠাতে ও গ্রহণ করতে পারেন আর যাঁরা তা পারেন না ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে একটি বিভাজনরেখা জন্ম নিচ্ছে এবং ইন্টারনেট ব্যবহার যত বাড়ছে ততই সুবিধাভোগী শ্রেণীর সংখ্যা কমে আসছে। সত্যই যে মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ইন্টারনেট রয়েছে, তিনি শিকাগোয় থাকা একটি মানুষের খোঁজখবর অনেক ভালোভাবে ও নিয়মিত নিতে পারবেন। কিন্তু তিনি যে শহরে বাস করেন, তার একপ্রান্তে যদি এমন কোনো পরিচিত মানুষ থাকেন, যাঁর টেলিফোন নেই, তবে সেই মানুষটিকে খবরাখবর দেওয়াটা ঐ ইন্টারনেটযুক্ত ভদ্রলোকের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে।

আমি বারংবার জোর দিয়ে যে বিষয়টি নির্দেশ করতে চাইছি তা হ'ল এই যে, প্রতিটি নতুন প্রযুক্তিরই দুটি পরস্পর বিরোধী ফলাফল রয়েছে। সংস্কৃতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে, প্রতিটি

নতুন প্রযুক্তিরই একটি স্বাধীন ক্ষমতা থাকে, এটি শ্রমের সময় কমিয়ে দিতে এবং শ্রমপ্রক্রিয়ার অযৌক্তিকতাকে দূর করতে পারে; এটি সংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করে বহু মানুষকে সংস্কৃতি চর্চার আধুনিক উপকরণের বৃত্তে নিয়ে আসতে পারে, নতুন আবিষ্কার ও পরীক্ষানিরীক্ষার নবদিগন্ত উন্মোচিত করতে পারে। সেই কারণেই আধুনিকতা-বিরোধী ফাঁদে পা দেওয়া এবং প্রযুক্তি প্রসারের বিরোধিতা করা একটি বিপজ্জনক ব্যাপার। বরং যে বিষয়টিকে লাগাতার বিরোধিতা করে যেতে হবে, তা হল উৎপাদন ও ব্যক্তিমালিকানার মধ্যে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্ক যা স্বাধীনতার সমস্ত সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে, তাকে প্রাধান্য বজায় রাখবার উপকরণে পরিণত করে তুলছে।

বিশ্বায়ন যে প্রযুক্তির হাত ধরে চলে সে প্রযুক্তি যেরকম প্রাধান্যের সাথে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ছে তা উপনিবেশবাদের সাংস্কৃতিক প্রচার কৌশলের করায়ত্ত ছিল না কখনো। ভারতের বেশির ভাগ মানুষই কখনো উপনিবেশবাদের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেনি, স্ববিরোধিতায় ভরা এই ধারণার সাহায্যেই জাতীয় সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে অথবা একগুচ্ছ ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিকে জাতীয় সংস্কৃতি নামের একটি সাধারণ মোড়কে ঢেকে ফেলা হচ্ছে। আজকে সাক্ষরতার প্রসার তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, আর বৈদ্যুতিন সাক্ষরতা, লিখতে বা পড়তে পারার অক্ষরচেতনার চাইতেও বহুগুণ প্রসার লাভ করেছে। অর্থাৎ যেসব মানুষ মোটামুটি নিয়মিতভাবে টেলিভিশন দেখেন, তাঁদের সংখ্যা অনায়াসে বই পড়তে পারেন তেমন মানুষের সংখ্যার চাইতে অনেক বেশি। আরও বলা যায় যে, গণসংস্কৃতি ও জনপ্রিয় বিনোদনের প্রতিষ্ঠানগুলি, যেগুলি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে এত নিবিড়ভাবে পৌঁছতে পারে, যা আগে কখনো পারেনি, তারাও আদর্শগত, রাজনীতিগত, নান্দনিক মূল্যগত ভাবপ্রকাশের মাধ্যমের দিক থেকে প্রবল শক্তিধর মার্কিনি মাধ্যম বা মিডিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। সুতরাং ভারতে নয়া উদারনৈতিক নীতি প্রবেশের সাথে সাথে আমাদের দেশের টিভি চ্যানেলগুলির নিয়ন্ত্রণ যে বিদেশী মাধ্যমগুলির হাতে চলে গেল, সেকথা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী টিভি চ্যানেলের প্রতি প্রবল আসক্তি প্রদর্শন করে এবং প্রতিবার টিভি দেখার সময় তাদের মস্তিষ্কে ও চেতনায় বুর্জোয়া শ্রেণীর আদর্শ ও সাংস্কৃতিক রুচি সুকৌশলে প্রবিষ্ট করানো হয়।

এই বিষয়টিকে অবশ্য সরাসরি পশ্চিমি অনুপ্রবেশ হিসাবে আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। এই মন্তব্যের পেছনে কতগুলি যুক্তি অবশ্য রয়েছে।

প্রথমত, এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতাবাদের সরাসরি হস্তক্ষেপ নয়, মননহীন বুর্জোয়াশ্রেণীর সাংস্কৃতিক উচ্চাশা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বিশ্বায়নের প্রযুক্তি একে সাহায্য করে, সাহায্য করে নয়া উদারনৈতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির সূত্রাবলীও, কিন্তু বিশ্বায়নের জনসংস্কৃতির ভেতরে, ভারতের প্রধান সংস্কৃতিসমূহকে গ্রাস করার কাজে, ভারতীয়রাই সংগঠকের ভূমিকা পালন করে। সঠিকভাবে বলতে গেলে এই সমস্ত ভারতীয়রাই হলেন একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধি যাঁরা উপনিবেশিকতার ফলাফল থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং যাঁরা ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রের উৎপাদনগুলিকে, বড় ও উন্নত দেশগুলির জনসংস্কৃতির 'মডেল' হিসাবে প্রদর্শন করতে চান। যেমন বলিউডের সিনেমার কথা ধরা যাক, ভারতীয় পটভূমিতে হলিউড যা পারেনি, বলিউড তা পেরেছে, অর্থাৎ বিশ্বের বাজারে পুঁজিবাদী ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে সুচারুভাবে এবং মনোগ্রাহী করে পরিবেশন করার কাজে মুম্বাই ফিল্ম ইনডাস্ট্রি সম্পূর্ণ সাফল্য দেখিয়েছে। বিদেশী আর্থিক পুঁজির শক্তিমত্তার ছত্রছায়ায় এইভাবেই এই শ্রেণীর মানুষরাই ভারতীয় অর্থনীতিকে সংহত করেছেন।

এই বিষয়টি কিন্তু শুধুমাত্র অনুপ্রবেশ আর প্রতিরোধের ঘেরাটোপেই নিজের বৃত্ত সম্পূর্ণ করছে না। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, ভারতীয় আধুনিক সংস্কৃতির ও সমাজের প্রগতিশীল ও মূল্যবান সম্পদগুলি প্রাথমিকভাবে ইউরোপ থেকেই এদেশে এসেছে— উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মার্কসবাদ ও কমিউনিজম, উদার গণতান্ত্রিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাপাখানার প্রযুক্তি, মুক্ত প্রেস, আধুনিক সামাজিক ও অপরাধ আইন, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা— এ সব কিছুর ধারণাই প্রথমে ইউরোপে জন্ম নিয়েছিল এবং আমরা আমাদের দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে এগুলিকে ব্যবহার করেছি; যেমন আমরা রেলপথ আর কলে তৈরি দ্রব্যসামগ্রীও ব্যবহার করেছি।

পুঁজিবাদী সার্বজনীনতার মধ্যে ভারত অঙ্গীভূত হয়ে পড়লে নেতিবাচক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিই আমাদের দেশে চলে আসতে চাইবে, সুন্দর ও উৎকৃষ্ট মূল্যবোধগুলি নয়।

প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদ যেখানে রমরমিয়ে চলছে সেইসব উন্নত পশ্চিমী দেশগুলির সংস্কৃতিতে বহু উৎকৃষ্ট বস্তুও রয়েছে, যা যথাযথভাবে আমাদের দেশে আমরা ব্যবহার করতে ও কাজে লাগতে পারি। এইসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বিদেশী অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করে যাঁরা লোক দেখানো স্বদেশী আওয়াজ তুলে থাকেন; সেইসব শিবসৈনিক বা স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের কর্মীরাও, সরকারের হয়ে কাজ করছেন। এইসব রাজনৈতিক দল আওয়াজ তুলে বিদেশীপুঁজির কাছে ভারতের বাজারকে খুলে দিতে চায় এবং এমনভাবে ভারতীয় আইন, তথা সংবিধানকে সংশোধন করতে চায়, যাতে মার্কিনী পুঁজিপতি যাঁরা এদেশে লগ্নি করতে চান, তাঁদের সুবিধা হয়। ধ্রুব সত্য এটাই যে লোকদেখানো বা প্রতীকী ধাঁচের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের বাইরে এই দলগুলির একটি পা-ও যাবার ক্ষমতা নেই, কারণ শুধুমাত্র তাদের সরকার নয়, তাদের মূল সামাজিক ভিত্তি বা অবস্থান যেখানে, সেই উচ্চবর্ণ, উচ্চবিত্ত, বড় শহরের ব্যবসায়ী বুর্জোয়া গোষ্ঠীর এবং গৈরিক নব্যযুবা শ্রেণীর মানুষেরাই উদারনৈতিক নীতির সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থক গোষ্ঠীটি তৈরি করেছে।

যখন আমরা আমাদের দেশের বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন একটি উল্লেখযোগ্য বৈপরীত্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর যে অংশটি স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েকটি দশক ধরে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন, তাঁরাই একটি স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি ও দেশের মধ্যে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরি করতে সচেতন ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিপরীতভাবে অতি দক্ষিণপন্থার সেই শ্রেণীর মানুষেরাই এখন সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, প্রকৃত ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন এবং এরাই সবচেয়ে ব্যাপক এবং নমনীয়ভাবে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের কাছে নতি স্বীকার করতে চান। এর ফলে সাম্প্রদায়িকতা অদ্ভুত ধরনের একটি হিংসাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। অন্যত্র, এ প্রসঙ্গে আমি মন্তব্য করেছি এবং বলেছি যে ভারতের মত একটি দেশে, যেখানে উপনিবেশিকতা-বিরোধী জাতীয়বাদী চেতনা জাগরিত হবার অতীত ইতিহাস রয়েছে এবং বর্তমানে যে দেশ ঔপনিবেশিক শক্তির লক্ষ্যবস্তু, সে দেশে জাতীয়তাবাদী আদর্শের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদি দেশের প্রগতিশীল শক্তিগুলি, এই জাতীয়তাবাদের প্রবাহকে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধিতার অভিমুখে পরিচালিত করতে না পারে তবে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাৎঅভিমুখী শক্তি সেই শূন্যস্থান অনতিবিলম্বে পূরণ করবে। *(বিস্তারিত পাঠের জন্য 'তুলিকা' প্রকাশিত আমার 'Lineages of the Present' পৃষ্ঠা-২৮০-২৯৭ দেখুন — এজাজ আহমেদ।)*

আধুনিক সময়ে আর এস এস এবং তার সহযোগী বন্ধুরা, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের

একটি সাম্প্রদায়িক ভাষ্য প্রচার করতে চায়, কারণ উপনিবেশবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ প্রচার কববার সাহস তাদের নেই। মানুষের মন থেকে, আসল লড়াইয়ের ভাবনাটাকে মুছে দেবার আশায় মনগড়া ও প্রতীকী ছায়াযুদ্ধ চালায় এরা। সেজন্যই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাকে অস্বীকার করতে পারে না, করেও না, যদিও এরাই প্রকৃত বঞ্চনা ও শোষণের পেছনে আসল অপরাধী, তথাপি আর এস এস শুধুমাত্র কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেন দোকানের সামনে প্রতীকী বিক্ষোভ সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড সীমিত রাখে। উপনিবেশবাদের কাছে নতি স্বীকার করে নেবার পরে অবশ্য এই ছায়াযুদ্ধ করবার মত সাহসও তাদের থাকে না, কেননা মার্কিন করপোরেট সেকটরের যে কোনো একটি অংশের ওপর সত্যিকারের আঘাত করার অর্থ হলো ভবিষ্যতে এদেশে যারা পুঁজি লগ্নি করতে চাইবে এই আঘাত তাঁদের মনে ভীতির সঞ্চার করবে।

সেজন্যই বিদেশী সাংস্কৃতিক পরিভাষায় বার বার নতুন করে ব্যাখ্যা করা হয়। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, ভারতের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হলো মধ্যযুগের মুসলমান অনুপ্রবেশ। বিদেশী পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশ নয়, বিদেশী ধর্ম, মূলত মুসলমান ও খ্রিষ্টান ধর্মই সবচেয়ে বিপজ্জনক। সে জন্যই বর্বরোচিত ভাবে একের পর এক প্রাচীন মসজিদ ও গীর্জাগুলি ধ্বংস করা হচ্ছে কারণ তারাই হলো বিদেশী ধর্মের প্রতীকচিহ্ন এবং এই কাজকে 'জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধার' আখ্যায় ভূষিত করা হচ্ছে। আর এসব করা হচ্ছে এমন একটা সময়ে যখন ভারতীয় জাতীয় সম্পদগুলিকে যথেচ্ছভাবে বিদেশী এবং দেশীয় পুঁজিপতিদের হাতে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ যে উগ্র আন্দোলন করছে তার উদ্দেশ্য হল বাস্তব সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যাতে উপনিবেশবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ জন্ম না নিতে পারে, কারণ সত্যি সত্যিই স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ হল একটি আপাদমস্তক ধাপ্পাবাজি, যার প্রকৃত জাতীয় সম্পদগুলিকে রক্ষা করার মত সদিচ্ছা বা ক্ষমতা কোনটাই নেই।

এবারে সাংস্কৃতিক অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক বিশ্বায়নের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা শেষ করা যাক।

সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে, একদিকে জাতীয় ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং অপরদিকে বিশ্বায়নের সংস্কৃতির মধ্যে কিছু কিছু মৌলিক বৈপরীত্য আছে। এবং এই বিশ্বায়ন সাংস্কৃতিক উৎপাদনগুলিকে এক ছাঁচে ঢেলে নিতে চায়, যদিও প্রাচীন সাংস্কৃতিক শৈলীগুলির মূল ধর্মই ছিল বহুধা বিভক্ত বৈচিত্রে সমৃদ্ধ সুসংহত আঞ্চলিক ঐতিহ্যের প্রতীক। এবং খুব সরলভাবে এইগুলিকে আশ্রয় করেই ঐ শৈলীগুলি বেঁচে ছিল। পুঁজিবাদের সার্বজনীনতা যাকে আধুনিক কেতাদুরস্ত পরিভাষায় বিশ্বায়ন আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা সমস্ত ধরনের বিভিন্নতা এবং বৈচিত্রের মধ্য দিয়েও বেঁচে থাকতে পারে। এই বৈচিত্র ধর্মীয়, ভাষাগত, জাতিসত্তাগত, সাম্প্রদায়িক, উপনিবেশিক, উত্তর-উপনিবেশিক, স্থানীয়, জাতীয়, প্রভৃতি নানা ধরনের হতে পারে। আবার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রেখে তাকে ব্যবহার করাটাই হল পুঁজিবাদী বাজারের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। যার মধ্যে দিয়ে পণ্যায়নের সমতাকে ছোটখাটো বস্তুসমূহের চরিত্রগত পার্থক্যের মধ্যে লুকিয়ে ফেলা যায় এবং যাকে ছাড়া অনেকগুলি বস্তুর মধ্যে একটিকে বেছে নেবার কাল্পনিক স্বাধীনতার আশ্বাসকে টিকিয়ে রাখা যায় না।

আরো বিশেষভাবে বলা যায় যে পৃথিবীতে প্রকৃত মানবিকতা অবলুপ্তপ্রায়, সেখানে জাতিগত এবং অন্যান্য পার্থক্যকে টিকিয়ে রেখে, প্রয়োজনে এই পার্থক্যকে তৈরি করে মোহ সৃষ্টি করা, প্রতিযোগিতার প্রামাণ্যতাকে যথার্থতা দেওয়ার। বিষয়গুলি অর্থনৈতিক বা

সাংস্কৃতিক যে পরিমণ্ডলেরই হোক না কেন, পুঁজিবাদ একই সাথে এগুলিকে টুকরো টুকরো এবং সংযুক্ত করবার ক্ষমতা রাখে। দ্বিতীয়ত, 'বিদেশী' এবং 'দেশী' এই দুটি ছদ্ম দ্বি-মুখী পরিচিতি থেকে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আমাদের অগ্রসর হতে হবে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে। এবং মনে রাখতে হবে যে সত্যিই উপযোগী সাংস্কৃতি হল তা, যা মানবমুক্তির কাজ ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে, এবং তা রাজনীতি বা সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেরই হতে পারে। আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভাবনায় যা কালোপযোগী নয় তাকে যেমন বর্জন করতে হবে, তেমনি বিদেশী সংস্কৃতির যা কিছু প্রগতিশীল তাকেও আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করতে হবে। একটি জীবন্ত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই হল ভবিষ্যৎমুখীনতা এবং সে জন্যই সন্দিগ্ধচিত্তে ও সমালোচকের দৃষ্টিতে অতীত সংস্কৃতিকে বিচার করতে হবে। শুধুমাত্র আমাদের দেশে উদ্ভূত হয়েছে বলেই কোন ধর্ম বা সংস্কৃতি মহৎ হতে পারেনা।

ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রধান প্রধান একচেটিয়া ব্যবসাগুলি, বহুজাতিক পুঁজির গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে, তেমনি বিশ্বায়নের জটিল ও সূক্ষ্ম আধুনিক পর্যায় ভারতের মুখ্য সংস্কৃতিকেও গ্রাস করে নিচ্ছে।

জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এককালে সাংস্কৃতিক দিক থেকেই উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করেছে বটে, কিন্তু তা এখন অতীত। ব্যক্তিগতভাবে এবং ক্ষুদ্র দল হিসেবে এমন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা উপনিবেশবাদের সমর্থক নন। কিন্তু বিশ্বায়নকে প্রতিহত করবার যোদ্ধা হিসাবে এই শ্রেণী কখনোই কাজ করতে পারবে না। আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলিকে দেখলেই বোঝা যায়, যে জাতীয় বুর্জোয়া দলগুলির নিজেদের মধ্যে যতই মতপার্থক্য থাকুক না কেন; ব্যক্তিমালিকানা, নয়া উদারনীতি ও বিশ্বায়নকে সাদর আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে এরা নীতিগতভাবে সকলেই একমত।

'প্রলেতারিয়েত'-কে নতুনভাবে একটি শ্রেণী হিসেবে গণ্য করবার এবং প্রলেতারিয়েত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে একটি সামাজিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দেবার প্রয়োজন রয়েছে, কেননা আধুনিক সময়ে আমাদের অনেকগুলি শক্তিশালী আদর্শের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। যে আদর্শ বিশেষভাবে প্রচার করে যে, বিশ্বায়নের নতুন প্রযুক্তিগুলি, শিল্পশ্রমিকের প্রয়োজনীয়তাকেই বাতিল করে দিয়েছে, ফলত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তার ঐতিহাসিক মুখপাত্রকেই হারিয়েছে। এটা সত্য, যে আধুনিক উৎপাদনের কতকগুলি বৃহৎ ক্ষেত্রে, ঐতিহ্যবাহী প্রলেতারিয়েত শ্রমিকের স্থান, একদিকে যন্ত্রমানব দ্বারা ও তথ্যপ্রযুক্তি দ্বারা অধিকৃত হয়েছে। অন্যদিকে আমাদের বোঝার জন্যই দুটি বিষয়কে আরো গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

বিশ্বের অপশ্চিমী দেশগুলোতে যেখানে আংশিক শিল্পায়ন হয়েছে, অর্থাৎ চীন, ভারত থেকে শুরু করে ব্রাজিল অবধি অসংখ্য বড় ও ছোট দেশের শিল্পক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, ইতিহাসে যার তুলনা পাওয়া ভার এবং বলা যায় প্রলেতারিয়েতরাই একটি বিশ্বজনীন শ্রেণী তৈরি করেছে। নতুন প্রযুক্তির প্রাধান্য সত্ত্বেও কিছুটা চিরাচরিত প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে শিল্পায়ন প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই সব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মোট সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য মানুষের ভিড়, যাঁরা অপুঁজিবাদী কৃষিকাজ বা প্রাকপুঁজিবাদী হস্তশিল্প—উৎপাদনের কোনও সাবেকী গোষ্ঠীতেই অন্তর্ভুক্ত নন এবং বহুকীর্তিত তথ্যপ্রযুক্তি তো দূরের কথা, শিল্পউৎপাদনেও যাঁদের নিযুক্ত করা যাবে না। মানবজাতির সবচেয়ে বড় অংশটি তৈরি হয়েছে এইসব প্রচলিত শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকশ্রেণী ও বিরাট সংখ্যক কর্মহীনদের বিশাল মজুতবাহিনীকে নিয়েই।

সাম্রাজবাদের সব চেয়ে আধুনিক পর্যায়ের বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, উন্নত এবং অনুন্নত, উভয় দেশেই শ্রেণীমেরুকরণ বাড়ছে। তৃতীয় বিশ্বের বৃহৎ সংখ্যক দেশে এমন কতকগুলি উন্নত শিল্প উৎপাদন এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার কিছু কিছু বিশেষ অঞ্চলে আজকাল হতে দেখা যাচ্ছে, উন্নত দেশের মূল শিল্পক্ষেত্রেই যেগুলির দেখা পাওয়া যায়। যেমন ব্রাজিলের একটি ভক্স্ওয়াগন কারখানা, জার্মানিতে ভক্স্ওয়াগনের মূল কারখানায় যে পদ্ধতিতে ও যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন হয়, অবিকল সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করে। ভারতের বুকে দক্ষিণ কোরিয়ার যে সমস্ত কোম্পানির গাড়ি তৈরির কারখানা রয়েছে তারা নিজস্ব এবং একই পদ্ধতি, যা কোরিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছে, তাকে অনুসরণ করে। তৃতীয় বিশ্বের যে অংশে উন্নত দুনিয়ার মতো, সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, সেখানে এমন একটি বুর্জোয়া শ্রেণীর উন্মেষ হচ্ছে, যা বিশ্বের যে কোনো ধনী দেশের অত্যন্ত বড়লোক শ্রেণীর মতই ধনসম্পদের অধিকারী এবং ঐ সব দেশের ধনী মানুষদের মত একই ধরনের আচার ব্যবহার করে এবং একই বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করে। এই ব্যাপারটার ঠিক বিপরীতে রয়েছে চরমতম দারিদ্র্যের ঘটনা। দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সংখ্যা শুধুমাত্র যে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নয়, এই সংখ্যা উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের কোনো কোনো অংশেও দারুণভাবে বাড়ছে। মনে হয় এই ধারাটাই বর্তমানে চলবে।

বিশ্বের সর্বত্র বিশ্বায়নের আগ্রাসনে মার খাওয়া ক্ষতিগ্রস্তরা ছড়িয়ে আছে। এরফলে দুনিয়ার সর্বত্র নতুন শ্রেণী বিন্যাস, নতুন মেরুকরণ হচ্ছে। বিশ্বজনীন এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কোনো নয়া ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয় বুর্জোয়াদের তরফ থেকে নয়, দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্য থেকেই বিশ্বায়ন-বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্ল মার্কস যে সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন, তা হল এই যে বিশ্ববাজার তৈরি করাই পুঁজিবাদের প্রাথমিক কাজ, এ সত্যকে সামনে রেখে আমরা এখন ইতিহাসের সেই বিরল মুহূর্তের সাক্ষী থাকছি, যখন পুঁজিবাদের মৌলিক শ্রেণীগুলির অর্থাৎ বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা ও শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং একই সাথে পৃথিবী জুড়ে কর্মহীন শ্রমিক সেনানীর সংখ্যা ও চরিত্রও বিশ্বজুড়ে একই রকমভাবে দেখা দিচ্ছে। এই ঘটনার মধ্যেই বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বীজ সুপ্ত রয়েছে। এই সংগ্রামের রাজনৈতিক পন্থা একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। কেননা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর প্রতিরোধের সাথে কর্মহীন শ্রমিক সেনানী ও বিশ্বায়নে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষিদের বিশ্বায়ন-বিরোধিতা তথা সংগ্রাম একসাথে যুক্ত করে এই পথ নির্দিষ্ট হয়েছে।

বিশ্বায়ন বিরোধিতার অবশ্য একটি বৃহত্তর উৎসও রয়েছে। বিংশ শতাব্দীকে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি বিশ্বজুড়ে জন্ম নেবার একটি সুবর্ণযুগ বলা যায়। যদিও গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকে বুর্জোয়া মতাদর্শের ব্যাখ্যায় ভুল ভাবে উপস্থিত করে নির্বাচনী গণতন্ত্রের বৃত্তের মধ্যেই তাকে আটকে ফেলা হয়। যদিও গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আরো মৌলিক যুক্তিবাদের সাহায্যে 'গণতন্ত্র' বিষয়টিকে আমাদের বোঝা প্রয়োজন। গণতন্ত্র হল একটি সমানাধিকারের রাজনৈতিক পদ্ধতি, যা মানবজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রগুলি জুড়ে থাকে এবং যে পদ্ধতির অভ্যন্তরে মৌলিক প্রশ্ন হিসাবে শ্রেণী, জাতীয়তা। লিঙ্গ ও জাতিসত্তাগত পরিচয়গুলি লুকিয়ে থাকে। 'সেই অর্থেই, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম যা বিংশ শতাব্দীর কেন্দ্রীয় সত্য, তা একই সাথে স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের জন্য লড়াই-এর অনেক বড় ঐতিহাসিক পটভূমিকায় একটি ধারালো তরবারির মত কাজ করেছে।

সমাজতন্ত্রের জন্য আন্দোলন, যা শ্রেণী সংগ্রামকে কেন্দ্র করে এবং উপনিবেশবাদ-বিরোধী

আন্দোলন যা জাতীয়তাবাদের চেতনাকে কেন্দ্র করে জন্ম নিয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল বিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই-এরই একটি প্রসারিত রূপ।

এই দুই আন্দোলনের ধারা একে অপরকে শক্তিশালী করে তোলবার কাজে দারুণভাবে সাহায্য করেছিল এবং এদের সাথে যুক্ত হয়েছিল প্রতিটি নাগরিকের একই ধরনের আইনের ক্ষমতা যা বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতদের সাথে অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনের জন্ম দিয়েছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার দাবি করার এই বৃহত্তর পটভূমিকায় বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে কৃষকসমাজ, গড়ে তুলবে বঞ্চিত মহিলারা (বিশেষত দলিত শ্রেণীর প্রতিনিধি মহিলারা), শিল্পক্ষেত্রে যুক্ত নন এমন অসংখ্য গরিব মানুষেরা, পরিবেশ আন্দোলনের সংগঠকরা বামপন্থীরা এবং তরুণ যুবক-যুবতীরা। আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন নতুন সচেতনতা এবং নানা ধরনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিপ্লবের প্রয়োজনীয় উৎস লুকিয়ে রয়েছে শ্রমজীবী শ্রেণীর রাজনীতি ও দলিত শ্রেণীর ঐক্যে, সেই বিপুল মানব সমাজের মধ্যে যারা জীবনযাপনের ন্যূনতম সুবিধা অথবা মানুষের যোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। এ রকম বিশ্বব্যাপী বঞ্চনা ইতিহাসে, এমন কি পুঁজিবাদের ইতিহাসেও কখনো ঘটতে দেখা যায়নি।

শেষ করার সময় প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির আঙ্গিকের প্রশ্নগুলিকে আবার স্মরণ করা যাক। প্রথম কথা যেটা বলা যায়, তা হল এই যে, উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তিগুলির (সাংস্কৃতিক উৎপাদনও এর মধ্যে রয়েছে) ভিতরে গণতন্ত্রীকরণের বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে, কিন্তু এই ক্ষমতাকে অনুধাবন করবার পরিবর্তে উৎপাদন ও ব্যক্তিমালিকানার মধ্যে যে আধুনিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা এই প্রযুক্তিগুলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং গভীর কার্যকরী, ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিস্তারের এবং সামাজিক মেরুকরণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে সাহায্য করে। আমাদের মনে এবিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যতদিন পুঁজিবাদ কায়েম থাকবে, ততদিন প্রযুক্তির প্রধান কাজ হবে মুষ্টিমেয়র সংস্কৃতিকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া।

এই প্রযুক্তিগুলি নিরপেক্ষ, ব্যবহার করা এবং পাওয়াটা খুব সহজ এবং সে জন্যই এগুলি গণতন্ত্রীকরণ পদ্ধতির সহায়ক। এই দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন এবং আধিপত্যের আদর্শকে এই দাবি অদ্ভুত রহস্যময়তার ধোঁয়াশায় লুকিয়ে রাখে। তাই এই জাতীয় অলীক কল্পনায় আস্থা জ্ঞাপন করা অনুচিত।

আবার উল্টোদিকে আধুনিকতা-বিরোধী যে জনপ্রিয় বক্তব্য আমরা শুনতে পাই, যার মূল বিষয় হলো, যেহেতু আমাদের একটি প্রাচীন প্রলেতারিয়েত ঐতিহ্য রয়েছে সেজন্য আমাদের কোনো প্রযুক্তির প্রয়োজন নেই। কারণ শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রয়োজন হল শুধুমাত্র প্রলেতারিয়েত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। সব থেকে প্রথমে আমাদের মনে রাখা দরকার, যে, যদি শ্রেণীশত্রুরা এই প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়, তবে এই একচেটিয়া অধিকারকে চূর্ণ করতেই হবে কেননা বামপন্থীদের স্মরণে রাখতে হবে যে এই প্রযুক্তিগুলির মধ্যে গণতন্ত্রীকরণের অমিতশক্তি লুকিয়ে রয়েছে, এবং এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই যে, বুর্জোয়াদের তৈরি যে সাংস্কৃতিক মাধ্যম, অর্থাৎ টিভি, সিনেমা, অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট প্রভৃতি প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর মধ্যেও একটি স্তরবিভাজন সৃষ্টি করেছে এবং বুর্জোয়া ধাঁচের একটি সাংস্কৃতিক রুচি তৈরি করেছে। সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি শাসক শ্রেণীর শ্রেণী আদর্শ এবং সাংস্কৃতিক শৈলীকে প্রাধান্য দেবার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তাই আমাদেরও ঐ সব প্রযুক্তিগুলিকেই ব্যবহার করতে হবে, যাতে মানুষের চেতনা, রুচিকে অন্য পথে পরিচালিত করা যায়।

তিনটি অন্য বিষয় সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রলেতারিয়েত ও

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা যখন সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে, তখন সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমগুলির মধ্যে এমন কোনো বৈপরীত্য থাকে না যার মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেবার প্রশ্ন ওঠে। যে প্রশ্ন ওঠে তা হল ঐ পরিস্থিতিতে কোন মাধ্যমটি সুপ্রযুক্ত হবে, বা সহজলভ্য হবে। কোনো একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে যে মাধ্যমটি সুপ্রযুক্ত হবে, অন্য পরিস্থিতিতে তা নাও হতে পারে, সেইজন্য এক্ষেত্রে কোনো একটি মাধ্যমকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলা চলবে না। দ্বিতীয়ত, —প্রলেতারিয়েত এবং কর্মহীন শ্রমিক সেনানীর সংযুক্ত ও বিপুল সামাজিক সমষ্টিকে; সেই সমষ্টি গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্র এবং নাগরিক শিল্প উভয়েরই অংশ হতে পারে, যদি পর্যালোচনা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে ঐ সব আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে হয় তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই অথবা যৎসামান্য অভিজ্ঞতা আছে এবং তাদের বৃহৎ অংশের ঐ প্রযুক্তির সাথে শুধুমাত্র একটি অলিখিত সম্পর্ক রয়েছে। বিনোদনের নতুন মাধ্যমের আমদানি কিন্তু পুরনো সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলির প্রয়োজনীয়তার অবসান ঘটায়নি, এই পুরনো সংস্কৃতি ঐতিহ্যগত বা প্রলেতারিয়েত আন্দোলন সম্ভূত, যাই হোক না কেন। এমন কি পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে যেখানে নবতম প্রযুক্তির অবদানগুলি অনেক ব্যাপকভাবে সহজলভ্য সেখানে প্রতিবাদের রাজনীতির সাংস্কৃতিক প্রকাশ, আজও ক্ষুদ্র মাধ্যমগুলির ওপরেই মুখ্যত নির্ভরশীল, কেননা রাজনীতিতে 'সাংস্কৃতিক' শব্দটি যে অর্থ বহন করে তার দ্বারা অজ্ঞাত পরিচয় জনসমষ্টির শ্রোতা বা দর্শকের ভূমিকায় নিশ্চেষ্টরূপে কোনো কিছুর গ্রহণ বোঝায় না, সত্যিকারের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে কোনো সাংস্কৃতিক মাধ্যমের সাথে জনসমষ্টির যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাকে বোঝায়। এইটেই হলো সেই কেন্দ্রীয় সত্য, যা প্রযুক্তির সহায়তায় উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী যে সাংস্কৃতিক বাতাবরণকে প্রসারিত করার জন্য তৈরি হচ্ছে তার সাহায্যে সম্পূর্ণ করে তোলা যাবে।

আমি যা বলবার জন্য চেষ্টা করেছি তা হল এই যে, সংক্ষেপে, বিশ্বায়নের প্রতিটি দিকই স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। রাজনৈতিক, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি-- উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বায়ন আরো স্ববিরোধিতা সৃষ্টি করবার মতো প্রভাব ফেলেছে। এই পদ্ধতির শক্তিমত্তাকে খাটো করে দেখবার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু বিশ্বায়নের স্ববিরোধের প্রকৃতি থেকেই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের রাজনীতির বীজ উপ্ত হবে।

ভাষান্তর ঃ বিদিশা ঘোষদস্তিদার

মূল রচনা ***'Culture and Globalisation'*** *নতুনদিল্লির জননাট্য মঞ্চ* ***(JANAM)*** *আয়োজিত সফদার হাশমি স্মারক বক্তৃতার লিখিত রূপ। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও* ***SAHAMAT (Safder Hasmi Memorial Trust)****-এর বরিষ্ঠ সংগঠক রাজেন্দ্রপ্রসাদের সৌজন্যে পাওয়া। লেখকের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত।*

বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি

মালিনী ভট্টাচার্য

প্রভাত পট্টনায়ক তাঁর সমকালীন একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন আমেরিকায় বামপন্থী বয়ানগুলির মধ্যেও অধুনা 'সাম্রাজ্যবাদ' কথাটির বিষয়ে এক 'বধির করা' নীরবতা খেয়াল করা যায়, যা নাকি বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের সর্বব্যাপী ক্ষমতা ও সজীবতারই প্রমাণ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আজকের দিনে 'বিশ্বায়ন' কথাটি এই নীরবতাকে আরো ঘনীভূত করার একটি মতাদর্শগত ঘেরাটোপ ছাড়া আর কিছু নয়। এর প্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছে গত দুই দশক ধরে তথাকথিত তৃতীয় দুনিয়ায় ঋণদাতা সংস্থাগুলির ব্যাপক অনুপ্রবেশ, তাদের নির্দেশিত 'কাঠামোগত সামঞ্জস্যবিধান' (Structural adjustment) এর কর্মসূচী, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ব্যাপক বিলগ্নিকরণ এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার উচ্চারিত উপস্থিতি। মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক স্তরেও অনেকে বিশ্বায়নকে 'বিলম্বিত সাম্রাজ্যবাদ'-এর (Late imperial culture) একটি লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাংস্কৃতিক পরিসরের মধ্যে তা কী ভাবে কাজ করে তা নিয়ে আরো অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার অবকাশ আছে। এই প্রবন্ধে 'বিলম্বিত সাম্রাজ্যবাদ'-এর যুক্তিকে মাথায় রেখেই লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পীদের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব কী হতে পারে তা নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বলতে সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের সাংস্কৃতিক পরিসরে বহুজাতিক বাজারি শক্তির অনুপ্রবেশের কথাই আমরা বোঝাই। আরো বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সংস্কৃতির সওদাগরদের দুনিয়াজোড়া প্রভাব বিস্তারের প্রসঙ্গটি আসে। যাঁরা এই বিষয় নিয়ে চর্চা করেন, তাঁরা সারা বিশ্বের টেলিভিশন যোগাযোগ ব্যবস্থা, সিনেমার পর্দা এবং বায়ুতরঙ্গের উপর দখলদারির কথা বলেন। ব্যাংকক ও টোকিওতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত ম্যাডোনার 'সেক্স' নামধেয় অ্যালবামটি কয়েক ঘন্টায় বিক্রি হয়ে যায়। ইউরোপের সাংস্কৃতিক রাজধানী প্যারিসে মার্কিন ছবির যতো উদ্বোধন হয় তা নিউ ইয়র্ক বা লস অ্যাঞ্জেলিসকেও পিছনে ফেলে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই গোটা দুনিয়ার উপর সাংস্কৃতিক ছায়াপাতের প্রচেষ্টা বিশ্বায়নের একটি দিক। কিন্তু এই চিত্রটিকে আরো জটিল করে দিচ্ছে অন্য কতোগুলি বিষয়। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের নমুনাগুলি অনেক সময়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলেও যে বৃহৎ যোগাযোগ সংস্থাগুলির মাধ্যমে এইসব বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তার বাস বিশ্বের যে কোনো জায়গাতেই হতে পারে। এই বৃহৎ যোগাযোগ সংস্থাগুলি গোড়ায় ব্যবহৃত হয়েছে

মহাজনি পুঁজির দ্বারা, তাদের অর্থনৈতিক লেনদেন এবং ফাটকা খেলার বার্তা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে দেবার জন্য। সারা বিশ্ব জুড়ে এই লেনদেনের ঊর্ণাজাল বুনে ফেলার জন্যই তাদের প্রয়োজন হয়েছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু যোগাযোগ প্রযুক্তির এই ব্যবস্থাগুলি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের কাজেও ব্যবহৃত হয়। তাই এই প্রযুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা মানেই সারা বিশ্বের সাংস্কৃতিক চলাচলের উপরেও নিয়ন্ত্রণ থাকা। বিভিন্ন দেশে মানুষের সৃষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ভাষা কখনোই ভৌগোলিক, রাষ্ট্রীয় বা ভাষাগত সীমানাকে মানেনি। এই বাধাগুলি ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আজ উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি যখন সংস্কৃতির বাহন তখন এই প্রযুক্তিকে যে নিয়ন্ত্রণ করবে, মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনার উপরেও সে দখলদারি করতে পারবে। এখানে আমরা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের আরেকটি মাত্রা দেখতে পাচ্ছি যেখানে সাম্রাজ্যবাদের সীমানা শাসক ও শাসিতের ভৌগোলিক অবস্থান দিয়ে নির্ধারিত হয় না।

এখানে আরো একটি প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে । অনেকদিন আগেই মার্শাল ম্যাকলুহান প্রচার করেছিলেন তাঁর 'গ্লোবাল ভিলেজে'র তত্ত্ব। যেখানে বিশ্বের মেরুগুলির মধ্যে দূরত্ব কমে গিয়ে সারা পৃথিবী পরিণত হবে একটি গ্রামে। তথ্যপ্রযুক্তির অতিদ্রুত বিবর্তনের ফলে স্থানিকতা এবং জাতীয়তার সব গণ্ডি যেখানে মুছে যাবে এবং একটি গ্রামসমাজের দৃঢ়বদ্ধ ও সমীকৃত চেহারা গোটা বিশ্বের মসৃণ নিভাঁজ ঐক্যে প্রতিফলিত হবে। প্রযুক্তিভিত্তিক সমীকরণই হবে এই বিশ্বগ্রামের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বায়নের চাপে জাতীয় এবং স্থানিক সংস্কৃতির অবলোপের এই সম্ভাবনা নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু সার্বিক সমীকরণের এই চিত্রের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। ভারত এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্য দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাগুলির নির্দেশ মেনে রাষ্ট্রে যতই তার জনকল্যাণমূলক ভূমিকাকে গুটিয়ে এনেছে ততোই সেই রাষ্ট্রের মধ্যে ভাষা, ধর্ম এবং জাতিসত্তার ভিত্তিতে পারস্পরিক বিভেদ ও স্বতন্ত্রতার বোধ বেড়ে গেছে। এই সব স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রভেদ বিশ্বায়নের যুগে যেভাবে প্রকট হয়ে উঠছে, পরম্পরার বিভিন্নতা নতুন নতুন চেহারায় যেভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে তা আগে কখনো দেখা যায়নি। অর্থনীতিবিদরা অনেক সময়ে বলে থাকেন যে, বাজারের স্বার্থেই জাতীয়তা ও স্থানিকতার গণ্ডি ঘুচিয়ে সমীকরণের প্রয়োজন দেখা যায়। মার্শাল ম্যাকলুহান কথিত বিশ্বগ্রামের ছবি বাজারের স্বার্থে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমীকরণের ছবির সঙ্গে ভালোই মিলে যায়; কিন্তু কার্যত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্থানিক সত্তা, জাতিগত সত্তা ও 'এথনিসিটির' যে বাড়বাড়ন্ত বর্তমান দেখা যাচ্ছে তা এই সমীকরণের তত্ত্বের থেকে আপাত বিচ্ছিন্ন এবং একে ব্যাখ্যা করতে গেলে সমীকরণের এই সহজ তত্ত্ব যথেষ্ট নয়।

আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ এখনো গ্রামে বসবাস করেন। যদিও নগরায়নের গতি দ্রুততর হয়েছে। আমরা এই প্রবন্ধে লোকসংস্কৃতি বলতে মূলত বোঝাচ্ছি গ্রামের শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের অনুসৃত সংস্কৃতির পরম্পরাগুলিকে। গ্রামের সমাজ অবশ্যই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এবং গ্রামের উচ্চকোটির মানুষের মতাদর্শগত প্রভাব স্বভাবতই গ্রামীণ শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির সংস্কৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের সৃজনশীলতা অনেক সময়েই শাসক সংস্কৃতির গণ্ডিগুলিকে পেরিয়ে নিজস্ব ভাষার পরম্পরা তৈরি করে নিয়েছে। এই মানুষেরা মূলত নিরক্ষর। তাঁরা মূলত কৃষিকাজের সঙ্গে সংযুক্ত অথবা গ্রামসমাজের অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজ তাঁরা করে থাকেন। বর্ণহিন্দুর সংখ্যা তাঁদের মধ্যে খুব কম। তাঁরা তথাকথিত 'নিম্নবর্ণে'র মানুষ, আদিবাসী গোষ্ঠী বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁদের এই সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলিতে যে ইতিহাসের গতি কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি তা নয়, কিন্তু এইসব পরিবর্তন ঘটেছে প্রায় অদৃশ্যভাবে ধীরগতিতে। নগরায়নের প্রভাবে এগুলি এমনকী এখন

পর্যন্তও আমূল পালটে যায়নি। এই পরিস্থিতিতে যখন এক প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সাংস্কৃতিক বাজারের কাছে আমাদের গ্রামসমাজের এই সাংস্কৃতিক পরিসর উন্মুক্ত হয়ে যায় তখন তা কীভাবে প্রভাবিত করে এই পরিসরকে?

একটা সম্ভাবনা এইরকম যে, নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের জীবনের ছন্দ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। কৃষিকাজের ধরন, তার সময়বৃত্ত, তার পরিমণ্ডল— এইসমস্ত বস্তুগত অর্থনৈতিক সম্পর্কের আদল আমূল পরিবর্তিত হবার মধ্য দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক ধারাগুলিও লুপ্ত হয়ে গেল এবং বৈদ্যুতিন দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমের যে দুনিয়া আজকের নগর সভ্যতায় সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছে, এই গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের চেতনাও সেই রাজ্যেরই বশংবদ প্রজা হয়ে গেল। বস্তুত, গ্রামের মধ্যে সিনেমা, ভিডিও ক্যাসেট, এমন কী টেলিভিশনেরও অনুপ্রবেশ আমরা আজ অনেক জায়গাতেই দেখতে পাচ্ছি। লোকসংস্কৃতির ধারাগুলির মধ্যেও তার অনুরণন অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, নগরসভ্যতার অনুপ্রবেশ বা সংস্কৃতিতে বাজারের ধারণার অনুপ্রবেশ মানেই তো 'বিশ্বায়ন' নয়। টাইম-ওয়ার্নার, টার্নার ব্রডকাস্টিং বা স্টার টেলিভিশনের দুনিয়াজোড়া উপস্থিতি এবং বাজার থাকলেও স্যাটেলাইট-যোগাযোগের সীমাবদ্ধতার কারণেই তার পক্ষে সরাসরি ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে যাওয়া সহজ নয়। এখন পর্যন্ত গ্রামে 'টেলিভিশন' বলতে গেলে দূরদর্শনের অনুষ্ঠানসূচিই বোঝে। দূরদর্শনের অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপনগুলিতে বিশ্ববাজারের যে ছায়াপাত গত কয়েকবছর ধরে ঘটেছে, দূরদর্শনের ছাঁকনিতে ছাঁকা হয়েই শুধু তা গ্রামীণ দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারে। এছাড়া ভাষারও সমস্যা আছে, যদিও এখন হলিউডি ছবির চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা বসিয়ে দেওয়ার প্রকরণও এসে গেছে। তবু ম্যাডোনার অ্যালবাম বা হলিউডি 'বে-ওয়াচ' প্রভৃতির চাপে গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের চেতনা সরাসরি বদলে যাবে, সেই চেতনায় আধুনিক পশ্চিমী মতাদর্শের কোনো প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটবে, 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের' এই সরলীকৃত বয়ানকে মেনে নেওয়া যায় না।

তাছাড়া 'বিশ্বায়নে'র ঘটনার সূত্রপাত হওয়ার আগে থেকেই তো গ্রামীণ সংস্কৃতির ওপর নগরের বাজারকেন্দ্রিক সভ্যতার ছায়াপাত ঘটেছে। নব্বইএর দশকের গোড়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োজিত হাক্‌সার কমিটি সংস্কৃতি বিষয়ে সরকারি নীতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে লক্ষ করেছিল লোকসংস্কৃতির সৃষ্টিগুলিকে পণ্য হিসাবে বা সংগ্রহশালার সামগ্রী হিসাবে আহরণ করে আনার শহুরে প্রবণতা। একদিকে যখন গ্রামসমাজে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে এবং ঘরবাড়ি, পোশাক আশাক, ব্যবহার্য বস্তু সবই শহরের বাজারের আওতায় চলে আসছে, চাহিদা ও জোগান সেই নিয়ম অনুযায়ীই নির্মিত হচ্ছে তখন আবার গ্রামের জিনিসকে বাছাই করে তুলে এনে তাকে পণ্যযোগ্য মোড়কে পুরে তা নিয়ে ব্যবসা করার মতো অনেক মানুষও জুটে যায়। হিন্দি 'ফিল্‌মি' গানে রাজস্থানী লোকসংগীতের সুর নিয়ে কুম্ভিলকবৃত্তি, গুজরাট-অন্ধ্র-বিহার-উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ কারুশিল্পীদের কাছ থেকে কম দামে জিনিস কিনে হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে তা দেশীয় ধনীদের ড্রয়িংরুমে বা লন্ডন-প্যারিস-নিউইয়র্কের সংগ্রহশালায় পাচার করা — এসব তো অনেকদিন ধরেই শুরু হয়ে গেছে। একে আমরা নগরায়ন বা বাজারিকরণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে পারি; কিন্তু এখানে 'বিশ্বায়নের' ভূমিকা কী তা নিয়ে ভাবতে গেলে আমাদের যুক্তিতে আরো কতগুলি মাত্রা যোগ করতে হবে।

গ্রামীণ লোকশিল্পী আজ দোতরা ব্যবহার না করে 'সিন্‌থেসাইজার' ব্যবহার করেন। তাঁর চরিত্রগুলিকে তিনি 'ফিল্‌মি' নায়ক-নায়িকার আদলে সাজান, তাঁর গানের পরম্পরাগত সুরকে পাল্‌টে দিয়ে দর্শক আকর্ষণ করার জন্য হিন্দি সিনেমার সুর লাগিয়ে দেন। এগুলি সম্বন্ধে তাঁরা

য় নেহাৎ অচেতন তা বলা যাবে না। দর্শক বা শ্রোতা আকর্ষণ করার জন্যই তাঁদের এই প্রচেষ্টা। কিন্তু 'বিশ্বায়নে'র প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। তবে যে প্রক্রিয়াগুলি অনেকদিন ধরেই চলছে, বিশ্বায়নের প্রকোপে তা আরো ত্বরান্বিত হচ্ছে, ঘনীভূত হচ্ছে, নগরায়ন তথা বাজারিকরণের অনেক নতুন প্রকরণ গজিয়ে উঠছে, এটা বললে বোধহয় ভুল হবে না। হলিউডি চিত্রকল্প লোকসংস্কৃতির ধারার মধ্যে চলে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু সাংস্কৃতিক বর্ণালীর এক মেরুতে দেশীয় শহরজাত সংস্কৃতিও যেমন নিজের মতো করে বিশ্বায়নের ধাক্কাকে অন্তস্থ করছে, তেমনি অন্য মেরুতে লোকসংস্কৃতির জগতেও তার পরোক্ষ প্রভাবই অনুমান করা যেতে পারে। বিশ্বায়নের যুগেও পরিস্থিতি হয়তো কখনোই এমন হবে না যে দেশীয় সাংস্কৃতিক উপাদান সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গিয়ে বহুজাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারের থেকে আমদানি-করা জিনিসের ওপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ব। অথবা আমাদের দেশে যে বিপুল ও বহুবিচিত্র সাংস্কৃতিক উৎপাদন ব্যবস্থা তা পুরোপুরি এই বহুজাতিকগুলির দখলে চলে যাবে। তা যদি যায়ও তাহলেও কি তাঁরা পাশ্চাত্যের চিত্রকল্পগুলির দখলে চলে যাবে? তা যদি যায়ও তাহলেও কি তাঁরা পাশ্চাত্যের চিত্রকল্পগুলিকেই পুরো আমাদের মাটিতে এনে উগ্‌রে দেবে, না কি একটি বিশেষ দেশের দর্শকের সাংস্কৃতিক প্রবণতার ওপর নজর রেখে তাদের পছন্দসই জিনিসগুলোকেই কিছুটা ভিন্নভাবে রং পালিশ করে তুলে ধরবে? বিশ্বায়নের বিস্তার তো কোনো নির্বাত শূন্যতার মধ্যে ঘটে না, আগে থাকতে মানুষের সাংস্কৃতিক অভ্যাস যা ছিল, যে সাংস্কৃতিক পরম্পরায় তার চেতনা বিন্যস্ত ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই বিবর্তন ঘটে। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও 'বিশ্বায়ন' মানে এই নয় যে যা ছিল তা রাতারাতি ধুয়েমুছে নিঃশেষ হয়ে পাশ্চাত্য থেকে আগত নানা নমুনা হঠাৎ করে আমাদের চেতনার ওপর চেপে বসবে। কিন্তু তার অর্থ এও নয় যে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রটি বিশ্বায়নের আওতার বাইরে রয়ে যাবে।

অনেকে বলেছেন 'মূক নিম্নবর্গীয়' বা silent subaltern এর কথা। তাঁদের মতে সংস্কৃতির জগৎ বা চেতনার জগৎকে প্রবল প্রতিপক্ষ যখন দখল করে নেয়, তখন সেই দখলদারির ভাষা আয়ত্তে না থাকার ফলে নিম্নবর্গীয় মানুষ আশ্রয় নেয় নীরবতার মধ্যে; এই মানসিক পশ্চাদপসরণ, এই নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাওয়াই তার প্রতিবাদের অনন্য রাস্তা। এই তত্ত্ব কিন্তু ধরেই নিচ্ছে যে একটি সমাজে যে সাংস্কৃতিক বর্ণমালাগুলি রয়েছে তার প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ, এক সাংস্কৃতিক ভাষার সঙ্গে আরেকটির কোনো আদানপ্রদানই সম্ভব নয়, প্রবলের চাপে দুর্বলের কণ্ঠরোধই হয়ে যায় শুধু এবং সমাজের মধ্যে তার ভাষার আত্মপ্রকাশ করার মতো কোনো জায়গাই থাকে না। এই তত্ত্বকে বোধ হয় সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া যায় না; আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই আমরা দেখি যে বাইরের প্রবল প্রভাবকে প্রতিহত করেও তথাকথিত 'নিম্নবর্গীয়' চেতনা নিজের মতন করে তার মুখোমুখি হচ্ছে।

যখন আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল সেসময়ে বৃহত্তর জনসাধারণ একটা সময় থেকে এই আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করে। মধ্যবিত্তের চেতনার সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের চেতনার স্বাভাবিক শ্রেণীগত তফাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের কোনো কোনো মুহূর্তে নাড়া খেয়েছিল, শ্রেণীবিভাজনের দেওয়ালে কতগুলি চিড় দেখা দিয়েছিল। লোকশিল্পীদের কেউ কেউ এই আন্দোলনে আলোড়িত হয়ে শ্রেণীগত নীরবতার প্রাচীর অতিক্রম করে শহরের মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের কতগুলি সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। এবং নিজেদের পরম্পরাগত শিল্পধারায় পরিবর্তন এনে বৃহত্তর রাজনৈতিক-সামাজিক পালাবদলের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পেরেছিলেন। মুকুন্দদাস থেকে শুরু করে

ভারতীয় গণনাট্যসংঘের যুগের রমেশ শীল, নিবারণ পণ্ডিত, গোমানি দেওয়ান, গুরুদাস পাল পর্যন্ত প্রবলতর সংস্কৃতির মূক তল্পিবাহকের ভূমিকা না নিয়ে নিজেদের সাংস্কৃতির ধারাগুলিকে আরো শক্তিশালী করেছেন। শুধু বাংলাতেই নয়, মহারাষ্ট্র-অন্ধ্র-পাঞ্জাবেও পোয়াডা-বুরাকথা-লোরি প্রভৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারার কোনো কোনো ধারক ও বাহক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গিত জগতে এসে এই ধারাগুলিকে নতুনভাবে ব্যবহার করেছেন। আবার অজস্র মধ্যবিত্ত মানুষও এই আন্দোলনের মঞ্চে হাজির হয়ে নিজেদের সাংস্কৃতিক চেতনার মধ্যে এই গ্রামীণ ধারাগুলির অনুরণন অনুভব করেছেন। আন্দোলনে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের দরজাগুলি আর পুরোপুরি বন্ধ থাকেনি।

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির জগৎ চারিপাশের ঐতিহাসিক বিবর্তন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ, আচোট্ জগৎ নয়। তার মধ্যে খেয়াল করলে সবসময়েই ইতিহাসের রেখাপাত লক্ষ করা যায়। লোক সংস্কৃতির মধ্যে যুগের পর যুগ একই পরম্পরার বিশুদ্ধ পুনরাবৃত্তিই লক্ষ্য করা যায়, তার ঈষৎ আদলবদল হলেই তা আর লোকসংস্কৃতি থাকে না, একথা যাঁরা বলেন সেই সাংস্কৃতিক শুদ্ধতাবাদীদের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। ইতিহাসে বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর নিজস্ব তাগিদেই অহরহ পরম্পরার পুনর্নির্মাণ ঘটে। আজ আমরা যাকে কালাতীত পরম্পরা বলে মনে করছি, খতিয়ে দেখলে হয়তো আবিষ্কার করব যে তার উদ্ভব ঘটেছে বিগত শতাব্দীর মধ্যেই। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আবার গ্রামীণ দরিদ্রশ্রেণীর লোকশিল্পীরা যে সর্বদাই নিষ্ক্রিয় প্রাপকের ভূমিকায় থাকেন, এই ধারণাও গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা কোনোকিছুই না বুঝে অসচেতনভাবে শুধু এইসব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার শিকার হয়ে যাচ্ছেন, এ কথা ধরে নিলে মানুষের মধ্যে তাঁদের প্রলম্বিত প্রভাবের কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। বিশ্বায়নের যুগেও বোধহয় সংস্কৃতিতে প্রযুক্তিগত বিপ্লবের বিপুল আয়োজন লোকশিল্পীকে নিষ্ক্রিয় শিকারমাত্রে পরিণত করতে পারেনি। তাঁদের মননের জগৎ আমাদের কাছে অদৃশ্য বলে আমরাই এ ধারণা করি।

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে এখানে আমি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করব। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার অধুনাপ্রয়াত দুলাল রায় একজন লোকশিল্পী, তপশীলি জাতির স্বল্পসাক্ষর মানুষ। যৌবনে তাঁকে স্পর্শ করেছিল স্বাধীনতা আন্দোলন ও গণনাট্য আন্দোলনের ঢেউ। কীর্তন আঙ্গিকটিকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন দেশের ও বিদেশের নানা রাজনৈতিক ঘটনা — যেমন লেনিনগ্রাড রক্ষার লড়াইয়ের কাহিনী বর্ণনা করতে। আশির দশকে তিনি যখন বৃদ্ধ, কিন্তু শিল্পী হিসাবে সক্রিয়, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কোনো একটি অনুষ্ঠানে। সেসময়ে তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ আচ্ছা, 'স্টার ওয়ার' ব্যাপারটা কী? এ সম্বন্ধে কীভাবে আরো জানতে পারব? আমি পাল্টা প্রশ্ন করি ঃ আপনার এ বিষয়ে জেনে কী হবে? এবং উত্তরে তিনি বলেন ঃ জানতে পারলে তা নিয়ে দুটো গান তো বাঁধতে পারব। বলা যেতে পারে, সব শিল্পী দুলাল রায় নন, বা পরম্পরাগত লোকসংস্কৃতির যে বিপুল নমুনা এখনও আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখি তার মধ্যে এই আধুনিকতার স্পর্শ নেই বা তা আনতে গেলে সেটা আর লোকসংস্কৃতি থাকবে না। পরম্পরাগত ধারার মধ্যে নতুন কিছু আনা শক্ত এটা সত্য হলেও কিন্তু পরিবর্তনের কিছু না কিছু লক্ষণ সবসময়েই এই ধারাগুলির মধ্যে দেখা যায়। দুলাল রায় বা আরো অনেক লোকশিল্পীর হাতের কাছে যদি 'স্টার ওয়ার' বা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার কার্যকলাপ বা ভারতীয় পেটেন্ট আইনের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যগুলি থাকত, এ সমস্ত বিষয় নিয়ে শহরের স্তরে যে আলোচনা বা বিতর্ক চলে তার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের কোনো রাস্তা যদি বার করা যেত তাহলে তাঁদের সামনে একটি বিকল্প থাকত এইসব চিন্তাভাবনার অনুরণন তাঁদের শিল্পধারার মধ্যে নিয়ে আসার।

কিন্তু যে আন্তর্জাতিক বাজারি শক্তিগুলি আজকের বিশ্বায়নকে পরিচালনা করছে, তারা তাদের নিজস্ব স্বার্থেই লোকসংস্কৃতির পুরোনো জগৎকে 'চির পুরোনো' করেই রেখে দিতে চায়। তাদের মনোভাবের স্ববিরোধ এইখানেই প্রকাশ পায় যে এই 'চির পুরোনো'র সংজ্ঞাও তারা নিজেরাই নির্দিষ্ট করতে আগ্রহী। আমাদের মনে পড়তে পারে আন্তর্জাতিক একটি 'কোলা'পানীয়ের বিজ্ঞাপন, যেখানে পেশীবহুল এক চিত্রতারকা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বিশাল গাড়ি চালিয়ে মরুভূমির মধ্যেকার এক প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে গাঁওবুড়াকে অনুরোধ জানায় স্থানীয় কোনো গান শোনাতে। সঙ্গে সঙ্গে ধুতি ও রঙিন পাগড়ি পরা গ্রাম্য বালক যে গানটি গেয়ে কোমর দুলিয়ে নেচে ওঠে, তা হল ঐ চিত্রতারকারই ছবিতে গাওয়া একটি গান : 'কহো না প্যার হ্যায়!' এবং নেপথ্যে শোনা যায় ঐ বিজ্ঞাপনের শ্লোগান : লাইফ হো তো অ্যায়সি! বিজ্ঞাপনের ছবিটিতে এই কাহিনীর তাৎপর্য ঐ শ্লোগানটির মধ্যেই বিধৃত। শ্লোগানের ভাষাটি অবশ্যই হিন্দি ও ইংরাজির সংমিশ্রণ, যুবক চিত্রতারকা ভারতীয় হলেও তাঁর এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের চেহারাছবি পশ্চিমী মোড়কে জড়ানো এবং সবচাইতে বড়ো কথা হল এই যে, আন্তর্জাতিক ঐ 'কোলা' পানীয়ের উপস্থিতি রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রামের জীবনের সঙ্গে চিত্রতারকার আধুনিক শহুরে জীবনকে একসূত্রে বেঁধে দিচ্ছে। হতে পারে যে, ঐ ফিল্মি গানের সুরটি হয়তো আদতে রাজস্থানেরই কোনো বাঁশি বা বেহালার সুর থেকে না বলে ধার করা, অর্থাৎ লোকসংস্কৃতিরই একটি সুর ঝকমকে 'আধুনিক' মোড়কে ভরে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে আবার গ্রামের মানুষকেই ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা যে তাদের কাছ থেকে চুরি করা সেটা বুঝতে না পেরে তারা এটাকে ঝাঁ-চকচকে আধুনিকতা'র নিদর্শন হিসাবে ভেবে নিয়ে তারই অনুকরণ করছে এবং এই পুরো ব্যাপারটির মধ্যে শক্তিমানের সাংস্কৃতিক দখলদারির যে ব্যাপারটা রয়েছে তাকে লুকিয়ে ফেলে এক নিভাঁজ ঐক্যের ছবি তুলে ধরতে সাহায্য করছে ঐ 'কোলা' পানীয়ের রঙীন উপস্থিতি। বিশ্বায়নের শক্তিগুলির পক্ষে গ্রামীণ সংস্কৃতিকে এরকম আচোট্ স্বভাবী এক চিত্রকল্পে ধরে রাখা প্রয়োজন। একমাত্র এইভাবেই এই জীবনকে সে তার নিজস্ব মতাদর্শের বিন্যাসে বিন্যস্ত করতে পারে। স্থানিকতার এক পুনর্নির্মিত চিত্ররূপ বিশ্বায়নের শক্তিগুলির প্রয়োজন। এইভাবে আমাদের তারাই নির্দিষ্ট করে বলে দিতে চায় খাঁটি গ্রামীণ সংস্কৃতির রূপটা কী। পরম্পরার এই পুনর্নির্মিত রূপকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তার প্রামাণিকতাকে আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে তারা তাদের বিপণনের পরিধি বাড়াতে চায়।

এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে বলেছি, জনকল্যাণমূলক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদলকে ভেঙে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বায়ন পরোক্ষে অনুপ্রেরিত করে নানাধরনের স্থানিক মৌলবাদকে। জনসাধারণের কাছে এই প্রজাতান্ত্রিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের যা যা প্রতিশ্রুতি ছিল, সেগুলি উবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'আমি ভারতীয় নাগরিক' এই পরিচয়ের তাৎপর্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে আমার আঞ্চলিক, সম্প্রদায়গত বা জাতপাতভিত্তিক পরিচয়টাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এইসব স্থানিক পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভিন্নতা এবং বিরোধেরও বাড়বাড়ন্ত ঘটে বিশ্বায়নের যুগে। বিশ্বায়নের স্ববিরোধ এইখানে যে, এইসব বিভিন্নতার আত্মপ্রকাশ তার বিপণনের ক্ষেত্রকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে দিতে চায়। এই কারণেই এইসব স্থানিকতার উপরেও নিয়ন্ত্রণ বা দখলদারি না রাখলে তার চলে না। তাই স্থানিকতাকে নিজের মতো করে নির্মাণ করে নেবার এই প্রচেষ্টা। এই নির্মাণের পিছনেও আছে বিশ্ববাজারের অযুক্তি এবং স্ববিরোধ। আমরা সবসময়েই দেখতে পাই নিজেরই সৃষ্ট স্থানিক মৌলবাদকে বিশ্বপুঁজির শক্তি কখনো চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কিন্তু সবসময়েই তার চেষ্টা থেকে যায়, তাকে নিজের সুবিধামতো একটা আদল দেবার।

আমাদের দেশে আজ সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ নামে যে মতাদর্শটি চালানো হচ্ছে তার

সঙ্গে বিশ্বায়নের শক্তিগুলির খাঁটি ভারতীয় সংস্কৃতির আদল তৈরি করার প্রচেষ্টার তাই একটা অন্তর্গূঢ় সাদৃশ্য আছে। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা বলে থাকেন যে, রাষ্ট্র হল গণতন্ত্রের মতোই বিদেশ থেকে আমদানি করা একটি ধারণা। আমাদের ভারতীয়ত্ব রয়েছে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে। সেখানে আমরা এক। 'খাঁটি ভারতীয় সংস্কৃতি' বলতে কী বোঝায় সেটা অবশ্য তাঁরাই ঠিক করে দিচ্ছেন। তাঁদের মতে এই সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিফলিত হয় পিতৃতান্ত্রিক এবং জাতপাতভিত্তিক থাক-বন্দী আচার-পদ্ধতিগুলিকে মেনে নেওয়ার মধ্যে। বিশেষত, হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে দর্শনীয় জাঁকজমকের মধ্যে দিয়ে যখন পালন করা হয়, তখনই আসে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য অর্থাৎ হিন্দু সাংস্কৃতিক ঐক্য। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যেও দেখতে পাই এই পরম্পরাগত খাঁটি ভারতীয়ত্বের অনুসন্ধান। এই বিশুদ্ধতা যেন পালটে যেতে না পারে, কেননা তাহলে তার পণ্যযোগ্যতাও কমে যাবে। আজকের ভারতবর্ষে 'Cultural tourism' বা 'Pilgrim tourism' এর নামে বিশুদ্ধ দেশীয়তার পুনর্নির্মাণের এই কাজ আজ শুরু হয়ে গেছে। ১৯৯২ সালে বি বি সির চোখ দিয়ে যখন আমরা বাবরি মসজিদের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেখানেও বারবার উন্মত্ত করসেবকের ঘোর-লাগা মুখের ছবি তুলে ধরে তাকে 'হিন্দু' বলে অভিহিত করা হচ্ছিল। করসেবক তাকিয়ে ছিল ক্যামেরার দিকে, অর্থাৎ দূরদর্শন-নিভে-যাওয়া ভারতবর্ষের ভারতীয় দর্শকের দিকে। আসলে যেদিন ঘটনাটি ঘটেছিল সেদিনের ঘটনা দূরদর্শনে স্থান পায়নি, কারণ দূরদর্শন তার চোখে বুজে ফেলেছিল। আমরা যেন নিজেদেরই আয়নার ছবির দিকে তাকাচ্ছিলাম এবং এইভাবেই বিশ্বায়িত টেলিভিশনের মধ্যস্থতায় ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্বের পুনর্নির্মাণ দর্শকের মনে ঘটে যাচ্ছিল।

বিশ্ববাজারের বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির দর্শকের কাছে পরম্পরার পুনর্নির্মাণের এই চেষ্টার পটভূমিতে আজ আমাদের গ্রামীণ দরিদ্র লোকশিল্পীরা দাঁড়িয়ে আছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত গ্রাম-সমাজের বাইরের জগতের সঙ্গে আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে আধুনিকতাকে আয়ত্ত করার যে লড়াই তাঁদের আমরা সারাক্ষণই করতে দেখেছি, এই পটভূমিতে তার সামনে নতুন এবং শক্তিশালী বাধা এসে দাঁড়াচ্ছে। একদিকে রয়েছে উন্নত প্রযুক্তি-ভিত্তিক যে সব সাংস্কৃতিক ধারা গ্রামসমাজে প্রবেশ করছে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতার সমস্যা, অপরদিকে রয়েছে বিশ্ববাজারের কাঙ্ক্ষিত 'বিশুদ্ধ পরম্পরা' বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা। যে সমস্ত স্থানিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে লোকসংস্কৃতি জড়িত ছিল, সেগুলিকে একটা জাঁকজমকপূর্ণ রূপ দিয়ে বিশ্ববাজারের সামনে উপস্থিত করার মতো আকারে এনে এই 'প্যাকেজ'টির মধ্যে লোকশিল্পীকে একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেমনভাবে গাইলে বা নাচলে, কী পোশাক পরলে, মঞ্চকে কীভাবে ব্যবহার করলে, তা বিশ্ববাজারের কাছে পণ্যযোগ্য হয়ে উঠবে, তা আগে থেকেই ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। লোকসংস্কৃতির যে ধারাগুলি কথার উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ যেখানে নতুন ধারণা, আলোচনা, বিতর্ক নিয়ে আসার অবকাশ আছে এবং লোকশিল্পী যেখানে ভাষার ব্যবহারে সক্রিয় হতে পারেন, সেইসব ধারাগুলি বিশ্বায়নের মঞ্চে অবহেলিত। যেখানে প্রদর্শনীর সুযোগ আছে, সাজসরঞ্জামের চমৎকারিত্বই প্রধান, এমন ধারাগুলি আদর পাচ্ছে। শিল্পী নিজস্ব প্রয়াসে আধুনিক বিশ্বে নিজের জায়গা করে নেবার যে সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারতেন, পরোক্ষভাবে হলেও বিশ্বায়ন তার গণ্ডিটাকে ক্রমেই ছোট করে আনছে। আজকে লোকশিল্পীর লড়াই ভয়ঙ্কর শক্তিশালী প্রযুক্তিভিত্তিক শক্তিগুলির মুখোমুখি হয়ে স্বকীয় আধুনিকতা অর্জন করার লড়াই। এ এক অসম লড়াই হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে এমন পরিসর সৃষ্টির অবকাশ যে নেই, তা নয়।

লোকসংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের থাবা

অরুণ চৌধুরী

'বিশ্বায়ন' বা কারুর কারুর কলমে তা 'ভুবনীকরণ' বলে অভিহিত, তার প্রভাব ক্রমাগতই বাড়ছে। তা ক্রমবর্ধমান। অর্থনৈতিক , সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সবদিকেই 'বিশ্বায়নে'র কালো ঘোড়া ছুটছে। একদা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে এক নীড়ে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আজকের বিশ্বায়নের ঘটনা কিন্তু তা নয়। বলা যেতে পারে আজকের বিশ্বায়নের লক্ষ্য হল সারা বিশ্বের বাজারকে পুঁজিপতিদের স্বার্থে এক করতে হবে, আর সেই বিশ্বায়িত এবং একীভূত যে বাজার তার সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে পুঁজিপতিদের । যে পুঁজিপতিরা আজ শুধু একচেটিয়া কারবারি নয়, তারা এখন বহুজাতিক সংস্থা গঠন করেছে। আর তার মাধ্যমে সে বিশ্বের আনাচে-কানাচে যেখানে যে পণ্য পড়ে আছে কিংবা যেখানে বাজার আছে সেখানে ঐ বহুজাতিক সংস্থার মালিকরা কিভাবে পৌঁছতে পারবে, কী কায়দায় সেই অতিদূরবর্তী দেশের অবহেলিত কোন কোণায় পড়ে থাকা সম্পদকেও নিজের তাঁবেতে আনতে পারবে। কী পদ্ধতিতে কিংবা কোন কৌশলে সেখানে শোষণের নখদন্ত বিস্তার করে তার থাবা বসাতে পারবে অথবা ঐ সম্পদকে নির্মমভাবে লুণ্ঠন করে তাকে নিজের মুনাফারবৃত্তে নিয়ে, তাকে নিঃশেষে চুষে নিয়ে আর তারপর ছোবড়া করে ফেলে দিতে পারবে। এটাই হল তার লক্ষ্য। এ লক্ষ্য সাধনে তার কোনো চক্ষুলজ্জা নেই। কোনো নৈতিকতার ধার সে ধ'রে না। কোনো মায়া-মমতা বা বেদনা সে অনুভব করে না। সে জানে মুনাফা , মুনাফা-ঠাকুর তার একমাত্র উপাস্য। এ 'ঠাকুর'কে সামনে রেখেই তার বিশ্বময় বাণিজ্যিক অভিযান। আর এই অভিযানে সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্য সে গঠন করেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা, ডব্লু টি ও। ঐ সংস্থার নিয়ম-কানুনের খুরে সব দেশকে মাথা মোড়াতে হবে। সবাইকে নিজ নিজ দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ঐ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার পদতলে আত্মনিবেদন করতে হবে। নিজ নিজ দেশের সংকীর্ণ স্বার্থ নিয়ে আত্মবৃত্তে থাকা একান্তভাবেই অনুচিত। এসো বিশ্ববৃত্তে। তবে, এ বিশ্ববৃত্তের মালিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ রাষ্ট্রের যিনি হর্তাকর্তা বিধাতা বর্তমানে বুশ সাহেব। তিনিই ঐ বৃত্তের নিয়ামক। তাঁর ইচ্ছাই শেষ কথা বলবে।

অবশ্য সামুচাচার বেশ কিছু সংখ্যক সাঙাৎ আছে। সাক্‌রেদ তো আছেই। অর্থবলে তিনি অনেকের কাছ থেকেই সাকরেদগিরির হলফনামা প্রকাশ্য বা পরোক্ষভাবে নিয়ে নিয়েছেন। নতুন নতুন সাক্‌রেদ জুটছে। আবার পুরনো সার্ক্‌রেদরা কোনো কোনো ঘটনায় অন্য সুর ভাজছে। সামুচাচার শরিকও আছে। তবে, তারা সবাই ছোট তরফ। পিছনে সামুচাচার মৃদু সমালোচনা করলেও সামনে কিছু বলা, প্রতিবাদ করা বা বিরুদ্ধাচরণ করার মতো বুকের পাটা

তাদের নেই। কলিজার জোরও কম। কব্জির জোর থেকে তো কলিজার জোর বাড়ে। সেই কব্জিই বড় দুর্বল। কারুর করুর আর্থিক ক্ষেত্রে জোর আছে। কিন্তু পাঞ্জা কষার মত মানসিক সবলতার অভাব। তার কারণ ধনতন্ত্রের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষার তাগিদ।

১৯৯০-৯১ সনে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন, পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের পথিক রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয় সামুচাচা, তার শরিকদের বুকের জোর বাড়িয়ে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন থেকে 'একক বিশ্ব গড়ার' স্বপ্নে মসগুল। সবাইকে একধাক্কায় এক ছাতার তলায় আনতে হবে। আর সব শিয়ালকে এক সাথে হুক্কাহুয়া করে বলতে হবে যে 'সমাজতন্ত্রের দিনাবসান। তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সে কালের সমুদ্রে ক্ষণিকের বুদবুদ মাত্র।'

এখন সামুচাচা কিছুটা চিন্তিত। তাঁর বিশ্বজয়ের অশ্বমেধের ঘোড়া থমকে দাঁড়িয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজগড়ার জন্য দৃঢ়পণ চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, কিউবা ও লাওসের অস্তিত্বে। তাছাড়া, সাঙাৎ ও সাক্রেদ দেশগুলোর মধ্যেও দোমনা ভাব দেখা দিয়েছে। প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের জনগণেরও বিভ্রান্তি কাটছে। সেখানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিবাদী আন্দোলন ক্রমশ সংগঠিত হচ্ছে। তবে, বিগত দশ বছরে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন এ দেশের সমাজ-সংস্কৃতি সব কিছুর ওলটপালট করে দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা থাবা বসিয়েছে। ঐ দেশগুলোর গৌরবময় জাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও আজ ভেঙে চুরমার।

ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়ন বা কাস্ত্রোর ভাষায় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন যার সঙ্গী হচ্ছে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ— এই ত্রিশূলে চড়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মুনাফাখোরী ও লুণ্ঠন প্রবৃত্তি, পুরানো সবকিছুকে ধ্বংস করার সর্বনাশা অভিযান সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক মানসিকতাকে বিপর্যস্ত ও বিপথগামী করছে। নিজেদের লুণ্ঠন প্রবৃত্তির সহায়তাকারী হিসাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সবকিছুকে তৈরি করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বদা সক্রিয়। সর্বতোভাবে তারা সর্বদিকে থাবা বিস্তার করছে। তারা চাইছে বিভিন্ন দেশ, তাদের স্বকীয়তা, তাদের নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতি, তাদের প্রবহমান সভ্যতার ধারা, তাদের ভাষা, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, তাদের চলন-বলন, আচার-আচরণ সব কিছুকে ধ্বংস করে ও দলিত-মথিত করে এক গজকচ্ছপ বা সুকুমার রায়ের ভাষায় 'হাঁসজারু' তৈরি করতে।

বলাবাহুল্য, আমাদের দেশের শাসকশ্রেণীর সৌজন্যে আমরাও সেই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আবর্তে পড়েছি। তার ঘোলাজলে আমরাও ঘুরপাক খাচ্ছি। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা— উচ্চকোটির সংস্কৃতি বা পরিশীলিত ও পরিমার্জিত সংস্কৃতি, লোকজীবনের সাথে জড়িত লোকসংস্কৃতি, উভয়কেই আজ বিশ্বায়নের ত্রিশূল নির্মমভাবে বিদ্ধ করছে। অবশ্য, এখনো আক্রমণটা উচ্চকোটির সংস্কৃতিতেই বেশি। তবে, নিম্নকোটির সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতি যে তা থেকে মুক্ত, তাও বলা যাবে না। সংস্কৃতির ধারা অনেক ক্ষেত্রেই উপর থেকে নীচের দিকে গড়িয়ে আসে। আমাদের দেশের জাতীয় সংস্কৃতি ধারার ইতিহাসে এর ভুরিভুরি নিদর্শন আছে। আবার উচ্চকোটির সংস্কৃতির ধারকবাহকরা প্রয়োজনের তাগিদে বলা যায় শ্রেণীস্বার্থ সিদ্ধির কৌশল হিসাবে নিম্নকোটির জনজীবন থেকেও কিছু কিছু আত্মসাৎ করে। তবে, তারা সুচতুরভাবে তার আত্তীকরণ ঘটায়। নিম্নকোটির সংস্কৃতিতেও এ আত্তীকরণ যে দেখা যায় না, তা নয়। তবে, সামাজিক অবস্থানের পশ্চাদপদতার কারণে সেই আত্তীকরণ সবসময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে হয় না। উচ্চকোটির মানুষরা কলাকৌশলে আরও সুচতুর ও ধুরন্ধর। কাজেই তাদের হস্তাবলেপে অনেক বস্তুই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়। শ্রেণীগত শোষণের সব হাতিয়ারগুলোকেই তারা শাণিত করে নেয়। মেহনতকারী সমাজ তাতে ততটা সিদ্ধহস্ত

নয়। তাদের নিপুণতার অভাব আছে। উৎপাদন ব্যবস্থার যে স্থানে তাদের অবস্থান, তার জন্যই ঐ পরিস্থিতি।

এবার মূল বিষয়ে আসা যাক। লোকসংস্কৃতির স্রষ্টা লোকজীবন এবং তা যৌথ সৃজন। সেখানে ব্যক্তির অস্তিত্ব অবলুপ্ত। ব্যক্তি নয়, সমষ্টিই সেখানে মুখ্যস্থানে। তাই, ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যক্তি সেখানে সমষ্টির সম্পূর্ণভাবে অধীন। লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহকও লোকসমাজ।

অমাদের দেশে এখনো সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার যথেষ্ট প্রাধান্য। এমনকি প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গোষ্ঠীগত ভাবধারা ও চেতনাও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। আমাদের দেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর একটা অংশ এখনও ঝুম চাষ করে। তাদের জীবনের যাযাবরবৃত্তির এখনও ইতি হয়নি। তবে, স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটাবার যে কাজ শুরু হয়েছিল, তা আজ বিশ্বায়নের ঘোড়ায় চেপে দ্রুততালে এগোতে চাইছে। এ দেশের বুর্জোয়া-জমিদার শাসক শ্রেণী ধনতান্ত্রিক পথে দেশের পুনর্গঠন করতে চাইল। তারই পথ ধরে হল ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশ। পুঁজি তো কেবল অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে না, তা যেমনি শুধু সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার মূল কাঠামোতে প্রভাব বিস্তার করে না, তা সমাজের উপরিকাঠামোতেও প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃতি উপরিকাঠামোর বিষয়। কাজেই, উৎপাদন ব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশও তার ভাবাদর্শ সমাজের ঐ উৎপাদন ব্যবস্থাতেও প্রভাব বিস্তার করে। সেখানেও ধনতান্ত্রিক ভাবধারার ছাপ পড়ে এবং তা পড়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালে ঐ ভাবাদর্শের প্রভাব বহুলাংশে বেড়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি যে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন— আমাদের দেশের উচ্চকোটির মানুষদের বেশ প্রভাবিত করেছে। তার ছাপ শিল্প-সাহিত্য ও সমাজের ঐ অংশের জীবনাচরণে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করছে। সংস্কৃতি তো সর্বব্যাপক। একটা বিশেষ সমাজের সংস্কৃতি বলতে সেই সমাজের মানুষদের চলা-বলা অর্থাৎ ভাষা ও কথা বলার স্টাইল বা রীতি, আদবকায়দা, পোষাক-আশাক, গৃহসজ্জা, আচার-আচরণ, খাদ্যবস্তু, সামাজিক দিকগুলি— নরনারীর সম্পর্ক, বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি-সহ শিল্প-সাহিত্যের নানাদিক অর্থাৎ মানস সৃষ্টিতে বিশ্বায়নিক ছাপরূপ ফুটে উঠছে।

এতো গেল সমাজের উচ্চকোটির সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাবের দিক। এখন ঐ প্রভাব চুঁইয়ে কতটা সমাজের নীচের দিকে গিয়েছে তা খতিয়ে দেখা যাক। অল্প কথায় কিছুটা চুঁইয়ে গিয়েছে আবার বিশ্বায়নের প্রবক্তা ও তার পরিকল্পক এবং পরিকল্পনার রূপায়ণকারীরা সরাসরি গ্রামীণ জীবনে বিশ্বায়নের ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিয়েছেন। তার অর্থনীতি ও সামাজিক দিকে দ্রুততালে যে-সব পরিবর্তন হচ্ছে, তার ছাপ লোকসংস্কৃতির উপরেও ভালোভাবেই পড়েছে। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের নানা পরিবর্তন হচ্ছে। লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্যেরও পরিবর্তন হচ্ছে। অন্যথায়, সেগুলির প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে। লোকবাদ্যের চেয়ে নানা ধরনের বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে। সেগুলোর প্রভাব বাড়ছে। লোকসংগীতেও নানা জাতীয় বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার, সঙ্গীতের কথা ও সুরকে ছাপিয়ে উঠছে, সামরিক একটা উন্মাদনার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এর কোন স্থায়ী প্রভাব থাকে না। শ্রোতাদের মনকে সাময়িকভাবে উত্তেজিত করলেও তা শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করে না। এগিয়ে নিয়ে যায় না। সেই সময়ের আবর্তেই সে-মানুষ ঘুরপাক খায়। মহাকালের যাত্রাকে সে সঠিকভাবে ধরতে পারে না।

লোকসঙ্গীতের গায়কদের দেখছি তাঁদের কেউ কেউ চিরায়ত বাদ্যযন্ত্র দোতারা বা গাবগুবি কিংবা গোপীযন্ত্র, এমন কি সাঁওতালদের চিরপরিচিত বেহালা-বানান, তা ত্যাগ করে সিন্থেসাইজার, ক্যাসিও, ব্যাঞ্জো, ইলেকট্রিক গীটার এসব ব্যাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করছেন। বিদেশি বলেই ঐসব বিদেশাগত বাদ্যযন্ত্র সর্বথা বর্জনীয়, আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে বলছি না। তবে, যে বিষয় উল্লেখ্য তা হল, বাংলার লোক সঙ্গীতের ভাবব্যঞ্জনা, যে সুর, যে তাল ও লয় তার সাথে মিলিয়েই ছিল ঐ সব বাদ্যযন্ত্র। তার পরিবর্তন সেই সঙ্গীতের যে ব্যঞ্জনা, যে সুরমূর্ছনা তাকেও নিঃসন্দেহে আঘাত করে। বলাবাহুল্য, তা করছে। তবে, নবায়নের যে ঢেউ তা আপাতত আসর মাত করছে হয়ত।

লোকসঙ্গীতের সুরের খুব পরিবর্তন এখন পর্যন্ত না হলেও তার তালের পরিবর্তন হচ্ছে। বিশ্বায়িত ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির অনুষঙ্গ যে ধরনের তাণ্ডব নৃত্য, যা সহজ ভাষায় বলা যায় এলোপাথাড়ি, তার কোনো ছন্দ বা কোনো তালের বালাই নেই, তা একেবারেই বেতালা। কিংবা জনপ্রিয়তার তাগিদে তার মাধ্যমে শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দাম করার একটা প্রচেষ্টা যার মধ্যে সুস্পষ্ট, আমাদের লোকসঙ্গীতের চিরায়ত যে আবেদন, যে আর্তি, তা ঐ উদ্দামতায় অবর্তমান। টেলিভিশন, বিভিন্ন চ্যানেল, ভি ডি ও প্রভৃতির মাধ্যমে বিশ্বায়িত ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির যতসব আবর্জনা, তা আমাদের দেশে হাজির করছেন, বিশ্বায়নের ব্যাপারীরা। বলাবাহুল্য মাইকও তাদের ঐ প্রচেষ্টার বিশিষ্ট বাহক।

অবশ্য বিশ্বায়নের দুর্বার যাত্রা যখন থেকে শুরু তার আগে থেকেই ঐ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। আজকাল ট্রেনের যাত্রীদের কাছে 'বাউল গান' পরিবেশনের একটা জোর প্রচেষ্টা দেখা যায়, 'বাউল গান' মাধ্যম। মূল লক্ষ্য অর্থোপার্জন। তথাকথিত ঐ বাউলরা কেউ কেউ লাল টকটকে একটা জামা গায় পরেন। আসল লক্ষ্য আকর্ষণ সৃষ্টি। বই-এর মলাটের মত। চিরায়ত বাউলদের পোষাক কোনোদিন ঐ ধরনের লাল টকটকে ছিল না। তারা নানা রঙের তালি দেওয়া আলখাল্লা পরতেন। প্রখ্যাত বাউল নবনীদাস বা জয়দেব-কেন্দুলির খ্যাপা বাউল প্রভৃতি নামজাদা বাউলরা ঐ রকম পোষাকই পরতেন। সেটা কি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য? নানা রঙের বাহার কি অন্য কোনো অর্থ বহন করে? তা কি সমন্বয়ী ভাবাদর্শের দ্যোতক?

পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত বাউলদের ঐ নানা রঙের বাহার সমন্বিত আলখাল্লা যেমনি দেখেছি, আবার বাল্য ও কৈশোরে দেখেছি পূর্ববঙ্গের বাউল গায়কদের তাঁদের আবার ধবধবে সাদা পোষাকও দেখেছি। তাঁদের হাতে দেখেছি গোপীযন্ত্র। এই প্রসঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ফকিরদেরও দেখেছি। গাজীর গানের গায়কদেরও দেখেছি, ওরা কালো পোষাক পরতেন। এখন বাউল ফকির একাকার হচ্ছে। গাজীর গানের গায়করা আজ দুর্লভ বস্তু। তাঁদের হাতের বিশেষ মূর্তি অঙ্কিত ঘুঙুরওয়ালা লাঠি, হাতের চামর— এসব আজ বিলুপ্ত। যাঁরা ফকিরি গান গাইছেন, তাঁরা বৈচিত্র আনার প্রয়াসে কেউ কেউ তালিমারা পোষাক পরেন। তবে, ঝোঁকটা তথাকথিত বাউল গায়কদের মত রক্তবর্ণ পোষাকে। গেরুয়া কেউ কেউ পরতেন। এখন ক্রমশই বাউলদের পরিধেয় আরও উজ্জ্বল ও টকটকে লাল হচ্ছে। কেউ সস্তা সিল্কেরও পোষাক পরছেন। পরুন, কিন্তু রঙটা কেন পাল্টাচ্ছে, তার জবাব ঐ সব বাউল গায়করা দিতে পারবেন কিনা, সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একটা জবাবই হয়ত পাব, তা হল বাণিজ্যিক আকর্ষণ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। বাজার হল মূল লক্ষ্য। তাতে বাউলের ভাবাদর্শ চুলোয় যাক। আমার পেট চললেই হল। গলায় সুর আছে, তাকে কাজে লাগাব। শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জনের জন্য গানের কথাবস্তুও যদৃচ্ছভাবে পাল্টাবো হাওড়া-গামী ই এম ইউ ট্রেনের কামরার আরোহী

অফিসযাত্রীদের মনে অন্যস্বাদের ছোঁয়া দেবার জন্য। বাউলগানের সুরে শ্যালিকা বা বউদি কিংবা স্বামীর সাথে আদিরসাত্মক রসালাপ সম্বলিত গান পরিবেশন করে অর্থোপার্জন করতেও কাউকে কাউকে দেখা যায়।

বাউল গানের বিশ্বযাত্রাও হয়েছে। কেউ প্যারিস, কেউ ওয়াশিংটন, কেউ বার্লিনে বাউল গান পরিবেশন করে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন। প্যারিসে তো ভারতীয় বাউল সরবরাহের কেন্দ্রও আছে বলে শুনেছি। 'বাউল সম্রাট' নামধেয় এক বঙ্গসন্তানের পুত্র নাকি ঐ কোম্পানির মালিক। কেউ কেউ বলতে পারেন, আপনি ওতে চোখ দিচ্ছেন কেন? আমি চোখ দিচ্ছি না। ঈর্ষান্বিতও নই। অর্থনীতির বিশ্বায়িত পন্থীরা হয়ত কেউ কেউ বলবেন— এতে তো ডলার আসছে। ডলার-প্রত্যাশী এই দেশ। সবই ঠিক। গণ্ডগোলটা অন্য জায়গায়, বিশ্বায়িত বাউলরা তাঁদের সুরটা ঠিক রাখলেও তাল ঠিক রাখছেন না, পোষাক তো নয়ই। লোকসঙ্গীতের এক গবেষকের কাছে শুনেছি যে প্যারিস যাবার জন্য তালিমারা এক সিল্কের জামা বানাতে ঐ বাউলের আড়াই হাজার টাকা লেগেছে। বাউলদের জীবনধারার পরিবর্তন হচ্ছে। এক প্রবীণা শিক্ষিকার কাছে শুনেছি যে তাঁর শৈশবে তিনি নানুরে নবনীদাসকে দেখেছেন। তখন নবনীদাস কিছুদিনের জন্য নানুরে চণ্ডীদাসের আরাধ্যা বলে কথিত বাঁসুলি মন্দিরের টিবির উপর থাকতেন। সারাজীবনে নবনীদাস বহু জায়গায় কুড়ে করে বাস করতেন। শেষ বয়সে সিউড়ির কাছে কুলেড়ায় বাড়ী করেন। পরে সিউড়ির উপকণ্ঠে কেন্দুয়ায়।

নবনীদাস রোজই ভিক্ষায় বেরুতেন। সারা দিনে সংগৃহীত চালই ছিল তাঁর ও তাঁর পোষ্যবর্গের আহার্য। তখন বড় কন্যা রাধারানী ও পুত্র পূর্ণদাসের জন্ম হয়েছে। পূর্ণ তখন কিশোর। সারাদিনের 'মাধুকরী'তে যা জুটত তাই ছিল ভরসা। আজাকের ক'জন বাউল এই জীবনধারা অনুসরণ করতে পারবেন? বা পারেন?

বলতে পারেন যে ধনতন্ত্রের প্রসারের জন্য সমাজের সব অংশেরই চাহিদা বেড়েছে । এটা অর্থনৈতিক নিয়ম। সে কথা ঠিক, কিন্তু যে আদর্শের ভেকধারী আমি, তাকি কেবল রোজগারের জন্য, আত্মসুখের জন্য? যে গানের ধারার অনুসারী আমি তাকি কেবল রোজগারের জন্য? বাউলরা ছিলেন মূলত আদর্শ প্রচারক। বৌদ্ধ ধর্মের ভাবাদর্শ সিদ্ধাচার্যরা একদা গানের মাধ্যমে প্রচার করতেন। বাউলরা তাদেরই উত্তরপুরুষ। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের শূন্যবাদ ও অদৃষ্টবাদ ওদের গানেরও উপজীব্য।

বাউল গানের মত ডলার-সংগ্রাহক বহির্বাণিজ্যে শুনেছি পটুয়া ও বহুরূপীদের একটা ভূমিকা আছে। ঐ জন্যও কিছু প্রমোটার আছেন। তাঁদের ও দু'পয়সা হচ্ছে। টাকা ধর্ম, টাকা স্বর্গ টাকাহি পরমন্তপ।

গ্রাম বাংলার প্রত্যন্তেও এখন ইউ.এস.এ. লেখা ও হাতে হাত মেলানো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা চিহ্নিত গেঞ্জির ছড়াছড়ি। পি এল ৪৮০-এর মাইলোর সাথে ঐ প্রতীক ছড়িয়েছিল ভারতময়। এখন তো গেঞ্জিতে উঠেছে। কদিন অগে জয়দেব-কেন্দুলিতে এক মাধ্যমিক শিক্ষকের বাড়িতে আমাকে বসার জন্য যে পেট্রো সামগ্রীজাত কেদারা দেওয়া হয়েছিল তার পিছনে অঙ্কিত আছে ইউ এস এ-এর স্ট্যাচু অব লিবার্টি। পরপর দু'খানা চেয়ারে ঐ প্রতীক অঙ্কিত। সাথে সাথে আমার মনের পটে ভেসে উঠল ইরাক, আফগানিস্তান, যুগোশ্লাভিয়ায় মার্কিনী বর্বরতা ও অমানুষিকতার ঘটনাবলী। ভেসে উঠল ভিয়েৎনাম। ভিয়েৎনামে ঐ স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, যা জর্জ ওয়াশিংটন ও আব্রাহাম লিঙ্কনের গৌরবময় স্মৃতির সাথে বিজড়িত, তা

বর্বরতা ও অমানুষিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন রেখেছে, আজ তা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণে ন্যক্কারজনকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পল রবসন, ল্যাংস্টন হিউজ, পিট সিগারদের মত বিশ্বের সংস্কৃতি জগতে যাঁরা শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁদের জন্মভূমির রাষ্ট্রনায়করা আজ সংস্কৃতিকেও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও তাদের সঙ্কটমুক্তির প্রয়োজনে বিশ্বায়িত বাজারের স্বার্থে নির্লজ্জের মত কাজে লাগাচ্ছেন। বলাবাহুল্য তা আজ গ্রামবাংলার প্রত্যন্তে অনুপ্রবিষ্ট।

গত চৈত্রমাসে শান্তিনিকেতনের সন্নিকটস্থ সাঁওতাল উপজাতি অধ্যুষিত এক গ্রামে গিয়েছি। চৈত্র হল উপজাতীদের বিয়ের মাস। গ্রামে ঢুকতেই মাইকের আওয়াজ শোনা গেল। ঝাড়খণ্ড থেকে আনা সাঁওতাল বিয়ের গানের (বাপলা সেরিং) ক্যাসেট বাজছে। পিচঢালা রাস্তার উপর একটা বাস দাঁড়ানো। বর-সহ বরযাত্রীরা এসেছে সেই বাসে চেপে। পাকা সড়কে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূরবর্তী এক গ্রাম থেকে বর এসেছে। ঐ গ্রাম থেকে কনের বাড়ি মাঠে মাঠে দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার। আগে সব বরযাত্রীরা কাঁধে লাঠি নিয়ে হেঁটে আসত। বরও তাই। সাথে থাকত 'ভেরুয়া' (ভারবাহী) একজন। বাঁশের তৈরি এক খাচিতে অধিবাসের সব সামগ্রী। হলুদে ছোপানো কাপড় পর্যন্ত। এখন বাসে। বর প্রাথমিক শিক্ষক। আগে এসে গাঁয়ের বাইরে ডেরা করতে হত। এখন ঐ রীতি পাল্টেছে। প্যান্ট পরা বরযাত্রীরা নীল আকাশের নীচে গাছতলায় রাত কাটাবে কি করে?

বন্ধুবর বীরেন বাস্‌কের পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজটা খুলে দেখছি, তিনি এভাবে লিখেছেন—

'বরযাত্রীরা বেরুবার সময় চাল-ডাল, তেল-নুন, মশলাপাতি সব সঙ্গে নেয়। রায়কর (ঘটক-অচ্) বরযাত্রীদের সঙ্গেই থাকেন। তারা কনের গ্রামের সীমানায় পৌঁছে অপেক্ষা করে, সেখানে তাদের নাচগান চলতে থাকে। বারবার কনেপক্ষকে এ সংবাদ জানালে কনেপক্ষের ছেলেরা ঢাক-ঢোল নিয়ে নাচতে নাচতে বরযাত্রীদের দিকে এগিয়ে যায়, দু'চার জন বীরের মত অঙ্গভঙ্গী করতে থাকে (অতীতে কনে কেড়ে নেবার জন্য লড়াই-এর প্রতীকী ঘটনা-অচ্)। নাচতে নাচতে এক সময় কনেপক্ষ বরপক্ষের সঙ্গে মিশে যায়। এভাবে কনের বাড়িতে আসার পথে গ্রামের লোকেরা বরকে গুড় ও জল খাওয়ায়।' (পৃষ্ঠা - ১৮৬)।

নাচগানের বিশেষ কোনো নজির পেলাম না। দূরে গ্রামের বৃদ্ধাদের একটি দল দং গান ও নাচ করছে দেখলাম। বরযাত্রীদের অধিকাংশ প্যান্টপরা, দু'চার জন হাড়াম (বৃদ্ধ) পুরানো পোষাকে লক্ষ্য করলাম। 'মাঝি হাড়াম' (গ্রামের মোড়ল) নিজস্ব পোষাকে। বরযাত্রীদের মধ্যে আছেন এক নৃতত্ত্বের গবেষিকা। জিজ্ঞেস করলাম, কি দেখছেন? তিনি বললেন বড্ড পরিবর্তন। এ পরিবর্তন ভীষণ খাপছাড়া। সমন্বয়ী প্রচেষ্টা একেবারেই অনুপস্থিত।

পরিবর্তন হবেই। কিন্তু সেই প্রবর্তন যদি মূলোৎপাটন করে দেয় তাহলে সর্বনাশ। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাই। এক ছাঁচে তৈরি কর সব মানুষকে। সকলের একটাই অভিধা। তাঁরা সবাই ক্রেতা। কনজিউমার। তার আর কোনো পরিচিতি নেই। কোনো সত্তাও নেই। বর্তমান শোষণভিত্তিক সমাজ কাঠামো কখনও সমাজের মেহনতকারী অংশকে প্রকৃত মুক্তি বা তার চিন্তা-চেতনা, তার সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটাতে পারে না। সেই বিকাশের কাজ হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পর। কিন্তু আজকে যদি লোকজীবনের সাংস্কৃতিক সম্পদগুলো সবকিছু বিধ্বস্ত ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় তাহলে যে গজকচ্ছপ সমাজ কাঠামো ও হযবরল সংস্কৃতি গড়ে উঠবে, যার প্রচেষ্টা দারুণভাবে চলছে তাতে সমাজের মেহনতকারী অংশ, যাঁদের মধ্যে সিংহভাগ গ্রামীণ মানুষ, তাঁদের সংস্কৃতির দিকেও নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে যেতে হবে। সেই সর্বনাশেরই অশনিসংকেত পাওয়া যাচ্ছে।

এ নিবন্ধের ইতি করতে চাইছি মনীষী কার্ল মার্কস ও ফেডারিক এঙ্গেলসের অমর লেখনী প্রসূত 'কমিউনিস্ট ইস্তাহারের' (১৮৪৮) একটি বিশেষ অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে। যা থেকে সংস্কৃতির বিশ্বায়ন সম্পর্কে বুর্জোয়া শ্রেণীর চিন্তা-ভাবনার হদিস পাওয়া যাবে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের যুগের ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিভূরা এক্ষেত্রে আরও মরিয়া। বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও উপভোগে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করে তারা শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়েছে সেই জাতীয় ভূমিটা যার উপর শিল্প আগে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত সাবেকি জাতীয় শিল্প হয় ধ্বংস হয়েছে, নয় প্রত্যহ ধ্বংস হচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন নতুন নতুন শিল্প যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই মরা-বাঁচা প্রশ্নের সামিল। এমন শিল্প যা শুধু দেশজ কাঁচামাল নিয়ে নয় দূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামালে কাজ করছে; এমন শিল্প যার উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয়, ভূলোকের সর্বাঞ্চলেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ উৎপন্নে যা মিটত তেমন সব পুরনো চাহিদার বদলে দেখছি নতুন চাহিদা, যা মেটাতে দরকার সুদূর দেশ-বিদেশের ও নানা আবহাওয়ার উৎপন্ন। আগেকার স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও স্বপর্যাপ্তির বদলে পাচ্ছি সর্বক্ষেত্রেই আদান-প্রদান, জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া পরস্পর নির্ভরতা। বৈষয়িক উৎপাদনে যেমন তেমনই মনীষার ক্ষেত্রেও। এক একটা জাতির মানসিক সৃষ্টি হয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি। জাতিগত একপেশেমি ও সংকীর্ণচিত্ততা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অসংখ্য জাতীয় বা স্থানীয় সাহিত্য থেকে জেগে ওঠে একটা বিশ্বসাহিত্য।

সকল উৎপাদন যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সভ্যতায় টেনে আনছে সমস্ত, এমনকি অসভ্যতম জাতিকেও। যে জগদ্দল কামান দেগে সে সমস্ত চীনা প্রাচীর চূর্ণ করে, অসভ্যজাতিদের অতি একরোখা বিজাতি-বিদ্বেষকে বাধ্য করে আত্মসমর্পণে তা হল তার পণ্যের সস্তা দর। সকল জাতিকে সে বাধ্য করে বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণে, অন্যথায় বিলুপ্ত হয়ে যাবার ভয় থাকে; বাধ্য করে সেই বস্তু গ্রহণে যাকে সে বলে সভ্যতা— অর্থাৎ বাধ্য করে তাদের বুর্জোয়া বলতে। এক কথায় বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর এই চরিত্রের সাথে বেশ কিছু পদ্ধতিগত তফাৎ আছে। তবে, মূল সুর একই; তা হল উচ্চকোটির সংস্কৃতি ও নিম্নকোটির সংস্কৃতি উভয়কে গ্রাস করতে সচেষ্ট। আগেই বলেছি যে এখন সে আরও মরিয়া। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সংকট যত ঘনীভূত হচ্ছে, ততই সে বাজার খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর জন্য তার বাজার চাই। মুক্ত বাজার চাই, চাই অবাধ বাণিজ্য। সংস্কৃতিও আজ পণ্য। লোকজীবনের যে সংস্কৃতি তাকেও তার শোষণের বৃত্তে আনতে চাইছে। সেই লক্ষ্য সাধনে সে মরণপণ উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

এই আক্রমণ সর্বগ্রাসী। তবু, এর হাত থেকে লোকসংস্কৃতিকে বাঁচতে হবে। লোকসংস্কৃতিরূপ জানকীকে উদ্ধার করে আনতে হবে। কাজ কঠিন। তবু, তা অসাধ্য এ কথা ভাবার কারণ নেই। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সেই দৃষ্টিকোণকে কায়েম করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরই মধ্যে সাফল্যও অর্জন করেছে। আশার আলো এভাবেই ফুটে উঠবে।

রাত্রি যত গভীর হয়, ভোরের প্রত্যাশা তত নিকটবর্তী হয়— এই তো প্রকৃতির নিয়ম।

বিশ্বায়ন ও মৌলবাদ

মইনুল হাসান

সারা পৃথিবী জুড়ে মৌলবাদ এখন বহু আলোচিত একটি শব্দ। আমাদের সাধারণ আলোচনাতে বিষয়টি যখন উঠে আসে তখন তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি ধর্মীয় ভাবধারা। এখন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে যে কোন ধর্মীয় চিন্তা সময়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চলতে পারছে না, আবার তার ডালপালা নিয়ে ফিরে যেতে চাইছে একেবারে পিছনের দিকে। অথবা নিজেদের চিন্তাকে মুক্ত ও গণতান্ত্রিক করতে অপরাগ হয়ে অন্যের চিন্তার উপর অযৌক্তিকভাবে হস্তক্ষেপ করছে—অসহিষ্ণু মনোভাবের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। এই রকম একটা অবস্থার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন 'যে মাটির মধ্যে গাছ শিকড় চালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শিকড়ের পক্ষে সেই ধ্রুব মাটি খুব ভালো—তাই বলে ডালপালাগুলোকে মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলা কল্যাণকর নয়।'[১] রবীন্দ্রনাথের আমলে মৌলবাদ কথাটার তেমন চল হয়নি। কিন্তু তাঁর মনোভাব থেকেই বুঝতে পারা যায় যে তিনি কি বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতন একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার কাছে সমাজ বরাবর সেটাই আশা করেছে।

ঠিক আর একটি দিক দিয়ে মৌলবাদ আলোচিত হচ্ছে। সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পৃথিবীর বর্তমান ধূসর সময়ে সেটাই অনেকখানি প্রয়োজনীয় চিন্তা আমাদের সময় কেড়ে নিচ্ছে। সেটা জরুরি ভিত্তিতে আলোচনা হওয়া অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিশ্বের বাজার এখন বিশ্বায়নে ভরপুর। যদিও বিশ্বায়ন শব্দটা নতুন নয়। শতবর্ষের পুরনো শব্দটি বিগত ২/৩টি দশকে নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে সারা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বায়নের আগ্রাসী মনোভাবে আক্রান্ত হয়েছে যে কোন প্রান্তের রাজনীতি, সামাজিক চিন্তাসমূহ, সামাজিক আন্দোলনগুলি এবং ব্যক্তি সম্পর্ক পর্যন্ত। ক্রমাগত আগ্রাসী বিশ্বায়নের কার্যকলাপ বেড়েই চলেছে। প্রমাণিত হয়েছে বিশ্বায়ন কেবলমাত্র একটি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নয়—একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিন্যাস, দার্শনিক মতবাদ নিয়ে তার পথ চলাচল। সুতরাং রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির জীবনের বিন্যাস ও নির্মাণ পাল্টে দেবার সাহস দেখিয়েছে এই মায়াসৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া। পৃথিবীর রঙ পাল্টে যাচ্ছে, শত্রু-মিত্রের সংজ্ঞা পাল্টে যাচ্ছে। এমনতর অবস্থায় পৃথিবীর কাছে, সামাজিক ক্ষেত্রে মৌলবাদ যে অবস্থায় ফিরে এসেছে তার সঙ্গে বিশ্বায়নের আগ্রাসী অভিপ্রায় আবেদনহীন হয়ে আছে এমন ভাবনা খানিকটা কষ্টকল্পিত বলেই মনে হচ্ছে। আবার ব্যক্তিগতভাবে আমি এটাও মনে করছি না যে, সারা বিশ্বে মৌলবাদের রমরমা কেবলমাত্র বিশ্বায়নের প্রভাবেই হয়েছে। সেটা পরিস্থিতির সরলীকরণে সাহায্য করবে বলে মনে হয়। কিন্তু এমতাবস্থায় ঘটনার পরম্পরা

বিশ্লেষণে আমাদের বিরত থাকলে পরিস্থিতি আরও খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য পালনে আমরা পিছুপা হব কেন?

আজ এটি একটি পরিচিত বাক্য যে ২০০১ -এর ১১ই সেপ্টেম্বরের পর পৃথিবী পাল্টে গেছে। মার্কিন মুলুকের জোড়া বাড়ি ধ্বংসের সাথে সাথে মৌলবাদ শুধু নয়, অনেক চিরায়ত চিন্তাভাবনা নিয়েও তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। প্রবল পরাক্রমশালী মার্কিন প্রধান জর্জ বুশকে কোরান হাতে মিটিং করতে দেখা গেছে সে দেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। অন্য মিটিং এ হুমকি দিতে দেখা গেছে এই বলে যে তুমি হয় আমেরিকার দিকে, নয়ত সন্ত্রাসবাদীদের পংক্তিতে। নতুন তত্ত্ব হাজির করা হয়েছে ইসলামি মৌলবাদ আর সন্ত্রাসবাদ সমার্থক। আর অন্যদিকে যারা জোড়া বাড়ি ধ্বংস করেছে তারা সন্ত্রাসবাদী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই— নাম উঠে এসেছে এক ইয়েমেনী ধনকুবের ওসামা বিন লাদেনের। পৃথিবী পরিচিত হয়েছে এক নতুন যোদ্ধার (!) সঙ্গে। কেউ কেউ তাকে শুধুমাত্র ইসলামি দুনিয়ার বীর বলে নয়, সাম্রাজ্যবাদীদের চাপে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রমজীবী মানুষের অন্যতম বড় বন্ধু বলে চিহ্নিত করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দুঃখজনক, সন্ত্রাসবাদী এই ঘটনার পক্ষে মিছিল করার কোন লোকের অভাব হয়নি। খোদ আমেরিকার বিভিন্ন শপিং সেন্টারে বিক্রি হয়েছে ওসামা বিন লাদেনের ছবি ছাপানো বিষয় সামগ্রী। পৃথিবী জুড়ে ছাপা হয়েছে এই মানুষটির জীবনী— খরচ হয়েছে লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা। অনেকেই এই ঘটনাটিকে বিশ্বজুড়ে মার্কিন আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, বিশ্বায়নের নগ্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। এই মতামতের সঙ্গে সহমত পোষণ না করেও কয়েকটি সহজ সত্য কথা বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি, পৃথিবীর আর সব দেশের মত আরব দুনিয়াতেও আঘাত হেনেছে অতি পরিচিত বিশ্বায়ন। প্রকৃত অর্থে যা উপনিবেশবাদী অর্থনীতি ও সংস্কৃতির নতুন পর্যায়। আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারবো না যে, ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী বিশেষ করে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণার এবং ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে আরব দুনিয়ায়। প্যালেস্টাইন নিয়ে আমেরিকার নগ্ন ভূমিকা, সেই সাথে আরব দুনিয়ার ভাঙন ধরানোয় নগ্নকাজে উৎসাহ দান (যাতে মাঝে মাঝে সফলও হয়েছে আমেরিকা), একের পর এক আগ্রাসন, সম্প্রতি ইরাককে কেন্দ্র করে উপসাগীয় যুদ্ধের মহড়া, পরবর্তী লক্ষ্য হিসাবে প্রকাশ্যে সুদানকে চিহ্নিত করে রাখার মতো ঘটনাগুলিই তার জন্য দায়ী। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের খনিগুলির উপর ক্রমাগত এবং নিরন্তর আধিপত্য বজায় রাখার জন্যই আমেরিকা আরব দুনিয়ার শেখতন্ত্র বজায় রাখতে চায়। এইসব ঘটনাগুলির মধ্যেই সংগঠিত হয়েছে সন্ত্রাসবাদী হামলা—তারপরেই পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে নতুন শতাব্দীর প্রথম যুদ্ধটি যা একান্তভাবেই সারা দুনিয়ার কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে নাড়া দিয়ে গেছে।

আমেরিকার পক্ষ থেকে এই যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আমাদের জানা আছে। হঠাৎ তাদের আবিষ্কার পৃথিবীকে ইসলামি মৌলবাদ থেকে মুক্ত করতে হবে। তাই এই অভিযান। কিন্তু আমাদের মতামতও আমরা গোপন রাখতে পারি না—সন্ত্রাসবাদী বা মৌলবাদীদের এক ইঞ্চি জায়গা না ছেড়েও —সবাই মধ্যপ্রাচ্যের তেলের খনির খবর জানেন। আমেরিকা কেমন করে এই চত্বরে আধিপত্য বিস্তার করে তাও আমাদের জানা। এক্ষেত্রে কিছুটা নতুন সংবাদ তৈরি হয়েছে। তুর্কমেনিস্তান থেকে কাস্পিয়ান সাগর এলাকায় তৈল সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারপরই মার্কিন তেল কোম্পানিগুলো আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। তারা এখন মধ্য এশিয়া হয়ে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে পাইপ বিছিয়ে নিতে চাইছে। কিছুদিন আগে আমেরিকা ক্যালিফোর্নিয়ার এক তেল কোম্পানির সঙ্গে আলোচনায় বসে। কোম্পানিটির নাম

উনোক্যাল। এই ব্যবস্থা নিয়ে আফগানিস্তানে তালিবানদের সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা হয়েছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। মোল্লা ওমর তাতে রাজি হয়নি। যদিও এই 'মসৃণ রাস্তা'র জন্য তাদের ১০০ মিলিয়ন ডলার ফি হিসাবে দেবার কথা হয়।'[২] সুতরাং ওদের সরাতে হবে। তেলের বিশ্বায়নের সামনের বাধা ভেঙে চুরমার করতে হবে। রাজি হলেই তারা সুখ আবেগ ভোগে ভেসে যেতে পারতো—তা না হওয়ায় প্রতি ইঙ্গিতে বোমা ধারণ করতে হয়েছে। আমেরিকাও এটাকে 'স্বাধীনতা এবং ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম' বলে বিশ্ববাসীকে জানিয়েছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না একসময় এইরকম কথা বলেই ওসামা এবং মোল্লা ওমরের পিঠ চাপড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং উৎসাহিত করা হয়েছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। অগাধ টাকা এবং অস্ত্র ছিল অন্যতম পুঁজি।

বার বার উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং যা সত্য যে দিনের পর দিন সারা পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়েছে—সেই কারণেই অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে আফগানিস্তান, ইরান-সহ মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে মৌলবাদীদের উত্থানের ইতিহাস পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আরব দেশগুলি তেলের খনির উপর নির্ভর করে আছে—তাদের উপরেই অন্যান্য মুসলিম প্রধান দেশগুলি বিভিন্নভাবে নির্ভর করে আছে। আরব দুনিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি পরিবর্তনের সাথে তারাও নির্ভরশীল। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা, পৃথিবীকে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ ও আমেরিকা নামক কষ্টকর দুইভাগে ভাগ করে ফেলার চেষ্টা, পৃথিবীকে এক মেরু করে ফেলার তথাকথিত হীনচেষ্টা, সেই সঙ্গে আগে উল্লেখিত বিশ্বায়নের লাগামছাড়া, বিবেকহীন পদচারণার প্রেক্ষিতে, আমরা যারা গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি, শ্রমকে শোষণ মুক্ত করার স্বপ্ন দেখি তাদের আশু কাজ হিসেবে মৌলবাদের সবরকম বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় ইংরাজি সাময়িকপত্রে এক রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মন্তব্য দেখে অন্যান্য তথ্য জানবার চেষ্টা করি। ভাষ্যকার উল্লেখ করেন ইসলামিক মৌলবাদ হচ্ছে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া মতামত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ ব্যাপারে পক্ষে বিপক্ষে মতামত লক্ষ করছি। বিষয়টি সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ভাষ্যকারের বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ এইরকম ঃ 'এদের সবাই বিশ্বায়নের দ্বারা আক্রান্ত বলে নিজেদের মনে করে। দেশীয় বাজারগুলি উন্মুক্ত হয়ে পড়ায় প্রতিযোগিতা বাড়ছে। শিল্পোন্নত দেশগুলি থেকে লগ্নিপুঁজি এবং পণ্যসামগ্রীর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে এ যাবৎ কালের নিশ্চিত বাজার। স্থানীয় ব্যবসা ও শিল্প ডকে উঠছে। চাকরি-বাকরি হাওয়া। ইসলামিক দেশগুলি, বিশেষ করে আরব দুনিয়া বিশ্বায়নের কোন সুযোগ পায়নি। এখানকার গরিবরা স্কুলে পড়ার খরচ জোগাতে না পেরে মাদ্রাসায় ছেলেদের পাঠাচ্ছে। ওসামা বিন লাদেন এদের হিরো হয়ে উঠেছে।'[৩]

পর্যবেক্ষণটির মধ্যে সরলীকরণ খুঁজলে কেউ হতাশ নাও হতে পারেন—আসলে কিন্তু এইরকম একটি মতবাদ বিশ্বজুড়ে চাউর হয়ে আছে। তবে এটা না বললে অবিচার হবে যে অনেক নামী-দামী ব্যক্তিত্ব এমনতর ঘটনার সাযুজ্য খুঁজে পাননি বরং তা অস্বীকার করেছেন। এই ব্যক্তিত্বদের অন্যতম হলেন নোয়াম চমস্কি। যিনি বিশ্বায়নকে বিশ্লেষণ করেছেন সাধারণের অসাধারণ দৃষ্টিতে। যিনি বিশ্বায়নের তথাকথিত মায়াবী ছটার প্রকাশকে অতিরঞ্জন এবং অবাস্তব বলেছেন। যাঁকে আমরা পশ্চিমের বিবেক নামে অভিহিত করেছি। বিশ্বায়ন ও মৌলবাদের সাম্প্রতিক রমরমার কোন আশু যোগ তিনি খুঁজে পাননি। তাঁর অভিমত হলো লাদেনের সঙ্গে বিশ্বায়নের কোন সম্পর্ক নেই। লাদেন হচ্ছে মার্কিনি বিদেশ নীতির ফল। এখানে

মার্কিনি বিদেশ নীতির বিস্তারিত পর্যালোচনার সুযোগ নেই। কিন্তু এটাও উল্লেখ না করা ভুল হবে যে ভিয়েতনাম যুদ্ধে নাস্তানাবুদ হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুঁজে বেড়াচ্ছিল নতুন মডেলের। যে মডেল তৃতীয় বিশ্বে তাদের আধিপত্যকে বাড়াতে পারবে—ভিয়েতনামের যুদ্ধে জেতার পর উদ্বেল জনজোয়ারকে বিপথগামী করতে পারবে। অর্থনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপকে আরও সুদৃঢ় করতে পারবে। নতুন কায়দায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সহজ হবে। সেই নীতিতেই মৌলবাদীদের উৎসাহদান—সন্ত্রাসবাদের রূপান্তর। ইয়েমেন-সৌদি আরব-সুদানের রাস্তা ধরে ওসামা বিন লাদেনদের আফগানিস্তানের মাটিতে বসবাস। তখন তারা মার্কিন রাষ্ট্রের চোখের মণি। তেলের খনিগুলিতে আধিপত্যের প্রশ্নে লড়াই শুরু। এই আধিপত্যবাদ বিশ্বায়নের দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অজান্তেই হয়তো বিন লাদেনের মত মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদীরা বিশ্বায়নের ক্রীড়নকে রূপান্তরিত হয়েছে।

যদিও নোয়াম চমস্কির অন্যান্য লেখাতেও এ ব্যাপারে মতামত আছে 'যদি আপনারা বালিতে মুখ গুঁজে থাকতে চান এবং নিজেদের সান্ত্বনা দিতে চান এই ভেবে যে, ওরা আমাদের ঘৃণা করে বিশ্বায়ন-বিরোধিতার কারণে তাহলে সেটা আপনাদের ব্যাপার। যদি মনে করেন এজন্যই ওরা কুড়ি বছর আগে ওরা আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করেছিল, রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল বা '৯৩ সালে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের টাওয়ার ওড়াতে চেয়েছিল—তাহলে সেটা সান্ত্বনা দিতে পারে। কিন্তু এরকম ভাবনাই হিংসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করবে।'[৪]

এসব সত্ত্বেও নোয়াম চমস্কি মৌলবাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেছেন যথেষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে উষর আরব ভূমিতে যুবদের প্রতিবাদ মিছিল এই প্রবীণ সমাজতত্ত্ববিদের নজর এড়ায়নি। এই তিক্ততা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাবধান করেছেন। মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসবাদীদের জনভিত্তি বাড়াতে পারে এমন নীতিগুলোর পর্যালোচনা করার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু মার্কিন শাসকরা এখন তাদের বিশ্বায়নের সকল প্রয়োগের চিন্তায় বিভোর। অন্যদিকে নজর দেবার কোন সময় তাদের নেই।

কিন্তু একথা আমি কেন অনেকেই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বিশ্বায়ন এবং মৌলবাদের বৃদ্ধির মধ্যে একটি যোগসূত্র খুঁজতে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। ১৯৯৯ সালের ইউ এন ডি পি-র রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে, 'বিশ্বজোড়া ভোগবাদী সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক সমসত্ত্বতা গড়ে তোলার জেরে মৌলবাদী তৎপরতা বেড়েছে। ...স্থানীয় আঞ্চলিক সংস্কৃতি-চর্চায় ফের উৎসাহ দেখা দিচ্ছে, রাজনৈতিক আন্দোলনে স্থানীয় সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় রক্ষার প্রশ্নটিই গুরুত্ব পাচ্ছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে স্থানীয় সংস্কৃতির বিষয়টি রাজনীতিতে মতাদর্শের জায়গা নিচ্ছে। মৌলবাদী আন্দোলনগুলির বিকাশের মধ্যে তা প্রতিফলিত হচ্ছে।'[৫] ইউ এন ডি পি-র এই রিপোর্টেই বিশ্বায়নের আর একটি দিকে নজর দেবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে 'বিশ্বায়নের যুগে সংস্কৃতি আজ সবচাইতে বড় পণ্য। তার রপ্তানিই আজ সবচাইতে বড় বাণিজ্য। আমেরিকার সবচাইতে বেশি রপ্তানিযোগ্য পণ্য বিমান, কম্পিউটার, গাড়ি নয়, বরং বিনোদনগুলি—টিভি কর্মসূচী এবং হলিউডি সিনেমা। আজ সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক পণ্যগুলির বন্যা বইছে একমুখী—ধনী দেশগুলি থেকে গরিব দেশগুলির দিকে। সংস্কৃতি আজ অর্থনৈতিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে।'[৬] এই রিপোর্টের আরও জোরদার সমর্থন পাওয়া যাবে ইউনেস্কোর তৈরি করা আর একটি প্রতিবেদন থেকে। 'সাংস্কৃতিক পণ্য আমদানি-রপ্তানি ঘিরে বিশ্ববাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৮০ থেকে ১৯৯১-এর সময়কালে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৬৭ বিলিয়ন ডলার

থেকে বেড়ে ২০০ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। এরকম অবস্থা হলে যা হয়ে থাকে, স্থানীয় বা দেশজ বাজার কমছে। বাড়ছে মার্কিনিদের আধিপত্য। খানিকটা আশ্চর্য লাগতে পারে কিন্তু এ সত্যটা প্রকাশিত যে রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালির মতোই ইজিপ্টের সিনেমার বাজারের প্রায় ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ হলিউডেরই হাতে।'[৭] এখানে আরব দেশগুলির উন্নয়নের সদ্যপ্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরতে চাই। ২০০২ সালের জুলাই মাসে ইউ এন ডি পি কেবলমাত্র আরব দেশগুলো নিয়ে এই প্রথম একটি প্রতিবেদন পেশ করেছে। মোট ২২টা দেশ। জনসংখ্যা ২৮০ মিলিয়ন। পৃথিবীর জনসংখ্যার ৫ শতাংশ এই এলাকায় বসবাস করে। এখানে সমস্যা হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের, সমস্যা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বাক্যের অধিকার, অভাব প্রকৃত শিক্ষার, অভাব গবেষণা ও পরিকল্পনার, অভাব কার্যকরী নেতৃত্বের। এমন একটা সমস্যার মধ্যে এই ভূখণ্ডে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ঘটনাগুলির সমস্যা যারপরনাই খারাপ।

এখানে ২৬.৯ শতাংশ পুরুষ এবং ৫১ শতাংশ মহিলা নিরক্ষর। একমাত্র কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে পুরুষের চাইতে মেয়েরা বেশি সাক্ষর। জ্ঞানচর্চার কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। সারাবছরে মাত্র ৩৩০টি বই অন্য ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ হয়ে থাকে। প্রতি ১ হাজার জন আরবের মধ্যে ৮৮ জন টেলিফোন ব্যবহার করে। মাত্র ০.৬ জন আরব মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। এর একটা বড় কারণ আরবরা ইংরেজি প্রায় না জানার মতো। সমগ্র আরবভূমির সর্বমোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৫৩১.২ বিলিয়ন ডলার। যা একটি মাঝারি আকৃতির ইউরোপের দেশের চাইতেও কম। যেমন স্পেন ৫৯৫.৫ বিলিয়ন ডলার। বাৎসরিক বৃদ্ধির হার মাত্র ৩ শতাংশ, বেকার ১৫ শতাংশ।[৮]

ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বেড়েছে। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে ২০০ জন ধনকুবেরের মধ্যে সবচাইতে বেশি সংখ্যা আমেরিকার—৬৫ জন, তার পরেই আরব শেখদের স্থান ১৬ জন। দেশজ বাজার সঙ্কুচিত হওয়ার কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। বিশ্বায়নের জমানায় আরব দেশগুলির রপ্তানি মার খেয়েছে, কাজের সুযোগ কমেছে। আমদানিও কমেছে। ১৯৯৯ সালে আমদানির পরিমাণ ছিল মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩০ শতাংশ, যা '৯০-র তুলনায় ১০ শতাংশ কম। একই সময়ে রপ্তানি কমেছে ৬ শতাংশ। এই সময়েই মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। মাথা পিছু ১৮.৩ শতাংশ মার্কিন ডলার ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আরবে সাধারণ মানুষ বৈদেশিক ঋণখাতে সুদ গুনে যাচ্ছেন। ১৯৯৯ সালেই দেখা যাচ্ছে যে, আরব দেশগুলির মোট রপ্তানির ১১.৬ শতাংশই গিয়েছে ঋণ খাতে সুদ গুনতে। দক্ষিণ এশিয়ার চাইতে এই সংখ্যাটা অবশ্য খুব কম।

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াতে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলো যে বেকারি, দারিদ্র আর বৈষম্য নিয়ে কালাতিপাত করছে সেক্ষেত্রে আরব ভূখণ্ডও ব্যতিক্রম নয়—তা আমাদের জানা হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিই এবং আরব ভূমিতে যুবদের মার্কিনী নীতির পদচারণা বিশ্বায়নের বিপরীতে ওসামা বিন লাদেনকে সময়ের হিরোতে পরিণত করেছে। লাদেন অনুরাগী এক সৌদি বুদ্ধিজীবী পরিষ্কারভাবে সেটা উল্লেখ করেছেন, 'বিশ্বায়ন বলতে সাধারণভাবে বোঝায় পুঁজির অবাধ যাতায়াত, তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব, জাতীয় কাঠামোর বদলে বহুজাতিক ও সম্পর্কের বিকাশ। একথা বলতেই পারি বিন লাদেনের সংগঠন বিশ্বায়নের কাঠামো ধ্যানধারণাকেই আরও উন্নতভাবে প্রয়োগ করেছে এবং বিশ্বায়ন যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেছে, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে।... কেউ যদি ভাবেন লাদেনের ধ্যান ধারণা এবং নতুন বিশ্বায়ন তত্ত্বের মধ্যে বিরোধ আছে তিনি ভুল করবেন। কারণ বিশ্বায়ন যখন মানুষের দুনিয়াকে একই ঘেরাটোপে বাঁধতে চাইছে তখন বহু সমাজে তা অন্তর্মুখীনতা এবং পুনরুত্থানবাদী প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে।

বিশ্বায়নের অস্ত্রগুলিকে ব্যবহার করেই লাদেনরা ধারণা দিতে চাইছে যে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র লড়াই নয়, একে শেষপর্যন্ত পরাজিতও করবে।'

এ প্রসঙ্গে ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল নামক একটি সংগঠনের নাম করতে হবে। এই সংগঠনটি ইরাক ও সুদানের মতদপুষ্ট। মুসলিম মৌলবাদীরা সরাসরি এটাকে মদত দিয়ে চলেছেন। তাদের প্রধান কাজ হলো দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদকে উস্কিয়ে দেওয়া, যেন সন্ত্রাসবাদের বিশ্বায়ন ঘটলো। তাদের লক্ষ্য কোনও জাতীয় মুক্তি, আঞ্চলিক স্বাধীনতা বা জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায় নয়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলি বিশ্বের বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে লগ্নি পুঁজির জালে জড়িয়ে, এরাও তেমনই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং এবং আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। জালের মত বিছানো ছোট ছোট সহযোগী সংগঠন দ্বারা তারা পুঁজি ও প্রযুক্তিকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে 'কর্পোরেট' দক্ষতায় পৌঁছে দেয়। দুনিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তার এবং সম্পদ জোগাড়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং ক্ষমতার দিকে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইছে।

একটি সংগঠনের উল্লেখ করলাম—কিন্তু এইরকম বহু সংগঠন আসলে যা করতে চাইছে তা হলো পুঁজি ও প্রযুক্তির অবাধ যাতায়াতের ব্যবস্থা, আরও বাজারের জন্য প্রবল ক্ষিদে, পৃথিবীকে শ্রমবিভাজনের কায়দায় বিশেষ বিশেষ পণ্য বা কাঁচামাল উৎপাদনের আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ভাগ করা, জাতীয় সার্বভৌমত্বকে অগ্রাহ্য করে উপগ্রহ-বাহিত আগ্রাসন, সস্তা শ্রমের নিয়ত সন্ধান—এ সব বৈশিষ্ট্যই হলো বিশ্বায়নের কর্তাদের। এদের কাছে ক্রমাগত মদত পেয়েই মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি পুঁজি, প্রযুক্তি এবং তথ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নির্ভর নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার একটা পাল্টা খাড়া করতে চাইছে—কোন কোন ক্ষেত্রে তা সফলও হয়েছে। এরা যতদিন অবাধ্য ছিল না, মাথা নত করে সব কথা মেনে নিয়েছে, কোন প্রতিবাদ করেনি; ততদিন বিশ্বায়ন-প্রভুদের কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু যখনই পরিস্থিতি পাল্টে নতুন দিকে গেছে—মৌলবাদ প্রভুত্ব করতে চাইছে। অন্যের প্রভুত্ব মানছে না। কোন কোন দেশের শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে চাইছে—আশ্চর্যের হলেও সত্য যে তাতে জন সাধারণের সমর্থন পাচ্ছে—কোন রাষ্ট্রনেতা অপসারণ করে নিজেরা গদি দখল করতে চাইছে—যারা আবার মার্কিনী রাষ্ট্রনায়কদের খুবই স্নেহধন্য—তখনই পরিস্থিতি আরও জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নওয়ালা মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে সংঘাত বেঁধে যাচ্ছে। আফগানিস্তানের যুদ্ধ তারই একটা পর্যায়।

বর্তমানে মৌলবাদের চলাচল যেন বিশ্বায়নেরই রাস্তা পরিক্রমা। মৌলবাদীদের প্যান-ইসলামিক পুনরুত্থানবাদ জাতীয়, আঞ্চলিক, এমনকি বহুত্ববাদকে স্বীকার করে না। মুসলিম সমাজগুলিকে 'একশিলা' (মনোলিথিক) করে তোলার জন্য এরা কোনও সমাজের ভিতরে কোন বিরোধ-বিতর্ক-জিজ্ঞাসা বরদাস্ত করতে রাজি নয়। ঠিক যেমন রাজি নয় বিশ্বায়নের কর্তারা। তাদের কাছে তারাই মূল ধারা, বাকি সব সভ্যতা, সংস্কৃতি সমাজ সব প্রান্তিক। বিশ্বায়নের মূল প্রভু দেশে দেশে বিভিন্ন কায়দায় নতুন বিশ্ব কায়েম করার বিষয়ে উদ্গ্রীব। আজকে আন্তর্জাতিক মৌলবাদীরা একই ভাবধারায় নিজেদের চালু করছে। তাদের হাতেও শস্ত্র পুঁজি, প্রযুক্তি, তথ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং পিছিয়ে পড়া দর্শন চিন্তা।

একটা প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসছে যে, সারা বিশ্ব জুড়ে ইসলামি মৌলবাদের এমন রমরমা বাজার কেন? বিষয়টি যে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সংবেদনশীল মানুষকে চিন্তায় ফেলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ নিয়ে বহু চর্চাও হচ্ছে। মূল সূত্রগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। বিশ্বায়ন এবং সংস্কৃতির সাযুজ্যবিধানের এবং একীকত্বকরণের নামে পশ্চিম দুনিয়া

যেভাবে আধিপত্যবাদ চালিয়ে যাচ্ছে তারই উল্টো দিকে মৌলবাদী চিন্তার সামাজিকীকরণ হয়েছে বহুল পরিমাণে। একটা সময় এমন ছিল যে, অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য মোল্লাশ্রেণীর লোকদের একটা অংশ ছিল মৌলবাদী ধ্যানধারণাগুলির প্রবক্তা। কিন্তু বিগত ২৫/৩০ বছরে মৌলবাদীদের সামাজিক ভিত্তি বহুদূর বিস্তার লাভ করেছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেই দেখেছি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বিশেষ করে ছাত্র-যুবরা পশ্চিমী ধাঁচের আধুনিকতাকে গ্রহণ করতে বিশেষ আগ্রহী ছিল। কিন্তু এখন তার বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে। উচ্চ শিক্ষিত ছাত্র-যুব, আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বড় অংশ আজ মৌলবাদের চালিকাশক্তি। বিশ্বের উন্নত প্রযুক্তি আত্মগত করে তাদেরই হৃদপিণ্ডে আঘাত করার কৌশল তারা রপ্ত করেছে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা তারই প্রমাণ। আর একটি কথা উল্লেখ করি, আমার মত অনেকেই হয়ত লক্ষ করে থাকবেন যে, আমাদের দেশেও মৌলবাদী এই ধরনের সংগঠনগুলির চেহারা অতীতে কেমন ছিল। শহরে কোন কোন সময় তাদের মিছিল করতে দেখেছি। গুটিকয় মানুষ যাদের বয়স যৌবন অতিক্রম করেছে তারই অংশগ্রহণ করতো। এখন সেই মিছিলে অবয়ব এবং গভীরতা দুই'ই পাল্টে গেছে। নতুন নতুন মুখ, যুব-ছাত্র তাতে অংশীদার। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সংগঠন বাড়ছে। যা এদেশেও একসময় অকল্পনীয় ছিল।

মৌলবাদীরা সেকারণেই আধুনিকতার সন্তান। তা যে অর্থেই আমাদের সামনে প্রতিভাত হোক না কেন! স্যামুয়েল হান্টিংটন-এর নাম এখন সবিশেষ পরিচিত বুদ্ধিজীবী মহলে। তাঁর মতামতটা আমাদের জেনে রাখা ভালো। যিনি সভ্যতার সংঘাত দেখেছেন—যিনি ধর্মগোষ্ঠীগুলির নতুন বিন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কালক্ষেপ করেছেন। 'যে কোনও বিপ্লবী আন্দোলনের মতোই এখানেও মূল সংগঠকরা হল ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী। অর্ধেকের বেশি এসেছে এলিট কলেজগুলি থেকে অথবা বিদ্যাবুদ্ধির সবচেয়ে বেশি দাবি যেসব জায়গায়, সেই কারিগরী শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্র থেকে। অনেকে আবার চিকিৎসা বিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ছাত্র ও শিক্ষক। ৭০ শতাংশের বেশি হলো মধ্যবিত্তের সন্তান। গরিব নয় অথচ সচ্ছলও নয়—এমন অনেক পরিবারের সন্তান যারা এই প্রজন্মেই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেল: এমন লোকের সংখ্যাও ব্যাপক। এরা ছোটবেলায় মফস্বলে কাটালেও বড় হলে বিরাট শহরে পা রেখেছে।'[১] সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং উচ্চশিক্ষিত তরুণরা, সমগ্র জনসংখ্যায় তাদের অংশ খুবই কম—কিন্তু তুলনামূলক বিচারে অত্যধিক হারে মৌলবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সুতরাং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। পৃথিবীর দেশে দেশে অবিচ্ছিন্নভাবে এমন ঘটনাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে শহুরে ছোট ব্যবসায়ী, সাধারণ চাকুরিজীবী নিম্নবিত্ত মানুষ। এ ব্যাপারে আর একটি অংশ হচ্ছে গ্রাম থেকে নানা কারণে ছুটে আসা ছিন্নমূল জনতা। সব মিলিয়ে মৌলবাদীদের অংশ নানাভাবে শক্তিশালী করেছে।

অতিরিক্ত আগ্রাসনবাদ মৌলবাদীদের দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। বিশ্বায়ন কর্তাদের সঙ্গে তাদের এক্ষেত্রে যথেষ্ট মিল আছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানের বর্তমান আগ্রাসনী চিন্তা সেই পর্যায়েই পড়ে। আমাদের দেশে হিন্দু মৌলবাদীদের দ্বারা ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা আগ্রাসনবাদেরই বহিঃপ্রকাশ। জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে জনপ্রিয়তা বাড়াতেও তা সাহায্য করছে। আর একটি বড় জনপ্রিয় কাজ মৌলবাদীরা চালাচ্ছেন তা হলো সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ। সেবাধর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা অনেক জায়গায় অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছে। হান্টিংটন-এর পর্যালোচনাতে ফিরে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে। 'এই মানবিক বা খয়রাতি কাজকর্ম শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার আড়াল বা আশ্রয় নয়। এসব প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে

সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচী চালায়। স্কুল, নার্সারি, হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র, কৃষি-ফার্ম, মেশিন-শপ-কী নয়। এরা নিজস্ব এলাকার দুঃস্থজনের মধ্যে ঔষধ, কাপড় বা বইপত্র বিলি করে। সব মিলিয়ে আমজনতার সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক কষ্টের সময় এরা পাশে দাঁড়ায়। তাদের এই দোলনা থেকে কবরস্থান পর্য্যন্ত সেবা কাজের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা যা পশ্চিমী মানবিক সংগঠনগুলির নেই।'[১০] সেকুলার রাষ্ট্রের মধ্যেই এমনতর ধর্মীয় জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা, মৌলবাদীদের জনভিত্তি বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইসলামি মৌলবাদের বৃদ্ধি কেবলমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেই ছড়িয়ে আছে তাই না। আগেই উল্লেখ করেছি বিশ্বব্যাপী তার জাল ছড়িয়ে পড়েছে। ২০০১ সালে আমেরিকার জোড়াবাড়ি ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তা নিয়ে আলোচনা আরও ব্যাপক অর্থে হতে শুরু করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি একহাতে কোরান ধরে মৌলভী-মওলানাদের সঙ্গে সভা করেছেন অন্যদিকে ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে সমার্থক করে নিরন্তর প্রচার করেছেন। ইসলামের দুর্ভাগ্য এটাই যে, যে ধর্ম একদিন কেবল ঊষর আরব ভূমিতে নয় সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায়, সহমর্মিতা বৃদ্ধিতে, ঐক্যের নিদান ঘোষণায় তৎপর হয়েছে, যার এই মানবিক রূপ প্রত্যক্ষ করে কোটি কোটি মানুষ ইসলামকে নিজেদের জীবনচর্চার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে; তাকেই এই বদনামের ভাগীদার হতে হচ্ছে। সেটা খুবই মর্মান্তিক। সেই কারণেই মুসলিম মৌলবাদের উত্থান এবং বিস্তৃতির বিকাশ আলোচনার প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। ইসলামের প্রকৃত আবেদনের সঙ্গে মৌলবাদীদের ক্লেদাক্ত চিন্তার কোন মিল নেই। ইসলামের একটিই রূপ। দু'ধরনের ইসলামের যে তত্ত্ব বুশ-বাজপেয়ীরা দেখাচ্ছেন তাকে অবলীলাক্রমে মিথ্যা বলে দেওয়া যায়। সেকারণেই আর একবার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্বব্যাপী মৌলবাদী পুনরুত্থান (ইসলামিক, হিন্দু, খ্রীস্টান সমস্ত) শুরু হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ভাঙন, অধঃপতন তথা সমাজতন্ত্রের আবেদনের ভাঁটার সময়ে। একদিন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দার্শনিক চিন্তা বিশ্ব-তারুণ্য মশগুল ছিল। তার যথাযথ কারণ আমাদের জানা। সোভিয়েত বিপ্লবের জয়, ফ্যাসিবাদীদের পরাজয়, একটার পর একটা ঔপনিবেশিক দেশের মুক্তি সারা পৃথিবীকে মাতোয়ারা করে দিয়েছিল। সেই দার্শনিক এবং ব্যবহারিক ঘটনাবলী এখন পিছনের দিকে— সাময়িক হলেও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় তার প্রভাব বিভিন্নভাবে ফুটে বেরুচ্ছে। মৌলবাদীদের তৎপরতা সেই প্রেক্ষাপটেই বেড়ে চলেছে। তার সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে পশ্চিমী পুঁজিবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা। তাছাড়া বিশ্বায়নের সংস্কৃতি ও অর্থনীতির প্রতিক্রিয়ায় মৌলবাদ এক শক্তিশালী রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিণত হয়েছে।

ভারতবর্ষের কতকগুলো বিষয় আলোচনা করার আগে আমরা এবারে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রতিবেদনের[১১] প্রেসিডেন্ট জেমস্ ডি উলকেনসন-এর মুখবন্ধটির দিকে নজর ফেরাতে চাইছি। প্রতিবেদনের লক্ষ্য বিশ্বের বাজার ব্যবস্থাকে বিকশিত করা, দারিদ্র্যের হার কমানো, বাজার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্ম্পক নির্ণয় করা। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, গতবারও এমনধারা প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছিল। সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা পারে সমাজকে স্থিতি এবং কল্যাণের পথ খুঁজে দিতে এবং তাতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অসম্ভব গুরুত্ব আছে। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে যে অবলম্বন দরকার তা দিতে পারে 'সোস্যাল ক্যাপিটাল' বা সামাজিক সম্পদ। সামাজিক সম্পদ সমাজে সুস্থিতি, শান্তি, দায়িত্ব প্রবর্তন করতে সহায়তা করে। কিন্তু সমাজে যারা অবদমিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, যাঁরা সমাজে বৈষম্যপূর্ণ সম্পত্তি কাঠামোর পরিবর্তন চান, যাঁরা চান দু'বেলা একটু পেট ভরে খেতে, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চেতনাকে উন্নত করতে, প্রতিদিন একটা

ন্যূনতম রোজগার নিশ্চিত করতে তাঁদের অনুকূলে কি সামাজিক যোগাযোগ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া এক দুরূহ কাজ। সামাজিক সম্পদ বলে সমাজের কল্যাণের জন্য যে সামাজিক যোগসূত্রতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা তো অবস্থাপন্নদের অনুকূলে। যারা সমাজে অবহেলিত, যাদের সংখ্যা পৃথিবীতে ৭০ শতাংশ তারা এই সামাজিক বন্ধনেরই শিকার নয় কি? বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসক্রিপশন কি কাজে লাগবে অবহেলিত? মানুষদের প্রতিবেদন তো ধনীদের আরও ধনী করার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষে এই রাস্তা ধরেই বিশ্বায়নের কাজ হয়ে চলেছে। একদা অর্থনীতির বন্ধনদশা ঘোচাবার নাম করে উদারনীতির রাস্তা নেওয়া হয়েছিল— সেই রাস্তা বেয়ে ভারতবর্ষ অনেকদূর রাস্তা পেরিয়ে এসেছে। একদশকের বেশি। পিছনের দিকে এবার আমাদের তাকাতেই হবে। বিনা বাধায় আমরা মেনে নিয়েছি উদারনীতি, সই করেছি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্তে। দেশের শিল্প এবং কৃষির নাভিশ্বাস উঠেছে। দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার লজ্জা করার মত। এতদ্‌সত্ত্বেও দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার নাকি উপচিয়ে পড়ছে। এর চাইতে বড় সাফল্য নাকি আর আসেনি। প্রকৃত অর্থে দেশের অর্থনীতির চিত্র কি? ১২/১৩ বছর এক নাগাড়ে ভালো মরশুম থাকা সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন একই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। রাজ্যে রাজ্যে কৃষকরা ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারছেন না বলে আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে গেছে। ন্যায্যদামে ফসল বিক্রি এখন স্বপ্ন। শিল্পে বৃদ্ধির হার বাড়বার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ৮০-র দশকে যে সাফল্য দেশে এক্ষেত্রে এসেছিল তা এখন মায়াতে পর্যবসিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প বন্ধ। একটার পর একটা নামী শিল্প, দেশের সম্পদ বেসরকারী করার নামে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। কোটি কোটি বেকারদের সামনে কেবল হতাশা। নতুন চাকরি হওয়া তো দূরের কথা প্রতি বছর ২-৩ শতাংশ করে কেন্দ্রীয় সরকারি পদ বিলোপ করার সিদ্ধান্ত কার্যকরী হচ্ছে। দারিদ্র দূরীকরণের কাজ বন্ধ হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে ৬ কোটি মেট্রিক টন খাদ্য জমা থাকা সত্ত্বেও খাদ্যের অভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে। ১০-১২টা রাজ্যে খরা। অবস্থা দেখে মনে হয়নি দেশে কোন সরকার আছে। প্রতিদিন রাজ্য সরকারগুলি তাদের আর্থিক অবস্থা নিয়ে চিৎকার করছে। কেন্দ্রে যেন এক বিদেশী সরকার অবস্থান করছে। বিশ্বব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের মাথা নত করানো শর্তগুলি প্রতিদিন জপ করা হচ্ছে— কিন্তু দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটছে না। দেশকে বিশ্বায়নের সারিতে দাঁড় না করাতে পারলে যাদের রাতের ঘুম হচ্ছে না তারা চিৎকার করছেন— হতভাগ্য দেশবাসীকে আর কি কি করতে হবে। কিন্তু আমরা জোরের সঙ্গে বলছি এই আর্থিক আধিপত্যের পিছনে একটি দর্শন আছে— বিশ্বায়ন একা আসে না, দর্শনটি সঙ্গে করে নিয়ে আসে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এদেশেও সেই পিছিয়ে পড়া পঞ্চদশ শতাব্দীর ক্লেদাক্ত দর্শন আমাদের চিন্তার জগতকে পঙ্গু করে দেবার কাজে সতত রত।

পরিস্থিতিটি আরও জটিল হয়ে গেছে এই কারণে যে, প্রায় ৪ বছর আগে দিল্লীতে দক্ষিণপন্থী মৌলবাদীদের নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠিত। তারা যখন সরকারে ছিল না তখন বিদেশী পুঁজি, প্রযুক্তি ইত্যাদির ব্যাপারে একরকম মনোভাব পোষণ করতো এখন একেবারে অন্য। বিশ্বায়নের কাজ যেমন দ্রুতগতিতে তারা করে চলেছে তেমনই মৌলবাদীদের কাজের ধারা, গভীরতা এই সময়েই বেড়ে গেছে সবচাইতে বেশি। বিশেষত হিন্দু মৌলবাদী শক্তি অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে এই সময়ে। ওড়িযার মনোহরপুরে খ্রীস্টান পিতা এবং বালকদ্বয়কে পুড়িয়ে মারার পিছনে কেবলমাত্র অসহিষ্ণুতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? ভারতবর্ষে খ্রীস্টানরা একেবারেই সামান্য পরিমাণ। ২/৩ কোটি'র বেশি নয়। তারা রাজনীতিতে, দেশের

পরিবর্তনে কোন ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাহলে তাদের খুন হতে হবে কেন? ওদের মতবাদ সংখ্যাগুরু অংশ বিশ্বাস করে না। এ অসহিষ্ণুতার দর্শন ভারতের চিরায়ত সহনশীলতার দর্শনের সঙ্গে মেলে না। তাহলে?

সদ্য সদ্য গোধরার ঘটনা আমাদের মাথা নত করে দিল। অনেক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি— সে বিতর্ক করার জায়গা এটা নয়। তবে ভারতবাসী অন্য ভারতবাসীকে পুড়িয়ে মারলো ধর্মের নামে। এমন ঘটনার সাক্ষী থাকতে হবে বলে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধা কারও চোখের আকুতি আমাদের বিবেককে নাড়া দিল না? এমন দস্যুহৃদয় ভারতবাসী কবে অর্জন করলো তা এখন আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

তারই সূত্র ধরে এলো গুজরাট। আমাদের এতদিনের কলঙ্কের তালিকাকে মুছে দিয়ে উজ্জ্বল(!) হয়ে উঠলো। ধর্মের নামে, ধর্মরক্ষার নামে, নারী পুরুষের এমন গণহত্যায় অংশগ্রহণ ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেনি। মায়ের পবিত্র গর্ভ এদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি, পিতার সামনে কন্যা, নাতির কাছে দিদিমাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে সবচাইতে বড় সম্পদ 'ইজ্জত'। আমরা মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দেবার জায়গায় আর নেই। কবে ভারতবাসীর হৃদয় এমন পাথর হলো?

সদ্য সদ্য সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে গুজরাটের বিশ্ববিখ্যাত স্বামীনারায়ণ-অক্ষরধাম মন্দির। যে মন্দির জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিভেদ উপেক্ষা করে বারে বারে সমন্বয়ের ঐক্যের আহ্বান জাগিয়ে রেখেছে বহুকাল ধরে। প্রতিদিন হাজার হাজার ভারতবাসীর প্রার্থনা যেখানে উচ্চারিত হয়ে ঘোষণা করে মানবজাতির জয়যাত্রা। তার পবিত্র আঙিনা নিরীহ সাধারণ মানুষদের উষ্ণ রক্তে ভেসে গেছে। নারী শিশু আরও একবার আমাদের চেতনার কাছে আবেদনহীন হয়ে গেল। মৌলবাদীরা কতখানি হিংস্র হতে পারে তাঁর পরিমাণ আমরা হয়ত এখনও করতে পারছিনা—কিন্তু এই অতলান্তিক গভীরতার আমরা পরিমাপ যদি করতে না পারলে আরও বহু মূল্য দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এই সেই গুজরাট যেখানে শিল্পের বিকাশ দেশের প্রথম সারির রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান। বিদেশি বিনিয়োগে ঈর্ষণীয় অগ্রগতি, কৃষির অগ্রগতি চমৎকার, আভ্যন্তরীণ শিল্পোৎপাদনে একেবারে সামনের সারিতে। আর্থিক সংস্থাগুলি বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা ঢেলে দিয়েছে বললে কম বলা হয়। যত আমানত নিয়েছে তারা তেমনই ফিরিয়ে দিয়েছে। আর একটা ফাঁকা বুলি বিজেপি-র রাজত্বে দাঙ্গা হয় না। প্রায় তত্ত্বের আকার ধারণ করছিল বুলিটি। এমন সময় বিশ্বায়নের বৃত্ত পূর্ণ করে ভয়াবহ ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো আমাদের, বুঝলাম প্রকৃতি প্রতিদান নিতে চেয়েছে। ক্লেদাক্ত দর্শন দাম মিটিয়ে নেবে। মানুষের পরিচয় হারিয়ে আমাদেরই ভাই বন্ধুরা জল্লাদের ভূমিকা নিল। বিষাক্ত আর্থিক দর্শনের কোন ভূমিকা নেই? তা কি হতে পারে? এদেশ রবীন্দ্রনাথের নজরুল, সুকান্ত-র। যারা ভারতবাসীর জীবনচর্চা তৈরি করে দিয়েছেন। এদেশ আলাউদ্দিন খাঁ ফৈয়াজ খাঁ ভীমসেন যোশী'র— যাঁরা আমাদের নিঃশ্বাসের বায়ু পবিত্র করে দিয়েছেন। সেই পবিত্রতা ছিন্ন করে বিষাক্ত ছোবলে আমাদের হৃদয় কি করে পাথর হলো? আমাদের বর্তমান আর্থিক সংস্কারের নামে পশ্চিমী দুনিয়ার বিশ্বায়নের দর্শনের দিকে নজর না ফিরিয়ে কোন উপায় নেই।

যে বিকৃত দর্শন চিন্তার কথা লেখায় বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছি সেই চিন্তাকে দেশের সবার মধ্যে সঞ্চারিত করার পরিকল্পনা সরকারীভাবে নেওয়া হয়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সহনশীলতার ঐতিহ্য শেষ হয়ে মৌলবাদীদের স্বার্থ রক্ষিত করার ভবিষ্যত তৈরি হয়ে

যাচ্ছে। দেশের ইতিহাস তৈরি হচ্ছে একপেশে, প্রথিতযশা ঐতিহাসিকদের বাদ দিয়ে শাসকশ্রেণীর কতকগুলি পেটোয়া লোক দিয়ে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করেছেন তাদের কথা বাদ দিয়ে অকিঞ্চিৎকর ঘটনার সমাহার সেখানে। মানুষের পরিচয়কে ধর্ম দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেবার পরিকল্পনা হয়েছে। যাতে ধর্মগোষ্ঠীগুলো একে অপরের রক্ত ঝরাতে পারে আর বিকৃত দর্শনের প্রতিষ্ঠা আরও সহজ হতে পারে।

দক্ষিণপন্থী মৌলবাদীদের আমলে সব ধরনের মৌলবাদী শক্তিই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে মুসলিম মৌলবাদীদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক থেকে ভারতবর্ষও বাদ যায়নি। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে মৌলবাদী সংগঠনগুলো তাদের কাজকর্ম বাড়িয়ে তুলেছে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে তারা দেশের নিরাপত্তার প্রতি বড় আঘাত দেবার পরিকল্পনা করেছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা একেবারেই আশাপ্রদ নয়। পাকিস্তান সরকার দোষারোপ করতেই ব্যস্ত কাশ্মীর তথা সারা দেশের মানুষকে বিশ্বাসের বৃত্তে নেবার কোন পরিকল্পনা নয়। বরং বিভিন্ন অজুহাতে এ ব্যাপারে মার্কিনী হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিচ্ছে—যা আমাদের গৃহীত বৈদেশিক নীতির বাইরে। আমেরিকা এই উপমহাদেশে সামগ্রিক বিচারে তার সামরিক রাজনৈতিক এবং আর্থিক আধিপত্যকে বাড়াবার কাজ ভারত সরকারের এমন দোদুল্যমানতাকে ভিত্তি করছে। মৌলবাদীরা সে সবেরই সুযোগ গ্রহণ করছে। আমাদের মনে রাখা দরকার বিশ্বায়নের দর্শন পৃথিবীর কোথাও সামাজিক সুস্থিতি দিতে পারে না। সেটা ভারতবর্ষে পাকিস্তানে, মধ্যপ্রাচ্যে যেখানেই হোক না কেন। সামাজিক অস্থিরতা অর্থনীতি এবং মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে বাধ্য এবং সেখানেই মৌলবাদীদের আবির্ভাব এবং কার্যকলাপ।

বিশ্বায়ন সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা উন্নয়নশীল এবং গরিব দেশগুলির আর্থিক ও সামাজিক চিত্র আলোচনা করি। কিন্তু এটা আর কোন গোপন তথ্য নয় যে উন্নত দেশগুলির অবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ধাক্কায় কাহিল। ২০০১ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে ও ই সি ডি (অর্গানাইজেশন অফ ইকনমিক কো-অপারেশন এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বেকারিত্ব, অসাম্য বাড়ছে ব্যাপক হারে। আমেরিকায় ৯০ ৯৮ সালে মোট শ্রমশক্তির ৫.৯ শতাংশ ছিল বেকার। মহিলারা সব চাইতে বেশি আক্রান্ত নোয়াম চমস্কি একটি বক্তব্য মন্তব্য করেছেন 'নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট' বা নাফ্টা মেক্সিকো, কানাডা এমনকি আমেরিকার বহু মানুষের অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে। ফ্রান্স জার্মানী, বেলজিয়াম সর্বত্র চাকরির অবস্থা খারাপ। এইসব দেশ ১৫ শতাংশ কাজ চালাবার মতো সাক্ষরতা অর্জন করেনি। মেয়েরা সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। ১৩০ মিলিয়ন মানুষ এখনও 'আয়জনিত দারিদ্র'-এর শিকার। ৮ মিলিয়ন মানুষ অপুষ্টিতে ভোগেন, ১.৫ মিলিয়ন মানুষ এইডস-এ আক্রান্ত। গত দেড় দশকে এসব দেশেও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বেড়েছে কেবলমাত্র আমেরিকা ও ব্রিটেনে বৈষম্য বৃদ্ধির হার ৭-১৫ শতাংশ। আমেরিকার ১০ শতাংশ মানুষের হাতে যা সম্পদ গচ্ছিত তা পৃথিবীর ৪৩ শতাংশ মানুষের মোট রোজগারের সমান এই প্রতিবেদনেই আশাবাদ ছড়ানো হয়েছে ২০০৫ সালের মধ্যে যদি দারিদ্রের মধ্যে বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা অর্ধেক কমানো যায় তবে অবস্থার উন্নতি হবে। অবশ্য তাহলেও উন্নতশীল দেশগুলির ৯০০ মিলিয়ন মানুষ থেকে যাবে জীবন যন্ত্রণার অন্ধকারে। ৪২৬ মিলিয়ন মানুষ তখনও আধপেটা খেয়ে বাঁচবেন।

কিন্তু এই আশাবাদ বিশ্বায়নের তত্ত্বের সঙ্গে মিলছে না। এই বৈষম্য বাড়বে বই কমবে না যে পথে চলার বাসনা সাম্রাজ্যবাদীদের তাতে বৈষম্যের ফারাক কমালে তাদের চলবে না

পৃথিবীর প্রতি চরম আধিপত্যবাদ ছড়িয়ে দেবার জন্য আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। সেই চলার পথে বিশ্বায়ন, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ সবগুলিই এক একটি সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ার। কখনও জোটবদ্ধভাবে আক্রমণ আবার কখনও সময় বিশেষে আলাদা আলাদা। এই আধিপত্যবাদের যা আকারই থাকুক না কেন— গণ-আন্দোলনের সম্মিলিত প্রতিরোধের কোন বিকল্প নেই।

বিশ্বায়ন, উত্তর-আধুনিকতা এবং বামপন্থী ভাবনা

এলেন মেইকসিনস উড

যে কোন লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে কোন ঘটনা বিংশ শতাব্দীর বাম-সংস্কৃতিকে সর্বাধিক আলোড়িত করেছে, তবে যে উত্তর সুনিশ্চিতভাবে মিলবে তা হল : "কমিউনিজমের বিপর্যয়"। তথাপি আজকের বামপন্থী বৌদ্ধিক জগতের যে কোনো শাখার দিকে তাকালে আমরা দেখব, যে আমাদের যুগের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পারম্পর্যে যে ছেদ ঘটেছে তা ঐ ঐতিহাসিক "বিপর্যয়ের" বৃত্তের বাইরেই রয়েছে এবং আগে থেকেই বিরাজ করছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ মনে করেন যে প্রায় পঁচিশ বছর আগে, ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার বছরগুলিতে, আমরা একটি যুগ-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছি। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি একটি বড় গুণগত উল্লম্ফন— চারিত্রিক বিচারে যা পুঁজিবাদী বিকাশের অনুক্ষণ পরিবর্তনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ হতে পারেন বা হতে পারেন উত্তর-আধুনিক সংস্কৃতিবোদ্ধা। তাঁরা এই নতুন যুগকে নানা নামে অভিহিত করতে পারেন। তার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত নামগুলি হল "বিশ্বায়নের যুগ" বা "উত্তর আধুনিকতার যুগ"। অথবা যৌথভাবে "উত্তর-আধুনিক বিশ্বায়নের যুগ"। যে নামেই এই যুগকে অভিহিত করা হোক না কেন, ঐ যুগপরিবর্তনের অনুক্ষণ অনুষঙ্গ বহুধাবিস্তৃত বামপন্থী ভাবতরঙ্গের মধ্যে আগাগোড়া বিদ্যমান।

এই নতুন যুগের রূপরেখা সর্বজনপরিচিত। বিশ্বায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই যুগের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল আন্তর্জাতিক পুঁজি, বিশ্ব-বাজার, বিশ্বায়িত উৎপাদন এবং জাতিরাষ্ট্রের বদলে পুঁজির আন্তর্জাতিক দালালদের কাছে সার্বভৌমিকতার হস্তান্তর। যদি কোনো একটি দীর্ঘমেয়াদি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এইসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে, তা হল প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, অর্থাৎ তথ্য যুগের সূচনা। এইসব পরিবর্তনগুলি কমিউনিজমের বিপর্যয়ের ফলে ঘটেনি। তবে এই পরিবর্তনগুলিকে শক্তি জুগিয়েছে কমিউনিজমের বিপর্যয়। কারণ পুঁজির বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির প্রতিবন্ধক রূপে আজ কমিউনিজম অনুপস্থিত।

উত্তর-আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও আমরা একই চিত্রের খণ্ডাংশগুলি দেখি। এখানেও অবশ্যই তথ্য যুগ ও বহুলাংশে বিশ্ব অর্থনীতি একটা বাস্তবতা। কিন্তু এখানে প্রধানত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সাংস্কৃতিক, ভাবগত এবং মনোজাগতিক পরিবর্তনের উপর; গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে সমস্ত পুরনো নিশ্চয়তাগুলির অবলুপ্তি, সমস্ত নৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিসমূহের অসংহতি,

ও "পরিচয়ের" (identity) অস্থিতির উপর। যদিও কমিউনিজমের বিপর্যয় "বিশাল আখ্যানসমূহ" (grand-narratives) ও আলোকপ্রাপ্তির প্রকল্পসমূহের (Enlightenment projects) পশ্চাদপসরণকে ত্বরান্বিত করেছে তথাপি এই ঐতিহাসিক ফাটল উত্তর-আধুনিক যুগকে আহ্বান করে আনেনি।

আপাতদৃষ্টিতে, বর্তমান যুগের রূপরেখাটি যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৃহৎ পরিবর্তনগুলি নিহিত রয়েছে যুদ্ধ-উত্তর তেজী বাজারের মধ্যে। আর এই পুঁজিবাদী পরিবর্তনসমূহের সঙ্গেই সম্পৃক্ত রাজনৈতিক পরিবর্তন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দীর্ঘমেয়াদী মন্দা— যা থেকে চরিত্রকে পৃথক—তা নিঃসন্দেহে শ্রমিক আন্দোলনকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধ্রুপদী পর্যায়ক্রমিক সংকটের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এখন প্রশ্ন হল : কীভাবে বিশ্বায়ন বা উত্তর-আধুনিকতা ফাটলের মুহূর্তকে তুলে ধরে? সাম্প্রতিক উত্তর-আধুনিক ও বিশ্বায়িত যুগকে আমাদের ভাবতে হবে ইশতেহারের সুবিখ্যাত পংক্তিগুলির তুলনামূলক প্রেক্ষাপটে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে মার্কস চিহ্নিত "বিশ্বায়ন", "স্থানীয় ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ম্ভরতা" কীভাবে "জাতিসমূহের সর্বজনীন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা" ও পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিকতাকে পথ করে দিয়েছে যা সমস্ত "চীনের প্রাচীর" ভেঙে নিজের মতো করে এক নতুন দুনিয়ার সূচনা করেছে। এমনকি সাম্প্রতিক এশিয় সংকট পূর্বাহ্নেই ফুটে উঠেছিল সেই জাদুকরের মধ্যে যে জাদুকর আর অধঃস্তন পৃথিবীর শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়, যদিও সেই শক্তি তার জাদুসঞ্জাত। একথা উল্লেখ করা যথেষ্ট, সংঘটিত বাণিজ্যিক পর্যায়ক্রমিক সংকট সমগ্র বুর্জোয়া সমাজকেই বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। এইসব সংকটগুলি মহামারীর আকারে বারবার দেখা দিয়েছে— এর কারণ ব্যাপকহারে অতি-উৎপাদন।

কিন্তু স্বয়ং মার্কস অঙ্কিত "উত্তর-আধুনিকতা"-র চিত্রকে কেই-বা অতিক্রম করতে পেরেছে?

."উৎপাদনের ধারাবাহিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক শর্তাবলীর উপর অপ্রতিহত বিঘ্নসমূহ, চিরবিরাজমান অনিশ্চয়তা ও ক্ষোভসমূহ...। সমস্ত সুস্থির, জমাটবাঁধা সম্পর্কসমূহ অপসৃত হচ্ছে; আর সমস্ত নবগঠিত সম্পর্কসমূহ জমাট বাঁধার আগেই পুরনোর তকমাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সমস্ত প্রস্তরীভূত বিষয়ই বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।"

উল্লেখ্য, এই পংক্তিগুলিতে আমাদের সাম্প্রতিক যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিধৃত নয়। বস্তুতপক্ষে, এগুলি কোনো একটি বিশেষ পুঁজিবাদী যুগের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে না। এগুলি সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদেরই বৈশিষ্ট্য।

মার্কস যখন তাঁর বহুলপরিচিত— বলা যায় প্রায় অতিলৌকিক দূরদৃষ্টি দিয়ে সাম্প্রতিক যুগের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলিকে বর্ণনা করেছেন, তখন "যুগ-পরিবর্তন" সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কী? একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার : বিষয়টি পুঁজিবাদের কোনো একটি স্তর নয়, বিষয়টি হল পুঁজিবাদের গতিসূত্র ও প্রণালীবদ্ধ যুক্তিসমূহ যা আগাগোড়া অনুক্ষণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বিষয়টি নিশ্চিতভাবে এই নয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝের বছরগুলির পুঁজিবাদ আর একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের পুঁজিবাদ একই। পক্ষান্তরে, বিষয়টি হল এই যে পুঁজিবাদ সদাপরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার দুরূহ যুক্তির দ্বারা শুরু থেকে নির্ধারিত হয়ে এসেছে। আর এই প্রক্রিয়ার যুক্তি পরিস্ফুট হয়েছে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি ও সামাজিক শর্তাবলীর উপর অনুক্ষণ ব্যাঘাত— উভয়ের উপর।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে: কেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বায়নকে একটি প্রক্রিয়ার পরিবর্তে একটি যুগ হিসাবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী? কেনা তাঁরা একে আবহমানকাল ধরে বিদ্যমান

পুঁজিবাদের প্রণালীবদ্ধ যুক্তির মধ্যে নিহিত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত না করে বিচ্ছিন্ন ইতিহাসের একটি স্তর হিসাবে চিহ্নিত করতে তৎপর?

এই প্রশ্নের উত্তর নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জটিল। কিন্তু এই উত্তরের একটি বড় অংশ সন্দেহাতীতভাবে রাজনৈতিক এবং ঐ রাজনৈতিক উত্তরটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রোথিত। বর্তমান বামপন্থী শিক্ষা-সংস্কৃতি শুধুমাত্র ঘটমান শর্তাবলীর দ্বারা নির্মিত নয়; তার শিকড় ছড়িয়ে আছে সেইসব মানুষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিতরে যাঁরা ঐ সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং আমরা এখনও সেই শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত যা গঠিত হয়েছে মূলত তাঁদের হাতে—যাঁরা ৫০ ও ৬০-এর দশকে রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জগতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্যই একথা সত্য যাঁরা যুগ-পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেন তাঁরা সবাই ঐ প্রজন্মের মানুষ নন কিন্তু আমি মনে করি ঐ প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা-মনন-সংবেদনশীলতা সামগ্রিকভাবে বামপন্থী শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পরিব্যাপ্ত।

তাহলে ঐ পর্বের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য কী? সর্বাগ্রে ৬০-এর দশকের মন্থন-পর্বের কথা উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু সেই প্রজন্মের বামপন্থীরা আজ কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গেলে তাদের অন্তিম ব্যর্থতাও পর্যালোচনা করতে হবে। ঠিক কোন্ ব্যর্থতার কথা আমরা বলতে চাইছি? কোনো ভনিতা না করে বলা যায় ৬০-এর দশকের প্রতিস্পর্ধী সংস্কৃতির মূল স্রোতের নেতৃত্ব ছিল বৈপ্লবিক চেতনাসমৃদ্ধ সমাজতন্ত্রী ও তাদের সহযাত্রীদের হাতে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না উক্ত সংস্কৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিকাশলাভ করেনি। আজকের বাম-সংস্কৃতি সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার দ্বারা কতটা নির্মিত সেই প্রশ্নের উত্তর সোভিয়েত ধাঁচের সমাজতন্ত্রের নিয়তি সম্পর্কে আমাদের সংশয়াকুল ভাবনাচিন্তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে ৬০-এর দশক সম্পর্কে আমরা সামগ্রিকভাবে কী মূল্যায়ন করতে পারি, যা আমাদের আজকের বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে?

এর জন্য আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর চোখ রাখতে হবে। এর কারণ এই নয় যে '৬৮ সালের মে মাসের ঘটনাবলীর বা ৬০-এর দশকে অন্যান্য দেশে যে র‍্যাডিক্যাল চিন্তা-চেতনার স্ফূরণ ঘটেছিল তার গুরুত্ব কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করার মূল কারণ হল সাম্প্রতিককালে প্রচলিত চিন্তা ভাবনা ফরাসী দার্শনিক চিন্তার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকহারে চালু রয়েছে। যাঁরা এই রচনাটি পড়বেন, তাঁদের নিজেদের জাতীয় অভিজ্ঞতাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মূল চিন্তাকে সামনে রেখে নিজেদের মতো করে সামান্য অদল-বদল করে নিতে হবে; কিন্তু আমি মনে করি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শগত ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আমি যা বলছি তা মোটের উপর অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিশেষত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬০-এর দশককে অনেকে পুঁজিবাদের 'সুবর্ণযুগ' হিসাবে অভিহিত করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে যদি কখনো কোনো ঐতিহাসিক পালাবদল হয়ে থাকে তবে তা ঘটেছিল ৬০-এর দশকের প্রজন্ম ও তার অব্যবহিত পূর্বের প্রজন্মের মাঝখানে। এ কথা বলাবাহুল্য আগের প্রজন্মের গঠনমূলক অভিজ্ঞতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই অভিজ্ঞতায় ছিল বিশ্বব্যাপী মন্দা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আর্থিক সংকট ও যুদ্ধ— পুঁজিবাদ সম্পর্কে এই হল তাঁদের ধারণা ও অভিজ্ঞতা।

পুঁজিবাদ সম্পর্কে যুদ্ধ-উত্তর প্রজন্মের ধারণা কী? কয়েকদিন আগে আমি একটা রচনা পড়েছিলাম। রচয়িতা একজন ৬০-এর দশকের ব্রিটিশ র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবী। তিনি এখনও বামপন্থী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত। তাঁর মতে, মননের দিক থেকে ৬০-এর দশকের র‍্যাডিক্যালরা

ছিলেন কেইনসিয়। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন, সেই সময় লোকেরা যে বিপ্লবের বুলি আওড়াত তা আদতে বিপ্লব তথা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ১৯৪৫ সালে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলিকে বাস্তবায়িত করা। তাঁর মতে, তৎকালীন র‍্যাডিক্যাল চিন্তাভাবনা কল্যাণকর পুঁজিবাদের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং একইসঙ্গে ব্যাপক উন্নয়নের স্বপ্নে মশগুল ছিল। ঐ লেখক মনে করেন যে আজকের বামপন্থীদের যন্ত্রণার কারণ যতটা না সাম্যবাদের পতন তার চেয়ে অনেক বেশি ঐ স্বপ্নের অবসান। তার মানে এই নয় যে বামপন্থীরা পুঁজিবাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেছে বা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সাম্যবাদের অসফল পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সংশ্লিষ্ট করেছে। বিপরীত দিকে সমস্যাটা হল এই যে বামপন্থীরা সমাজতন্ত্রকে তুলনামূলকভাবে মানবিক অথচ অসফল পুঁজিবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছে।

অবশ্য ১৯৪৫ সালের ব্রিটেনের প্রেক্ষাপটে এইসব প্রতিশ্রুতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনায়, প্রতি-তুলনায় ভিন্ন মাত্রা বহন করে। যতই হোক, ৬০-এর দশকের ব্রিটেনে একটি বড় ভূমিকা নিয়েছিল রণক্ষেত্র প্রত্যাগত শ্রমিক শ্রেণীর সেনানীরা যারা একটি লেবার পার্টির সরকারকে নির্বাচিত করে এবং তাদের অনেকেরই একটি প্রকৃত বৈপ্লবিক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু ৬০-এর দশকের ব্রিটেন সম্পর্কিত এইসব ভাবনাচিন্তা আমাকে ভাবিয়ে তোলে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে অনুরূপ কোনো কিছু বলা যায় কিনা।

ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র ঐ দু'টি দেশের শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ র‍্যাডিক্যাল ছাত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে কেইনসিয় বা অন্য কোনো নিরিখে গ্রহণ করতেন না। কর্পোরেট শক্তি বা রাষ্ট্র সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা বিস্তৃত ছিল। বহু মানুষ নাগরিক অধিকারের লড়াই বা ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী লড়াইতে সামিল হয়েছিলেন। তবুও লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য পুঁজিবাদী অর্থনীতি ছিল না। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বা কৃষ্ণাঙ্গমুক্তি আন্দোলনে কয়েকটি গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল যারা মাওবাদী-লেনিনবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তবে তাদের সমস্যা ছিল তারা পুঁজিবাদের সঙ্গে আপোষ করেছিল। কিন্তু সে কাহিনী স্বতন্ত্র।

মোদ্দা কথা, বর্ণবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থানসমূহ সবসময় পুঁজিবাদ-বিরোধী ছিল না। যাঁরা পুঁজিবাদী অর্থনীতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন, তাঁরাও এর উচ্ছেদের কথা ভাবার বদলে পুঁজিবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীসমূহকে এর অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভেবেছেন। সুতরাং এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে তাঁরা এক অর্থে, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে, কেইনসিয় মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন অথবা, বলা যায়, অচেতনভাবে হলেও গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ছিলেন যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপের মতো করে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বা কল্যাণকর রাষ্ট্র বাস্তবে বিকশিত হয়নি। যাই হোক, আমার প্রজন্মের বহু র‍্যাডিক্যালের সর্বোচ্চ আশা ছিল আরো বেশি মানবিক ও গণতান্ত্রিক ধাঁচের পুঁজিবাদ যা বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী হলেও মূলত পুঁজিবাদই।

কিন্তু বাস্তবতা ছিল জটিল। যদিও ছাত্র-কর্মীদের বৈপ্লবিক স্বপ্ন পুঁজিবাদের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, পুঁজিবাদের প্রতি তাদের আশা ও স্বপ্নের পথ ছিল প্রতিবন্ধকতাময়। পুঁজিবাদের বিরোধী হোক বা না হোক, তারা বর্ণবাদ ও ঠাণ্ডা যুদ্ধ— উভয়েরই বিপক্ষে ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক পথে হলেও তাঁরা রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমানতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের প্রাপ্তি ও সেই প্রাপ্তি লাভের জন্য তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান।

অন্যভাবে বলা যায়, ৬০-এর দশককে বিপ্লবের মুহূর্ত হিসাবে চিহ্নিত করার ফলে পরিবর্তনের কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার সুযোগের বদলে তাদের সীমিত কর্মসূচীর বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রতিরোধের মোকাবিলা অনেক বেশি করতে হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সাধিত হয়েছে। তবে পুঁজিবাদের চরিত্র অপরিবর্তিত থাকায় দুনিয়া এর থেকে খুব ভালো কিছু লাভ করেনি। বস্তুত, যুদ্ধোত্তর তেজী বাজার শীঘ্র উধাও হবার সাথে সাথে এবং যখন পুঁজিবাদ তার বিরুদ্ধে সংঘটিত আঘাতের মোকাবিলায় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে উদ্যত হয়, অবস্থা তখন আরো খারাপের দিকে যায়।

আমি এক ঐতিহাসিক হতাশার কথা উল্লেখ করতে চাইছি। অধিকাংশ লোকের কাছে এই হতাশার জন্ম আরো বেশি মানবিক পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতাসঞ্জা। পুঁজিবাদের সম্ভাবনার উপর আস্থা রাখার অনেক কারণ এই প্রজন্মের ছিল। অন্তত, তিরিশের দশকের মানুষের তুলনায়। কিন্তু একই সঙ্গে হতাশ হবার সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণও ছিল। মানুষ যা লাভ করেছিল এবং যা লাভ করতে পারেনি উভয়ের দ্বারাই মানুষ হতাশ ও পর্যুদস্ত হয়েছিল।

আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ প্রজন্মের অনেকেই, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, শ্রমিক শ্রেণীকে পরিবর্তনের অগ্রণী শক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এমনকি সমাজতান্ত্রিক বামপন্থীরাও সুনিশ্চিত হয়েছিলেন ভোগবাদ শ্রমিক শ্রেণীকে কিনে ফেলেছে। ছাত্ররা এবং বুদ্ধিজীবিরা ভেবেছিলেন যে, শ্রমিক শ্রেণী নয়, তাঁরাই হবেন ইতিহাসের পালাবদলের মাধ্যম। কারুর কারুর ক্ষেত্রে এই ভাবনা ঐতিহাসিক হতাশার মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ ছাত্ররা এবং বুদ্ধিজীবিরা যদি বিপ্লবের মাধ্যম হন এবং সেই বিপ্লব যদি ব্যর্থ হয় তবে সেই ব্যর্থতা তাঁদের। তবে কেউ কেউ এই ব্যর্থতার থেকে এক ভিন্ন শিক্ষা গ্রহণ করলেন। সামাজিক পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা বিদ্যাচর্চায় "বিপ্লব" সাধন করতে তৎপর হলেন। এই তৎপরতা প্রকাশ পেল কোনো একটি পাঠ TEXT-এর উত্তর আধুনিক বিনির্মাণ এবং 'অর্থসীমা লঙ্ঘনের মধ্যে।

বিশ্বায়ন বিরোধিতা বা উত্তর-আধুনিকতা কিংবা অন্য যে কোন পথই তাঁরা অবলম্বন করুন না কেন ঐ প্রজন্মই সম্ভবত প্রথম পুঁজিবাদের প্রকৃত বিরোধিতা করেন। এই প্রজন্মই তুলনামূলকভাবে সফল পুঁজিবাদের অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং তাঁরাই চূড়ান্ত সফল পুঁজিবাদের ব্যর্থতা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তুলে ধরেন।

ঐ রূঢ় জাগরণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রধানতঃ দুটি খাতে প্রবাহিত হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে কারো কারো ক্ষেত্রে এটি রূঢ়তর জাগরণ ছিল। কেউ কেউ মনে করতেন, ষাটের দশকের পুঁজিবাদ সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু আবার কেউ কেউ মনে করেন, পুঁজিবাদ আগে যা দিয়েছে এই প্রজন্মে তা দিতে পারেনি। এরূপ ভাবার কারণ কি? কারণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি একটি যুগ-পরিবর্তন, ব্যাপক ঐতিহাসিক পরিবর্তন যা পুঁজিবাদের মৌল যুক্তিকেই বদলে দিয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এটা উপলব্ধি করা কঠিন নয় কেন এই যুগ পরিবর্তনের ভাষা এতো আকর্ষণীয়। কেউ কেউ মনে করতেই পারেন যে, মানবিক পুঁজিবাদ একটি বাস্তবতা। এবং এই বাস্তবতা পুঁজিবাদী বিকাশ ও প্রগতির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ গণ-সংগ্রামের সাহায্য। যার একমাত্র প্রয়োজন ছিল স্বভাবতই এরূপ একটি ধারণা ভীষণভাবে অবাস্তব। কারণ একটি সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ফলে পুঁজিবাদের যুক্তি মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলত আগে যা সম্ভব ছিল এখন তা অসম্ভব। সুনির্দিষ্ট ভাবে বললে বিশ্বায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী ঐতিহাসিক পরিবর্তন নয়। এটি একটি নতুন ঐতিহাসিক যুগ। এই যুগের পুঁজিবাদের যুক্তি নতুন ও সর্বাঙ্গীণভাবে ভিন্ন।

বস্তুতপক্ষে, কখনও কখনও মনে হয় কোন কোন মানুষ যেন প্রথম পুঁজিবাদকে আবিষ্কার করছেন। যাকে তাঁরা একটি নতুন যুগ বলে চিহ্নিত করছেন আসলে তা পুঁজিবাদের মৌল যুক্তি যা যুদ্ধোত্তর তেজী বাজারের পর পুনরায় তার শক্তিকে প্রকাশ করতে উৎকটভাবে তৎপর। একে বিশ্বায়ন বা উত্তর আধুনিকতা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তবে আসলে এটি সেই পুঁজিবাদ যা ১৯৭২ সালে জন্ম নিয়েছিল এবং বামপন্থীদের সমস্ত আশা ভরসার অবসান ঘটিয়েছিল।

যদিও আমরা কল্যাণকর রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে সংঘটিত ও গণ-সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত সকল বিজয়কেই সমর্থন করেছি, তবুও আমরা মানবিক পুঁজিবাদের দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যকে সর্বদা সংশয়ের চোখে দেখেছি। মনে করুন, আপনি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ও মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখার জন্য পুঁজিবাদী ক্ষমতার প্রতি সর্বদা সংশয় প্রকাশ করেছেন। মনে করুন, আপনি সবসময় ভেবেছেন যে, সামাজিক গণতন্ত্র পুঁজিবাদের ইতিহাসে একটি ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত মাত্র এবং এটি পুঁজিবাদী প্রগতির চূড়ান্ত ফল নয় বরং এটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং ক্ষণস্থায়ী ঐতিহাসিক শর্তাবলীর উপর নির্ভরশীল একটি বিষয়মাত্র। মনে করুন, আপনি সবসময় ভেবেছেন যে, মজুত ও চূড়ান্ত মুনাফার স্বপক্ষে পুঁজিবাদী অনুজ্ঞা গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশগত স্বাস্থ্য ইত্যাদির উপরে কড়া ফতোয়া জারি করে। তাহলে সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলি পুঁজিবাদের মৌলযুক্তির ব্যাপক পরিবর্তন হিসাবে প্রতিভাত না হয়ে পুঁজিবাদের চিরন্তন যুক্তি হিসাবে প্রতিভাত হবে। নিশ্চয়ই আপনি পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়ায় অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন কিন্তু সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলি একটি সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক ফাটল হিসাবে চিহ্নিত হবে না।

প্রশ্নাতীতভাবে পুঁজিবাদ আজ আরো বেশি বিশুদ্ধ ও অপ্রতিহত। যুগ-পরিবর্তন হিসাবে বিশ্বায়নকে দেখলে পুঁজিবাদের বিজয় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বায়নকে দেখলে আমরা লক্ষ্য করব মার্কসের বীক্ষণ : ব্যবস্থার মৌলিক পরস্পর বিরোধিতা ও পুঁজিবাদী সম্প্রসারণের স্বপক্ষে পরস্পর বিরোধী যুক্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিশ্বায়ন মার্কসের চিন্তাকেই সত্য বলে প্রমাণ করে: পুঁজিবাদী সংকটকে অতিক্রম করার প্রতিটি প্রয়াস আরো বেশি বিধ্বংসী সংকটের জন্ম দেয় এবং ভবিষ্যতের সংকটসমূহকে প্রতিরোধ করার পথকে রুদ্ধ করে দেয়। পুঁজিবাদের স্ববিরোধিতা আরো বেশি নতুন ও শক্তিশালী মাত্রায় প্রকাশ পাচ্ছে। কারণ, মার্কস যেভাবে বলেছিলেন ঠিক সেভাবেই, পুঁজিবাদী সংকটকে অতিক্রম করার ব্যবস্থাগুলি ক্রমশই কমে আসছে। আর এর জন্য দায়ী পুঁজিবাদের সার্বজনীনতা।

উদাহরণস্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের মাধ্যমে অতীতে পুঁজিবাদ তার সংকটের মোকাবিলা করেছে। কিন্তু আজ পুঁজিবাদ সার্বজনীন হয়ে যাওয়ায় সামরিক শক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের প্রায় কোনো সুযোগ নেই। আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, বাজার নিয়ন্ত্রণ, ঋণ প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদের নয়া রূপগুলি পুঁজিবাদের বাজার-সংক্রান্ত যুক্তির গভীরে প্রোথিত এবং সেই কারণেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরস্পর বিরোধিতায় সম্পৃক্ত।

পুঁজিবাদের সার্বজনীনতা বলতে বোঝায় আরো অধিক সংখ্যক পুঁজিবাদী অর্থনীতি সম্পন্ন দেশ বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে, অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশ প্রায় আত্মঘাতী মাত্রায় রপ্তানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং আরো সঠিকসংখ্যক প্রতিযোগী একই বিশ্ব বাজারের জন্য উৎপাদনে রত হচ্ছে। এর পাশাপাশি আরো প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন হবার জন্য তারা সেই ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতাকে সীমিত করতে চাইছে যাদের কাছে পৌছবার লক্ষ্যে তারা প্রতিযোগিতা করছে। প্রকৃত ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করার পরিবর্তে তারা বিদ্যুৎ গতিতে

শব্দসর্বস্ব, অসার সম্পদ তেজী স্টক মার্কেটে ছাড়তে চাইছে যে স্টক মার্কেট আবার বাস্তবতা থেকে সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন। সর্বোচ্চ উন্নয়ন বা বহির্মুখী প্রসারে আজ পুঁজির সর্বোচ্চ লাভ নিহিত নয়। তা আজ নিহিত রয়েছে পুঁজির পুনর্বণ্টন ও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্বের মধ্যে। আর এই দুটি প্রক্রিয়াই ঘটছে জাতি-রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে এবং একে-অপরের মধ্যে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলনে নবজীবন লাভের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। কানাডা থেকে মেক্সিকো, ফ্রান্স থেকে দক্ষিণ কোরিয়া— সর্বত্র রাস্তায় রাস্তায় নয়া উদারনীতি ও বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কোন একটি ঐতিহাসিক ফাটলকে নয়। আজকের ঘটনাবলী একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ার খণ্ডাংশকে চিহ্নিত করে যে প্রক্রিয়া পুঁজিবাদী বিকাশ ও সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া। আর এই প্রক্রিয়া বরাবরের মতো আজও গভীরভাবে স্ববিরোধী। পুঁজিবাদের শক্তিই তার দুর্বলতা। এটি চিরকালীন সত্য। আজও সমানভাবে সত্য। বস্তুত বিশ্বায়ন তার ক্রমবর্ধমানরূপে স্বচ্ছ স্ববিরোধিতা নিয়ে এক দীর্ঘমেয়াদী পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সূচনা করতে পারে।

পুঁজিবাদের স্ববিরোধিতা বলতে দুটি জিনিস বোঝায়। প্রথমত, একটি প্রকৃত মানবিক ও গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ কখনও বাস্তবে দেখা দেয়নি। দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি আরো বেশী সম্ভাবনাময় হয়ে উঠতে পারে।

ভাষান্তর ঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

মান্থলি রিভিউয়ের সৌজন্যে পাওয়া মূল রচনার শিরোনাম ***'Globalization, Postmodernity and Other New Ages'*** */*

বিশ্বায়ন, সংস্কৃতি ও পণ্যায়ন

কে এন পানিক্কর

আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে মতাদর্শগত বাকবিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলি প্রায়শই তার প্রকৃত অর্থকে ছদ্মবেশে গোপন করে রাখে। সর্বগ্রাসী প্রভাবের তেমনই নিরীহ একটি শব্দ 'বিশ্বায়ন'। নিরঙ্কুশ আধিপত্য অর্জন এর প্রকৃত লক্ষ্য, অথচ মনে হয় যেন বিপরীত কোনো ইঙ্গিতই বাহিত হচ্ছে এই শব্দ বন্ধে। যখন সরলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, মনে হয় সমানাধিকার আর স্বেচ্ছায় যুক্ত হবার এ এক আদর্শ প্রস্তাবনা। যদিও, অসম বিকাশের এই বর্তমান বিশ্ব-ব্যবস্থায়, কোনো সম্পর্কই যে সমান সমান হতে পারে না, সে কথা বুঝতে হলে চাতুর্যের দরকারই হয় না। পুঁজিবাদী যে বিশ্বব্যবস্থা, তার ইতিহাসের প্রতি ছত্রে ছত্রে চিহ্নিত রয়েছে বৈষম্য আর নিরঙ্কুশ আধিপত্য উজ্জীবনের অনিবার্য প্রবণতা। ঔপনিবেশিক-উত্তর সমাজগুলিকে স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য অর্জনের আগেই যখন পুনর্বার এক বিশ্বব্যবস্থায় অঙ্গীভূত করা হয় তখন আর্থিকভাবে দুর্বল দেশগুলির অধীনতাই নিশ্চিত হয়। সুতরাং ভারতবর্ষের মত দেশের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন বশ্যতায় আতঙ্কই বয়ে আনে। আমেরিকা, জাপান আর জার্মানির ক্ষেত্রে, এটি উদ্দীপিত সম্ভাবনা হতে পারে; কিন্তু ভারত, বাংলাদেশ কিংবা আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার অন্যান্য উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলোর বেলায় এই একই প্রত্যাশা আসলে অসম্ভবের আশা। বিশ্বায়ন এই দেশগুলোর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং প্রগতির ভবিষ্যত-বার্তা নয়; বরং এর বিপরীতে এটি পুঁজিবাদী দেশগুলোর সম্মিলিত জোটের নিরঙ্কুশ আধিপত্য আর প্রভুত্বের জন্য প্রয়োজনীয় যে পরিবেশ তাকে নিরাপদ এবং সুনিশ্চিত করে। মতাদর্শের দিক থেকে এর বাইরের খোলসটুকু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আমদানির প্রকৃত স্বরূপ মুখোশের আড়ালে ঢেকে রাখে। কাজেই বিশ্বায়নের ভাবনাদুষ্ট প্রতিটি ধারণার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা, এর রহস্যের গোপন কথাটি উন্মোচিত করাই এখন অত্যন্ত জরুরি।

কেন বিশ্বায়ন

পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকে যে 'বিশ্বায়ন' নামের কোন কর্মসূচীর হদিশ ছিল না, এটি যে এল নব্বই-এর দশকে, এরও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বস্তুত দ্বিমেরু বিশ্বের ভস্মরাশী থেকেই এর উদ্ভব। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া মুখ থুবড়ে পড়ায় পুঁজিবাদী শক্তির সামনে বিশ্বজয়ের এক নয়া যুগ-প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। বিরুদ্ধ কোনো শক্তি ছিল না আর, বাঁদরের পিঠে ভাসা নিজেরাই তখন মশগুল। লুটের মাল ভাগ-বাটরা করে নেওয়াই হল তখন সবচেয়ে ভালো আর সহজ পন্থা। তাই আজকে পুঁজির এই সার্বজনীন প্রত্যাশা।

ভারতের মতো যেসব দেশ স্বাধীনতার পর থেকেই আত্মনির্ভরশীলতাকে আর্থিক নীতির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিল, পুঁজির এই অবাধ চলাচলের বিরুদ্ধে তারাই প্রতিরোধ গড়ে তুলবে—এরকম প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু ঠিক তার বিপরীত ঘটছে সে প্রসঙ্গে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বহুধাবিস্তৃত এক পারমিট-লাইসেন্স-ব্যবস্থা সমৃদ্ধ বিকাশের নেহেরুপন্থী (Nehruvian) ধারণা আত্মসুখ সন্ধানী বুর্জোয়া আর ভোগতৃষ্ণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। তারা উদারীকরণের মধ্যেই এই সব শেকল-বেড়ির মুক্তি, বিশ্বায়নের জগতে তাদের যে অবাধ উন্নতির সম্ভাবনা তার মধ্যে নিজেদের বন্ধনমুক্তির স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ করেছিল। কাঠামোগত বিন্যাসের পৃষ্ঠপোষক, একটি বহুজাতিক সংস্থার সহ-সভাপতি যখন বিশ্বায়নকে 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' বলে বর্ণনা করেন, তখন তার অন্তরালে সুচারু বাগ্মিতায় পূর্বোক্ত কথাগুলোই বেশ স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত হয়। এই 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোনরকম প্রতিকূল বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে অধিকাংশ ভারতীয়ের অবান্তর বিশ্বায়নের ভাবাদর্শে গদ গদ বুর্জোয়া শ্রেণীর এই অদম্য উদ্দীপনা আসলে আন্তর্জাতিক পুঁজির সপক্ষে দেশীয় দালালি ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত এর দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলকে উপলব্ধি না করেই ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এই বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার একজন উৎসাহী সঙ্গী হয়ে উঠেছে। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জন্য এই সংস্কারের নানা সুফলসহ আর যা যা আর্থিক যুক্তি দেওয়া হচ্ছে সেগুলো ছাড়াও ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী আর তার সপক্ষের চিন্তাবিদরা বিশ্বায়নের পক্ষে আরো দুটো যুক্তি পেশ করেছে। সারা পৃথিবীতে এখন যে প্রকৌশলগত বিপ্লব ঘটে চলেছে, বিশেষ করে তারই পটভূমিকায় প্রথম যুক্তিটি আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার মুর্খামির ওপর জোর দেয় দ্বিতীয়টি বিশ্বায়ন ও আধুনিকতার আন্তর্সম্পর্কের কথা বলে। ভাবখানা এমন, যেন পশ্চিমী দুনিয়া যা কিছু অর্জন করেছে এবং করছে, তার সবটুকুই আমাদের কাছে সুগম করে তুলতে পারে ঐ একটি শব্দ অর্থাৎ বিশ্বায়ন।

রাজনীতি ও সাধারণ নীতির বিচারে এই স্বাতন্ত্রবাদ মোটেই টেঁকসই নয় আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা দুর্বলতার লক্ষণ— এটাই চালু যুক্তি। অতীতে, ঔপনিবেশিক বিজেতা আর তাদের 'দেশীয়' দালালরা প্রায়শই এই যুক্তির অবতারণা করেছে। ইউরোপীয় শক্তি যখন এশিয়া, আফ্রিকা, আর লাতিন আমেরিকায় তাদের বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতা বিস্তৃত করেছিল, তখন তারা সভ্যতা সম্প্রসারণের এই যে মহৎ উদ্দেশ্য তার ওপরই জোর দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিশ্বঅর্থনীতিতে সুসংহতির সুবিধা ইত্যাদির সুদৃশ্য মোড়কে তাদের আগ্রাসনের ছকটি উপস্থিত করা হয়েছিল। চীন আর জাপানের মতো যে সমস্ত দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী আপন ঘেরাটোপে নিজস্ব সচ্ছলতায় দিন কাটাচ্ছিল, দরজা-বন্ধ-করে-রাখার নীতিতে প্রতিহত করছিল সমস্ত বহিরাগতকে, তাদেরও বাণিজ্য আর বিনিয়োগের পথে চলতে বাধ্য করা হল বিশ্বঅর্থনীতির সঙ্গে তাদের সংযুক্ত করার যে মহান ব্রত ঔপনিবেশিকতা উদযাপন করল, তারই পরিণতিতে, সমৃদ্ধির গৌরচন্দ্রিকার বদলে সে দেশগুলি শোষণ আর দারিদ্র্যের পথে এগিয়ে চলল। সংহতি যে সহজাত বিশেষণেই সুবিধাজনক নয়, ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতাই তার যথেষ্ট প্রমাণ। কার লাভ হল আর কারই বা লোকসান এটা নির্ণয় করার আপাত যে ক্ষমতা তার মাপকাঠি অত্যন্ত জটিল। ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার মত ক্ষমতার যোগ-বিয়োগের কাটাকুটি ফল বিশ্বায়নের ক্ষেত্রেও এক জটিল সমীকরণ।

দ্বিতীয় যুক্তিটা যাকে বলে মনোমোহিনী, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে তো বটেই দেশকে একবিংশ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য রাজীব গান্ধীর যে 'শ্লোগান' এতদিনে তা জীর্ণ-বিবর্ণ, ক্লিশে। যাই হোক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে একবিংশ শতাব্দীতে এগিয়ে যাবার অর্থ হল, শিল্পোন্নত পশ্চিমের সমস্ত উৎপন্ন-সামগ্রীর নাগাল পাওয়া, আর তারই

আয়নায় চিনে নেওয়া নিজের আধুনিকতার বোধবুদ্ধিকে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর সমস্ত সামগ্রী— কম্পিউটার, ভোগপণ্য, যত রকমের উৎপাদিত বস্তু, তাদের সবকটিকে আশ্রয় করে এক 'আধুনিক' জীবনযাপন পদ্ধতি গড়ে তোলার একটা সুবর্ণ সুযোগ— তাদের কাছে বিশ্বায়নের অর্থ এটাই। সারা দেশ জুড়ে গজিয়ে ওঠা সমস্ত দোকানগুলো, ম্যাকডোনাল্ড আর কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেন থেকে শুরু করে লিভাইজ (জীনস) আর মার্স ইত্যাকার বহুজাতিকের কাছ থেকে খাজনা দিয়ে তাদের জিনিস ব্যবহার করার স্বত্ত্ব কিনে সারা দেশ জুড়ে দোকান গজিয়ে উঠছে। তারা সব বিত্তশালীদের 'আধুনিক' চাহিদা মিটিয়ে লাভ করতে চায়। এই আরোপিত 'আধুনিকতা' একেবারে ভাসাভাসা পদার্থ এবং স্ববিরোধদুষ্ট। ভারতের সবচেয়ে বড়ো আধুনিক মহানগরী বোম্বেতে, ৬২ শতাংশ মানুষ বাস করে বস্তিতে, ফুটপাতে। সেখানে না আছে প্রয়ঃপ্রণালী, না আছে স্বাস্থ্যকর পানীয় জল। আধুনিকতার যে ধারণায় সমাজের একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের স্বার্থ গোটা দেশের ঘাড়ে চেপে বসে, সে ধারণার গোড়াতেই তো কিছু গলদ আছে। পশ্চিমীদের মতো হয়ে যাবো, কেবলমাত্র এই ভয়ে যাঁরা আধুনিকতার সমালোচনা করেন, তাদের এখন বিষয়টির আরো গভীরে দৃষ্টিপাত করা উচিৎ। কেননা যে আধুনিকতার পথপ্রদর্শক বিশ্বায়ন, সেটি পশ্চিমের সঙ্গে অন্য বিশ্বের বৈষম্যকেই আরো তীব্রতর করে তোলে।

সাংস্কৃতিক নিহিতার্থ

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংগঠনগুলো বিশেষভাবে সক্রিয়। ঔপনিবেশিকতার প্রথম পর্বে বাইবেল হাতে যে বাণিজ্য, তারই স্মৃতি যেন মনে পড়ে যায়। আজকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যে সাংস্কৃতিক আক্রমণ চলছে, সেটি সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার এক প্রচেষ্টা— সংস্কৃতি যেন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ— সর্বগ্রাসী আধিপত্যের অগ্রদূত। পুঁজিবাদের সংস্কৃতি ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে, তারই আবহাওয়ায় তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোকে সুশিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। থিওডোর অ্যাডর্নোর* শব্দবন্ধে (phrase) সেই যে এক 'সম্পূর্ণভাবে শাসিত দুনিয়া'-র (administered world) কথা শুনি, তারই ভিত্তি তৈরির কাজে সুশিক্ষিত করা হচ্ছে এদের। এরপর সেই দুনিয়া কর্পোরেট পুঁজির সহজগম্য স্থান হয়ে উঠবে। এইভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় বাজারের নানান সুপ্ত সম্ভাবনা নিজেদের সুবিধার্থে নিংড়ে নেবার জন্য দরকারি প্রাথমিক কাজটুকু সেরে ফেলে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ।

শুধুমাত্র তাই নয়, সমসাময়িক সাংস্কৃতিক আক্রমণের নেপথ্যে চালিকাশক্তি হিসেবে রয়েছে উন্নত পুঁজিবাদী দেশ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উৎপন্ন। সংস্কৃতির কারণেই পুঁজিবাদী পশ্চিমে পর্নোগ্রাফী থেকে পিজা পর্যন্ত শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। সম্প্রতি উত্তর আমেরিকায় বিনিয়োগ ঠাঁই বদল করেছে সাংস্কৃতিক শিল্পের আঙিনায়। দৈত্যাকৃতি কর্পোরেট প্রভুরা এতদিনে এর বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি উপলব্ধি করতে পেরেছে। সাংস্কৃতিক শিল্প বিষয়ক এক গভীর গবেষণা শেষ করেছে জেমস পেট্রাস। দেখিয়েছেন যে, উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বিত্তবানদের পাঁচজন পিছু একজনের সম্পদ তৈরি হয়েছে গণমাধ্যম থেকে। দূরদর্শন, সংবাদপত্র, পথ-চলতি খাবার, হালকা পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অসংখ্য সাংস্কৃতিক শিল্পকর্মের জগত বিনিয়োগকারী পুঁজির কাছে প্রতিদিন আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। লাভজনক হয়ে ওঠার জন্য নতুন নতুন রাস্তাও খুঁজে নিতে হচ্ছে। এইসব সাংস্কৃতিক উৎপন্ন সামগ্রী যাতে নতুন অঞ্চলে তাদের বিজয়পতাকা ওড়াতে পারে তারই জন্য

** থিওডোর অ্যাডর্নো : সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ১৯৩০-৪০ দশকের একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী মার্কসবাদী এবং প্রতিবাদী তাত্ত্বিক। তিনি ছিলেন ম্যাক্স হরখাইমার (Max Horkheimer), ওয়াল্টার বেঞ্জামিন, হার্বার্ট মারকিউজ প্রমুখের সমসাময়িক এবং সহযোগী লেখক।*

নয়া সড়ক নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় আজকের এই সাংস্কৃতিক আক্রমণ।

সাম্প্রতিক কালের এই সাংস্কৃতিক আক্রমণের দুটি মাত্রা ঃ একদিকে আধিপত্য বিস্তার করা আর অন্যদিকে সে কর্ম সম্পাদনের হাতিয়ার হয়ে ওঠা। শুধু এই দুটি মাত্রাকে আলাদা আলাদা করে জানলে বাস্তবতার সমগ্র রূপটি মোটেই বোধগম্য হয় না। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় বিশ্বায়নের সাফল্য আরো অনেক বেশি ঃ এটি সংস্কৃতিকে সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখপট হিসেবে ব্যবহার করে। অন্যভাবে বললে, সংস্কৃতি তলোয়ার আর মুখোশ, দুটোর কাজই করে।

উন্নত পুঁজিবাদী যে সংস্কৃতি আজ তৃতীয় দুনিয়ায় এসে হাজির হয়েছে, সেটি নানা অভিমুখে পুঁজিবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজটি করে চলে। বিশ্বায়নের শক্তিগুলো যাতে কাজ করতে পারে, তার জন্য মতাদর্শের এক পরিমণ্ডল তৈরি করে এটি। এই ঘটনাকে বোঝার জন্য আন্তোনিও গ্রামসি তাঁর সংস্কৃতি এবং রাজনীতি সংক্রান্ত বিশ্লেষণে যা যা বলেছেন, সেটি আমাদের অন্তর্দৃষ্টির রূপরেখা নির্মাণে অত্যন্ত কার্যকর। বিশেষ করে, গ্রামসি-র 'সাধারণ বোধবুদ্ধি'-র ধারণাটি খুবই কাজে আসে। তাঁর মতে, আমাদের 'সাধারণ বোধবুদ্ধি' প্রধানত কোনো সমালোচনাকে তোয়াক্কা-না-করা অসচেতন এক প্রক্রিয়া। এর প্রভাবেই একজন মানুষের জগৎ সম্পর্কিত ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে। এই সাধারণ বিচারবোধের দ্বারাই একজন ব্যক্তিমানুষ জনগোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ প্রভাবিত হয়। গ্রামসি যুক্তি দেন যে, সমাজের অগ্রণী গোষ্ঠীভুক্তরা সাধারণ বোধবুদ্ধির ধারণাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে; এজন্য তারা জগত সম্পর্কে তাদের যে ধারণা তারই কাছাকাছি অন্য একটি ধারণা সৃষ্টি করে। ভারতে বিশ্বায়নের বিশেষ শক্তিগুলো আর 'দেশীয়' দালালরা খুব নির্দিষ্টভাবে এই কাজেই যুক্ত রয়েছে।

ভারতে বর্তমানে যে সাংস্কৃতিক সাধারণ বোধ তা এদেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভুত। নানান বিচিত্র উৎস থেকে এর রূপরেখাটি আঁকা হয়েছে। চরিত্রের দিক থেকে এটি অসমধর্মী আর প্রকাশের দিক থেকে বহুত্ববাদী। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক যে সব অভ্যাস আচার আচরণ বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে তাদের মধ্যে এই সব গুণাবলী প্রতিফলিত হয়। পুঁজিবাদী পশ্চিমের প্রতিতুলনায় এখানে কোন আদর্শ মাপকাঠি নেই। সেটা খাবার হতে পারে পোষাক-পরিচ্ছদ, আমোদ-প্রমোদ কিংবা ভঙ্গিমা— দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সমস্ত খুঁটিনাটি দিকগুলোতেও একটা স্পন্দনশীল সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার প্রত্যক্ষ করা যায়।

বিশ্বশক্তির সাংস্কৃতিক কারিকুরি-করা নয়া পরিকাঠামোর ধাক্কায় দেশীয় সাধারণজ্ঞান কেবল যে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে তা নয়, আজকের সময়ে যে বেমানান, এই উন্নত পুঁজির যে সাধারণ বোধ তাকেই এর স্থলাভিষিক্ত করা হচ্ছে। এই সাধারণ বোধের প্রভাবে, উন্নত পুঁজিতন্ত্রের উৎপন্ন সামগ্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু হাবভাব, কিছু অভ্যেস সুবিধে পেয়ে যায়। তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে তার সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি থেকে ছিন্নমূল করাটাই উন্নত পুঁজির বিশ্বজনীন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

আঞ্চলিক সংস্কৃতির পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় যে বিশ্বায়ন গোষ্পদে বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতিফলনের পথ সুগম করে দেয়। আর এই ভাবেই বৃহত্তর সমগ্রের অংশ হয়ে ওঠে আঞ্চলিক সংস্কৃতি। খুব সংক্ষেপে বললে, আধিপত্যের স্বার্থকে গোপন করার এ হলো সুবিধাজনক এক অজুহাত। পুঁজিবাদ উত্তরণের কালে, বুর্জোয়া শ্রেণী যেমন তাদের স্বার্থকে সমগ্র সমাজের স্বার্থের সমার্থক করে তুলেছিল, সেইভাবে উন্নতধনবাদী-দেশের পুঁজি এখন তার সংস্কৃতিকে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির আদর্শ হিসাবে সার্বজনীন করে তুলেছে।

বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলি সম্প্রতি ভারতবর্ষে যে সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে তাতে আঞ্চলিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে বিশ্বায়নের এই সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করে নেওয়ার রাস্তাটাই আদতে তৈরি হচ্ছে। বুর্জোয়াদের মধ্যে যে সক্রিয় সংহতি চোখে পড়ে

তার ফলে তথাকথিত এই 'সার্বজনীন' সংস্কৃতিকে ভারতীয় মনোজগতে সেঁধিয়ে দেওয়া সহজ হবে। দেশীয় বুর্জোয়ারা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে যাচ্ছে যাতে পূর্বোক্ত কাজটি সহজতর হয়। সর্বকর্তৃত্বময় এই সংস্কৃতির মূল্যবোধ, আর রুচি-পসন্দ—এদের প্রচারকাজে সাহায্য করেই এই সংহতি থেমে যায় না, একে স্বাভাবিক করে তোলার পিছনেও রয়েছে এদের অবদান। ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ঠিক এমনি। ঔপনিবেশিকতার যুগে, এদের মনোজগতে যখন সাংস্কৃতিক পালাবদল ঘটছিল তখনই তাদের সামনে পশ্চিমী দুনিয়া থেকে কী কী পাওয়া যেতে পারে, তারই সম্ভাবনার দরজা খুলে গিয়েছিল। তারা নিরাশ হয়েছিল, কেননা, স্বাধীনতা ওই আকাশ কুসুমের পেছনে ছুটে বেড়ানোর সুযোগটুকুও দেয়নি। যে সুযোগের পথ চেয়ে তাদের এত দিনের প্রতীক্ষা, তারই নৈবেদ্য সাজিয়ে এনেছে বিশ্বায়ন। কাজেই বিশ্বায়নকে তারা কেবল সাদরে বরণই করল না, তার অবাধ প্রবাহের বাহিকা হয়ে উঠল এরা।

বুর্জোয়া শ্রেণী আর মধ্যবিত্তরা প্রায়ই পছন্দ করে নেওয়া বা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাকে সাদর আমন্ত্রণ জানায়। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তারা যেন এই সমাজে নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে— মনের ভাবটা তাদের এমন। গান্ধীজী যে কথা বলেছিলেন, খোলা জানলা দিয়ে বাইরের বাতাস আসতে দেওয়া সেটা নিশ্চয়ই জরুরি, কিন্তু সে হাওয়ায় যেন আমাদের পায়ের তলার মাটি সরে না যায়, সেটা দেখাও সমান জরুরি। আজকের দিনে আমরা যদি চাই-ও তবু জানলা বন্ধ করে রাখা যাবে না কিছুতেই। এমন উদ্যোগের কোনো অবকাশই নেই আমাদের। কেননা স্বাধীন সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের বদলে, আজ বরং সামগ্রিক দৃশ্যপটে শক্তির ভার-বৈষম্য আর অর্থনৈতিক অসমতার ভিতের ওপর সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের আদল স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বেছে-নেবার স্বাধীনতা তো একটা বিভ্রম। এমনকি, বিশ্বশক্তি এখন রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে না। নিরপেক্ষতার এক সূক্ষ্ম প্রভাবমণ্ডলে এখন সংস্কৃতির কাজকারবার চলে। তবু এ স্বাধীনতা আমাদের মনের ভুল মাত্র। স্বদেশীয় সাংস্কৃতিক রীতি-রেওয়াজ ক্রমশ কোণঠাসা, এ এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আর এই প্রক্রিয়া অবলুপ্তির আরম্ভ মাত্র, অবশেষে এই প্রক্রিয়া আপন আপন মৌলিকতাকে প্রাণহীন ফসিলে পরিণত করার পথেই আমাদের টেনে নিয়ে যাবে।

বৈদ্যুতিন প্রচার-মাধ্যমের দ্রুত অনাহুত প্রবেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের যে চেহারা নজরে পড়ছে, তাতে এমন একটা মনোভাব তৈরি করার চেষ্টা চলছে যে, বিশ্বশক্তি যেন নতুন এক সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে শুধুমাত্র আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিচ্ছে। কাজেই এই 'নতুন' আমাদের ভারতীয় মূল্যবোধ-বিরোধী, এইরকম একটা সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে আমাদের বিরোধিতা সীমায়িত হয়ে আছে। পুরোপুরি বিভ্রান্তিকর এই বিরোধিতা। কেননা বিশ্বশক্তি ভারতীয়ত্বের খোলসের মধ্যেই কাজ করছে, এর সমস্ত দেশীয় সাংস্কৃতিক কাঠামো, সমস্ত রীতিরেওয়াজকে আত্মসাৎ করেই এর কাজকারবার।

নির্মাণ এবং পণ্যায়ন

এই নিজের মত করে নেওয়া, যাকে বলি আত্মসাৎ, তারও দুটি মাত্রা আছে ঃ নির্মাণ ও পণ্যায়ন। বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এজেন্সি সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক, তার বৈচিত্র্য বিশেষভাবে অনুধাবন করার জন্য দেদার টাকা ঢালছে। ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য মূল্যায়নের কার্যক্রম এখানে-ওখানে। সেখানে নানান জনপ্রিয় সংস্কৃতির আঙ্গিকে তার ছাঁচ সবকিছু কাটাছেঁড়া করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সাধারণের জীবনে যে ভাব একেবারেই অপ্রচলিত, তেমন গূঢ়ার্থ এর মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া হচ্ছে।

প্রাচ্যকরণের মধ্যে দিয়ে যে ভারতীয় সংস্কৃতির নির্মাণ-কাজ শুরু, এ তারই অবশেষ। শেষ বিচারে ঔপনিবেশিকতার স্বার্থই রক্ষা করে এই প্রয়াস। একইভাবে উত্তর আধুনিকতা এবং বিনির্বাণবাদী তাত্ত্বিকদের সংস্কৃতিকে পরিপ্রেক্ষিতহীন। ইতিহাসহীন করার অপচেষ্টা প্রত্যক্ষভাবে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্যকেই পুষ্ট করছে। স্বাধীনতার ফলে বুর্জোয়ারা যে এই পশ্চিমী লাড্ডুকে (Utopia) সম্পূর্ণ আত্মস্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় উশৃংখলার অধিকার না পেয়ে হতাশ হয়েছিল। সংস্কৃতিকে তার উৎসমূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই সব-নির্মাণ বস্তুত সংস্কৃতির নাড়ির সুতোটি ছিঁড়ে দিচ্ছে। আর এই ভাবে বিশ্ব শক্তির দাপিয়ে বেড়াবার উপযুক্ত জমি তৈরি করা হচ্ছে।

দেশীয় সংস্কৃতির দখলদারী আর তার পণ্যায়ন, এ হলো একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সংস্কৃতির এইসব সুদক্ষ পরিচালকেরা অত্যন্ত ধীরগতিতে, অথচ অবিচলিত দৃঢ়তায় জনপ্রিয় সংস্কৃতির আঙিনায় একটু একটু করে পা ফেলছে। তাদের দেশের শ্রোতা-দর্শকদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান-বোধ আর সাংস্কৃতিক কৌতুহল মেটাতে বিশ্ব-প্রচার মাধ্যমে উপস্থাপনার জন্য এই জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে তারা পণ্যে পর্যবসিত করছে। আদিম জনগোষ্ঠীর নাচ, কিষাণের ফসল তোলার গান, গ্রামীণ লোকসমাজের যুদ্ধপ্রিয় শিল্প-আঙ্গিক (Martial art), এরকম অসংখ্য নানান আঙ্গিককে তাদের সংলগ্ন বিষয় থেকে তুলে আনা হচ্ছে, স্টুডিও-র চারদেওয়ালে তার অক্ষম পুনরাভিনয় চলছে, তারপর একটা ভিনদেশী আদিম রীতিরেওয়াজ হিসেবে এরা পরিবেশিত হচ্ছে। শেষাবধি হয়ত এসব লোকায়ত আঙ্গিক তাদের পণ্যায়িত আদর্শরূপেই কেবল বেঁচে থাকবে, হারিয়ে ফেলবে তাদের সত্যিকারের আঙ্গিক, তাদের বিষয়, তাদের পটভূমি। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের এমন ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধির দৌলতে সংস্কৃতির এই কৃত্রিম উৎপাদন সংখ্যার কৌলিন্যে জৈবিক সৃষ্টির স্থান দখল করে নেয়। যে কোনো দেশীয় সমাজে, এই প্রবণতার পরিণতিতে, আপন সৃষ্টিশীলতার ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। কেননা সামাজিক পরিসরের সঙ্গে তখন সেই সংস্কৃতির বিচ্ছেদ ঘটে যায়। নিদারুণ বেদনায় জনপ্রিয় সংস্কৃতির রূপ বদলে যায়, তা হয়ে ওঠে জনপ্রিয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতির প্রাণহীন ফসিলে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার গতিরোধ করা বড়ো দুরূহ, কঠিন হয়ে ওঠে।

বিশ্বশক্তি তাদের আপন স্বার্থে ভারতকে পদানত করার এই যে নিপুণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারই পরিমণ্ডলে সংস্কৃতির এমন প্রাণহীনতার গুরুত্বপূর্ণ একটা রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা রয়েছে। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী যেহেতু ইতিমধ্যেই ব্রেটনউড সংগঠনের কাছে আত্মসমর্পন করেছে সে কারণে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে রাষ্ট্রশক্তির বাইরে থেকে। বামশক্তির নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের সংগঠিত শক্তি সোচ্চার হয়েছে রাজনৈতিক বিরোধিতায়। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় সে কণ্ঠ যথেষ্ট প্রবল নয়। তার একটা কারণ হতে পারে যে, সাংস্কৃতির এই বিপুল প্রাণপ্রাচুর্যের মধ্যেই যে প্রতিরোধের সহজাত শক্তি রয়েছে সে কথা হয়ত ঠিকমত অনুভব করা যাচ্ছে না।

আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামী আমিলকার ক্যাব্রালের* বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন— সংস্কৃতি হল মানব সমাজের এমনই এক আঙিনা যেখানে আধিপত্যের যে কোনো রূপের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ তার অভিব্যক্তির প্রকাশকে খুঁজে পায়। অস্ত্র হাতে বিপ্লব সংগঠিত করার যে চিরাচরিত অভ্যস্ত পথ তার বিপরীতে অন্য এক খাতে এই প্রতিরোধ সদা বহতা নদীর মত প্রবহমান। সেই মধ্যযুগে সংগঠিত প্রতিরোধ যখন কঠিন ছিল তখনো প্রতিরোধের রথ সংস্কৃতির নব নব আঙ্গিকে সওয়ার হয়ে অভিব্যক্তি প্রকাশের পথে ছুটে চলেছিল। জাতীয় আন্দোলনের কালে, সংস্কৃতির অনেক আঙ্গিক আপন রূপ বদল করেছে, শক্তিশালী করেছে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামকে, এমন দেখা গেছে বার বার। বিশ্বশক্তি, তাই, সংস্কৃতির

** আমিলকর ক্যাব্রাল— পর্তুগীজ অধিনস্থ আফ্রিকার বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী, লেখক ও সংস্কৃতি তাত্ত্বিক।*

জগতে সেই সুপ্ত প্রতিরোধী সম্ভাবনাকে গোপনে গোপনে দুর্বল করে দিতে চায়; দেশীয় সংস্কৃতির দখলদারী আর পণ্যায়নের গোপন সুড়ঙ্গ পথে সে সম্ভাবনাকে ক্ষয় করে দিতে চায়। এছাড়াও, সে একই সঙ্গে সমাজের অন্তস্থলের শক্তি-সম্পর্ককে বার বার আঘাত করে চলে। আজ সমস্ত সংস্কৃতিকে সদৃশ করে তোলার, একই রূপ দেবার যে কর্মকাণ্ড চলছে চর্তুদিকে, তাতে আধিপত্যকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের যে ক্ষমতা সমাজের অভ্যন্তরে রয়েছে, তার বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে। 'সার্বজনীন' সংস্কৃতির পক্ষে বুর্জোয়া শ্রেণীর সোচ্চার সমর্থন তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিই করছে।

সাম্প্রদায়িক পরিণতি

বিশ্বায়ন সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মীয় মৌলবাদকে মদত দিচ্ছে, না তাকে বাধা দিচ্ছে, ভারতের ক্ষেত্রে এ বড়ো কঠিন প্রশ্ন। পৃথিবীর অনেক দেশেই মৌলবাদ সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিয়েছে। এডওয়ার্ড সঈদ-এর মতে এটি প্রায়শই এক 'ব্যক্তিগত আশ্রয়স্থল' হয়ে ওঠে। ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু পরিস্থিতি গুণগতভাবেই আলাদা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (RSS) 'স্বদেশী' কার্যক্রম, মহারাষ্ট্রের শিবসেনা - বিজেপি সরকারের এনরন-চুক্তি বাতিলের হুমকি এসব থেকে এমন এক ধারণা তৈরি হয় যে হিন্দুত্বের তাসেই দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমতা রক্ষা করা যাবে। এ বিষয়ে বিজেপি অত্যন্ত ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতের জন্য নতুন কোনো পথের ঘোষণা নেই তাদের। এসব কিছু বিচার করলে, বর্তমানে তাদের সরকারের যে পথ, তার চেয়ে ভিন্ন কোনো পথে ভবিষ্যতে তারা চলবে এমন আশা বাস্তবসম্মত নয়। এমনই এক সময়ে, বিশ্বায়ন হয়ত মানুষের সাম্প্রদায়িক সচেতনতাকে আরো তীব্র করে তুলছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক সংকটের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকার প্রাথমিক অভিঘাত প্রতিভাত। এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্তরা তাদের জীবনযাপনে পশ্চিমী আধুনিকতার ধরনধারণ নকল করে, আধুনিকতার এক ভাসা-ভাসা, অগভীর ধারণা পোষণ করে মনে মনে। তবুও ক্রমাগত তারা উৎসের সন্ধানে ফেরে আর প্রশ্নাতীতভাবে তাদের আদিম সত্তায় তার মূলটি দেখতে পায়। বিশ্ব জুড়ে আধুনিকতার আরোপিত রূপ তাদের এই দ্বিচারিতাকে তীব্র করে তোলে আর 'আন্তর্জাতিক আধুনিক' মানুষ তার ধর্মীয় আচারে, সংস্কারে, দুর্বোধ্যতার অন্ধকারে সান্ত্বনা খুঁজে পায়। যেহেতু হিন্দুত্বের শক্তি ওই শেষের আশ্রয়টুকুকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তাই এর উত্থানপর্বকে তারা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়।

বিশ্বশক্তির ক্ষেত্রে, স্বাধীনভাবে আর্থিক কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য তাদের যে নিরন্তর সন্ধান চলছে, সে কাজে যদি এই পবিত্রতা কি ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো ঝামেলা না বাধায়, তাহলেই তাদের সংজ্ঞা তাদের কাছে আলাদা হয়ে যাবে। এই ভাবে দুপক্ষের স্বার্থ একই বিন্দুর অভিমুখী। অতএব সাম্প্রদায়িক শক্তি আর বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে একটা সুস্পষ্ট আঁতাতের সম্ভাবনাই বর্তমান। হিন্দু জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডের গায়ে একটুকুও আঁচ না ফেলে বিশ্বায়ন এই হিন্দুত্বকে তাদেরই 'আধুনিকতা'-র পথ-প্রদর্শক করে তুলতে সক্ষম হবে। শাসকশ্রেণীর যে অংশ নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে মনে করেন এবং একই সঙ্গে বিশ্বায়নকে সমর্থন করেন তাঁরা এই সম্ভাবনা সম্পর্কে উদাসীন বলে মনে হয় কিন্তু তারা ভুলে যান যে এই সম্ভাবনা রূপায়িত হলে ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল ধ্বংস হয়ে যাবে।

ভাষান্তর ঃ কাবেরী বসু

বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা-র জন্য প্রেরিত লেখকের মূল রচনাটির শিরোনাম ***'Globalisation and Culture'।***

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

কঙ্কন ভট্টাচার্য
শ্যামল চক্রবর্তী
বন্দনা শিবা

বিশ্বায়ন এবং বিজ্ঞান

কঙ্কন ভট্টাচার্য

বিশ্বায়ন এবং বিশেষ করে মেধাস্বত্বের নামে যে সব নতুন নতুন আইন চালু হয়েছে তাতে বিজ্ঞান গবেষণার কাজে নানারকম বাধা আসছে। বিজ্ঞানের যেসব আবিষ্কার থেকে বাণিজ্যিক লাভের সম্ভাবনা সেগুলি কতগুলি কোম্পানি নিজের মুঠোয় আনার চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষের মতো উন্নতিশীল দেশগুলির গবেষণার একটা বড়ো অংশ নিয়োজিত ছিলো বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরির প্রক্রিয়া বা প্রসেস উদ্ভাবন করায়। নতুন আইনের ফলে এই প্রয়াস উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের সর্বত্র এই নতুন আইনের কুপ্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। পৃথিবীর ধনী দেশগুলি বিশেষ করে আমেরিকার কয়েকটি বড়ো কোম্পানির লোভের জন্য সারা বিশ্বের জ্ঞানচর্চার পথ রুদ্ধ হবার মুখে।

আমেরিকার নেতৃত্বে ধনী দেশগুলি জোর করে ভারত ও অন্যান্য গরিব দেশগুলির ওপর জোর করে বিশ্বায়ন চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে ধনী দেশগুলির এক ধরনের দুর্বলতা ও ভয় প্রকাশ পাচ্ছে। ওরা ভয় পেয়েছে ভারত এবং চীনের মতো গরিব দেশগুলির বিজ্ঞানীদের মেধাকে। ধনী দেশগুলির ভয়-ভারত, চীন এবং অন্যত্র অবাধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা এবং প্রয়োগের সুযোগ দিলে বিশ্বের বাজার আমেরিকার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আশির দশকের গোড়ায় আমেরিকার বহু পত্র-পত্রিকায় লেখা হতো যে ভারত, চীন হলো খাঁচায় বন্দী বাঘ। একবার খাঁচা থেকে বেরোলে এরা আমেরিকার পক্ষে ভয়ানক বিপদের বিষয় হবে। বিশ্বায়নের লক্ষ্য হলো এই খাঁচা আরো মজবুত করা।

ষাটের দশক পর্যন্ত আমেরিকার কোনো ভয় ছিলো না। ভারতবর্ষে তখন প্রায় কিছুই তৈরি হতো না। ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কট চলছিলো। পি. এল. 480-র পচা গম ভারত আমদানি করতো। সার, আধুনিক উন্নত বীজ, কীটনাশক সব কিছুই আমদানি হতো। র‍্যানিটিডিনের মতো মামুলি অম্বলের ওষুধ ভারতে পাওয়া যেতো না। ভালো হাতঘড়ি, জামাকাপড়, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য কিছুই ভারতে পাওয়া যেত না। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্রীজ তৈরির জন্য আমরা বিদেশী প্রযুক্তি ধার করতাম। সেই সময় আমেরিকার কাগজে লেখা হতো, ভারতকে নিয়ে ভয় নেই। বলা হয়েছিল, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হবে ভারতে।

কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ভারত মাথা তুলে দাঁড়ালো। প্রথমে হলো সবুজ বিপ্লব। চাষিরা বিজ্ঞানের আধুনিকতম অবদানগুলি কাজে লাগালেন। বিজ্ঞানীরা যোগান দিলেন সার, কীটনাশক, উন্নত বীজ। দুর্ভিক্ষ তো হলোই না বরং খাদ্য আমদানির বদলে খাদ্য রপ্তানি শুরু

করলো ভারত। তারপর এক নিঃশব্দ বিপ্লব হলো ওষুধ শিল্পে। দেখা গেলো, একের পর এক ভারতীয় ওষুধ কোম্পানি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তারা আমেরিকার তুলনায় 10-20 ভাগ কম দামে অত্যন্ত সস্তায় অতি উচ্চ মানের ওষুধ বিক্রি করতে শুরু করলো। তাদের ওষুধ এমনকি আমেরিকাতেও বিক্রি শুরু হলো। অন্যদিকে ব্রীজ, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইত্যাদি তৈরি শুরু করলো ভারতীয় কোম্পানিগুলি। জামাকাপড়ের ক্ষেত্রেও মার্কিন বাজারে থাবা দিলো ভারত।

কিন্তু এসব হলো কি করে? এর একমাত্র কারণ হলো ভারতবর্ষের সরকার ইংরেজ আমলের পেটেন্ট আইন বাতিল করে 1970 সালে ভারতীয় পেটেন্ট আইন চালু করলো। এর বিশদ বিবরণ দেবার আগে পেটেন্ট কি সেটা বলা দরকার। পেটেন্ট হলো একটা আইনগত অধিকার যার বলে পেটেন্টের মালিকের একচেটিয়া অধিকার থাকে একটি আবিষ্কারের ওপর। পেটেন্টের মালিককে লাইসেন্স ফি না দিলে কোনো ব্যবসায়ী সেই পেটেন্ট করা জিনিসটা ব্যবহার করে ব্যবসা করতে পারে না। এই পেটেন্টকেই মেধাস্বত্ব বলা হয় কারণ কোনো একজন নিজের মেধার জোরে যা আবিষ্কার করেন, পেটেন্টের ফলে তার বাণিজ্যিক স্বত্ব তাঁর কবজায় থাকে।

মনে রাখা দরকার পেটেন্ট আর নো-হাউ (Know how) কিন্তু আলাদা। পেটেন্ট নেওয়া জিনিসকে নানাভাবে পরিবর্ধিত না করলে তা বাণিজ্যে ব্যবহার করা যায় না। যারা এই নো-হাউ উদ্ভাবন করেন তাদের গুনে গুনে ফি দিতে হয় পেটেন্টের মালিককে।

1970 সালের ভারতীয় পেটেন্ট আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে কোনোরকম পেটেন্টের বাধা নিষেধ ছিলো না। তার ওপর ওষুধ, কৃষিতে প্রয়োজনীয় পদার্থ (সার, বীজ, কীটনাশক) ইত্যাদিতে প্রসেস পেটেন্ট নেবার সুযোগ ছিলো। এই প্রসেস পেটেন্ট থাকার সুযোগ থাকায় ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীরা বহু প্রসেস উদ্ভাবন করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, বিদেশী কোম্পানিগুলি কিন্তু তাদের নো-হাউ আমাদের দেয়নি। আবার নানা প্রসেসের তারা আগে থেকে পেটেন্ট নিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু নতুন নতুন প্রসেস পেটেন্ট নিয়ে কয়েক বছরের মধ্যেই ভারত ওষুধ শিল্প, কীটনাশক ইত্যাদিতে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। এর পেছনে বিশেষ করে CSIR ল্যাবরেটরিগুলির বিশেষ অবদান ছিলো। আশির দশকে দেখা গেলো এমনকী আমেরিকায় ভারতের ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে। যেহেতু ভারতীয় ওষুধের দাম বহু ক্ষেত্রে আমেরিকার থেকে 10-20 ভাগ কম ফলে এমন সম্ভাবনা দেখা গেলো যে বিশ্বের ওষুধের বাজার ভারত দখল করে ফেলবে। কৃষি, রাসায়নিক শিল্পে অগ্রগতির সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার আগ্রহ ছড়িয়ে পড়লো ভারতবর্ষে। উদাহরণস্বরূপ, হীরে কাটার ব্যবসার কথা বলা যায়। দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ হীরে কাটার কারিগর ছিলেন ভারতীয়রা। কিন্তু আশির দশক পর্যন্ত তারা মূলত হাতে হীরে কাটতেন। ষাটের দশকে লেজার (Laser) আবিষ্কৃত হয়। আশির দশকে দেখা গেলো ইজরায়েলে লেজার রশ্মি দিয়ে হীরে কাটা হচ্ছে। অতি দ্রুত ভারতীয় শ্রমিকরা লেজার প্রযুক্তিও আয়ত্ত করে নিলেন। এখন পৃথিবীর মোট হীরের ৮০ শতাংশ কাটা হয় ভারতে এবং লেজার রশ্মি দিয়ে। বস্ত্রশিল্পেও ভারত ৮০-র দশক থেকে বিপুল পরিমান রপ্তানি করতে শুরু করে। আমাদের মোট রপ্তানির প্রায় অর্ধেক হচ্ছে বস্ত্রশিল্প বিশেষ করে সূতির জামাকাপড়।

ভারতের এই অগ্রগতি আমেরিকার ব্যবসায়ীদের শঙ্কার কারণ হয়ে দাড়ায়। মনে রাখতে হবে, মার্কিন ব্যবসায়ীদের দুশ্চিন্তা ছিলো যে তাদের লাভ কমে যাচ্ছে এই নিয়ে। ভারতে তৈরী জিনিস আমেরিকায় বিক্রি হলে আমেরিকায় কারখানা বন্ধ হবে বা মার্কিন শ্রমিক কর্মচ্যুত হবেন এ নিয়ে আমেরিকার ধনী ব্যবসায়ীদের মাথা ব্যথা ছিলো না। বহুদিন ধরেই সস্তায় জিনিস

তৈরি করার জন্য মার্কিন ব্যবসায়ীরা ল্যাটিন আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এমনকি চীনেও কারখানা খুলেছিলো। আমেরিকায় বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানার শ্রমিকদের কথা ভেবে ১৯৮৩ সালে বব ডিলান 'Infidels' (অর্থাৎ বিধর্মী, কাফের বা বিশ্বাসঘাতক) গানে বলেছিলেন 'সূর্য অস্ত গেছে ইউনিয়নের এবং সেইসঙ্গে যা কিছু তৈরি হতো আমেরিকায়।' ('It's sundown on the union and what's made in the USA')। যেসব মার্কিন ব্যবসায়ীরা এইভাবে নিজের লাভের জন্য কোটি কোটি মার্কিন শ্রমিকদের চাকরি খাচ্ছিলেন সেই ব্যবসায়ীরাই ডিলানের মতে বিধর্মী বা কাফের।

আজ যখন জাপানি গাড়ি মারুতির চাপে হিন্দমোটর বন্ধ হবার মুখে সেই একই দশা আমেরিকায়। যে অ্যাডিডাস কোম্পানির জুতো বিক্রি করে আমেরিকার এতো রমরমা এখন সেই কোম্পানির ৮০ শতাংশ জুতো তৈরি হচ্ছে চীনে। এখন আমেরিকায় বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে যেসব বিক্ষোভ হচ্ছে তাতে অংশ নিচ্ছেন এই অ্যাডিডাস বা সম্প্রতি লাটে ওঠা এনরনের মতো কোম্পানির কর্মচ্যুত শ্রমিকরা।

ভারতের বিজ্ঞানীদের সাফল্য এবং শ্রমিক-কৃষকদের দক্ষতা ছাড়াও আরো একটি জিনিসের ওপর বিদেশী কোম্পানির নজর ছিলো তা হলো জৈব-বৈচিত্র্য (bio-diversity)। ভারতবর্ষের উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ুতে এমন অনেক ধরনের গাছপালা বা বীজানু জন্মায় যা শীতপ্রধান দেশে পাওয়া যায় না। এসব জিনিস পাচার করে মার্কিন কোম্পানিগুলি বহু লাভ করছিলো। যেমন বেশ কয়েক বছর আগের হিসেব অনুযায়ী মার্কিন কোম্পানি প্রোক্টর এন্ড গ্যাম্বল ভারত থেকে 600 কোটি টাকার ইযবগুল কিনে তা 20 গুণ দামে আমেরিকায় বিক্রি করত 'মেটমুসিল' নামে। এই ইযবগুলের ভূষির ব্যবসায় 'ডাবর' ইত্যাদি ভারতীয় কোম্পানি ভাগ বসানোর চেষ্টা করছিলো।

ক্যানসার রোগের সবচেয়ে কার্যকরী একটি ওষুধ হলো ট্যাক্সল। ভারতবর্ষের একটি গাছ ট্যাকসাস্ ব্যাকাটা থেকে এই ওষুধের একটি উপাদান পাওয়া যায়। নিমের কথা তো অনেক আলোচনা হয়েছে। বিশ্বায়নের নামে মেধাস্বত্বের সঙ্গে নিম, হলুদ, বাসমতী চাল দখল করার চেষ্টা করছে মার্কিন কোম্পানিগুলি।

এখন কথা হলো পেটেন্ট করে এই সব জিনিসের দখল নেওয়া কি মানবিক? আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট পেটেন্ট করে বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু তার সব টাকা দিয়ে তিনি যখন বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কার চালু করেন তখন তার সঙ্গে তিনি একটা শর্ত দিয়েছিলেন। সেই শর্ত ছিলো কোনো বিজ্ঞানী যদি তার আবিষ্কার বাণিজ্যিক লাভের জন্য পেটেন্ট করেন তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে না। লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের টীকা আবিষ্কার করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি দুধ, সার্জিকাল অপারেশনের ছুরি, কাঁচি এমনকী মদ তৈরির ঝোলাগুড় ইত্যাদি নানা জিনিস জীবানুমুক্ত করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এত সব আবিষ্কারের মধ্যে শুধু মদ তৈরির ঝোলাগুড় জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতি তিনি পেটেন্ট করেছিলেন। বাকি সব মানব কল্যাণের জন্য তিনি পেটেন্ট করেননি যাতে সবাই তা নিখরচায় ব্যবহার করতে পারেন। এটাই তো বিজ্ঞানের আদর্শ, বিজ্ঞানীর আদর্শ।

অথচ এখন জিন প্রযুক্তি ব্যবসায়ে লাগতে পারে বলে জিন অর্থাৎ মানুষের শরীরের অংশও পেটেন্ট নেওয়া হচ্ছে। যখন জিন পেটেন্ট শুরু হয়েছিলো তখন নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী জে. ডি. ওয়াটসন একে পাগলামি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, জিন হলো ডি এন এ-র অংশ। ওয়াটসন ডি এন এ-র গঠন আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি ডি এন এ পেটেন্ট নিলে আজ কেউ কোনো জিন পেটেন্ট নিতে পারতো না। এখন একেক কোম্পানি একেকটি জিন

পেটেন্ট করে বিভিন্ন গবেষণাগারে চিঠি পাঠাচ্ছে, পেটেন্ট করা জিন নিয়ে গবেষণা করতে গেলে কোম্পানিকে পয়সা দিতে হবে। আশ্চর্য কথা হলো বছর কুড়ি আগে এক বাঙালি বিজ্ঞানী আনন্দ চক্রবর্তী একটি বীজানু পেটেন্টের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তখন মার্কিন আদালত বলেছিলো কোন জীবিত জিনিস পেটেন্ট নেওয়া চলবে না। এখন জিন পেটেন্টের দৌরাত্মে জিন গবেষণা বন্ধ হবার মুখে।

তবে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত এখন কমপিউটার সংক্রান্ত গবেষণা। কারণ সব প্রোগ্রাম পেটেন্ট করা। পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। কিন্তু কোম্পানিগুলি এতো পাজি যে প্রোগ্রামের 'সোর্স কোড' দেবেনা। কাজেই ক্রেতা তার নিজের দরকার মতো প্রোগ্রামটির রদবদল করতে পারবে না। কিন্তু সত্তরের দশকে বিজ্ঞানীরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিনা পয়সায় প্রোগ্রাম আদান প্রদান করতেন। আমেরিকায় চালু ছিলো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি প্রোগ্রাম এক্সচেঞ্জ (Quantam Chemistry Programme Exchange)। শুধু প্রোগ্রাম বা সফ্‌টওয়ার নয় কমপিউটারের সব কিছু দখল করেছে বিল গেটস্ এর মাইক্রোসফ্‌ট এবং ইনটেল কোম্পানি। সারা পৃথিবীর ছোট ছোট কমপিউটার কোম্পানি বাধ্য হচ্ছে ইনটেল চিপ এবং মাইক্রোসফটের উইনডো কিনতে। মাইক্রোসফ্‌ট তার প্রোগ্রামের কোনো কিছু ক্রেতাকে জানায় না। অথচ 'লিনাক্স' (Linux) বলে বিনে পয়সার আরেকটা বিকল্প আছে যা ব্যবহার করলে সব প্রোগ্রাম নিজের মতো লিখে নেওয়া যায়। মাইক্রোসফ্‌ট তার পয়সার জোরে লিনাক্স, নেটস্কেপ বহু কিছুকে বাজার থেকে হটিয়ে দিচ্ছে। বিল গেটস নিজে আবিষ্কার করেছেন অতি সামান্য জিনিস। কিন্তু ব্যবসায়ী বুদ্ধি, রাজনৈতিক শক্তি এবং টাকার জোরে তথ্য প্রযুক্তির বহু কোম্পানির তিনি টুঁটি চেপে ধরেছেন। এখন অবশ্য বেশ কয়েকটা মামলায় বিল গেটস কিছুটা ধাক্কা খেয়েছেন।

পৃথিবীতে এখন প্রয়োজন সারা বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞানের অবাধ প্রসার। একসময় রাষ্ট্রসঙ্ঘে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো সমস্ত ধনী দেশ তাদের মোট সম্পদের ০.৯ শতাংশ খরচা করবে গরিব দেশগুলির বিকাশের জন্য। কিন্তু আমেরিকা এখন পর্যন্ত তার সম্পদের ০.১ শতাশের বেশি গরিব দেশগুলির উন্নতিতে খরচ করেনি। একমাত্র নরওয়ে ০.৯ শতাংশ খরচ করেছে এই উদ্দেশ্যে। ফিদেল কাস্ত্রো বলেছেন ধনী দেশগুলি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে প্রতি বছর দুশো বিলিয়ন ডলার বা দশ লক্ষ কোটি টাকা গরিব দেশের উন্নয়নে ব্যয় হতো। যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে সেই দেশের বিজ্ঞান গবেষণাও তার সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে। মনে রাখতে হবে লেজার, আইসি চিপ ইত্যাদি আধুকিতম আবিষ্কার রাশিয়ায় হয়েছিলো এবং এই বিষয়গুলির নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। 'নেচার' এবং 'সায়েন্স'-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকীয়তে আবেদন করা হয়েছে সোভিয়েত বিজ্ঞানকে বাঁচাতে হবে, টাকা ঢালতে হবে। একমাত্র ফ্রান্স সোভিয়েত বিজ্ঞান রক্ষার জন্য কিছু টাকা দিয়েছে। আমেরিকা প্রতিবিপ্লবের জন্য কোটি কোটি ডলার খরচ করলেও সোভিয়েত বিজ্ঞান রক্ষার জন্য টাকা দেয়নি।

এক প্রতিকূল অবস্থা বিশ্ব বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানীদের বলা হচ্ছে আবিষ্কার করলেই চলবে না, পেটেন্ট নিয়ে যাও। নইলে শুধু বাণিজ্যিক ক্ষতি নয়, পরবর্তী গবেষণা আটকে যাবে; কারণ অন্য কেউ পেটেন্ট নিলে সে বিষয়ে আর গবেষণা করা যাবে না। অনেকের ধারণা পেটেন্ট নেওয়া খুব মামুলি ব্যাপার। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো পেটেন্ট নেবার পদ্ধতি বেশ জটিল এবং প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। জাপানের টোশিবা কোম্পানি তাদের পেটেন্টগুলি সারা বিশ্বে চালু রাখার জন্য বিভিন্ন দেশে যে ফি দেয় তার মোট পরিমাণ ভারতবর্ষের বার্ষিক বিজ্ঞান বাজেটের সমান। কাজেই টোশিবার মতো একটা মাত্র কোম্পানির

সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে ভারতবর্ষের সব বিজ্ঞান গবেষণাগারে তালা ঝুলিয়ে দিতে হবে।

সারা বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। আমেরিকার তাবড় তাবড় কোম্পানি ধ্বসে পড়ছে। যতো মন্দা বাড়বে, ততো বিশ্বায়নের নামে গরিব দেশগুলির ওপর আক্রমণ বাড়বে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো মেধাস্বত্বের হয়ে যারা সবচেয়ে বেশি ওকালতি করছিলো সেই মার্কিন কোম্পানিগুলিও ডুবেছে। জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বেশ কিছু নতুন শস্য বাজারে ছাড়া হয়েছিলো। আমেরিকার মনসান্টো (Monsanto) কোম্পানি কয়েক বছর আগে এই সব জি এম (genetecially modified) শস্যের পেটেন্ট বহু টাকা খরচ করে কিনে রেখেছিলো। অতি সম্প্রতি ভারত সরকার ভারতে জি এম শস্য চাষ করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে খোদ আমেরিকাতে ক্রেতারা এই জি এম শস্য খেতে ভয় পাচ্ছেন। জি এম বীজ বন্ধ্যা বীজ— অর্থাৎ চাষিদের প্রতি বছর নতুন বীজ কিনতে হবে। এতো ফন্দি করেও জি এম বীজ বিক্রি না হওয়ায় মনসান্টো কোম্পানির এতো লোকসান হয়েছে যে মনসান্টো কোম্পানি বিক্রি হয়ে যায় ফার্মাসিয়া কোম্পানির কাছে। ফার্মাসিয়া কোম্পানিও মনসান্টোর লোকসান সামলাতে না পেরে তার সব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে। ফার্মাসিয়ার নিজের অবস্থা কাহিল; এখন কে মনসান্টোর মালিক বোঝা মুশকিল। শেষ পর্যন্ত মনসান্টোর অবস্থা হয়তো এনরন, কে মার্ট, ওয়ার্লড টেল-এর মতো হবে।

বিশ্বায়ন এক ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো শুধু বিশ্ব অর্থনীতিকে আক্রমণ করেনি তা সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান গবেষণাগারে ঢুকে পড়েছে। এরকম বিশ্বায়ন আমরা চাই না। আমরা চাই সেই বিশ্বায়ন যার কথা ফিদেল কাস্ত্রো বারবার বলছেন। কাস্ত্রোর মতো আমরা চাই সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে মৈত্রী এবং সহযোগিতার বিশ্বায়ন, আমরা চাই বিশ্বের সম্পদ, সুযোগ এবং জ্ঞানের সুষম বন্টনের বিশ্বায়ন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পণ্যায়ন
বিকৃত বিশ্বায়নের হালফিল রূপরেখা

শ্যামল চক্রবর্তী

বিশ্বায়ন 'ডট কম'-এর দাপট এতো বেশি যে বসুধৈব কুটুম্ব'কম' এর ভারতীয় ভাবনা আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই কথা মনে রেখেই আলোচনা শুরু করা ভাল যে 'বিশ্বায়ন' বিশ শতকে বহুজাতিকের আমদানি করা কোন শব্দ নয়। আমাদের কাছে সারা বিশ্ব ধরা দিক— এমন সংলাপ ও অভিলাষ আমরা দীর্ঘকাল ধরেই বহন করছি। সত্যজিৎ রায়ের 'অপু' যখন কলেজের প্রিন্সিপালের ঘরে যায়, আমাদের স্কুলের পড়ুয়া ছেলেরা যখন হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে গিয়ে দেখা করে, একটা 'গ্লোব' নয়তো একটা 'পৃথিবীর মানচিত্র' সে দেখতে পাবেই। শিক্ষার ভগীরথ যাঁরা, তাঁরা যে মননে বিশ্বজনীনতার কথাই প্রচার করতে চান, 'গ্লোব' আর 'মানচিত্র' তেমন প্রতীকী সংকেতেই আমাদের কাছে কথা বলে।

কপাল মন্দ আমাদের। ভালো মন্দ দুই জিনিসই আমরা বহুকাল ধরে সাহেবদের কাছে শিখছি। ফলে বিশ্বায়নের নতুন বয়ান তাঁদের ভাষ্যে আমাদের শুনতে হচ্ছে। শুধু শ্রোতার ভূমিকা পালন করতে হলে ক্ষতি বিশেষ কিছু ছিল না। ঐ যাঁতাকলে আমাদের ওরা যখন পিষে মারছে, তখন কিছু জরুরি কথা উচ্চারণ করতে হবেই। পরিত্রাণের প্রয়াসে ঘুরে দাঁড়াতে হবেই।

সত্যিই এক বিচিত্র দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। একশো জনের ভেতর পঁয়ত্রিশজন ভারতীয় নিরক্ষর। আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যায় আমরা পৃথিবীর উপর সারিতেই রয়েছি। আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিজ্ঞানের যথার্থ আত্তীকরণ আজও ঘটেনি। যদি ঘটতোই, ডাইনি হিসেবে পুড়ে মরতে হতো না কাউকে। সতী সাজিয়ে পুড়িয়ে মারা হতো না কাউকে। অযোধ্যার ক'ফুট বাই ক'ফুট জায়গায় 'শ্রীরামচন্দ্র' জন্মেছিলেন, কথাটা মানতে আদিমতম পন্থায় বাধ্য করা হত না। দেশের প্রায় আড়াইশো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের জ্যোতিষশাস্ত্র, গ্রহরত্ন, কোষ্ঠি, ঠিকুজি বিশারদ হতে উপদেশ বর্ষিত হত না। বিজ্ঞানী নিউটনের সূত্র বিষয়ে পারদর্শী(!) বিকৃতমনস্ক রাজ্য প্রধানের পরিচালনায় গুজরাটে গণহত্যা পরিচালিত হত না। কথায় বলি আমরা 'গোদের উপর বিষফোঁড়া'। ক্লাইভের সুযোগ্য বংশধরেরা, পরিচয়ে যাঁরা ভারতীয়, এখনও এদেশের ভাগ্যনিয়ন্তার আসনে রয়েছেন। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ অন্ধকার আর বাইরের বহুজাতিক ও ধনবাদীদের হুঙ্কার আমাদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে।

উরুগুয়ে রাউন্ড নিয়ে পৃথিবীর কাটল প্রায় একদশক। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৪। 'ডাঙ্কেল

ড্রাফট টেক্সট' তৈরি হল। দেশে দেশে বিতরণ হল। বইয়ের ভেতর ১৯৪৮ সালে গড়ে ওঠা সংগঠন 'জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন টারিফ অ্যান্ড ট্রেড'এর স্বেচ্ছা মৃত্যুর বাসনা ঘোষিত হল। ঐ মৃতদেহ থেকে ওরা তৈরি করবেন নতুন এক সংগঠন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন। আগের নাম সেকেলে ধরনের। দু'দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে ঘটকালি করার কাজ ছিল। এবার যা নাম, পৃথিবীর সকল কাজের কান্ডারি হতে কোন আপত্তি নেই। আপত্তি থাকলেই বা শুনছে কে? টুঁটি চেপে ধরতে হবে মানুষের। সে কাজ ওরা করেই যাবে। তবে শুধু যে দুনিয়া জুড়ে মানুষ চোখের জল ফেলেছেন, তা নয়। লড়াইয়ের ময়দানে কমবেশি সামিল হয়েছেন। সিয়াটল থেকে দোহার ইতিহাস পিচ্ছিল ইতিহাস। রিও থেকে জোহেন্সবার্গের ইতিহাসও কলঙ্কিত ইতিহাস। হুমকি আর আক্রমণ বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে আমেরিকার কারচুপি-নির্বাচনে জেতা জর্জ বুশ জুনিয়র বলতে পারেন, রাষ্ট্রসংঘ যদি কথা না শুনে চলে, তার অস্তিত্বই পৃথিবী থেকে লুপ্ত করে দিতে পারে আমেরিকা। একেই তো বলে গণতন্ত্র! নইলে কোন কবি লিখতে পারেন নাকি, 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি, হোয়্যার লিবার্টি ইজ অ্যা স্ট্যাচু'!

পাঠক জানেন, ১৯৮৬ সালের গ্যাট রাউন্ডেই প্রথম বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধা স্বত্ব অধিকারের (TRIPS) কথাটি উঠে এসেছিল। তুলেছিলেন মার্কিন প্রতিনিধি। আগে কথাটা ছিল শুধু ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস (IPR), এখন বলা হচ্ছে 'ট্রেড রিলেটেড ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস।

আমেরিকা আছে। সোভিয়েত নেই। যুদ্ধ বেঁচে থাকলেও সারা বছর যুদ্ধের অস্ত্র বিক্রি করা যায় না। সন্ত্রাসবাদীদের কাছে খানিকটা আর নানা দেশের উগ্রপন্থীদের কাছে খানিকটা অস্ত্র বিক্রি করে বছরে আর কত রোজগার হয়? ফলে নতুন অস্ত্র তৈরি কর । আইনের জটাজালে বেঁধে দাও চারপাশ। পৃথিবীর যাবতীয় মেধা ও সৃষ্টিকে পণ্য করে তোল। যখন 'ট্রিপস' এর প্রস্তাব পাড়ল আমেরিকা, কেউ বিশেষ আপত্তি করেনি। অনেকেই ভেবেছিলেন, নামে আর কি আসে যায়! যায় বৈকি! বড়লোক দেশের সঙ্গে গরীব দেশের ঝগড়ার কাহিনি চিরন্তন। বড়লোক দেশগুলো নিজেদের ভেতর ঝগড়া বাঁধাল। আমেরিকা যখন ফরাসি দেশের সরকারকে বলছিল, তেলবীজ তৈরির কৃষকদের বেশি ভর্তুকি দিও না, ফরাসি দেশ শোনেনি। আমেরিকার চেয়েও বেশি ভর্তুকি ফরাসি দেশের কৃষকেরা পাচ্ছিলেন। ফলে বীজের দোকান সাজিয়ে বসলে ফরাসি কৃষক আমেরিকার কৃষকদের চেয়ে কম দামে তেলবীজ বেচে দিতে পারেন। এ বেশ মজাই বলা যায়। নিজেরা শিক্ষায়, কৃষিতে ভর্তুকি অনেকটাই দেয়। গরীবদেশের সরকারকে বলে, ভর্তুকি তুলে দাও। মনপসন্দ সরকার থাকলে তেমন কথায় নাচতে থাকে। ভর্তুকি কমানোর প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এমন তো ওরা করেই। নিজেদের ঘরে টন টন পরমাণু অস্ত্র মজুত রেখে বাকি দেশের সরকারকে শাসায়, 'পরমাণু অস্ত্র তৈরি বন্ধ কর। পরমাণু অস্ত্র মজুত বন্ধ কর। CTBT-তে সই কর এক্ষুনি।'

রাগ বেশি হলে কখন কি বলতে হয় অনেকের খেয়াল থাকে না। হয়তো বা লেখার গতিপথও তেমন ভাবেই এগোচ্ছে। বলতে চাইছিলাম যে কথা, 'ট্রিপস' এর পোষাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার বিশ্বায়নের থাবাকে ক্রমশ ধারালো করে তুলেছে। কোন সম্পদের স্রষ্টা তাঁর উদ্ভাবনের স্বীকৃতি চাইবেন, আমরা আপত্তির কিছু দেখিনি। 'স্রষ্টা'র প্রকৃতি দিন দিন এমন চেহারা ধারণ করেছে, আমাদের বিভ্রান্তি বাড়ছে বই কমছে না। এই কোপ সবচেয়ে বেশি পড়েছে যেখানে তার নাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

দিতে চাইলে আমাদের উদাহরণের অন্ত নেই। আর উপস্থাপিত বিষয়ে স্বচ্ছতা আনতে চাইলে উদাহরণ আমাদের দিতেই হবে। স্রষ্টার সৃষ্টি রক্ষা করার আইনি উপায় পৃথিবীতে

বহুকাল আগেই তৈরি হয়েছিল। প্যারিস কনভেনশন থেকে ১৮৮৩ সালে তৈরি হয় 'প্রটেকশন অফ ইনডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি'। বার্ন কনভেনশন থেকে ১৮৮৬ সালে তৈরি হয় 'প্রটেকশন অফ লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্কস'। রাষ্ট্রসংঘের নজরদারি বিভাগ 'ওয়ার্ল্ড ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (WIPO) এসব বিষয় খেয়াল রাখত। কাউকে এরা যে কখনও ইচ্ছে করে অবজ্ঞা করেছে বা কারও বিপক্ষে বিসদৃশ ভাব অবলম্বন করেছে এমন নয়। কিন্তু প্রকৃত রক্ষী হিসাবে নাকি বিশেষ কাজ করতে পারেনি। দুনিয়ার সব মানুষই কি WIPO-কে একইভাবে দোষী সাব্যস্ত করছেন? না। বড় বড় কোম্পানির মালিক যারা, যারা বহু পণ্য তৈরি করে, আগামী দিনে আরও পণ্য তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তাদেরই রাষ্ট্রসংঘের এই সংস্থার উপর রাগ বেশি। এই রাগ থেকেই 'ট্রিপস'-এর জন্ম। পয়সাওয়ালাদের রাগ বলে কথা! রাষ্ট্রসংঘকে দিন দিন ওরা কেমন চোখে দেখছে তার পরিচয়তো আমরা খানিকটা আগেই দিয়েছি।

'ট্রিপস' না হয় তৈরি হল। কোন দেশ যদি না মানে কি হবে? বিচারের প্রার্থী হওয়া চলবে। 'বিবাদ নিষ্পত্তি কমিটি'ও তৈরি হয়েছে একটা। এরা অভিযোগ অনুযোগ খতিয়ে দেখে কোন দেশের বা কোম্পানির পক্ষে বিপক্ষে রায় দেবে। যে ভাবনাকে ঘিরে 'ট্রিপস' তৈরি হয়েছে তার মূল কথা পেটেন্ট। পেটেন্ট নিয়েই সিংহভাগ বাদ প্রতিবাদ। উত্তর দক্ষিণের লড়াই। বহুজাতিকের সঙ্গে গরীবদেশের লড়াই। ভেষজ পণ্য ও রাসায়নিকের বেলায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো খুব শক্তপোক্ত আইন চায়। ১৯৯৫ সালের শুরু থেকে ডব্লিও টি ও-র যে কোন সদস্যকে এই 'ট্রিপস' আইন মেনে চলা বাধ্যতামূলক। গরীবের প্রতি দয়া দূর হয়না। গরীব ও উন্নয়নশীল দেশের জন্য চার বছর ছাড় দেওয়া হল। গরীব দেশগুলোকে পণ্য পেটেন্ট সুরক্ষার জন্য আরও পাঁচ বছর বাড়তি সময় দেওয়া হল। মারাকাশে যখন চুক্তি হয়েছে তখন হয়তো কোন একটা পণ্য পেটেন্টের আওতায় ছিল না। ফলে তার জন্য পাঁচবছর দিতেই হয়। ভেষজ ও কৃষি রাসায়নিকের বিষয়ে বাইরের দরখাস্তকারীদের কাছ থেকে গরীব দেশগুলোকে দরখাস্ত গ্রহণ করতে হবে। পাঁচবছরের জন্য একচ্ছত্র বাণিজ্যের অধিকার (EMR) দিতে হবে। অথবা পেটেন্ট গ্রহণ বা বর্জন পর্যন্ত এই সুযোগ চালু রাখতে হবে। খুব গরীব দেশের জন্য সময়টা বাড়িয়ে দশ বছর করা হয়েছিল। এমনও বলা হয়েছিল, আবেদন করলে গরীব দেশগুলোর সময় আরও বাড়ানো যেতে পারে।

আগে যা কখনও দেখা যায়নি এবার 'ট্রিপস' এর বেলায় সেই নিয়ম চালু হল। প্রতিটি ডব্লিউ টি ও-র স্বাক্ষরকারী দেশকে নিজেদের সংসদে এই আইন পাশ করতে হবে। পেটেন্ট আইন চুক্তি মত যাতে কার্যকরী হয় তার জন্য আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অভিযোগের ছবিটাও আমরা একবার দেখে নিতে চাই। 'বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি'তে জমা পড়া অভিযোগের সংখ্যা মোটেও কম নয়। সব অভিযোগ আমরা আলোচনার আওতায় আনব না। পেটেন্ট সংক্রান্ত মামলার বিষয় শুধু উল্লেখ করব। তালিকাটি দেখলেই সঠিক বুঝতে পারবেন, পেটেন্টের থাবা প্রসারের জন্য কেন আমেরিকার এত বেশি মাথাব্যথা ছিল। যত অভিযোগ ডব্লিউ টি ও- তে পড়েছে তার পঁচাত্তর ভাগেরও বেশি অভিযোগ বড়লোক দেশের। পেটেন্ট বিষয়ক মামলার সবক'টাই প্রায় তিন বড়লোকের বিষয় আশয়। আমেরিকা, কানাডা আর ইউরোপিয় ইউনিয়ন। হয়তো বা নিরপেক্ষতার মুখোশ রক্ষা করার জন্যই বড়লোক বড়লাকের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। ফেব্রুয়ারি ২০০০ পর্যন্ত একটা হিসাব আমরা নীচে দিচ্ছি।

উপরের এই পরিসংখ্যান থেকে নানারকমের অভিমত পেশ করা যায়। বড়লোকদেশ যখন গরিবদেশের বিরুদ্ধে মামলা লড়ছে, সিদ্ধান্ত তৈরি হতে বেশি সময় লাগেনি। দুই বড়লোকের

সারাণ - ১

কবে অভিযোগ জানায়	অভিযোগকারী দেশ	কার বিরুদ্ধে অভিযোগ	কি বিষয়ে অভিযোগ	সমাধান কি হয়েছে
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬	আমেরিকা	জাপান	সাউন্ড রেকর্ডিং সংক্রান্ত	দ্বিপাক্ষিক সমাধান
এপ্রিল ১৯৯৬	আমেরিকা	পর্তুগাল	শিল্পসম্পত্তি আইন অনুযায়ী পেটেন্ট সংরক্ষণ	দ্বিপাক্ষিক সমাধান
এপ্রিল ১৯৯৬	আমেরিকা	পাকিস্তান	ভেষজ ও কৃষি রাসায়নিক	দ্বিপাক্ষিক সমাধান
মে ১৯৯৬	ইউরোপিয়ান কমিউনিটি	জাপান	সাউন্ড রেকর্ডিং সংক্রান্ত	দ্বিপাক্ষিক সমাধান
জুলাই ১৯৯৬	আমেরিকা	ভারত	ভেষজ ও কৃষি রাসায়নিকের পেটেন্ট সংরক্ষণ	প্যানেল রিপোর্টে ভারতকে দোষারোপ করা হয়। ভারত আবেদন করে। সমীক্ষণ কমিটি প্যানেল রিপোর্ট বজায় রাখে। জানুয়ারি ১৯৯৮ এ দুটো রিপোর্টই গৃহীত হয়।
এপ্রিল ১৯৯৬	ইউরোপিয়ান কমিউনিটি	ভারত	ভেষজ ও কৃষি রাসায়নিকের পেটেন্ট সংরক্ষণ	একই ঘটনা ঘটে। সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ প্যানেল রিপোর্ট গৃহীত হয়।
মে ১৯৯৭	আমেবিকা	সুইডেন	মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ	দ্বিপাক্ষিক সমাধান.
মে ১৯৯৭	আমেবিকা	আয়ারল্যান্ড	কপিরাইট সংক্রান্ত	সমাধান হয়নি এখনও
মে ১৯৯৭	আমেরিকা	ডেনমার্ক	মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ	সমাধান হয়নি এখনও
ডিসেম্বর ১৯৯৭	ইউরোপিয়ান কমিউনিটি	কানাডা	ভেষজ সংক্রান্ত পেটেন্ট সংরক্ষণ	প্যানেলের বিচারধীন
জানুয়ারি ১৯৯৮	আমেরিকা	ইউরোপিয়ান কমিউনিটি	কপিরাইট সংক্রান্ত	আলোচনা শুরু হয়নি
এপ্রিল ১৯৯৮	আমেরিকা	গ্রিস	চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত	আলোচনা শুরু হয়নি
এপ্রিল ১৯৯৮	আমেরিকা	ইউরোপিয়ান কমিউনিটি	চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত	আলোচনা শুরু হয়নি
ডিসেম্বর ১৯৯৮	কানাডা	ইউরোপিয়ান কমিউনিটি	ভেষজ ও কৃষিরাসায়নিক সংক্রান্ত	আলোচনা শুরু হয়নি
জানুয়ারি ১৯৯৯	ইউরোপিয়ান কমিউনিটি	আমেরিকা	আমেরিকা কপিরাইট অ্যাক্ট ধারা ১১০(৫)	প্যানেলের বিচারাধীন
মে ১৯৯৯	আমেবিকা	কানাডা	পেটেন্ট সংরক্ষণ শর্তাদি সংক্রান্ত	প্যানেলের বিচারাধীন
মে ১৯৯৯	অমেবিকা	আর্জেন্টিনা	ভেষেজর পরীক্ষা সংক্রান্ত ফলাফলেব গোপনীয়তা রক্ষা ও কৃষিরাসায়নিক বিষয়ক	আলোচনা শুরু হয়নি
জুন ১৯৯৯	আমেবিকা	ইউরোপিয়ান কমিউনিটি	ট্রেডমার্ক ও স্থানীয় উৎপাদন সংক্রান্ত	আলোচনা শুরু হয়নি
জুলাই ১৯৯৯	ইউরোপিয়ান কমিউনিটি	আমেরিকা	ট্রেডমার্ক সংক্রান্ত (ধারা ২১১)	আলোচনা শুরু হয়নি

বহু ঝগড়ার এখনও আলোচনাই শুরু হয়নি। হয়নি কেন? কর্মসংস্কৃতিতে পিছিয়ে থাকা দেশ নাকি ওরা? রাজনীতি ও মতাদর্শ ওদের এমন মন্থরগতিই নির্দেশ করছে। আমেরিকা আর ইউরোপীয় দেশের যাবতীয় বিষয়-আশয় হয় বিচারাধীন নয়তো আলোচনাই শুরু হয়নি এখনও। আরো কয়েকটা অভিযোগের ছবি নিশ্চয়ই বদলেছে এই সময়ের ভেতর www.wto.org - এর বোতাম টিপলেই হাল আমলের খবর পেয়ে যাবেন।

পেটেন্ট প্রশ্নে আমরা ভারতীয়রা এখন কোথায় আছি? ১৯৭০ সালের যে পেটেন্ট আইন ছিল আমাদের ফসল, খাদ্য, জীবনদায়ী ওষুধের পণ্যপেটেন্ট গ্রাহ্য ছিল না। ডব্লিউ টি ও-র অংশীদার হয়ে আমাদের ঐ অধিকার আমরা নিজেরাই ছেড়ে দিয়েছি। জানুয়ারি ২০০৫ সালের মধ্যে আমাদের ওদের সব নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। যতদিন না আমরা বদলাতে পারছি নিজেদের, বাইরের কোন আবেদনকারী বহুজাতিককে একচ্ছত্র ব্যবসার অধিকার দিতে হবে ১৯৯৯ সালে আমাদের দেশের সরকার দিল্লিতে বসে এমন একটা কথাই ঘোষণা করল একথা ঘোষনার ফল কি? ওষুধের বেলায় পণ্য পেটেন্ট এই দেশে গ্রাহ্য হবে। বহুজাতিকের দরখাস্ত ২০০৪ সালের মধ্যে বিবেচনা করতে হবে। যাই হোক, পরিবর্তনের নানা কথাবার্তাগুলো খতিয়ে দেখার জন্য যৌথ সাংসদ কমিটি তৈরি হল। ওঁরা অভিমত দিলেন ওঁদের মত। ২০০২ মে মাসে সংসদে সংশোধনীসহ বিল পাশ হয়ে গেল। এখনও অবশ্য ব্যবসার একচ্ছত্র অধিকার (EMR) বাতিল হয়ে যায়নি। ২০০৪ সালের পর বাতিল করতে হবে। ভেষজের পণ্য পেটেন্টে সম্মতি জানাতে হবে। গরীব ভারতীয়ের নাক কো বহুজাতিকের যাত্রা শুরু হবে। নাক কাটার সুচতুর নাপিতেরা দেশের এখানে ওখানে বহাল তবিয়তেই রয়েছেন। সব সর্বনাশা কথাগুলো এখনও উচ্চারণ করিনি। সংশোধনের পর যে আইন তৈরি হয়েছে তার ফলে যাদের অধিকারে পণ্য পেটেন্ট থাকবে তারা বাইরের কাউকে এদেশে সেই পণ্য তৈরি করতে, কাজে লাগাতে এমন কি বিক্রি করতেও দেবে না। অন্য দে থেকে আনতে চাইলেও দেওয়া হবে না। মিষ্টি কথা রয়েছে যদিও সেখানে। যদি মূল পেটে অধিকারীরা কাউকে অনুমতি দেয় তবে সে বাইরের দেশ থেকে ঐ পণ্য আনতে পারবে। অ দেশে বেচতে পারবে। কোন কোন অর্থনীতিবিদ এই শর্তের ভেতর মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন। কেন পৃথিবীর সব রাঘববোয়াল বহুজাতিকের সব দেশেই নিজস্ব সংস্থা আছে নাকি? না প্রতিনিধির মাধ্যমে তারা ব্যবসা বাড়িয়ে তোলে। বহুজাতিক ব্যবসার এইতো সাধারণ নিয়ম মুক্তির স্বপ্ন কি করে দেখছেন কেউ কেউ, বুঝতে পারিনা।

সর্বনাশের দ্বিতীয় ছবিটি আরও ভয়াবহ। বিজ্ঞানী ও গবেষকদের কাছে এই বীভৎসতা কোন সমান্তরাল উদাহরণ রয়েছে বলে মনে করি না। ১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইনে স্প বলা হয়েছিল, যে কোন ভেষজের পেটেন্টের সময়সীমা বিক্রির দিন থেকে পাঁচ বছর নয়তো পেটেন্ট লাভের দিন থেকে সাত বছর। অপেক্ষাকৃত কম জরুরি বিষয়ের জন্য খুব বেশি হ চৌদ্দ বছর সময়সীমা দেওয়া হবে। নতুন সংশোধনীতে [অধ্যায় ৫৩ (১)] সময়সীমা বাড়ি কুড়ি বছর করা হয়েছে। একজন সক্রিয় বিজ্ঞানী বা গবেষক জানেন, কুড়ি বছর আগে প প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে প্রতিযোগীর অবস্থান কেমন দাঁড়ায়, কোথায় দাঁড়ায়। কথাটা ভে নিয়েইতো একসময় দেশের সিংহভাগ বিজ্ঞানী এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন।

নিট ফল ভাল হলনা কিছু। পেটেন্ট আইনে নানা রক্ষাকবচ রয়েছে, এমন একটা কোম হাওয়া বইয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে বহুকাল ধরেই। সত্যিই যে কিছু কিছু কথা নেই, এমন না 'ট্রিপস'-এর ২৭ নং (২ এবং ৩) ধারায় কিছু কথা বলা হয়েছে। যেমন কতগুলো জিনি পেটেন্ট করা যাবেনা। কি কি?

এক : মানুষ, উদ্ভিদ, নানা জীবজন্তু ও পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর কোন কিছুর পেটে চলবে না।

দুই : মানুষের চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা উপায় যেমন রোগনির্ণয়, প্রতিরোধ ও শল্যচিকিৎসার বিষয় পেটেন্ট করা যাবে না।

তিন : অণুজীব ছাড়া সকল উদ্ভিদ বা প্রাণী পেটেন্টের আওতার বাইরে থাকবে। নানা ধরনের বীজ, তার নানা প্রজাতি ও উৎপাদনের নানা জৈবিক পদ্ধতি পেটেন্ট মুক্ত থাকবে।

বহু বাদ প্রতিবাদের পর একটা বিষয় ভারতীয় সংশোধনীতে যোগ হয়েছে। 'ট্রিপস' চুক্তিতে ছিলনা। দেশের যে কোন অঞ্চলের কোন আদিবাসী বা নির্দিষ্ট মানুষজন বংশ পরম্পরায় যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তার কোন পেটেন্ট আইনসিদ্ধ হবেনা। তবে সরকার স্বীকৃত কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ঐ জ্ঞান কাজে লাগাতে চাইলে দাতাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (অধ্যায় ৯৯ থেকে ১০৩)। কোন জরুরি কারণে সরকার যদি কারও পেটেন্ট রয়েছে এমন পণ্য কাজে লাগান, পেটেন্ট মালিককে আগাম জানালেই হবে। যদি কোথাও অসুবিধে তৈরি হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদনের বিনিময়ে হাইকোর্ট ঐ পেটেন্ট খারিজ করে দিতে পারে। এখানেই সার সত্য লুকিয়ে আছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির মানচিত্রে এখন কে বেশি ক্ষমতাশালী? দেশীয় হাইকোর্ট না কি যারা ডব্লিউ টি ও সদস্য তাদের 'বিরোধ নিষ্পত্তি সমিতি'? নানা সঙ্গত কারণেই মনে হয় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাকে পাশ কাটিয়ে বড় কোন জয় পরাজয় নির্ধারিত হবে না।

না হবার তালিকা এক পাশে রেখে যদি আমরা পেটেন্টের তালিকার দিকে চোখ রাখি তবে বিস্ময়ের ঘোর বেড়েই চলে। বলেছি আমরা কোন 'জীবন' পেটেন্ট হবেনা। তাই নাকি? বহুজাতিক ডু পন্টের কথা বলছি। সেই ডু পন্ট, যে সি.এফ.সি. তৈরি করে ওজোন স্তরের গর্ত তৈরিতে সহায়তা করেছে। ১৯৮৮ সালের ১২ই এপ্রিল 'ডু পন্টের ইঁদুর' পেটেন্ট পেল। পাঁচটা ইঁদুরের মতো নয় সে। ক্যান্সার তৈরির জিন তার শরীরে ঢুকানো হয়েছে। নাম 'অনকোমাউস'। এই ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করেছেন হার্ভার্ডের বিজ্ঞানীরা। তাঁকে বিজ্ঞানী মহল 'হার্ভার্ড মাউস' বলেও ডাকে। আমরা মনে করি, তার আসল নাম হওয়া উচিত 'ডু পন্ট মাউস'। যে যত বড়ো বিজ্ঞানীই হোন না কেন, বাহবা পেতে পারেন বহু, নোবেলও পেয়ে যেতে পারেন, ব্যবসায় কোটি কোটি টাকা করবে ডু পন্ট। পৃথিবীর যে কোন দেশের বিজ্ঞানীরা ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করতে চাইলে এই ইঁদুর পেতে চাইবেন। ইঁদুরের দাম আকাশছোঁয়া হলে গরীবদেশের বিজ্ঞানীরা টাকা পাবেন না। গবেষণায় পিছিয়ে পড়বেনই। হিটলার তাঁর দেশের বিজ্ঞানীদের কাছে দাবি শুনে বলেছিলেন, 'গিনিপিগ কেনার টাকা দিতে পারব না। ইহুদি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে শরীর দুভাগ করে ওষুধের পরীক্ষা করুন।' বর্তমান ব্যবস্থার নৃশংসতা আমি একবার শুধু মিলিয়ে দেখতে চাইছি। হিটলার ভাবনার চেয়ে বহু যোজন দূরের ভাবনা কি?

একটা বহুজাতিক কোম্পানির নাম ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোটিনস লিমিটেড (PPL)। এডিনবরায় 'ডলি' নামের ভেড়া জন্মের আগে ঐ কোম্পানির ভেড়া 'ট্রেসি' জন্মায়। আর পাঁচ দশটা ভেড়ার মত নয় সে। তার স্তনগ্রন্থিতে মানুষের শরীরের জিন লাগানো হয়েছে। ফলে এই ভেড়ার দুধে খুব দরকারি একটা প্রোটিন তৈরি হয়। 'ট্রেসি' এই দুনিয়ায় একটা দুটো হলে চলে না। অনেক 'ট্রেসি' চাই। পথ তাহলে একটাই। ক্লোনিং। ক্লোনিং গবেষণা এডিনবরায় যা হয়েছে তার টাকা দিয়েছে কিন্তু এই কোম্পানিই। ডলির আবিষ্কর্তা কে? রসলিন ইনস্টিটিউট। কিন্তু মালিকানা কার? ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোটিনস লিমিটেড।

আমার আপনার শরীরের জিনের মালিকানা মার্কিন বহুজাতিকের কবলে চলে যেতে পারে, মানেন কি? 'মাইরিয়াড ফার্মাসিউটিক্যালস' এক মার্কিন বহুজাতিক। স্তন ক্যান্সার হবার জন্য যেই জিন দায়ী তার পেটেন্ট পেয়েছে। আগে একটা 'নতুন জিন' পেয়েছি বললেই পেটেন্ট

পাওয়া যেত। এখন তবু মন্দের ভাল বলব। আবিষ্কৃত জিনের উপযোগিতা বা অপকারিতা কি জানাতে হবে। প্রমাণ দেখাতে হবে। তবে পেটেন্ট পাওয়া যাবে। সর্বনাশ যা হবার হবে। বাণিজ্যে ফুলে ফেঁপে উঠবে বহুজাতিক।

বিজ্ঞান গবেষণার মালিকানা উগ্রপন্থীদের হাতে অপহৃত লোকজনের মত হাত বদল হয়। বিদেশের সরকারি গবেষণাগার 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ'। ওখানকার বিজ্ঞানীরা জিনথেরাপির একটা উপায় বের করেন। পেটেন্ট করেন। বহুজাতিক 'স্যান্ডোজ' সেই উপায় তিনশো পঁচানব্বুই মিলিয়ন ডলারে কিনে নেয়। 'স্যান্ডোজ' আর 'সিবা-গাইগি' মিলে এখন নতুন কোম্পানি 'নোভারতিস' হয়েছে। থেরাপি মানেই তো চিকিৎসার এক রকমের উপায়। তবে ঐ যে কিছু আগে এক দুই তিন করে লেখা হল, 'এই পেটেন্ট চলবে না, ওই পেটেন্ট চলবে না' তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার মতো কোম্পানি গোকুলে কত বাড়ছে আন্দাজ করতে পারছি।

রকেফেলার বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকার খুবই নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়। ওখানে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন, কোন জিনের জন্য মানুষ মোটা হয়। জেনেই বহুজাতিক 'অ্যামজেন' এর আহ্লাদ ধরেনা। দরাদরি করে সেই কাজ নব্বুই মিলিয়ন ডলারে কিনে নেয়। এখন সাধারণ অসুখ বিসুখের জন্য কোন কোম্পানি ওষুধ তৈরি করতে চায় না। রোগা হবার ওষুধ বানায়। মাথায় টাক গজানোর ওষুধ বানায়। উজ্জ্বল যৌবন ধরে রাখার ওষুধ বানায়। গরীবদেশের কথা ছেড়ে দিন। বড়লোকের দেশ যে খাবার তৈরি করে, নানা দেশে বাণিজ্য করে, তার উপাদান এমন থাকে যে আপনার মোটা না হয়ে উপায় নেই। চর্বি না জমে উপায় নেই। কাজেই এক কাউন্টারে দাঁড়িয়ে মোটা হবার 'পণ্য' কিনবেন, পরের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে 'রোগা' হবার ওষুধ কিনবেন। শাঁখের করাতের অত্যাধুনিক সংস্করণ!

ফলে ছবিটা আমাদের সামনে জ্বলজ্বল করছে। এখন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আপনি পেটেন্টের কথা ভাবতে পারছেন। শুধু যন্ত্রের পেটেন্ট আজকাল আর গ্রহণযোগ্য নয়। জীবনের পেটেন্ট হবে। গাণিতিক সমীকরণের পেটেন্ট হবে। আমাদের দেশের জৈববৈচিত্র্য একটার পর একটা বহুজাতিকের ঘরে চলে যাচ্ছে। আমরা সবাই মিলে সোচ্চার হইনি। বাসমতী বেচে যে বিশাল বিদেশি টাকা ঘরে আসত, আজকাল আর আসে না। 'রাইসটেক অ্যান্ড কোং' বাসমতীর মালিকানা নিয়ে দেশে দেশে কম দামে ফিরি করছে। ভারত পাকিস্তান দুই দেশের কর্তাব্যক্তিরাই বোমা ফাটানোর 'নাবালক' খেলায় এতো মত্ত ছিল, ওদিকে নজর দিতে পারেননি। ঢাকঢোল পিটিয়ে দিল্লির কর্তাব্যক্তিরা বলেছিলেন, ভারতের জৈববৈচিত্র্য অনন্য। পেটেন্ট যুগ শুরু হোক একবার। পেটেন্ট করে রয়্যালটি এনে দেশকে সম্পদে আর অর্থে ভরিয়ে তোলা যাবে। ফলেন পরিচয়তে। নিমের প্রায় সব পেটেন্ট বহুজাতিক 'ডব্লিউ. আর. গ্রেস অ্যান্ড কোং' এর হাতে। আমাদের পেটেন্ট গোটা তিনেক। কর্তাব্যক্তিরা ভুল স্বীকার করেন না। লজ্জাতে অধোবদনও হননা। হলুদ মামলায় আমরা জিতেছি। জিতেছি কেন? ঢাকার এক সম্মেলনে ড. মাশেলকারকে সাহস সঞ্চয় করে কথাদুটো বলেছিলাম। আমার প্রতীতী ভাঙ্গতে পারেননি। প্রথম কথা, চুন হলুদের গুণাগুণ নিয়ে পেটেন্ট করলে খানিকটা 'ক্রুড' বা স্থূল পেটেন্ট হয়ে যায়। আমাদের গল্প গাঁথায় এসব কথা প্রচলিত রয়েছে। মিসিসিপি মেডিক্যাল সেন্টার ঐ ভুলটুকু করেছিল। যদি যৌগ নিষ্কাশিত করে পেটেন্ট করে ফেলত, আমাদের মামলায় জেতা দুঃসাধ্য হত। দ্বিতীয়ত মামলা লড়তে আমাদের দেশের খরচ লেগেছে পাঁচ লক্ষ টাকার মত। এমন পরিমাণ টাকা যে কোন দেশই খরচ করতে পারে। সব পেটেন্ট মামলার ভবিতব্য তা হবার নয়। 'ইনস্ট্যান্ট ফটোগ্রাফি'র মামলাতো বিশ্বখ্যাত হয়ে রয়েছে। মাশেলকার নিজেই দিল্লিতে দেশমুখ

স্মারক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন, ইস্টম্যান কোডাক আর পোলারয়েড-এই দুই বহুজাতিক মামলার ফয়সালা আর ক্ষতিপূরণ মিলিয়ে যে অর্থ বিনিয়োগ করেছিল তা ভারতের বার্ষিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বাজেটের অর্ধেকের বেশি। দেশের বিজ্ঞান ও শিল্প কেন্দ্রের অধিকর্তা যদি একথা জানেন তবে গরীব দেশের 'পেটেন্ট সংস্কৃতি'র পক্ষে সওয়াল করেন কেমন করে, বুঝতে পারিনা। সিয়াটল থেকে দোহা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার লড়াই চলেছে। রিও থেকে জোহেনেসবার্গ জৈববৈচিত্র্য ও বাণিজ্যের লড়াই চলেছে। নইলে যুদ্ধপ্রেমিক কলিন পাওয়েল বললেন কি করে, জিম্বাবোয়ে ও জাম্বিয়াকে আমরা ভাল চোখে দেখছি না। একটা দেশের অপরাধ, রাজনীতিতে আমেরিকার প্রভুত্ব না মেনে নিজস্বতা অর্জন করতে চাইছে। অন্য দেশ আমেরিকার জিন-বদল খাবার খাবেনা। কিনবেনা কেউ। ব্যবসায় মার খাবে আমেরিকা। সইবে কেন? ইউরোপেরও বহু দেশ জেনেটিক প্রযুক্তির খাবার খায় না। আমেরিকা ইউরোপের সঙ্গে যেভাবে লড়াই করবে, গরিব দেশে তা করবে না। অতএব নিন্দে মন্দ কর।

প্রতিদিন নিজভূমে পরবাসী হচ্ছি আমরা। একটার পর একটা আমাদের ফসল বিদেশের মালিকানায় চলে যাচ্ছে। নিম হলুদ বাসমতীতো রয়েছেই। করলা, জাম, কালমরিচ, আমলকি ও আরও বহু ওষুধি গাছের গুণাগুণ বাইরের দেশে বহুজাতিকের হাতে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকার পেটেন্ট নং ৪৪৩৮০৩২-এর সঙ্গে এক চাঞ্চল্যকর কাহিনি যোগ হয়ে আছে। জন মুর বলে একজন ভদ্রলোকের প্লীহার কোষ চড়া দাম পেয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের ডাক্তারেরা স্যান্ডোজের কাছে বেচে দিয়েছিলেন! ঐ কোষ ছিল ক্যান্সার আক্রান্ত। গবেষণায় কাজ দেবে খুব। টাকা পাওয়া গেছে তিন বিলিয়ন। জানতে পেরে মুর মামলা করেন। তার শরীরের অংশ ভালো কি খারাপ যাই হোক, তাকে না জানিয়ে বিক্রি হয় কেমন করে? মামলায় হেরে যান মুর। সব মামলার রায় পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয় না। কলঙ্কও কোথাও কোথাও ছেয়ে থাকে।

আমেরিকা সরকারের বাণিজ্য বিভাগ আর 'ফার্মাসিয়া' বহুজাতিক রক্ত ক্যান্সার প্রতিরোধক্ষম কোষ-সারির অধিকারিণী এক চব্বিশ বছরের যুবতীকে পেটেন্ট করতে এগিয়েছিল। কানাডার মানুষ প্যাট রয় মুনি ১৯৯২ সালের জেনেভা জৈববৈচিত্র্যে সম্মেলনে লড়াই করে সেই অধ্যায় ঠেকিয়েছিলেন। জিনপ্রযুক্তি ও জৈববৈচিত্র্য নির্ভর গবেষণাই এখন পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। একটার পর একটা পণ্য বাজারে উন্মুক্ত করছে। ১৯৯৮ সালের একটা হিসেব আমাদের হাতের কাছে রয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে পয়সাওয়ালা দশটি বহুজাতিকের হিসেব। কিভাবে তাদের মূলধন খাটে আমরা নীচে দেখতে পাচ্ছি।

সারণী-২

গবেষণার বিষয়	মোট ব্যবহৃত মূলধন	বহুজাতিকের অংশ
বীজ গবেষণা	২৩ বিলিয়ন ডলার	৩২ শতাংশ
ভেষজ গবেষণা	২৯৭ বিলিয়ন ডলার	৩৫ শতাংশ
পশুচিকিৎসা গবেষণা	১৭ বিলিয়ন ডলার	৬০ শতাংশ
কীটনাশক গবেষণা	৩১ বিলিয়ন ডলার	৮৫ শতাংশ

এইতো গেল বহুজাতিকের হিসেব। বড়লোক দেশগুলো পেটেন্টের মালিকানা কেমন কুক্ষিগত করে রেখেছে তার ছবিটাও আমরা একবার দেখতে পারি। পৃথিবীতে যত পেটেন্ট নথিভুক্ত হয়েছে তার শতকরা ৯৭ ভাগ শিল্পোন্নত দেশগুলির দখলে রয়েছে। ১৯৯৫ সালে

রয়্যালটি থেকে পৃথিবীতে যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল তার পঞ্চাশ ভাগ টাকা গেছে আমেরিকায়। পৃথিবীর দশটি উন্নত রাষ্ট্রের পঁচানব্বুই ভাগ পেটেন্ট আমেরিকা থেকে কেনা।

কেউ কেউ বলতে চান, বহুজাতিকেরা পেটেন্ট করবার সুযোগ না পেলে গবেষণায় টাকা দেবেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুশি করবে না। কি করে বহুজাতিক? অল্প বিনিয়োগ করে সিংহ পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করে। তাছাড়া তথ্যও ভিন্ন। ১৯৫৫ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় ক্যান্সারের যতো ওষুধ বেরিয়েছে তার বিরানব্বুই ভাগ গবেষণা সরকারি টাকায় হয়েছে। অথচ মজার এই, প্রায় সব কটা ওষুধেরই পেটেন্ট নিয়েছে বহুজাতিক। অনেকে আবার মানবিক মূল্যবোধেরও কথা বলেন। বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদের স্বীকৃতি চাই তাঁর উদ্ভাবনায়। আমরা একশোভাগ একমত। কিন্তু সেই উদ্ভাবনার ব্যবহার দেখলে আমাদের প্রতিবাদ জানানো ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই কোন উপায় থাকে না।

১৯৯৬ সালে আমেরিকা তিরিশ বিলিয়ন ডলার রয়্যালটি পেয়েছে। দক্ষিণের গরিব দেশগুলো ১৯৯৫ সালে ১৮ বিলিয়ন ডলারের প্রযুক্তি কিনেছিল। সব সময় যে এরা প্রযুক্তি রয়্যালটির বিনিময়ে বেচে, তা-ও নয়। আমাদের দেশের বেলাতেই তো এমনটি ঘটেছে। সি.এফ.সি.-এর বিকল্প তৈরির প্রযুক্তি আমেরিকার কাছে ভারত চেয়ে পায়নি। পরিবেশ নির্ভর বাণিজ্যের যে অভাবনীয় সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, তার একাধিপত্যে ফাটল ধরাতে আমেরিকা রাজি নয়।

আমাদের মতো গরিব দেশের চেহারাটা কি? প্রচলিত প্রযুক্তিগুলোও চুরি হয়ে বাইরের দেশে চলে যাচ্ছে। বাইরের 'সভ্য ও উন্নত' রাষ্ট্র বা বহুজাতিক তার পেটেন্ট অর্জন করছে। রাষ্ট্রসংঘেরই একটা রিপোর্ট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলো প্রতি বছর তিনশো মিলিয়ন ডলার ক্ষতির শিকার হচ্ছে। বীজ, ওষুধি গাছ থেকেই প্রধানত এই ক্ষতি হয়। সাহেবরা নিয়ে যায়। চুরি করেই নিয়ে যায়। প্রাপ্য রয়্যালটি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। আমাদের জগদীশচন্দ্র বসু যেভাবে বঞ্চিত হয়েছিলেন অতোকাল আগে, আমরা ভুলতে পারিনি। অনেকেই হয়তো উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে শিশুসাহিত্যিক হিসেবে জানেন। এদেশে 'হাফটোন' মুদ্রণের পথিকৃৎ তিনি। ফটোগ্রাফি বিষয়ে একজন প্রথম সারির উদ্ভাবক। তাঁর দুটো উদ্ভাবনা সাহেবরা পেটেন্ট করে 'চুরি' করেছিল। এখনও আমাদের দেশের নানা বনজঙ্গল থেকে ওষুধি গাছ চুরি হয়। ক্ষুধার্ত আদিবাসী ধূর্ত বহুজাতিক প্রতিনিধির কাছে কত কি তথ্য জানিয়ে দেয় আর সে বিনা বাধায় প্রফুল্লচিত্তে সেই তথ্য চুরি করে নিয়ে যায়। অসততার কালিমা তাঁর চৈতন্যে বিন্দুমাত্র লাগেনা।

নতুন পেটেন্টরাজ আমাদের সৃষ্টিশীল গবেষকদের কর্মহীন করেও তুলেছে। আমি নিছক গবেষণাপত্র বা ডিগ্রির কথা বলছিনা। দেশের উন্নয়নে প্রয়োজন এমন সম্পদ সৃষ্টির কথা বলছি। কিছুদিন আগে আমরা একটা সংবাদ সবাই দেখেছি। এইড্‌স্-এর ওষুধ AZT আমাদের হায়দ্রাবাদের বিজ্ঞানীরা অপেক্ষাকৃত কম খরচে সংশ্লেষণ করেছিলেন। আন্তর্জাতিক বাজারে এই ওষুধের চাহিদা খুব। আমরা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে কম দামেই চাইলে বেচতে পারি। বহুজাতিকের আপত্তি। এমন জিনিস চলবে না। যার পেটেন্ট আগে, তার নির্ধারিত দামেই এই ওষুধ কিনতে হবে।

বিশ্বাস করি না, এমন দীর্ঘকাল চলতে পারে। শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস অবিনশ্বর নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছাত্ররা জানেন, এই শব্দ দুটোর সংজ্ঞাতেই বিশ্বজনীন ধারণা সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে। নিউটনের বিজ্ঞান শুধু খ্রিস্টান লোকজন কাজে লাগান না! বোস-আইনস্টাইন সূত্র শুধু হিন্দু আর ইহুদিরা ব্যবহার করেন না। ল্যান্ডাও আর পাউলিং-এর কাজ সমাজতান্ত্রিক ও

ধনতান্ত্রিক লোকজনদের জন্য পৃথক করে কোন কিছু নয়। নোবেলজয়ী আবদুস সালাম শুধু আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জন্য বিজ্ঞান তৈরি করেছেন কি?

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা উদ্ভাবনাকে পেটেন্টের নাগপাশ পড়িয়ে বহুজাতিক ও ধনবাদী রাষ্ট্র যে ঔদ্ধত্যের আবহ গড়ে তুলেছে তার সমুচিত জবাব তৃতীয় দুনিয়ার মানুষ দেবেই একদিন। সারা দুনিয়ার গরিব মানুষ সংঘবদ্ধ হবেন এমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে আমার ছিঁটেফোঁটাও সন্দেহ নেই। অভিমতটুকু 'বিজ্ঞান ভাবনা প্রসূত' বলেই দ্বিধাহীনচিত্রে এমন কথা উচ্চারণ করতে পারছি।

সূত্র

1 Intellectual Property Rights : KPG Nair & Ashok Kumar Edited, Allied Publishers Limited, 1994.

2 Intellectual Property Rights unders WTO, Tasks before India : T. Ramappa, Wheeler Publishing, 2000.

3 The World Trade Organisation, Millennium Round, Free Trade in the Twenty-First Centry : Klaus Günter Deutsch & Bernhard Speyer Edited, Routledge, London, UK, 2001.

4. Patents, Myths & Reality : Vandana Shiva, Penguin Books, 2001.

5. ডারউইনের দুনিয়া ও মুশকিল আসান কম্পিউটার ঃ শ্যামল চক্রবর্তী, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০১।

6 Patents for Biotechnology Inventions in TRIPS : C. Niranjan Rao, Economic and Political Weekly, June 1, 2002.

7 TRIPS agreement and amendment of Patents Acf in India : Sudip Chaudhuri, Economic and Political Weekly, August 10, 2002.

বিশ্বায়ন এবং পরিবেশ

বন্দনা শিবা

পৃথিবীর মূল সম্পদগুলি হল স্থল, জল এবং পরিবেশগত বৈচিত্র্য। দারিদ্র্যের প্রাকৃতি মূলধনও হল তাই। বিশ্বায়নের প্রভাবে এই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উপাদানগুলি প রূপান্তরিত হচ্ছে। নতুন ধরনের সম্পদ হিসাবে এই উপাদানগুলি উপজাতি ও কৃ সম্প্রদায়ের অধিকার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিশ্বায়িত কর্পোরেশনগুলির নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণ হচ্ছে। জাতীয় নীতি ও আইন উল্লঙ্ঘন করে প্রায়শই এই ঘটনা ঘটছে। বিশ্বায়িত বাণিজ্যে চুক্তিগুলি জাতীয় সংবিধানকে অবনমিত করে, যার অর্থ নাগরিকদের জীবনের প্রতি আধিকা স্থল, জল এবং পরিবেশগত বৈচিত্র্যের প্রতি অধিকারের অবলুপ্তি। দুন উপত্যকা খননকার্য ব করতে যে যুগান্তকারি রায় দেওয়া হয়েছিল তাতে এটা পরিষ্কার হয় যে জীবনের প্রতি অধিকা কখনই বাস্তুতন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদানের প্রতি অধিকারকে বর্জন করে বাস্তবায়িত হতে পা না। যেহেতু আলোচ্য খননকার্য ঐ উপত্যকার জলের ভাণ্ডার নষ্ট করছিল এবং জলকে ব দিয়ে জীবন হয় না, তাই প্রাণ বাঁচাতে ঐ রায় দেওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা ছিল ন বাণিজ্যকে পরিবেশগত ভারসাম্যের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়।

বিশ্বায়ন কিন্তু, ব্যবসা-বাণিজ্যকে জীবনের উপরে স্থান দেয়। নাগরিক অধিকারের ক হয়ে বসছে কর্পোরেশনগুলি, প্রাকৃতিক উপাদানগুলির গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে কর্পোরে নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার অত্যাচারমূলক রাস্তাটি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

বিশ্বায়ন এবং জমির কর্পোরেটাইজেশন্

ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র গ্রাম এবং ক্ষুদ্র চাষিদের দেশ। সংবিধান এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতী নীতিগুলি উপজাতি অধিকৃত জমি এবং ক্ষুদ্র চাষিদের রক্ষা করে এসেছে।

ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চম শিডিউল উপজাতিদের জীবনধাবণের মূল উৎস, জমি সংরক্ষণ করে। আবার, সংবিধানের ৭৩-তম সংশোধন (১৯৯২), তফশিলী সম্প্রদা জমিচ্যুতি এবং কোনো তফশিলী জাতির বেআইনিভাবে হারানো জমির বিরুদ্ধে যথোচি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গ্রামসভাগুলিকে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করেছে।

যখন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার বিড়লাদের হাতে উপজাতি অধিকৃত জমি বক্সাইট খননের জ লিজ দেয় তখন উপজাতিরা সংঘবদ্ধভাবে এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। 'সমথা' (Samath

নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে তাঁরা এই ঘটনার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে কেস ফাইল করেন। ১৯৯৭ সালে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে তফশিলী সম্প্রদায় অধিকৃত জমি বেসরকারি হাতে খননকার্যের জন্য লিজ দেওয়া বেআইনি এবং অসাংবিধানিক। কেন্দ্রীয় সরকার সেই ঘটনার পর থেকেই সংবিধান বিকৃত করে সমথা রায়ের অন্যথা করার চেষ্টা করে আসছে।

জুলাই, ২০০০এ খনিমন্ত্রক একটি গোপন চিঠিতে (রেফ. ১৬/৪৮/৯৭—এম VI) কমিটি অফ সেক্রেটারিজ্‌কে প্রস্তাব দেয় সংবিধানের পঞ্চম শিডিউলকে সংশোধন করা হোক যাতে সমথা রায়কে পাশ কাটানো যায়। এর ব্যানারে তীব্র প্রতিবাদ হয়। 'ক্যাম্পেন ফর পিপলস্‌ কন্ট্রোল ওভার ন্যাচারাল রিসোর্সেস', আইনসভায় প্রশ্নের ঝড় ওঠে; ফলত ঐ সংশোধন সাময়িকভাবে রদ হয়ে যায়। এমনকি রাষ্ট্রপতি তাঁর সাধারণতন্ত্র দিবসের (২০০১) ভাষণে বলেন, 'ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এই মত পোষণ না করে যে ভারতীয় রাষ্ট্র সবুজ ধ্বংস এবং নিরীহ আদিবাসী হত্যার উপর নির্মিত হয়েছে।'

হচ্ছিল। বিলগ্নিকরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, অরুণ শৌরি জনসাধারণকে জানিয়ে দেন যে বালকো কেসের মধ্যে দিয়ে সরকার সমথা রায়কে এড়াতে চাইছে।

সুপ্রিম কোর্ট ১০ই ডিসেম্বর, ২০০১, এ যে সিদ্ধান্ত জানান তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে সেইসব ক্ষেত্রে যা মানুষের মৌলিক অধিকার ও চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রথমত সুপ্রীম কোর্ট বালকোর বেসরকারিকরণকে সমর্থন জানান, যা পঞ্চম শিডিউলের অবমাননা সূচনা করে। জনসাধারণের প্রকৃত চাহিদা ও কল্যাণের উদ্দেশ্য ছাড়া, উপজাতি অধিকৃত জমি ব্যবহার করা যাবেনা, এই ছিল পঞ্চম শিডিউলের ধারণা। যেহেতু বেসরকারিকরণ শুধু বেসরকারি লাভেই সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে, বালকোর বেসরকারিকরণ উপজাতি সম্প্রদায়ের জমির প্রতি অধিকারকে নষ্ট করবে।

সরকারি সংস্থা হিসাবে যখন বালকো সেইসব জমি ব্যবহার করেছে, তখন যে পরিস্থিতি ছিল এখন বেসরকারি মালিকানায় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেইজন্যই, বিচারপতি কৃপালের মতের বিপরীতে, ছত্রিশগড় সরকারের দাবি কখনই তার নিজস্ব কার্যাবলীর পরিচ্ছন্নতাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সমতুল হতে পারে না।

যেহেতু পঞ্চম শিডিউল উপজাতিদের তাঁদের জমির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, তাই সরকারি মালিকানায় বালকোর উপস্থিতি উপজাতি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে ট্রাস্টি হিসাবে সরকারকে উপস্থাপিত করেছিল। মালিকানার পরিবর্তনে উপজাতিদের সঙ্গে সংবিধান সমর্থিত এক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যাঁদের জমিতে বালকোর অবস্থান সেই উপজাতিদের কোনো কথাই শোনা হয়নি। সংবিধানের বিপক্ষে যাওয়া এই রায়কে তাই অসাংবিধানিক এবং বেআইনি বলা উচিৎ।

সুপ্রিম কোর্ট ভারতবাসীর মৌলিক অধিকারকেও অস্বীকার করেছে এই বলে যে, অর্থনৈতিক নীতি যা বেসরকারিকরণ এবং উদারীকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত তার ব্যাপারে কোনো ভারতীয় কোর্টই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অন্যভাবে বললে জল, অরণ্যের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের বেসরকারিকরণকে কোনো চ্যালেঞ্জ জানানো যাবে না। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য অধিকার, খাদ্য ও শিক্ষার প্রতি অধিকারও যদি কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সেই ঘটনাকেও চ্যালেঞ্জ জানানো যাবেনা।

জনগণের অস্তিত্ব সম্পর্কিত সবকটি ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের সম্ভাবনা এসেছে বিশ্বব্যাঙ্কের 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতির হাত ধরে।

বিশেষ করে দোহার ঘোষণার একত্রিশতম অনুচ্ছেদে পরিষ্কার বলা হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদেও মুক্ত বাণিজ্য করা যাবে। এইসব বিশ্বায়িত চুক্তিগুলি এক্সিকিউটিভরা সই করে কাজে রূপান্তরিত করেছেন আইনসভার সমর্থন ব্যতিরেকেই। এই ঘটনা চূড়ান্ত বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে ভারতীয় আইনসভায়।

বেসরকারিকরণ এবং উদারীকরণ তাই আইনসভার সমর্থন ছাড়াই বলবৎ হয়ে গিয়েছে কোর্টের রায় বলছে, "বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতির গুণগত তারতম্য নির্ধারণ করা কোর্টের কাজ নয়; কোনো অর্থনৈতিক নীতির নির্ভুলতার বিচার করতে আইনসভা আছে, কোর্ট নয়।' আইনসভা যখন চুক্তি সম্পাদন এবং রূপায়ণের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকছে, তখন কোর্টের এহেন রায় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত নাগরিক অধিকারগুলিকেই ক্ষুণ্ণ করে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান দায়িত্ব হলো সংবিধানের চরিত্র রক্ষা করা এবং তার মাধ্যমে জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করা; সেইসব সময়ে, যখন এক্সিকিউটিভ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে উক্ত অধিকারগুলি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বালকো কেসে সুপ্রীম কোর্টের রায় এক্সিকিউটিভ এবং বিশ্বায়নের স্বার্থের প্রতি মনোযোগ দিয়েছে। সংবিধান, প্রকৃতপক্ষে, হত হয়েছে।

নতুন কৃষিনীতি জমির কর্পোরেটাইজেশনের মাধ্যমে কৃষককে জমিচ্যুত করছে। জমিদারী বিলোপ এবং ভূমি সংস্কারের আগের অবস্থানই যেন ফিরে এসেছে; অতি স্বল্প কিছু মানুষের হাতে থাকবে জমিস্বত্ব, ক্ষুদ্র এবং হতদরিদ্র কৃষকরা হবেন বঞ্চিত।

ল্যান্ড অ্যাকুইজেশন অ্যাক্ট জমি বিচ্যুতির আরেকটি কারণ। ১৮৯৪-এর এই আইন লেখা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনের সময় যখন, জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং রাষ্ট্রের অধিকার ছিল সর্বোচ্চ।

বহু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন হয়েছে এই আইনের। বিশ্বায়নের প্রভাবে দিনদিনই খনি, বড় রাস্তা, বন্দর এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর জন্য জমির চাহিদা বাড়ছে। কৃষক এবং উপজাতিদের হাত থেকে জমি লুণ্ঠন করতে এই আইনকে কর্পোরেট ভর্তুকি হিসাবে দেখা যেতে পারে। কর্নেল প্রতাপ সাউ ২০ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলশ্রুতি হিসাবে। এই ঘটনা ঘটেছে গুজরাটের উমরগাঁওতে। ইউনোক্যাল (UNOCAL) এবং ন্যাটেলকো (NATELCO) একটি বন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে গেলে বিক্ষুব্ধ এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে ঐ ঘটনা ঘটে।

কর্পোরেট অধিকারে জল

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দোহা মিনিস্টিরিয়াল বৈঠকে প্রতিযোগিতা, বিনিয়োগ, সরকার কর্তৃক আহরণ এবং বাণিজ্য-সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে শেষ মুহূর্তের দরাদরিতে ধনী, উত্তরের দেশগুলি চোরাপথে আর্টিকল ৩১ (৩) ঢুকিয়ে দিয়েছে; এই অনুচ্ছেদের বক্তব্য হলো, পরিবেশগত দ্রব্য এবং পরিষেবার উপরে শুল্ক হ্রাস এবং সম্ভব হলে শুল্কবিলোপ। পরিবেশগত দ্রব্য প্রকৃত অর্থে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জলসম্পদ ছাড়া আর কিছু না।

গ্যাটস বা জেনেরাল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস বেসরকাবিকরণের আরেকটি উপাদান, যেখানে জলকে পরিষেবা হিসাবে দেখা হয়েছে। তিরুপ্পুর, পুনে, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, হায়দারবাদ এ জলসম্পদের বেসরকারিকরণ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। জলব্যবসায়ীরা হিসাব করে দেখেছে জল বিক্রী থেকে এক ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি লাভ সম্ভব। এই ক্ষেত্রে কর্পোরেট সংস্থাগুলির কিছু নাম : সুয়েজ, ভিভেনডি, আগুয়াল দ্য বার্সেলোনা, টেমস্ ওয়াটার, স্যর, বেশটেল, এনরন, মনসানটো ইত্যাদি।

বেসরকারিকরণের ধাপগুলি চতুর এবং ছদ্মবেশী। তারা বেসরকারি সরকারি যৌথ উদ্যোগের কথা বলছে। সাধারণ মানুষের আন্দোলনের পরিভাষা 'পানি পঞ্চায়েত' তারা ব্যবহার করছে, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো জলকে সাধারণের সম্পদ থেকে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য এবং বেসরকারি সম্পত্তিতে পরিণত করা।

ফলতঃ মাধ্যাকর্ষণের সূত্র লঙ্ঘন করে যেন জল অর্থের চূড়ায় আরোহন করছে। বেসরকারিকরণের পরে ওড়িশায় সেচযোগ্য জলের দাম বেড়ে গেছে তিনগুণ। নাইরোবিতে জলের দাম বেড়েছে ৪০ শতাংশ এবং সাড়ে তিন হাজার পৌরকর্মীকে কর্মচ্যুত করে সেখানে এসেছে পঁয়তাল্লিশ জন বিদেশী কর্মী। গিনিতে জলসম্পদের কর্মী সঙ্কুচিত হয়েছে ৫০ শতাংশ এবং দামও বেড়েছে।

বেসরকারিকরণ শুধু যে জনগণের জলের অধিকারকে ধ্বংস করছে তাই নয়, এটি সেইসব ব্যক্তির জীবিকাকেও ধ্বংস করছে, যাঁরা পৌরসংস্থা, স্থানীয় জল এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কাজ করেন। সরকারি ব্যবস্থায় বিশ্বজুড়ে প্রতি হাজার জলসংযোগে ২-৩ জন কর্মচারী নিযুক্ত হন। বেশিরভাগ ভারতীয় শহরে পৌরকর্মীরা জল ও নিকাশী ব্যবস্থার বেসরকারিকরণকে রুখেছেন। এইসব ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীরা ধার্য হয়েছেন 'বাড়তি কর্মী' হিসাবে যাঁরা রাষ্ট্রায়ত্ত জল সংস্থাগুলির নিম্ন উৎপাদনশীলতার জন্য দায়ী।

বেসরকারিকরণের গঠনমূলক প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিম্নমানের কাজকর্মকে কারণ হিসাবে ধরে তার মহিমা প্রচার হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কাজ মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেখানকার কর্মীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে; কিন্তু সেই দায়িত্বজ্ঞান বেসরকারি মালিকানায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবেই এমন কোনো কথা নেই, বিপরীতে, অন্য রকম ঘটনাই ঘটছে। বেসরকারিকরণের সাফল্যের খতিয়ান নেই, কিন্তু ঝুঁকি এবং ব্যর্থতার হিসাব আছে। দুটি প্রাথমিক ঝুঁকি হল, বেসরকারি সংস্থায় পাওয়া পরিষেবা যে স্তরের চাওয়া হচ্ছে সেইস্তরের হয় না, উপরন্তু তার দামও হয় রাষ্ট্রায়ত্ত পরিষেবার থেকে অনেক বেশি।

ভালো উদাহরণ দেওয়া যাবে আর্জেন্টিনা থেকে দুটি সবচেয়ে বড় ফরাসি বেসরকারি সংস্থা, লিওনাইজ দ্য ইউ-দুমেজ এবং কমপ্যানি জেনেরাল দ্য ইউ, দুটি বৃহত্তম ব্রিটিশ বেসরকারি সংস্থা, টেম্‌স্ ওয়াটার এবং নর্থওয়েস্ট ওয়াটার এবং স্পেনের বৃহত্তম সংস্থা কেনাল ইসাবেল II, একত্রে একটি কনসর্টিয়াম তৈরি করেছে একটি বিশ্বব্যাঙ্ক পরিচালিত জলবেসরকারিকরণ প্রকল্পের পরিচালনভার পাওয়ার জন্য। বুয়েনেস্ আয়ারস্ এর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ওবরা স্যানিটারিয়াস দ্য লা নেশিওন এ (OSN) কর্মী সঙ্কোচন হয়েছে ৭৬০০ থেকে ৪০০০এ। ৩৬০০ কর্মীর কর্মচ্যুতি বিরাট সাফল্য হিসাবে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে জলের দাম প্রথম বছরের মধ্যেই ১৩.৫ শতাংশ বেড়েছে।

চিলিতে ফ্রেঞ্চ সংস্থা সুয়েজ লিওনাইজ দ্য ইউ ৩৫ শতাংশ লাভ চেয়েছে। ক্যাসাব্লাঙ্কার জলের দাম বেড়েছে ৩ গুণ, ব্রিটেনে জল এবং নিকাশীব্যবস্থার বিল ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯৪-৯৫ এর মধ্যে বেড়েছে ৬৭ শতাংশ। জল-যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার ঘটনা বেড়েছে ১৭৭ শতাংশ। নিউজিল্যান্ডে জলের বাণিজ্যিকরণের বিরুদ্ধে রাস্তায় বিক্ষোভ হয়েছে। জোহানেসবার্গে জল সরবরাহ ব্যবস্থা সুয়েজ লিওনাইজ দ্য ইউ অধিগ্রহণ করেছে। জল হয়ে গেছে আয়ত্তের বাইরে। হাজার হাজার লোক জলশূন্য হয়ে কলেরার কবলে পড়েছেন।

স্থানীয় অধিবাসীদের প্রচণ্ড বিরোধীতা সত্ত্বেও জলের বেসরকারিকরণ প্রচণ্ড গতিতে হয়ে চলেছে। ঋণজর্জর দেশগুলি জলকে রোজই বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও বিশ্ব অর্থ তহবিল জলের বেসরকারিকরণ ঋণপ্রদানের শর্ত হিসাবে রাখছে। একটি উদাহরণ,

২০০০ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন কর্তৃক বণ্টিত বিশ্ব অর্থ তহবিলের ৪০টি ঋণের মধ্যে ১২টিতে শর্ত হিসাবে জলের আংশিক বা পূর্ণ বেসরকারিকরণ রাখা হয়েছে, শুধু তাই নয় এই ধরনের প্রজেক্টে খরচ হওয়া সম্পূর্ণ টাকা যাতে উঠে আসে তার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। ঋণযোগ্য হতে গিয়ে, আফ্রিকান সরকারগুলি প্রতিনিয়ত জলের বেসরকারিকরণজনিত চাপের মুখে পড়ছে। ঘানায় বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিশ্ব অর্থ তহবিল কর্তৃক বলবৎ হওয়া নীতির কারণে জল বিক্রি হচ্ছে বাজারি হারে, দরিদ্রদের জল কেনার ব্যয় বেড়ে গেছে ৫০ শতাংশ।

জলের জন্য কর্পোরেট লোভের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হতে পারে বলিভিয়ার কোচাবাম্বার ঘটনা। এই প্রায় মরুভূমি অঞ্চলে জল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং তাই দামি। ১৯৯৯-এ বিশ্বব্যাঙ্ক কোচাবাম্বার পৌরজল সরবরাহ কোম্পানিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়, বেশটেলের সহযোগী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারকে এক ছাড় প্রদানের মাধ্যমে। ১৯৯৯ এর অক্টোবরে, পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর আইন বলবৎ হয়েছে যার ফলে ঐ ক্ষেত্রে সরকারি ভর্তুকি বন্ধ এবং বেসরকারিকরণ শুরু হয়েছে। কোচাবাম্বার ন্যূনতম মজুরি প্রতি মাসে ১০০ ডলারের কম, জলের বিল সেখানে প্রতি মাসে ২০ ডলারে পৌঁছেছে— যে ব্যয় পাঁচজনের একটি পরিবারের দু সপ্তাহের খোরাকি। জানুয়ারি ২০০০-এ, নাগরিকদের একটি সংগঠন তৈরি হয় যার নাম লা কো-অর্ডিনেশন দ্য একেনসা ডেল আগুয়ার দ্য লা ভিডা বা দ্য কোয়ালিশন ইন ডিফেন্স অফ ওয়াটার অ্যান্ড লাইফ। গণবিক্ষোভে সেই সংগঠন শহরের সব দোকানপাট ৪ দিন বন্ধ রাখে। এক মাসের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বলিভিয়াবাসী কোচাবাম্বায় মার্চ করে যান, সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয় সব যানবাহন চলাচল বন্ধ করে। জমায়েতে কোচাবাম্বা ডিক্লেয়ারেশন তৈরি হয়, বিশ্বজনীনভাবে জলের প্রতি অধিকারকে সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে। সরকার জলের দাম পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু পালন করেনা।

২০০০ এর ফেব্রুয়ারিতে লা কোঅরডিনেডোরা একটি অহিংস মিছিল করে। যার উদ্দেশ্য ছিল পানীয় জল এবং পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার উপর হওয়া ঐ আইন রদ করা, বেসরকারিকরণপন্থী অর্ডিনান্সগুলি রদ করা এবং জলচুক্তি বিলোপ এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ সমন্বিত একটি জলসম্পদ আইন প্রণয়ন করা। কর্পোরেট চাহিদা বিপন্নকারি নাগরিকদের এই দাবি রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। কো-অর্ডিনেডোরার নীতিসম্বলিত বইটি জলকে নাগরিক অধিকারের কোনো সম্পত্তি বলেই মনে করেনি। প্রতিবাদীরা 'জল ভগবানের দান, বাণিজ্যের জন্য নয়' এবং 'জলই জীবন' গোছের শ্লোগান ব্যবহার করেন।

এপ্রিল ২০০০-এ সরকার বাজারি আইন দিয়ে জলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দমানোর চেষ্টা করে। কিছু বিক্ষোভকারি মারা যান, অনেকে গ্রেফতার হন; মিডিয়ার কর্মস্বাধীনতা লুপ্ত হয়। পরিশেষে, ১০ই এপ্রিল জনসাধারণই জয়লাভ করেন। আগুয়াস ডেল তুনারি এবং বেশটেল বলিভিয়া পরিত্যাগ করে এবং সরকার বাধ্য হয় ঘৃণ্য জল আইন প্রত্যাহার করতে। জল কোম্পানি সার্ভিসিও মিউনিসিপ্যাল ডেল আগুয়া পোট্যাবল্ আলক্যানট্যারিলাডো (SEMAPA) এর সব ঋণ কর্মচারী এবং জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০০০ এর গ্রীষ্মে, লা কো অর্ডিনেডোরা গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সাধারণ শুনানির আয়োজন করে। সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক জল ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য আন্দোলন করেছেন, কিন্তু একনায়করা মানুষের এই প্রতিস্পর্ধার বিরুদ্ধে তাঁদের চেষ্টাও জারি রেখেছেন। বেশটেল বলিভিয়া সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। সেই সরকারও লা কো-অর্ডিনাডোরার আন্দোলনকারিদের সবরকমভাবে হেনস্থা করছে।

কর্পোরেশন এবং বাজারের হাত থেকে জল উদ্ধার করে, বলিভিয়ানরা প্রমাণ করেছেন

বেসরকারিকরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের কর্পোরেট হাতে যাওয়া কোনো অনিবার্য ঘটনা নয় এবং তাকে গণতান্ত্রিক শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা যায়।

জীববৈচিত্র্য এবং জিনগত সম্পদের উপর কর্পোরেট দখল

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ট্রিপ্‌স্‌ এগ্রিমেন্ট জীবনগত পেটেন্ট প্রথা সারা বিশ্বের দেশগুলির উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এই সূত্রে তৃতীয় বিশ্বের স্বচেষ্টার্জিত জ্ঞান এবং জীববৈচিত্র্য চোরাপথে বিদেশে চলে যাচ্ছে। নিম, বাসমতী, টারম্যারিক এই ঘটনার বিরুদ্ধে উদাহরণযোগ্য লড়াই করছে।

নিম বা এ্যাজাদিরাশটা ইন্ডিকা (ল্যাটিন নাম) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বহুকালধরে ভারতে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। ওষুধ তৈরিতে এবং কৃষিক্ষেত্রে নিমের বহুল ব্যবহার। ২০০০ বছর আগেই নিমকে ভারতীয় পুঁথিপত্রে বায়ুশোধনকারি এবং কীটনাশককারি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসায়নিক কীটনাশকে যেসব পোকা মরে না, এমন ২০০ রকমের পোকাও নিমে পর্যুদস্ত হয়। মাঝারি মাপের ল্যাবরেটরিতে বা ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদিত নিমের নানান বাণিজ্যিক সামগ্রী, কীটনাশক ওষুধ এবং প্রসাধনী, গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু, এইসব দ্রব্যের ফর্মুলাগত প্রোপ্রাইটারি স্বত্ব জোগাড় করার চেষ্টা হয়নি, কারণ ১৯৭০ এর ভারতীয় পেটেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী, কৃষিজাত দ্রব্য এবং ওষুধ পেটেন্টযোগ্য নয়।

১৯৮৫ তে নিমের কীটনাশকের একটি পেটেন্ট চালু হয় আমেরিকায়। তারপর থেকে প্রায় একশটি এরকম পেটেন্ট চালু হয়েছে। নিম তাই আজ আর স্বাধীন গাছ নয়, তার উপর আমেরিকান, জাপানি এবং জার্মান কোম্পানির প্রায় নব্বইটি পেটেন্টের দাবি আছে। এখন নিম পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক এবং কর্পোরেশনের সম্পত্তি, তবে এর মধ্যেও, ২০০টিরও বেশি সংস্থা ডব্লিউ. আর. গ্রেস (ইউ. এস. এ) এবং ইউরোপীয়ান পেটেন্ট অফিস অধিকৃত ২টি নিমের পেটেন্টের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে। ১০ই মে, ২০০০, জীববৈচিত্র্যগত চুরি রুখতে একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেদিন ইউরোপীয়ান পেটেন্ট অফিস, আমেরিকান সরকার এবং ডব্লিউ. আর. গ্রেসের যৌথ পেটেন্ট বাতিল করে দেয় জ্ঞানের চোরা পাচার এবং অভিনবত্বের অভাবের কারণে।

ভারতীয় উপমহাদেশ খুব ভাল মানের সুবাসিত বাসমতী চালের সর্ববৃহৎ উৎপাদক এবং রপ্তানিকারক। বছরে এখানে ৬ লাখ ৫০ হাজার টন বাসমতী উৎপাদিত হয়। ধান জমির ১০-১৫ শতাংশ এই চাল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাসমতী এবং অন্য চাল ৮০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হয়। অন্য চাল ১৯৯৬-৯৭ সালে ১.৯ মি. টন রপ্তানি হয়েছে যার মূল্য ১৮ বি. ($ 450 মি.) টাকা। বাসমতী রপ্তানি হয়েছে ৪,৮৮,৭০০ টন এবং মূল্য পাওয়া গিয়েছে ১১.২ বি. টাকা ($ 280 মি.)। বাৎসরিক বাসমতী রপ্তানি হয় ৪ লাখ থেকে ৫ লাখ টন। এই চাল যারা কেনে তারা হল মধ্যপ্রাচ্য (৬৫ শতাংশ), ইউরোপ (২০ শতাংশ) এবং ইউ. এস. এ (১০-১৫ শতাংশ)। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক ক্রীত চালের মধ্যে ভারতীয় বাসমতীরই দাম সর্বাধিক ($ 850 প্রতি টন), তার পরেই পাকিস্তানি বাসমতী ($ 700 প্র.ট.) এবং থাইল্যান্ডের বাসমতী ($ 500 প্র.ট.)। ১৯৯৬-৯৭ এ ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে এক লাখ টন বাসমতী রপ্তানি হয়েছে।

পুরানো পুঁথিপত্র, কবিতা, লোকগাথায় ভারতীয় বাসমতীর মহিমা বিদ্যমান। ভারতে ২৭ রকমের বাসমতী তৈরি হয়। হরিয়ানা এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, হিসার-এ রক্ষিত কবি বরিস্‌ শাহ্‌ এর রচনা 'হীর-রন্‌ঝা' (১৭৬৬) বাসমতীর সর্বপ্রাচীন উল্লেখ বহন করে। প্রাকৃতিকভাবেই সুগন্ধী এই চাল ভারতীয় অভিজাতরা সগর্বে রক্ষা করে এসেছেন বহু প্রাচীন

কাল থেকে এবং বিদেশীরা ঐ একই সময় ধরে এই অধিকারকে ঈর্ষা করে এসেছে। কৃষকেরা অনেকদিনের পরিশ্রমে ও অভিজ্ঞতায় বিচিত্র এই চাল উৎপাদন করে এসেছেন বিভিন্ন স্বাদ ও পরিবেশ বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে। ঘরোয়া উৎপাদন পদ্ধতি বাসমতীর উৎকর্ষের কারণ। ১৯৯৭ এর ২রা সেপ্টেম্বর, টেকসাসের বহুজাতিক কোম্পানি রাইসটেক বাসমতীর উপর পেটেন্ট পেয়ে যায়, যার নম্বর ৫৬৬৩৪৩৪।

বাসমতী 'উদ্ভাবনের' এই পেটেন্ট এর অর্থ ব্যাপক এবং এর মধ্যেই ২০টি দাবির অস্তিত্ব আছে। বাসমতীর জিনগত ধারাগুলি এবং তার বিভিন্ন বৈচিত্রের জিনগত বৈশিষ্ট্য যা একান্তভাবেই কৃষকদের অবদান, এই পেটেন্টের মধ্যে বর্তমান। যদি এই পেটেন্ট বলবৎ হয়, তবে কৃষকেরা রাইসটেকের অনুমতি ব্যতীত এবং ঐ সংস্থাকে রয়্যালটি না দিয়ে বাসমতীর চাষ করতে পারবেন না। রাইসটেক ইতিমধ্যেই বাসমতী, টেক্সমতী এবং যশমতী, এইসব ব্র্যান্ড নেম দিয়ে বাসমতী বিক্রি করা শুরু করেছে, রাইসটেক বাসমতীর যে ধারাটির পেটেন্ট পেয়েছে, সেটি ভারতের সাবেকী চালের মতোই লম্বা, নির্দিষ্ট সুগন্ধযুক্ত; ধানগাছটি হ্রস্ব এবং উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন। এই ধারাটি মোটেই রাইসটেকের নিজস্ব উদ্ভাবন নয় এবং তাই পেটেন্টযোগ্যও নয়। ২০০১ এর আগস্টে, ৪ বছরের আইনি যুদ্ধ এবং প্রচারের পর, ইউ. এস. পেটেন্ট অফিস রাইসটেকের বাসমতী পেটেন্টের ৯০ শতাংশ কেটে দিতে বাধ্য হয় কারণ ভারতীয় কৃষকেরা বহুশত বৎসর আগে থেকেই এই চালের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছেন।

পেটেন্ট আইন : জীবনের প্রতি অধিকার লঙ্ঘন

দরিদ্র ভারতবাসীর জীবনের প্রতি অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় তাঁদের জীবিকার প্রতি অধিকারের মাধ্যমে। ভারতীয় কৃষকের কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বীজ। তাঁরা এযাবৎ এই বীজ স্বাধীনভাবে পেয়েছেন। সংরক্ষণ এবং পরিচর্যার মাধ্যমে বীজ থেকে তৈরি করেছেন নানা উদ্ভিদ। বীজ, গাছ এবং যাবতীয় জীবন্ত বস্তু, তা প্রাকৃতিক হোক বা মানুষের অবদান, ১৯৭০ এর ইন্ডিয়ান পেটেন্ট ল'র আওতা থেকে মুক্ত ছিল।

বাণিজ্যিক প্রথায় বীজ সরবরাহ ইতিমধ্যেই কৃষকদের আত্মহত্যার মুখে ঠেলে দিয়েছে। পেটেন্ট করা বীজ তাঁদেরকে অস্তিত্বের সংকটে ঠেলে দেবে, কারণ পেটেন্ট প্রথার জন্য তাঁরা বীজ বিনিময় বা সংরক্ষণ, কিছুই করতে পারবেন না, আবার রয়্যালটিও দিতে হবে।

পেটেন্ট আইন সংশোধন : জীবনের উপর পেটেন্টের সম্ভাবনা তৈরি

১৯৯৯-এর প্রথম সংশোধন পেটেন্ট আইনে বীজ ও গাছের উপর পেটেন্টপ্রথা চালু করল। ইন্ডিয়ান পেটেন্ট আইন, ১৯৭০, এর 'ছাড়' পর্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, সেকশন ৩-এ এই সংশোধন করা হয়। এখন পেটেন্ট করা যাবে –

(১) সেইসব পদ্ধতির উপর যার উদ্দেশ্য গাছকে রোগশূন্য এবং উচ্চ অর্থনৈতিক মূল্যসম্পন্ন করা,

(২) অতিক্ষুদ্র জীবিত বস্তুর উপর যেমন বিভিন্ন বৈচিত্রের বীজ এবং প্রজাতি,

(৩) উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উপর, যারা জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে উৎপন্ন।

জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং উদ্ভিদের মধ্যে সেইসব জিন প্রবিষ্ট করাতে পারে যার মাধ্যমে

সেই উদ্ভিদ মারণ রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করবে। এই ধরনের কৃষি এখন সেকশন ৩ (১) এর মাধ্যমে পেটেন্টযোগ্য যদিও আগের সেকশন ৩ (এইচ) এ তা বেআইনি ছিল। কৃষিতে পেটেন্টের নিষেধ কৃষকদের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ছিল। তুলাচাষিরা অনেকেই আত্মহত্যা করেছেন। এই অবস্থা আরো খারাপ হবে যদি তাঁদের প্রয়োজনীয় চাযের সব বীজ এবং উদ্ভিদেই পেটেন্ট থাকে এবং তা উৎপাদনের জন্য তাঁদের রয়্যালটি দিতে হয়।

ট্রিপস্‌-এর পুনর্মূল্যায়নে ভারত সরকার জীবনের উপর পেটেন্ট বন্ধের জন্য দাবি করেছে, কিন্তু ঘরোয়াভাবে এই পেটেন্ট চালু রেখেছে। যে সব দেশ পুনর্মূল্যায়িত ট্রিপস্‌ চুক্তির জন্য লড়ছে তাদের অবস্থানও এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি সরকারের ট্রিপস্‌-এর বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন থাকে তবে পেটেন্ট আইন বদলের মাধ্যম কেন কৃষকদের যাবতীয় রক্ষাকবচ হরণ করা হচ্ছে!

অবিষ্কার এবং উদ্ভাবন ঃ জৈবনিক চুরি

৩ (সি) ধরায় বলা হয়েছে জীবিত বস্তু বা প্রাকৃতিকভাবে বর্তমান জড় বস্তুর অবিষ্কারের ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে সেই শর্তগুলি উল্লেখ করে বোঝাতে হবে যে ঐ অবিষ্কার উদ্ভাবন নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় যে বাসমতী, নিম এবং হলুদ মেক্সিকান বীনের ক্ষেত্রে জৈবনিক বস্তুর উপর পেটেন্ট এবং এই সংক্রান্ত চুরির ঘটনা ঘটেছে। টেক্সাসের রাইসটেক কোম্পানিকে ২০টি সুদূরপ্রসারিত সম্ভাবনাসম্পন্ন পেটেন্ট দেওয়া হয়। সেই পেটেন্টের নম্বর ছিল ৫৬৬৩৪৮৪। ভারত সরকার এই নির্লজ্জ চুরির কোনো প্রতিবাদ করেনি। রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ইকোলজি (RFSTE) একটি পি আই এল দাখিল করে সুপ্রিম কোর্টে এবং সরকারকে আর্জি জানায় ইউ এস পি টি ও'র মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা নিতে। সরকার ইউ এস পি টি ও তে যায়, কিন্তু বাসমতী সংক্রান্ত মোটে ৩টি ধারার বিরুদ্ধে মত জানায়। বাসমতী বীজ ও গাছ সংক্রান্ত পেটেন্ট অভিযোগের আওতার বাইরে থেকে যায়। সেই কারণে কৃষকদের অধিকার, তাঁদের বহুবছরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রতিষ্ঠা পায় না, যদিও সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং আই সি এ আর এটি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে যে বাসমতী বীজের পেটেন্ট সাবেকী বীজবৈশিষ্ট্যের উপরই করা হয়েছে। পরিশেষে, আর এফ এস টি ই এবং অন্যান্য সংস্থা রাইসটেকের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী এক প্রচারের মাধ্যমে ইউ. এস. পেটেন্ট অফিসকে বাধ্য করে বাসমতী পেটেন্টের ৯০% বাতিল করতে।

অবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের তফাৎ করলেই এই ধরনের পেটেন্ট বন্ধ করা যায়। পেটেন্ট অ্যাক্টে এই তফাৎটির পরিষ্কার উল্লেখের প্রয়োজন যাতে বাসমতী অনুরূপ ঘটনা আর না ঘটে। জীবিত বস্তুর উপর পেটেন্টের আর একটি কালো নজির ঘটেছে ইনোলা ইয়োলো বীনের ক্ষেত্রে, যেখানে সামান্য আবিষ্কারকে উদ্ভাবন বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ল্যারি প্রোক্টর বলে এক আমেরিকান এই বীন মেক্সিকোর বাজারে কেনে এবং তার পেটেন্টের জন্য আবেদন করে। ইউ এস পেটেন্ট নং ৫৮৯৪০৭৯ এর মাধ্যমে সে এখন এই বীন উৎপাদনকারী চাষিদের বিরুদ্ধে মামলা করছে।

প্রকৃতিকভাবে অবস্থানরত জীবিত বস্তু, তা কৃষকের অবদানেই হোক বা প্রকৃতির, এখন পেটেন্টযোগ্য উদ্ভাবন হিসাবে চালানো হচ্ছে। এই বিষয়ে পেটেন্ট আইনে পরিষ্কার নির্দেশ থাকা উচিৎ যে এইসব বস্তু নিছকই 'আবিষ্কার' এবং ধারা ৩ (সি)'র মাধ্যমে পেটেন্টের আওতার বাইরে থাকবে।

সেকশন ৩ (১) এ 'উদ্ভিদ' কথাটি নেই, যার মানে সংশোধিত পেটেন্ট আইনে উদ্ভিদ

পেটেন্টযোগ্য। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী; জীবনের প্রতি অধিকার এবং কৃষকের অস্তিত্ব এতে বিপন্ন হবে। বেসরকারি সংস্থা বীজের উপর মনোপলি প্রতিষ্ঠা করবে আর কৃষকেরা উচ্চ মূল্যে সেই বীজ কিনতে না পেরে অস্তিত্বের সংকটে পড়বেন। আর্টিকল্ ২৭.৩ (বি) 'র পুনর্মূল্যায়ন সংক্রান্ত আলোচনা পত্রে ভারত সরকার সব জীবিত বস্তুর উপর পেটেন্ট নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে। পরিবশগত বৈচিত্র এবং তার ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখতে এই পেটেন্ট বন্ধ হওয়া একান্ত জরুরি, অন্যথা বস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। পেটেন্টের মাধ্যমে জীববৈচিত্রে 'প্রপার্টি' বা সম্পত্তি তৈরি করে কর্পোরেশনগুলি 'লাইফ-লর্ড' বা জীবনের প্রভু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে, আগেকার দিনের জমিদারদের কায়দায়।

প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন যাবতীয় বীজের উপর প্রকৃতির দান এবং জৈববৈচিত্র থেকে তৈরি ওষুধ-বিযুধের উপর তারা এখন রয়্যালটি দাবি করবে। এইসব বীজ বা ওষুধ মানুষ এযাবৎ সহজ ও স্বাধীনভাবে পেয়ে এসেছে। পেটেন্টের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে আদায় করা এই রয়্যালটি প্রথা লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেবে।

ভাষান্তর ঃ ঈশিতা গোস্বামী এবং সৌমিত্র লাহিড়ী

বর্তমান নিবন্ধটির মূল শিরোনাম, 'Globalisation & Environment।' লেখাটি 'Research Foundation for Service, Technology and Ecology' (নতুন দিল্লী)-র সৌজন্যে পাওয়া।

পরিষেবা ও মহাজনী মূলধন

নীলোৎপল বসু
প্রদীপ বিশ্বাস
শান্তি ভট্টাচার্য

ভারতের মূলধনী বাজারের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

নীলোৎপল বসু

বিশ্বায়নের চরিত্র ও বিস্তারের উপর বহু মতপার্থক্য হয়েছে। তবে, কোনো বিরুদ্ধতার ভয় না রেখেই বলা যায় যে চার রকমের উপাদান আজকের বিশ্বায়নের জন্মদাতা; সেগুলি পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাযুক্তিক ঘটনাবলী হতে উদ্ভূত।

আশির দশকের শেষদিকে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের রাজনৈতিক সম্পর্কগুলি আমূল বদলে যায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ভাঙন হওয়ায় রাজনৈতিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এই সুযোগে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের প্রবল কর্তৃত্বমূলক নীতির সাহায্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময়কালীন তৈরি হওয়া রাজনৈতিক দ্বিমেরুকরণের পরিবর্তে আসে একমেরুকরণ। উন্নত দেশগুলি এই পরিস্থিতিকে ট্রানস্‌ন্যাশনাল কর্পোরেশনস্ (TNC)-এর স্বার্থ সুরক্ষা এবং বিস্তারের কাজে লাগাতে প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই আরও স্পষ্ট হয়েছে উপসাগরীয় যুদ্ধে এবং সদ্য সংঘটিত আমেরিকার নেতৃত্বে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধে। বিশ্বায়ন, তাই রাজনৈতিক ব্যাখ্যায়, আমেরিকা ও তার বন্ধুদের আরো বেশি আধিপত্যকেই নির্দিষ্ট করে।

সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক চিত্র সাপেক্ষে, ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসান আমেরিকার সামরিক শিল্পের পক্ষে কিছু ক্ষতি সূচিত করেছিল। সেইসঙ্গে, উন্নত দেশগুলিতে পণ্য ও পরিষেবা চাহিদার আপেক্ষিক সম্পৃক্তি, উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিতে টি এন সি'র বাজারের দ্রুত এবং ব্যাপকতর প্রসার দাবি করেছিল। উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ততদিনে উৎপাদন ও কৃষিক্ষেত্রেই আবদ্ধ হয়ে আছে। পাশাপাশি আবার অর্থনৈতিক পরিষেবার চাহিদাও বেড়ে গেছে দারুণভাবে। ফলত মুক্ত বাণিজ্যের দ্বারা উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলিকে বশে আনা হয়ে উঠেছে একমাত্র বিকল্প। এই প্রসার ঘটার জন্য দরকার হল অর্থনৈতিক প্রবাহ বৃদ্ধি, যাকে সম্পদের ঋণাত্মক হস্তান্তর বলা হয়। বিশ্বজুড়ে এহেন আর্থিক সংস্কার বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন ছিল, এককথায়, দরিদ্র জাতি-রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের অবলুপ্তি। বিশ্বায়ন মানে তাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিলোপ' সাধন।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার সাথে সাথে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ব্রেটন উডস্ ইনস্টিটিউশন্‌স — ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এবং ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড-এর তৈরি করা নিয়মকানুন ততদিনে এই নতুন অর্থনৈতিক আবশ্যকতাকে বাস্তবায়িত করার পক্ষে কমজোরি হয়ে পড়েছে। বিশ্বের বাজারগুলির একীভবনের মাধ্যমে বিশ্বায়নের দ্রুত প্রসারের

জন্য দরকার হল এক নতুন প্রতিষ্ঠানের, কারণ ফান্ড-ব্যাঙ্ক-এর প্রস্তাবিত স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এবং তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিগুলির স্থিতিকরণ (Stabilisation), যে পরিমাণ একীভবন প্রয়োজন ছিল, তা দিতে পারেনি। সারা বিশ্বের বাণিজ্যিক মঞ্চকেই কাজে লাগিয়ে তৈরি হল জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যান্ড টারিফ বা GATT। উরুগুয়ে রাউন্ডের পর বিশ্বায়নের গতি ও সুযোগ নতুন উদ্দীপনা পাবে এমন আশা করা হল। এই সমস্ত আশা ও ঘটনাবলীর পরিণতিতেই ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO)-এর জন্ম। গোটা বিশ্বের সরকার গঠন করলে তার যা ক্ষমতা হত, এই ডব্লিউ.টি.ও.-র ক্ষমতাও প্রায় তাই। স্বভাবতই বাণিজ্য-সম্পর্ক বহির্ভূত বিষয়গুলিতেও এই সংস্থার অস্তিত্ব অনুভূত হতে থাকল। জাতিরাষ্ট্রগুলির সব অর্থবহ কার্যাবলী ডব্লিউ. টি. ও. কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হলেও প্রভাবিত হতে থাকল, সেই প্রভাব সেই দেশগুলির পক্ষে যতই ক্ষতিকারক হোক।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শর্তাবলী ঠিকমতো তৈরি হলেও, বিশ্বায়ন আদৌ সম্ভবপর হত না যদি প্রযুক্তির সুবিধা উন্নত দেশগুলির সঙ্গে না থাকত। বিশেষ করে দুটি বিষয় এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, একটি হল অপটিক্যাল্ ফাইবার কেবলস্ এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার রূপান্তর এবং অন্যটি, তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ফোরণ।

বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচুর্যে পূর্ণ নাগরিক কেন্দ্রগুলি এবং দুঃস্থ অর্থনীতিসম্পন্ন দেশগুলির পশ্চাৎপ্রদেশের সহাবস্থান। এই সমীভবনে থাকবে না শান্তি, যা ঠাণ্ডাযুদ্ধ সমাপনে আসবে বলে মনে হয়েছিল; অর্থনৈতিক সমতা, যা সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে থাকা উচিৎ ছিল; এবং থাকবে না ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত জীবনের উন্নয়ন, যা বাস্তবায়িত করা সব দেশেরই মিলিত লক্ষ্য। বিশ্বায়ন এমনই এক ঐক্য যার ভিত্তি আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নেই, আছে অবিবেচক এক নীতিতে যা পিছিয়ে পড়া ব্যক্তি ও দেশগুলিকে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বাইরে ঠেলে দিয়ে উন্নত দেশগুলির সুবিধা নিশ্চিত করে।

(২)

বিশ্বায়ন জন্ম নেওয়ার কারণগুলি অনুসন্ধান করলে বোঝা মোটেই শক্ত নয় যে তা উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে সর্বনাশের সমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে, এই দেশগুলির শিল্প উন্নয়ন এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতাকে বিচার করতে হবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির মূলধনী বাজার এখন অনেক পরিবর্তনের সম্মুখীন। ভারতের মূলধনী বাজার-এর চরিত্র কিছু জটিল, কারণ ভারতের শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছিল বিশ্বজুড়ে বিউপনিবেশীকরণের আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে। বিউপনিবেশীকরণের প্রক্রিয়া আবার সূচিত হয় ফ্যাসিবাদের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের জয় ঘোষণায়, পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতিষ্ঠায় এবং কিছু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়লাভে, যেমন এই রকমের এক জনসংগ্রামের ভিতর দিয়েই পিপলস্ রিপাবলিক অফ চায়নার জন্ম হয়েছিল।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটিই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব এইসব নতুন স্বাধীন হওয়া দেশগুলিকে তাদের শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ দেয়। বিউপনিবেশীকরণের প্রক্রিয়াগুলিকে সংবদ্ধ করার জন্য শিল্পোন্নয়নের এই প্রচেষ্টাকে উন্নত দেশগুলির অসহযোগিতা পুরোপুরি ভাঙতে পারেনি। অতীতে, মৌলিক ও ভারি শিল্পগুলির উন্নতি, যা অর্থবহ শিল্পায়নের শর্ত, কোনোভাবেই ধনী ও উন্নত দেশগুলির সাহায্য পায়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন পাশে থাকার সুবাদে, স্বাধীন ও উপনিবেশমুক্ত দেশগুলি তাদের মূলধনী ও শিল্পের প্রয়োজনের জন্য কিছু মাত্রায় হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নির্ভর করা শুরু করল।

এই সময়ে ভারতে শিল্পোন্নয়ন হয় বেশির ভাগই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থায়। পরিকাঠামো ও মৌলিক শিল্পগুলি নির্মাণ করতে যে বিপুল মূলধন লাগে এবং এইসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে লাভ পাওয়া অব্দি যে লম্বা জেসটেশন (gestation) পিরিয়ড-এর সম্মুখীন হতে হয়, তার ঝুঁকি নেওয়া বেসরকারি সংস্থাগুলির পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রায়ত্ত পরিচালন ব্যবস্থায় মৌলিক শিল্পগুলির ভিত তৈরি হওয়ার পরই শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারি প্রবেশ সম্ভব হয়।

স্পষ্টতই, শিল্পায়নের ঐ সমস্ত প্রজেক্টগুলিকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল, যদিও ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান শুরুর দিকে তেমন ছিল না। ব্যাঙ্ক ছিল বেসরকারি হাতে। বীমা বেসরকারি হাতে থাকলেও খুব ভাল অবস্থায় ছিল না। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি এল.আই.সি. এবং জি.আই.সি. তৈরি হয়। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হয় অনেক পরে, সত্তর দশকের প্রথমে। শুধুমাত্র উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি, যেমন, আই.ডি.বি.আই. (IDBI), আই.এফ.সি.আই. (IFCI), আই.সি.আই.সি.আই. (ICICI) ইত্যাদি এসেছে আরও পরে।

বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং মূলধনের বাজার যদিও সেসময় খুব ভাল মতোই বর্তমান ছিল, তা তখনকার অর্থাৎ পঞ্চাশ, ষাট এবং সত্তরের দশকের শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে পারেনি। এল.আই.সি. এবং জি.আই.সি. তৈরি হওয়ার এবং ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রয়ত্তকরণের পরেই কেবল সামাজিক, পরিকাঠামোগত এবং ভারী শিল্পের ক্ষেত্রগুলিতে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়া যায়। একটি উন্নত মূলধনী বাজারের অনুপস্থিতির কারণে, ইকুইটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগেও একটি বিরাট সমস্যা ছিল।

১৯৬৩-তে ভারত সরকার ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া (UTI) তৈরি করল সাধারণ মানুষের সঞ্চয়কে বড়ভাবে কাজে লাগিয়ে মূলধনী বাজারে প্রবেশের লক্ষ্যে। ইউ এস ৬৪ প্রকল্প এই লক্ষ্যে বিশাল সাফল্য পায়। ভারত সরকারের প্রেক্ষাপট পিছনে থাকায় ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের ইকুইটি বাজারে প্রবেশ খুব একটা সমস্যা হয়নি। ইউ.টি.আই.-এর এহেন সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মূলধনী বাজার পরিণত অবস্থায় পৌঁছোলো। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি তাদের তহবিল ব্যবস্থাপক হিসাবে ইউ.টি.আই.-কে নির্বাচিত করল বিভিন্ন কারণে, যেমন, উত্তম লাভ, কর-সুবিধা এবং বিনিয়োগের নিরাপত্তা। নিরাপত্তা, লিকুইডিটি এবং উচ্চহারে ডিভিডেন্ড দেওয়ার কারণে ইউ এস ৬৪ ঐ মাপের সাফল্য পায়। দু'কোটিরও বেশি বিনিয়োগকারি, যার ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারি, আর ৩০০০০ কোটি টাকার আয়তন নিয়ে ইউ.টি.আই. এক প্রধান বাজারনির্মাণকারি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেল।

উন্নত দেশগুলির মত প্রাতিষ্ঠানিক অর্থভাণ্ডার ভারতীয় বাজারের বিশেষত্ব ছিল না। সরকারি সিকিউরিটি অথবা আর.বি.আই. বন্ডেই পেনশন ফান্ড এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর টাকা বিনিয়োগ হত। তাই, ব্যতিক্রমীভাবে খুচরা বিনিয়োগকারিরাই দেশের মূলধনী বাজারের ৭০ শতাংশ গঠন করে ফেললেন। বিশ্বায়নের আক্রমণের আগে অবধি অর্থাৎ নব্বই-এর দশক শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত এই ছিল মূলধনী বাজারের চিত্র। বিশ্বায়নের পর এই ছবিটি একদম পাল্টে গিয়েছে।

(৩)

বিশ্বায়ন কীভাবে ভারতের মূলধনী বাজারের উপর প্রভাব ফেলেছে দেখার আগে, তার কাজ ও চরিত্র অর্থনীতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে কী, সেটা বোঝা দরকার। সকলেই জানেন, নির্দিষ্ট চরিত্রের কোনো কোম্পানি বা প্রজেক্টের আর্থিক সংস্থান দু'ভাবে ঘটতে পারে, একটি ইকুইটির মাধ্যমে, অন্যটি ঋণের মাধ্যমে। এই আর্থিক ব্যবস্থা সারা পৃথিবী জুড়ে স্বীকৃত। ঋণ

ও ইকুইটির মিশ্রিত ব্যবস্থা বেশ কিছু বিষয়সাপেক্ষ ঘটনা, যেমন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রটির বৈশিষ্ট্য, তার আর্থিক লাভ করার এবং মূলধন গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি। ঋণ ও মিশ্রণযুক্ত প্রজেক্টের আর্থিক স্বাস্থ্য ভীষণভাবেই নির্ভর করে প্রজেক্টের নিয়োজিত অর্থ পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার ক্ষমতার উপর। যে-কোনো আর্থিকভাবে ভায়াবল্ (Viable) প্রজেক্টের এই বৈশিষ্ট্য থাকবে যে তা যেন উপার্জন বা লাভ দিয়ে ঋণজাত সুদের বোঝা মিটিয়ে ভালভাবে ডেট ট্র্যাপ (Debt trap) এড়িয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে, ইকুইটি স্তরও এমন হবে যাতে প্রজেক্টের মূল্য ন্যূনতম রাখা যায়। প্রোমোটারদের অংশ এবং পাবলিক পিক-আপ শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ নিয়ে ইকুইটির সংস্থান তৈরি হয়।

ইকুইটি অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে মূলধনী বাজারের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলধনী বাজারেরও দুটি হাত, একটি প্রাথমিক অন্যটি আনুষঙ্গিক। প্রাথমিক বাজারে প্রোমোটাররা অথবা কোম্পানিগুলি শেয়ার বিক্রি ও কেনার মধ্য দিয়ে প্রজেক্টের জন্য ইকুইটি অর্থসংস্থান তৈরি করে। কোনো প্রজেক্টের পাব্লিক ইস্যু বাজারে আসার আগে সেই প্রজেক্টের ক্ষমতা সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়। এই বিচারে আর্থিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে, যেমন, ঋণ নির্ধারণকারী এজেন্সিগুলি; ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি, যারা ইস্যুটিতে অর্থ সরবরাহ ছাড়াও তার দেখ্ভাল করছে; স্টক এক্সচেঞ্জগুলি, বিভিন্ন রেগুলেটর, আর.বি.আই. ইত্যাদি। বিনিয়োগকারিদের স্বার্থ দেখার জন্যই পরিশ্রমসাধ্য বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিশ্লেষণকারিদের শংসাপত্র বিনিয়োগকারিদের বেশ কিছুটা মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য দেয়। প্রোমোটার কোম্পানিগুলি এই বিশ্লেষণজাত ফলাফল তাদের অফার সমেত প্রসপেক্টাসে ছেপে হবু বিনিয়োগকারিদের কাছে পৌঁছে দেয়। এই স্বচ্ছতা বুদ্ধিদীপ্ত এবং সজ্ঞান বিনিয়োগে সাহায্য করে। বিশ্লেষণকারি এজেন্সিগুলির গাফিলতির কারণে যদি কোনো ইস্যু বাজে ফল করে, তবে সেই দায় সহজেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়। এই এজেন্সিগুলির দায়বদ্ধতাই বাজারকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেয়। প্রাথমিক বাজারে জনগণের সঞ্চয়ের মাধ্যমে ইকুইটি অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে এহেন দায়বদ্ধতা এক সদর্থক আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

আনুষঙ্গিক বাজারের সাপেক্ষেই প্রাথমিক বাজারকে কাজ করতে হয়। স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক তালিকাকৃত কোম্পানিগুলির শেয়ারবাণিজ্য সুনিশ্চিত করা আনুষঙ্গিক বাজারের কাজ; যদিও সব শেয়ারেই ব্যবসা হয় না — সেটা অনেকটা কোম্পানিগুলির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এক্সচেঞ্জ অথবা রেগুলেটর কর্তৃক নির্দিষ্ট করা নিয়ম ও সীমাগুলি মেনে চলার উপরেও শেয়ার ব্যবসা নির্ভর করে। আনুষঙ্গিক বাজারের উপযোগিতা অনুভূত হয় প্রোমোটার কোম্পানিগুলির শেয়ার হোল্ডারদেরকে যে-কোনো সময় বহির্গমন পথ দিতে পারার ক্ষমতায়। এক সুবিন্যস্ত আনুষঙ্গিক বাজার হল সেই স্বস্তিদায়ক স্থান যেখানে প্রাথমিক বাজারের ভাল ইস্যুগুলি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আনুষঙ্গিক বাজার যে-কোনো বিনিয়োগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লিকুইডিটি নিশ্চিত করে। জনগণের ধারণায় প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক বাজারের এই আবশ্যিক পারস্পরিকতা খুব একটা পরিষ্কার নয়, কারণ এক্সচেঞ্জগুলিতে শেয়ার ব্যবসার পরিমাণ ও মূল্যই মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

আনুষঙ্গিক বাজারে ফাটকা খেলা একটি স্বীকৃত বিষয়। সারা পৃথিবীর মূলধনী বাজারেই ওঠানামা আছে। কিন্তু খুব বেশি রকমের পরিবর্তনশীলতা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সন্দেহ ও শঙ্কা ছড়ায়। বিশেষ করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারিরা বাজারের এই চরিত্রের কারণে শেয়ার ব্যবসায় অংশ নিতে ভয় পান। বেআইনিভাবে সংগৃহীত অর্থ বাজারে আসার কারণেও শেয়ারের দাম ওঠানামা করতে পারে এবং এই ঘটনা বাজারের স্থিতিশীলতাকে কোনো

কোনো সময় একেবারে নষ্ট করে দেয়। যারা কৃত্রিমভাবে শেয়ারমূল্যের বদল ঘটায় তারা অভ্যন্তরীণ চিত্রটি ভালই জানে এবং কী ঘটতে চলেছে আঁচ করে যথাসময়ে নিজেদের সুরক্ষিত করে নেয়। কিন্তু, যাঁদের কাছে সেই খবর থাকে না, তাঁরা বাজারের ঐ আকস্মিক পতনে খুব বিশ্রীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। সাম্প্রতিক অতীতে কেতন পারেখের উদ্যোগে, শেয়ারবাজারে যে আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে, তা এই ধরনের প্রবণতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। পারেখ হর্ষদ মেহতার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে অতীতের কেলেঙ্কারিতেও কাজ করেছিল। '৯৮-৯৯-২০০০ সালে দুনিয়াব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলির শেয়ারের তেজী ভারকে কাজে লাগিয়ে, পারেখ ভারতীয় মূলধনী বাজারে কয়েকটি নির্দিষ্ট কোম্পানির শেয়ারের দাম তুলতে থাকে। পারেখের এই প্রয়াস সাধারণ ফাটকাবাজী ছিল না। ইউ.টি.আই.-সহ বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা, গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক-সহ কিছু ব্যাঙ্ক। বেশ কিছু প্রোমোটার কোম্পানি এবং সর্বোপরি মরিশাসে রেজিস্ট্রিকৃত আর্থিক সংস্থার মাধ্যমে লব্ধ বেশ কিছু টাকা, এই শেয়ারগুলির দামের ঊর্ধ্বগতিকে সুনিশ্চিত করার কাজে লাগায়। পরবর্তীতে ২০০০ সাল থেকে শেয়ার বাজারে মন্দা দেখা দেয়। এবং ২০০১ সালের বাজেটের পর এই দাম একেবারেই তলানিতে ঠেকে। বাজারে এই ধ্বস স্বভাবতই ইউ.টি.আই-সহ ছোট বিনিয়োগকারিদের সারা জীবনের কোটি কোটি টাকার সঞ্চয়কে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এইজন্যই স্টক এক্সচেঞ্জ এবং বাজারি রেগুলেটরগুলির খুব স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন কিছু নিয়মনীতি নির্ধারণ করে দেওয়া উচিৎ যাতে ব্রোকারদের বেআইনি কার্যকলাপ কোনোভাবেই না বিনিয়োগকারীদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি করতে পারে।

(৪) দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এবং জনসাধারণের অর্থসংগ্রহের যন্ত্র হিসাবে মূলধনী বাজারের অপরিসীম গুরুত্ব আছে। কাজেই, ভারতের মূলধনী বাজারে বিশ্বায়নের প্রভাব বুঝতে গেলে, বিশ্বায়নের অঙ্গ হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঘটানো সংস্কারের চরিত্র ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে হবে।

১৯৯১ থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বড় রকমের উদারীকরণের মাধ্যমে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়। গুরুত্বের বিচারে কর্মাশিয়াল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, উন্নয়নশীল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। বেসরকারি ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলি, তার মধ্যে আছে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি, ভারতের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ঢুকতে শুরু করে। ফলত এক অসম অবস্থা তৈরি হয়। যেহেতু বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি শুধুমাত্র কর্পোরেট চাহিদা এবং বড় শহর ও মেট্রোপলিটানগুলিতেই মনোনিবেশ করে, ব্যাঙ্কিং তত্ত্বের যে ধারণা এযাবৎ চালু ছিল যে ব্যাঙ্কিং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে দেশের পশ্চাদপর ক্ষেত্রগুলিতেও, বেশির ভাগই গ্রামীণ ও আধা শহরে, সামাজিক উন্নয়ন সাধিত করে, তা বিরাট ধাক্কা খায়, বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি, বিদেশী ব্যাঙ্কই বেশি, তাদের প্রযুক্তি চালিত পরিকাঠামো ও কম লোকবল নিয়ে উচ্চ গোত্রের মানুষদের চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; এই ঘটনা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বিপদে ফেলে দেয়। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর থেকে তাদের যা লক্ষ্য ছিল, অর্থাৎ গ্রাম ও আধা শহরগুলিতে বিস্তার লাভ করা, তা এই নতুন লাভকেন্দ্রিক ব্যবস্থাতে সমস্যায় পড়ে যায়। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ক্ষেত্রগুলি হতে, ডিপোজিট সংগ্রহ করার যে পূর্বতন লক্ষ্য ছিল তা নষ্ট হয়ে যেতে বসে।

ব্যাঙ্কিং লক্ষ্যের এই পুনর্মূল্যায়িত অবস্থায় নানা অসাধু ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পেতে থাকে। সরকারি সিকিওরিটিজ্ এবং শেয়ার বাজারকে জড়িয়ে প্রথম বড় স্ক্যাম-এর কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কিছু বিদেশী ব্যাঙ্ক এবং অনেক ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক হর্ষদ মেহতা কর্তৃক ঘটিত এই স্ক্যামে অভিযুক্ত হয়েছিল।

এই ঘটনাতে দমে না গিয়ে, সরকার বিশ্বায়নের ছাপ মারা আরো নানা প্রকল্প রূপা করতে শুরু করে। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস ও অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ডিপোজিটে, তাতে বি ডিপোজিট স্কিমও আছে, সুদের হার কমিয়ে দেওয়া হয়। বিনিয়োগের খরচ কমানোর জন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত এবং সর্বব্যাপী ভোগবাদের আবহাওয়া শেষমে সংস্কার সাধন করে তা এখনও দ্রষ্টব্য। জিডিপি-র শতাংশে গ্রস ডোমেস্টিক সেভিংস যেভা বদলাচ্ছে তা নিম্নোক্ত টেবলটিতে দেখানো হল —

বছর	জিডিপি (GDP)-র শতাংশে গ্রস ডোমেস্টিক সেভিংস
১৯৫০-৫১	০৮.৯
১৯৬০-৬১	১১.৬
১৯৭০-৭১	১৪.৬
১৯৮০-৮১	১৮.৯
১৯৯০-৯১	২৩.১
১৯৯১-৯২	২২.০
১৯৯২-৯৩	২১.৮
১৯৯৩-৯৪	২২.৫
১৯৯৪-৯৫	২৪.৮
১৯৯৫-৯৬	২৫.১
১৯৯৬-৯৭	২৩.২
১৯৯৭-৯৮	২৩.৫
১৯৯৮-৯৯	২২.০

উৎস ঃ ইকনমিক সার্ভে ২০০০-২০০১

বিশ্বায়নের জন্য প্রস্তাবিত শর্তাবলী গ্রস ডোমেস্টিক সেভিংস খানিকটা কমিয়ে না দিলে কিছুটা নিশ্চল করে দিয়েছে। গ্রস ফিক্সড্ ক্যাপিটাল গঠনেও ঠিক এইরকম একটি ধরন লক্ষ করা যাচ্ছে, সেটি ১৯৯০-৯১-এর ২২.৯ থেকে ১৯৯৯-২০০০-এ ২২.৩-এ নেমে এসেছে। বিশ্বায়নের নীতি নিয়েও ভারত পুরো ৯০-এর দশকে ১৬ বিলিয়ন ইউ.এস.ডলারের বেশি মূলধন আকৃষ্ট করতে পারেনি এবং স্বভাবতঃই শিল্পোন্নয়নের খাতেও বেশি মূলধন পাওয়া যায়নি। শিল্পোৎপাদনের সূচক ১৯৯৩-'৯৪ সালের পর থেকে আপেক্ষিক অর্থে যেভাবে নিশ্চল—

বছর	শিল্পোৎপাদনের সূচক (বেস ঃ '৯৩-'৯৪ = ১০০)
১৯৯৩-'৯৪	১০০
১৯৯৪-'৯৫	১০৯.১
১৯৯৫-'৯৬	১২৩.৩
১৯৯৬-'৯৭	১৩০.৮
১৯৯৭-'৯৮	১৩৯.৫
১৯৯৮-'৯৯	১৪৫.২

তাই, ডিপোজিটের উপর সুদ হ্রাস মারফৎ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণসংগ্রহের উপর ধারাবাহিকভাবে সুদের হার কমিয়ে, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা না সঞ্চয় বাড়াতে পেরেছে, না আশাব্যঞ্জক শিল্পোন্নয়ন করতে পেরেছে।

অন্যদিকে ক্রমশ বাড়তে থাকা সুবিধেসম্পন্ন ব্যবস্থাতেও টাকা ধার করে কর্পোরেশনগুলি সেই ঋণ শোধ করেনি বা পারেনি। উন্নয়নের খাতে সম্পদ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল আর্থিক সংস্থার ক্রমশ বাড়তে থাকা এন.পি.এ. (NPA)-র পরিমাণ। গত শতাব্দীর শেষে, এই সম্মিলিত এন.পি.এ.-র পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লাখ কোটি টাকা, আর এর বেশির ভাগই ফেরৎ না হওয়া কর্পোরেট ঋণ।

(৫) '৯০ দশকের আগে, আর্থিক সংস্কার শুরুর মুখে মূলধনী বাজার-এর আয়তন এমন কিছু ছিল না যাতে তা দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। নীচের টেবল্‌টি এই সত্যকেই স্পষ্টতা দিয়েছে —

স্টক এক্সচেঞ্জ এবং বাজারি মূলধনের প্রেক্ষাপটে তালিকাকৃত কোম্পানি

	এক্সচেঞ্জের সংখ্যা	তালিকাকৃত ফার্ম	বাজারি মূলধন (কোটি টাকায়)
১৯৪৬	৭	১১২৫	৯৭১
১৯৬১	৭	১২০৩	১২৯২
১৯৭১	৮	১৫৯৯	২৬৭৫
১৯৭৫	৮	১৮৫২	৩২৭৩
১৯৮০	৯	২২৬৫	৬৭৫০
১৯৮৫	১৪	৪৩৪৪	২৫৩০২
১৯৮৮	১৫	৫৮৪১	৫১৩৭৯
১৯৯০	১৯	৫৯৬৮	৭০৫২১

উৎস : 'দ্যা স্টক মার্কেট টুডে', ১৯৯১, বি.এস.ই.।

১৯৯২-৯৩ সাল থেকে, ১৯৯১-এর অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে, বাজারি মূলধনের চরিত্র উল্লেখযোগ্যভাবে বদলাতে থাকে—

	এক্সচেঞ্জের সংখ্যা	তালিকা ফার্ম	বাজারি মূলধন (কোটি টাকায়)	বার্ষিক টার্নওভার (কোটি টাকায়)	দৈনিক টার্নওভার (কোটি টাকায়)
১৯৯০-৯১*	১৯	৬২২৯	১১০২৭৯	৩৬০১২	১৮৯
১৯৯১-৯২*	২১	৬৪৮০	৩৫৪১০৬	৭১৭৭৭	৩৩২
১৯৯২-৯৩*	২২	৬৯২৫	২২৮৭৮০	৪৫৬৯৬	২৩৮

** দৈনিক এবং বার্ষিক টার্নওভার শুধু বি.এস.ই.'র সঙ্গে সম্পর্কিত।*

১৯৯৩-৯৪-এর আর্থিক বছর থেকে বিশ্বায়ন নাটকীয় চরিত্র নিতে থাকে। বিভিন্ন কারণ দায়ী ছিল এই পরিণতির জন্য।

সর্বপ্রথমে বলতে হয়, '৯২-এর হর্ষদ মেহতা ঘটিত স্ক্যাম, যেটায় রাষ্ট্রায়ত্ত এবং অরাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মীরাও জড়িত ছিলেন, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক-এর গুরুতর নিয়ন্ত্রণজনিত

গাফিলতিকে সবার সামনে আনে। আন্তর্জাতিক প্রথা মেনে বেঞ্চমার্ক তৈরি ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রেও গুরুতর ঘাটতি গোচর হয়। জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির (JPC) সুপারিশ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ তদন্তগুলি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় খানিকটা নিয়ন্ত্রণ আনে। ফলত কেতন পারেখ দ্বারা সংঘটিত স্ক্যাম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির উপর তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। যা কিছুই ঘটুক না কেন, তা কেবল আর্বান কো-অপ. ব্যাঙ্ক এবং নতুন তৈরি হওয়া বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিকেই প্রভাবিত করেছে।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে আগের চেয়ে বেশি অনুশাসন ও তত্ত্বাবধান, স্টক মার্কেট রেগুলেটর হিসাবে সিকিওরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া নির্মাণ; যার কাজ অর্থমন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল কন্ট্রোলার অফ ইস্যুজ (CCI) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, মূলধনী বাজারভিত্তিক ক্রিয়াকলাপকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেয়। একই সময়ে আরো স্বচ্ছতা লাভের লক্ষ্যে অনেক ব্যাপকভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। মুলধনী বাজারকে এইভাবে বিশ্বায়নের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে।

জেপিসি'র তদন্তে প্রকাশ পায় শেয়ার দালাল এবং বিভিন্ন স্টক এক্সচেঞ্জ আধিকারিকদের মধ্যে আঁতাত কীভাবে মূলধনী বাজারের চরিত্র হনন করেছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনৈতিক সংস্থা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত এবং স্টেট-অফ-দ্য-আর্ট এক্সচেঞ্জ তৈরি করার কথা বলেছে জেপিসি। স্যাটেলাইট যোগাযোগের মাধ্যমে চালিত নেটওয়ার্ক সমন্বিত ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ নির্মাণ-এর ঘটনা, ১৯৯৪-এ, যা ৪০০টি কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে একই সময়ে, মূলধনী বাজার প্রসারে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। এই সংস্থা খুব দ্রুততার সঙ্গে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে ব্যবসার পরিমাণের আসল চেহারা দেখিয়ে দেয়। নীচের টেবলটিতে দ্রুত ক্রমবর্ধমান বাজারের চিত্রটি বোঝা যাবে —

এক্সচেঞ্জ, ফার্ম, বাজারি মূলধন এবং টার্নওভার

	এক্সচেঞ্জের সংখ্যা	তালিকাকৃত ফার্ম (কোটি টাকায়)	বার্ষিক মূলধন (কোটি টাকায়)	বার্ষিক টার্নওভার (কোটি টাকায়)	দৈনিক টার্নওভার (কোটি টাকায়)
১৯৯৩-৯৪	২৩	৭৮১১	৪০০০৭৭	২০৩৭০৩	৮১৫
১৯৯৪-৯৫	২৩	৯০৭৭	৪৭৩৩৪৯	১৬২৯০৫	৬৫২
১৯৯৫-৯৬	২৩	৯১০০	৫৭২২৫৭	২২৭৩৬৮	৯০৯
১৯৯৬-৯৭	২৩	৯৮৯০	৪৮৮৩৩২	৬৪৬১১৬	২৫৮৪
১৯৯৭-৯৮	২৩	৯৮৩৩	৫৮৯৮১৬	৯০৮৬৮১	৩৬৩৫
১৯৯৮-৯৯	২৩	৯৮৭৭	৫৭৪০৬৪	১০২৩৩৮২	৪০৯৪
১৯৯৯-২০০০	২৩	৯৮৭১	১১৯২৬৩০	২০৬৭০৩১	৮২৬৮

দ্রষ্টব্য : ট্রেডিং ডে ২৫০ ধরে দৈনিক টার্নওভার হিসাব করা হয়েছে।

উৎস : আই এস এম আর, এন এস ই।

বর্তমান দৈনিক ব্যবসার পরিমাণ ৬২০০ কোটি টাকার মত হবে।

(৬)

মূলধনী বাজারের সাপেক্ষে বিশ্বায়নের নীতি ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টরস্ (FIIs)-এর ভারতে প্রবেশের উপর নিয়ন্ত্রণের বিলোপন বাস্তবায়িত করেছে। ১৯৯০-এর দশকের

শেষদিকে ভারতীয় বাজারে এফ আই আই-দের কার্যাবলীর ব্যাপকতা অনেক বেড়ে যায়। যদিও এখনও পর্যন্ত খুচরা বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয়ই ব্যবসার সিংহভাগ দখল করে রেখেছে, এফ.আই.আই.-রাই বাজারের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। কেনা অথবা বিক্রির ক্ষেত্রে তাদের হস্তক্ষেপ ঠিক করে দিচ্ছে ট্রেডিং ডে নেট বিক্রি না নেট ক্রয়, কীসে শেষ হবে। স্পষ্টতই এই ঘটনা বাজারের পরিবর্তনশীল চরিত্রকে আরো জোরদার করবে। মূলধনী বাজারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের যে শক্তি ছিল তা দিনদিন কমতে থাকবে, তাঁদের অর্থ শিল্পায়নের কাজে লাগানোও আর সম্ভব হবে না।

ভারতের মূলধনী বাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের আর একটি ক্ষতিকারক দিক হল, এটি মার্জারস অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন (M&A)-এর জন্য বিনিয়োগকে উৎসাহ দিচ্ছে। গ্রিন ফিল্ড প্রজেক্টগুলি তাদের গুরুত্ব হারাচ্ছে।

বাজারের উদ্বায়ী চরিত্র এফ.আই.আই.-রা আসার পরে আরো ঊর্ধ্বগামী হয়েছে; উপরন্তু সরকার বিশ্বায়নের সূত্র মেনেই ওভারসিজ কর্পোরেট বডিস (OCBs)-কে মূলধনী বাজারে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। মরিশাসে নিবন্ধীকৃত এই সমস্ত সংস্থাগুলি তুলনামূলক কর সুবিধা পেয়ে বহুল পরিমাণে বাজারে বিনিয়োগ করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মরিশাসের সঙ্গে ভারতের ডাবল ট্যাক্স এ্যাভয়ডান্স ট্রিটি সম্পন্ন হয়েছে, শুধু তাই নয়, সেখানে উদারীকরণের জন্য মরিশাস অফশোর বিজনেস অ্যাক্ট কার্যকরী হওয়ায় মরিশাসকে এখন কর সুবিধার স্বর্গ বলা যায়। ১৯৯৮ থেকে ২০০১-এর মধ্যে, ভারতে মরিশাস-কেন্দ্রিক ওসিবি'র সংখ্যা ১৫০ থেকে বেড়ে ৭০০ হয়েছে।

মার্চ-এপ্রিল ২০০১-এ ঘটা সর্বশেষ শেয়ার স্ক্যামে এইসব ওসিবি'র ভূমিকা স্পষ্ট হয়। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, সরকার যে কারণে এই সংস্থাগুলিকে এনেছিল যেমন এরা বাজারে বিদেশী অর্থ আরো বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করতে পারবে, তা না করে, উল্টে কিছু ওসিবি যা অর্থ এনেছিল তার দশগুণ অর্থ বাজার থেকে আত্মসাৎ করেছে। প্রোমোটার-দালাল আঁতাত ছাড়াও, ওসিবি-দের উপস্থিতিজনিত ক্ষতির স্বরূপ এই স্ক্যামে বোঝা গেছে।

স্ক্যাম ঘটার পিছনে সরকারের আরো দুটি বিশ্বায়নমুখী কাজ আছে। মরিশাসের সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া করচুক্তির সাপেক্ষে ওসিবি-রা কর ছাড়-এর দাবি করেছিল, ভারতের আয়কর বিভাগ এই দাবির উপরে একটি প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে দেয়। ভারতীয় মূলধনী বাজার যে বিবেকহীন খেলোয়াড়দের (প্লেয়ার্স) হাতে কতখানি অসহায় তা বোঝা যায় যখন করবিভাগের নোটিশ যাওয়ার পরেই সেনসেক্সকে পড়ে যেতে বাধ্য করা হয়। সরকার এই অশিষ্টতাকে 'বাগে' আনতে ওসিবি-দের উদ্দেশ্যে কারণ দর্শানোর বার্তা পাঠায়, কিন্তু তাতে করবিভাগের সিদ্ধান্তের আর কোনো গুরুত্বই রইল না।

ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট (FERA)-এর পরিবর্তে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (FEMA) আসায় এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ED)-এর ক্ষমতা অনেক খর্ব হয়ে যায়। এতেও ওসিবি-রা অনেক সুবিধা পেয়েছে। ইডি'র প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অভাব থাকায় এবং আর বি আই (RBI) ও সেবি (SEBI)-কে যথেষ্ট শক্তিশালী না করায় ওসিবি-রা যা করতে চাইছে তাই করতে পারছে। কার্যক্ষেত্রে, ওসিবি-দের সঙ্গে আসা আর্থিক মন্দার কারণ অনুসন্ধান করতে যাওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটি বিড়ালের ইঁদুর ধরার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এই সমস্ত ঘটনাই মূলধনী বাজারে ধ্বস-এর কারণ। লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারি টাকা হারিয়ে হয়ে গেলেন যার শিকার।

ইউ টি আই (UTI)-এর নীতিহীন ক্রিয়াকলাপও বহু একক বিনিয়োগকারীকে বাজার

থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ২ কোটিরও বেশি বিনিয়োগকারী ইউ এস ৬৪'র কারণে বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

(৭)

সাধারণভাবে আর্থিক ক্ষেত্র এবং বিশেষ করে মূলধনী বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটা অভিজ্ঞতার সূত্র ধরেই বিশ্বায়নের চরিত্র উপলব্ধি করতে হবে। মূলধনী বাজারে সঞ্চয়ের উপযোগিতার মাধ্যমে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া দ্রুত করার কাজ কেমন হয়েছে তার ভিত্তিতেই এই মূল্যায়ন সম্ভব।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, '৯০ দশকের বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া ঘরোয়া সঞ্চয়ের পরিমাণে যদি না কিছু মাত্রায় ক্ষয় ঘটিয়ে থাকে, কিছুটা বদ্ধ করে দিয়েছে। সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য নিরাপদ ক্ষুদ্র সঞ্চয় স্কিম থেকে সরিয়ে ইকুইটি বাজারে নিয়ে যাওয়ার, কিন্তু আর্থিক সংস্কারের দশ বছরে এই ক্ষেত্রের চিত্রটি বেশ করুণ। শুধু ইউ টি আই নয়, অন্যান্য মিউচুয়াল ফান্ডগুলির অবস্থাও মোটেই ভাল নয়। সংস্কারের বছরগুলিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা যেভাবে সারা জীবনের সঞ্চয় হারিয়েছেন শেয়ার বাজারে, সেরকমটা আগে কখনও ঘটেনি।

বাজারের বাহ্যিক আয়তন বৃদ্ধি পেলেও, নতুন শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সেই অর্থ কাজে লাগেনি। নীচের টেবল্-এর হিসাব দ্রষ্টব্য —

ইনিশিয়াল্ প্লাবিক অফার-এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ

বছর	সংখ্যা	কোটিতে টাকার পরিমাণ
১৯৯৭-৯৮	১৫	৯৬
১৯৯৮-৯৯	৪	১৩০
১৯৯৯-২০০০	৩	৫৩
২০০০-০১	৩৭	৩৯২
	১	৫

উৎস : ডব্লিউ ডব্লিউ মাইআইরিস.কম।

আনুষঙ্গিক বাজারের বিশাল আয়তনগত বৃদ্ধির সঙ্গে আইপিও (IPO)'র জন্যে সংগৃহীত অর্থের কোনো সংযোগ নেই।

সময় হয়েছে আত্মবিশ্লেষণের। বিশ্বায়নের নীতিগুলি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। যত প্রতিকূল পরিস্থিতিই হোক না কেন, জাতীয় প্রয়োজনে শিল্পায়নকে সাহায্য করতে মূলধনী বাজারের পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ। চিন্তা ও কাজের নবীকরণই আমাদের বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারে।

ভাষান্তর ঃ ঈশিতা গোস্বামী

বর্তমান সংকলনের জন্য ইংরেজিতে লিখিত নিবন্ধটির শিরোনাম 'Globalisation: Its Impact on Indian Capital Market'।

বিশ্বায়ন ও ব্যাঙ্কশিল্প

প্রদীপ বিশ্বাস

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তথাকথিত সংস্কারের ১১ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। কোন পথে এই 'সংস্কার' চলবে তার ফতোয়া আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক এবং পরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা জারি করে দিয়েছিল। বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী দ্বারা পরিচালিত বুর্জোয়া-ভূস্বামী শ্রেণীর সরকার বিশ্বস্ততার সঙ্গে দ্রুতবেগে ঐ রাস্তায় এগিয়ে চলেছে। প্রথম প্রজন্মের সংস্কারের পর এখন তারা দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কারের পথে হাঁটছে। ১৯৯৩ সালে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের অধীনস্থ অর্থনৈতিক বিষয়ক দপ্তর রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও আর্থিক ক্ষেত্রের উপর যে আলোচনা পত্র (discussion paper) তৈরি করেছিল সেখানে খোলাখুলিভাবে বলা হয়েছিল যে আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার নয়া অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ১৯৯১ সালে নয়া সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পাঁচ সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিং (যাঁর পিতৃত্বের কাছে ঋণী এই সংস্কারের ভূত, সেই ভূত থেকে তিনি এখন পালিয়ে বাঁচতে চাইছেন বলে খবরে প্রকাশ) একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। সেই কুখ্যাত নরসিংহম কমিটি। ব্যাঙ্ক সহ সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো, সংগঠন, কাজ ও পদ্ধতির সমস্ত কিছুর প্রাসঙ্গিক দিকগুলো এই কমিটির বিবেচনাধীন করা হলো।

তথাকথিত অর্থনৈতিক সংস্কারের গতির সঙ্গে তাল রেখে মাত্র ১০০ দিনের মধ্যেই শ্রীনরসিংহম উক্ত কমিটির পক্ষে প্রতিবেদন পেশ করলেন। অবশ্য বেচারা নরসিংহমের কীই বা করার ছিল। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। হুকুমদারের মর্জিমাফিক তৈরি হওয়া প্রতিবেদনের বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক না করেই সই করা ছাড়া।

আর্থিক ব্যবস্থার 'সংস্কার' সম্পর্কে নরসিংহম কমিটির সুপারিশের দিকে একটু তাকিয়ে দেখা যাক। এককথায় তা যেন প্রভুর কণ্ঠস্বরেরই প্রতিধ্বনি।

বিশ্বব্যাঙ্ক ঃ বাজেট ঘাটতি কমাতে হবে এবং CRR (Cash Reserve Ratio) ও SLR (Statutory Liquidity Ratio) কে কমিয়ে মোট ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে।

উন্নয়নের জন্য সরকারের টাকার প্রয়োজন হলে তা সংগ্রহ করতে হবে বাজার নির্ধারিত সুদের হারে। ঘাটতি মেটানোর জন্য টাকা ছাপা বন্ধ (Monetisation)। অর্থাৎ দেশের আর্থিক বিকাশের জন্য সরকারি উদ্যোগকে বন্ধ করে দেওয়া।

নরসিংহম কমিটি ঃ মোটের উপর সাধারণ অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের (Macro Economic

Stability) সঙ্গে মানানসই স্তরে আর্থিক ঘাটতিকে নামিয়ে আনার যে সরকারি সিদ্ধান্ত তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে SLR কে পাঁচ বছরের মধ্যে ধাপে ধাপে ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনা উচিত। এবং চলতি বছরেই তা অনেকটা কমিয়ে দেওয়া হোক। CRR কে (Cash Reserve Ratio) ক্রমশ বেশি বেশি করে কমিয়ে আনার সুপারিশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে দেওয়া হয়েছে কমিটির পক্ষ থেকে।

প্রসঙ্গত, CRR অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আভ্যন্তরীণ আমানতের যে অংশ জমা রাখতে হয় বর্তমানে তা কমিয়ে আনা হয়েছে ৫.৭৫ শতাংশে। ১৯৯২ সালে তা ছিল ১৫ শতাংশ (১ শতাংশ কমলে এখন ব্যাঙ্কগুলোর কাছে ১০ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত থাকে)। SLR কমিয়ে আনা হয়েছে ২৫ শতাংশে যা ১৯৯২ সালে ছিল ৩৮.২৫ শতাংশ।

বিশ্বব্যাঙ্ক ঃ ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে যারা বৃহৎ ঋণগ্রহীতা তাদেরকেই কেবলমাত্র ঋণ দিতে অনতিবিলম্বে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ দান নীতি নির্ধারিত করা হোক এবং এইভাবেই অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে দেয় ঋণের পরিমাণকে প্রথমে ২০ শতাংশে পরে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে।

প্রসঙ্গত, ব্যাঙ্কের মোট ঋণের ৪০ শতাংশ অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। এই সুপারিশ কার্যকরী হলে ছোট-মাঝারি শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্যোগী, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও গরিব-মাঝারি কৃষকেরা সুলভে ঋণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। প্রতিবাদ-আন্দোলন ও জনমতের চাপে সরকার এখনও ঐ পথে অগ্রসর হতে পারেনি। শিল্পে মন্দার জন্য ঋণ নেওয়ার গতিও খানিকটা শ্লথ — যা ব্যাঙ্কগুলোকে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে দাদন দিতে বাধ্য রেখেছে।

নরসিংহম কমিটি ঃ নির্দেশিত ঋণদান কর্মসূচী (Directed Credit Programme) ধাপে ধাপে উঠিয়ে দেওয়া হোক। অগ্রাধিকার ক্ষেত্রকে পুনর্সংজ্ঞায়িত করা হোক এবং এই ক্ষেত্রে মোট ঋণের ১০ শতাংশ স্থির করতে হবে।

বিশ্বব্যাঙ্ক ঃ উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দীর্ঘমেয়াদি ঋণের উপর দেয় সুদের হারকে আরও সুসংবদ্ধ, নমনীয় ও উদার করতে হবে। রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য ঋণের উপর দেয় সুদের হারের কাঠামোগত পরিবর্তন একইরকম ভাবে করা হোক। কৃষিক্ষেত্রে একইভাবে ঋণদান পর্যালোচনা কমিটির (Agricultural Credit Review Committee) সুপারিশ গ্রহণ করে সুবিধাজনক ঋণ দিতে হবে।

প্রসঙ্গত এই সুপারিশের ফলে একমাত্র উপকৃত হবে ধনী কৃষক ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পে অংশগ্রহণকারী বড় পুঁজিপতিরা।

নরসিংহম কমিটি ঃ নরসিংহম কমিটি মনে করছে বর্তমানে যে প্রশাসনিক নির্দেশ মারফত সুদের হার নির্ধারণের যে কাঠামো বলবৎ আছে তা অত্যন্ত জটিল ও অনমনীয়। কমিটির প্রস্তাব সুদের হারকে আরও বিনিয়ন্ত্রিত করা হোক যাতে বাজারে বিকাশমান লক্ষণগুলির প্রতিফলন এতে ঘটে। সুবিধাজনক সুদের হারকে ধাপে ধাপে তুলে দিতে হবে।

বিশ্বব্যাঙ্ক ঃ বেসরকারিক্ষেত্রে প্রবেশ ও প্রসারকে আরও সহজতর করে প্রতিযোগিতাকে বাড়াতে হবে।

নরসিংহম কমিটি ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও বেসরকারি ব্যাঙ্কের মধ্যে কোন পার্থক্য করা চলবে না, একই দৃষ্টিতে দেখতে হবে, বেসরকারি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন বাধা রাখা চলবে না।

বিশ্বব্যাঙ্ক ঃ উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক ও কাজকর্ম সংক্রান্ত

স্বায়ত্তশাসনের অনুমতি দিতে হবে। প্রুডেনশিয়াল রীতিনীতি ও তদারকি ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

নরসিংহম কমিটি ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বায়ত্তশাসনের জন্য একটি ব্যবস্থা নির্ধারণ করা জরুরি যাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ থেকে অব্যাহতি পায়।

বিশ্বব্যাঙ্ক ঃ মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসাবে বাজার নির্ধারিত মুখ্য হারের (Prime rate) ভিত্তিতে পরিবর্তনশীল সুদের হার চালু করতে হবে।

নরসিংহম কমিটি ঃ মধ্যবর্তীকালীন উদ্দেশ্য হিসাবে বাজার নির্ধারিত সুদের হারের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

বিশ্বব্যাঙ্ক ঃ আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের পর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো আন্তর্জাতিক মানের দিকে তাকিয়ে পুঁজি আরও বাড়াতে হবে এবং তা সম্ভব করতে হবে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে।

নরসিংহম কমিটি ঃ ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কগুলির পুঁজির অনুপাত সাধারণভাবে খুব কম এবং কিছু কিছু ব্যাঙ্কের তো পুঁজি ন্যূনতম যা থাকা উচিত তার চেয়েও কম। আন্তর্জাতিক (বোসেলে গৃহীত মানদণ্ড) মান পুঁজির পর্যাপ্ততা পরিমাপ করে দেখতে চায় অর্থাৎ ঝুঁকি পূর্ণ সম্পদের অনুপাতে পুঁজির পরিমাণটা কত। ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কগুলোরও ধাপে ধাপে এই মানে ওঠা প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাঙ্ক ঃ রাষ্ট্র ও রাজ্যভিত্তিক বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মিলিত উদ্যোগে ঋণদানের বর্তমান ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে ; যাতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি নিজেরাই মেয়াদি ঋণ দিতে পারে।

নরসিংহম কমিটি ঃ যৌথ ব্যবস্থার মাধ্যমে (Consortium) ঋণদানের ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। এর বদলে ব্যাঙ্কগুলিকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঋণদানের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বব্যাঙ্ক ঃ ১৯৮০-এর দশকে প্রভূত অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও পুঁজির বাজারে কতকগুলো সমস্যা লক্ষ করা গেছে। সরকার শেয়ারের মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ করার কথা বিবেচনা করতে পারে। একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী সংস্থা হিসাবে Stock Exchange Board of India তৈরি করার জন্য আইন পাশ করা হয়েছে। SEBI Primary, Secondary বাজারে অধিকতর শক্তিশালী মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করবে যাতে তথ্যের আদান প্রদান আরও ভাল হবে, এতে বাজারে অংশগ্রহণকারীদের নৈতিকতা ও আর্থিক সক্ষমতা বজায় থাকবে।

নরসিংহম কমিটি ঃ পুঁজির বাজারকে দ্রুত বেগে ও যথেষ্ট মাত্রায় উদারীকরণ করতে হবে। আমরা সুপারিশ করছি যে SEBI এমনভাবে তার নির্দেশিকা রচনা করুক যার মধ্য দিয়ে বিনিয়োগকারীর স্বার্থকে রক্ষা করা যায়। SEBI বাজারের নিয়ন্ত্রক হিসেবেই বেশি কাজ করবে এবং বাজার নির্ধারিত নীতির ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করবে।

কাজেই, যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এখানে লক্ষ্যণীয় তা হলো নরসিংহম কমিটি বিশ্বব্যাঙ্কের সুপারিশ অনুযায়ী আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কারের কথা চিন্তা করেছিল। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক সংস্থাগুলির উদ্ভূত সমস্যা ও প্রয়োজনীয় সংস্কারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নরসিংহম কমিটি বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তথা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির চাহিদা পূরণ করার জন্যই এগিয়ে এল। ভারত সরকারকে প্রদত্ত ঋণের উপর চাপানো শর্তগুলি পূরণ করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। শর্তগুলির মূল কথা হলো, উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন মানে হচ্ছে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বা আন্তর্জাতিক পুঁজির জন্য দেশের বাজারকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেওয়ার নীতি।

নরসিংহম কমিটির সুপারিশের উদ্দেশ্য ছিল উক্ত তিনটি লক্ষকে নিঃশর্তভাবে পূরণ করা।

ব্যাঙ্ক-সহ আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কারের জন্য নরসিংহম কমিটির সুপারিশ দুভাবে বিভক্ত। (১) প্রথম প্রজন্ম ও (২) দ্বিতীয় প্রজন্ম। এগুলোর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের কাছে সুপরিচিত। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুধাবন করতে পারলেই আমরা গত দশবছরেরও বেশি সময়কালে চালু সংস্কারের প্রভাব স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতে পারব। এই সংস্কারের উপর চর্চা করার আগে এই সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় চর্চা করা অধিকতর সদর্থক। পূর্বোক্ত আলোচনা পত্র (discussion paper) থেকে একটি অংশ তুলে দেওয়াই এক্ষেত্রে যথার্থ হবে। 'জাতীয়করণের লক্ষ্য ছিল দেশের সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজের সমস্ত অংশের কাছে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক কাজকর্মের পরিধিকে বিস্তৃত করা। সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আরও বিস্তারই ছিল এর লক্ষ্য। এতে কোন সন্দেহ নেই যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পেরেছিল। এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক প্রভাব-বিস্তারকারী জাল (Network) রচনা করেছিল। বিস্তৃত ব্যাঙ্কিং কাঠামো বিপুল আর্থিক পরিষেবা ও আর্থিক কাজকর্মের ব্যাপক মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পেরেছিল। আর্থিক উন্নয়নের অধিকাংশ সূচকই তাৎপর্যপূর্ণ প্রগতির পরিচায়ক। জাতীয়করণের সময়, ব্যাঙ্কের শাখা ছিল ৮,৩২১ যার ২৩ শতাংশ ছিল গ্রামীণ শাখা। বর্তমানে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কসহ মোট শাখা সংখ্যা ৬৫ হাজারের মত যার ৫৩ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে। আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখাসহ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মোট শাখার (অফিস) ৯৩ শতাংশ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মোট আমানতের (Deposit) ৮৭ শতাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অধীনে। ১৯৬৯ সালে জাতীয়করণের সময় ব্যাঙ্কের আমানত মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১৩ শতাংশ ছিল। ১৯৯৩ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় ৩৭ শতাংশ। জাতীয়করণের সময় প্রতি ৬৫ হাজার জনসংখ্যা-প্রতি ছিল একটিমাত্র ব্যাঙ্কের শাখা, এখন ১১ হাজার জনসংখ্যা প্রতি একটি ব্যাঙ্কের শাখা। জনসমষ্টির সঞ্চয়কের এক বড় অংশকে আমানতকারী হিসাবে সমবেত করা ও সারা দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ব্যবহার পরিষেবায় যুক্ত হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে এই পরিমাণগত প্রসার খুব সাহায্য করেছে। এ ছাড়াও, সারা দেশে শিল্পোদ্যোগের ভিত্তি প্রসারে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে। যদিও কৃষিক্ষেত্রে-উন্নয়নের প্রশ্নে কোন মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু এটা সর্বজনবিদিত যে কৃষির অগ্রগতিতে বা সবুজ বিপ্লব সফল করতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অবদান অনন্য। এই সাফল্যের বিপ্রতীপে 'সংস্কার' চালু করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে 'সংস্কার'-এর কর্মসূচী দেখে মনে হবে যে সামগ্রিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় আর্থিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানোই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। আসলে মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স পুঁজির স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর দেশী-বিদেশী রাঘব বোয়াল ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর হস্তান্তর করা। ভারতীয় আর্থিক বাজারকে আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির ফাটকা বাজারে পরিণত করা।

এই পরিস্থিতিতে যখন সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের চেয়েও কঠোর একগুচ্ছ প্রুডেনশিয়াল রীতি নীতি চালু করা হলো, তখন স্বার্থান্বেষী মহল আশা করেছিল যে অধিকাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কই এই মানদণ্ডে পৌঁছতে পারবে না। যদি পৌঁছতে না পারে তাহলে ঐ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোতে অতি সহজেই 'দুর্বল' এই তকমাটা লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে এবং এই সুযোগে জনমানসে সুড়সুড়ি দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ার বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া বা সরাসরি বিক্রির ক্ষেত্র তৈরি করা যাবে। যাই হোক, তাদের আশা হতাশায় পর্যবসিত হয়।

জনগণের অগাধ আস্থা ও কর্মচারীদের সমর্থনে একটি মাত্র ব্যাঙ্ক ছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ২৭টি

ব্যাঙ্কই 'সংস্কার' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জকে সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে। এমন কি যে যে তথাকথিত দুর্বল ব্যাঙ্কগুলির মৃত্যুর শোকগাথা রচনা করা হয়ে গিয়েছিল। সেই সেই ব্যাঙ্কগুলোও প্রুডেনশিয়াল রীতিনীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক সূচক অর্জন করতে সক্ষম হয়। আজকে আর তথাকথিত দুর্বল ব্যাঙ্ক নিয়ে হৈ-চৈ শোনা যায় না।

১৯৯৮ সালের ১৬-১৮ ডিসেম্বর ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদদের সম্মেলনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ডঃ বিমল জালান তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে উল্লেখ করেন '... বিগত কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাঙ্ক শিল্পের সাফল্যের মূল সূচকগুলিব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে যেমন সিডিউল্ড রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নীট মুনাফা মোট সম্পদের শতাংশের হারে যা ছিল ঋণাত্মক ১ শতাংশ (-১%) তা ১৯৯২-৯৩, ১৯৯৩-৯৪-তেই গড়ে .৫ শতাংশে চলে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে অধিকাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কেই কর্মচারী প্রতি ব্যবসা ও কর্মচারী প্রতি লাভে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য কয়েকটি সূচকও বেশ ভাল জায়গায়। ১৯৯৭ সালের মধ্যে প্রায় সবগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কই পুঁজির পর্যাপ্ততা বিধির (Capital Adequency) ন্যূনতম ৮ শতাংশ অর্জন করতে পেরেছে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাই মোট অকার্যকরী সম্পদ (Gross NPA) ও নীট অকার্যকরী সম্পদ (Net NPA) দেয় অগ্রিমের শতাংশের হিসেবে যথাক্রমে ১৬ শতাংশে ও ৮.২ শতাংশে নেমে এসেছে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই।" আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার চালু করার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিনিয়ন্ত্রিত বাতাবরণে ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত অনুশাসনের মধ্যে কাজ করে এসেছে। সেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ছিল প্রধান। লাভজনকতা (Profitability) একমাত্র মানদণ্ড রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ছিল না কারণ সামাজিক দায়বদ্ধতা ছিল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মূল নির্দেশক নীতি। সুতরাং ১৯৬৯ সালের জাতীয়করণের পর থেকে ১৯৯০-এর প্রথমভাগ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের কর্ম বিস্তৃতির মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক ব্যাঙ্কিং। তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জোর দেওয়া হয়েছিল :

(১) গ্রামীণ ও আধা শহর অঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তার।

(২) আর্থিক ঘাটতি মেটানো এবং কোন কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের উন্নয়নের কাজকে সহজতর করা SLR এবং উচ্চ ও ক্রমবর্ধমান হারে যার প্রতিফলন ঘটত এবং নির্দেশিত ঋণ দেওয়া।

(৩) অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে সস্তায় ঋণ দেওয়া, যার মধ্যে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প আছে।

(৪) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বিভিন্নবকম দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী রূপায়ণে অর্থ যোগান দেওয়া।

'সংস্কারে'র রাজত্বকালে দক্ষতা ও লাভজনকতা বিনিয়ন্ত্রিত ও উদার আর্থিক বাজারে একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হয় ; সেখানে মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতা ও মুনাফাই শেষ কথা।

উপরিউক্ত পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যাঙ্কশিল্পে আর্থিক সংস্কারের প্রভাব ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা দরকার। আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য সাধারণভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায় —

(১) বিদেশী ব্যাঙ্ক-সহ নূতন নূতন বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলোকে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে অসম প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তোলা।

(২) প্রুডেনশিয়াল রীতি নীতি চালু করে ব্যাঙ্কগুলির তথাকথিত আর্থিক স্বাস্থ্য উন্নতি ঘটানোর জন্য বিধি ব্যবস্থা।

(৩) সুদের হার বিনিয়ন্ত্রণ, SLR-কমানো, ফাটকা বাজিতে শেয়ার বাজারে অর্থ বিনিয়োগ ইত্যাদির অধিকার দিয়ে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান।

(৪) মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তনে বিধি ব্যবস্থা। অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণ।

এই লক্ষ্যে যে যে পরিবর্তন করা হয়েছে তা হল :

৯ টি নূতন ব্যাঙ্ক বেসরকারি ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বন্দরগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সময়ে ৫টি বেসরকারি লোকাল এরিয়া ব্যাঙ্ক কাজ করতে শুরু করেছে। বিদেশী ব্যাঙ্ক যা ১৯৯৫-৯৬ সালে ছিল ৩৩ টি তা ১৯৯৯-২০০০ সালে ৪৫ এ দাঁড়ায়।

এশীয় সংকটের পরিণতিতে পুঁজির খাতে সম্পূর্ণ রূপান্তরযোগ্যতা (কোন বিধি নিষেধ ছাড়া মুদ্রা চলাচলের বিধি ব্যবস্থা) প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া (তারাপোরে কমিটির সুপারিশ) ব্যাহত হওয়ায় বিদেশী ব্যাঙ্ক খোলার উদ্যোগ স্তিমিত হয়ে পড়ে। ব্যক্তি মালিকানাধীন নূতন ব্যাঙ্কগুলির বেআইনি কার্যকলাপ ও আর্থিক দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়ার ঘটনার পর (Global trust Bank / UTI) এই ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উৎসাহ কমে আসে। অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করে। এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাঙ্ক খোলার জন্য প্রাথমিক আদায়ীকৃত মূলধনের (Paid-up Capital) সীমা ১০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ কোটি টাকা করেছে যা তিন বছরে ৩০০ কোটি টাকায় নিয়ে যেতে হবে। বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীকে কোন ব্যাঙ্ক খুলতে দেওয়া হবে না। পৃথকভাবে শিল্পসংস্থাগুলি প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের শতকরা ১০ ভাগ ইকুইটির অংশীদার হতে পারবে কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঐ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারবে না। ব্যাঙ্ক মালিকরা তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নিতে পারবে না।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মালিকানা পরিবর্তন অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানায় রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে শতকরা ৫১ ভাগ সরকারের আয়ত্তাধীন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থাৎ ৪৯ শতাংশের অংশীদার হতে পারবে দেশী, বিদেশী ব্যক্তি বা আর্থিক সংস্থাগুলি। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে সরকারের ইকুইটির অংশ শতকরা ৩৩ ভাগ কমিয়ে আনার জন্য সংসদে বিল পেশ করেছে। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের তীব্র আন্দোলন ও বিরোধীদলের বিরোধিতার ফলে বিলটি বর্তমানে সংসদীয় আর্থিক কমিটির বিবেচনাধীন আছে। এই বিল পাশ হলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি বেসরকারীকরণ সম্পন্ন হবে। ইতিমধ্যে অন্ধ্র ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক, দেনা ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স, স্টেট ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ বিকানীর এন্ড জয়পুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ত্রিভাঙ্কুর, সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক, বিজয়া ব্যাঙ্ক বাজারে শেয়ার বিক্রয় করেছে। শেয়ার বাজারে হাল নিম্নমুখী থাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রির প্রক্রিয়া থমকে আছে। ইকুইটিতে বিদেশী আর্থিক সংস্থার অংশগ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতেও বিদেশী সংস্থার পক্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশ শেয়ার কিনে নেওয়ার পথে কোন বাধা নেই। ইতিমধ্যে স্টেট ব্যাঙ্কের বিক্রীত শেয়ারের ২৬ শতাংশ বিদেশী মালিকানাধীন হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কক্ষেত্র ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাঙ্কক্ষেত্রের মধ্যে যুক্ত মালিকানাধীন ব্যাঙ্কের আবির্ভাব ঘটেছে। বলা বাহুল্য — যা হচ্ছে পূর্ণ ব্যক্তিমালিকানাধীন করার একটি চতুর মধ্যবর্তী ধাপ।

তথাকথিত 'সংস্কার' (reforms) প্রক্রিয়া চালু হবার পর যে সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল সরকারের আর্থিক ঘাটতিতে অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের সম্পদের বিপুল অংশ আগে থেকেই স্থিরিকৃত করে রাখা ও সুদের হার নির্ধারণ করা— এই উভয় নিয়ন্ত্রণই শিথিল করা হয়েছে। C.R.R এবং SLR বাবদ ব্যাঙ্কের সঞ্চিত

সম্পদের ৬৩.৫ শতাংশ সরকারি আর্থিক ঘাটতির জন্য নির্ধারিত ছিল ১৯৯০ সালের পর তা হ্রাস করে ৩৫ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে — অর্থাৎ সুদের হার এখন নিয়ন্ত্রিত নয়। মেয়াদি আমানতের (T.D.) উপর সুদের হার এখন ব্যাঙ্কগুলিই ঠিক করছে। ব্যাঙ্কঋণ এর উপর সুদের হার ঠিক করার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাত থেকে নিয়ে ব্যাঙ্কগুলির হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২ লাখ টাকা পর্যন্ত সুদের হার ঠিক করবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সরকারি আর্থিক ঘাটতি প্রয়োজনে ব্যাঙ্কের সম্পদ ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে সরকারকে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে বেশি মূল্যে। ক্রমশ বন্ধ হচ্ছে অর্থনৈতিক বিকাশের গতি। বিকাশের স্বার্থে ব্যাঙ্ক সম্পদ অর্থাৎ জনগণের সঞ্চিত অর্থের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়াই এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে সরকারি ঘাটতি কমানোই হলো বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অন্যতম শর্ত। এর অর্থ অর্থনৈতিক বিকাশ ও জনগণের স্বার্থে বিশেষ করে গরিব মানুষের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনুদান দেওয়ার নীতি ক্রমশ বাতিল করে দেওয়া। উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সরকারি ক্ষেত্রে আর্থিক ঘাটতির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কী ফল হতে পারে— তার সাম্প্রতিক উদাহরণ আর্জেন্টিনা আর বর্তমানে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতির শ্লথ হয়ে আসা। বাজারে চাহিদার হার ক্রমাগত কমছে এবং এটা কমতেই থাকবে। এর অন্যতম কারণ কর্মসংস্থান ভয়ংকর ভাবে কমে যাওয়া ও ব্যাপক কর্মচ্যুতি ও তথাকথিত স্বেচ্ছা অবসর যা প্রকৃতপক্ষে বাধ্যতামূলক অবসরের নামান্তর। অবশ্য কর্মসংস্থানহীন তথাকথিত অগ্রগতির এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশেষত কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে একই চিত্র। ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি।

স্বাভাবিকভাবেই শিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধির হার— ৫.৯ শতাংশ (এপ্রিল-অক্টোবর ২০০০) কমে বর্তমানে ২.২ শতাংশ দাঁড়িয়েছে (এপ্রিল-অক্টোবর, ২০০১)। মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হার বর্তমানে ৫.৩ শতাংশ— যার গতি নিম্নগামী। অর্থনীতি মন্দা-আক্রান্ত। এই অবস্থায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া ক্রমশঃ কমছে। যদিও ব্যাঙ্ক ঋণ ও CRR (Cash resreve ratio) ক্রমাগত কমে যাওয়ার ফলে ব্যাঙ্কগুলির হাতে পর্বত প্রমাণ টাকা। কিন্তু তা লগ্নী করার জায়গা নেই; উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কে টাকা নেবে? যখন বর্তমানে উৎপাদিত বস্তু বিক্রয় করা যাচ্ছে না?

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ইত্যাদি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে সুলভে ঋণ দেওয়া। এই প্রেক্ষিতে সুদের হার বিনিয়ন্ত্রিত করার জন্য এই সুলভ ঋণদাননীতি অর্থহীন হয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের প্রসার, ক্ষুদ্রশিল্পের পুঁজির সীমারেখা উর্ধ্বমুখীকরণ, কৃষিক্ষেত্রে— 'সংস্কার' উদারীকরণের অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে এইসব ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজি ও বহুজাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটছে। সুলভ ঋণ না পাওয়ার ফলে ও অন্যান্য কারণে কৃষকরা ও ক্ষুদ্র শিল্পের বর্তমান মালিকরা অসম প্রতিযোগিতায় হটে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

অপরদিকে বৃহৎপুঁজির চাপে ব্যাঙ্কঋণের উপর সুদের হার ক্রমশ কমছে। ব্যাঙ্ক রেটও কমিয়ে এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। একই সাথে কমছে আমানতের উপর সুদের হার। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্ষুদ্র আমানতকারীরা। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে উৎসাহের অভাব দেখা যাচ্ছে— যা অর্থনীতিতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে — জাতীয় আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় কমতে শুরু করেছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ব্যাঙ্কব্যবস্থার সুবিধা ব্যাপক জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া ছিল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। গ্রামীণ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কব্যবস্থার সম্প্রসারণের চিত্রটি নিম্নপ্রদত্ত সারণীতে দেওয়া হল—

সারণী-১

এস,বি,আই	৪৬ শতাংশ	(মোট শাখার)
এস, বি, আই এর সহযোগী	৩২.১ শতাংশ	,,
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক	৪২.৯ শতাংশ	,,
ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাঙ্ক	২২.৮ শতাংশ	,,
বিদেশী ব্যাঙ্ক	০ শতাংশ	,,

জাতীয়করণের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে গ্রামীণ এলাকায় ব্যাঙ্কশাখার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮৩৩ টি। বর্তমানে এই সংখ্যা ৩২৬৭৩। ১০ হাজার লোক অধ্যুষিত গ্রামে ১টি ব্যাঙ্কের শাখা আছে। ক্ষেত্রিয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের (RRB) সংখ্যা ১৯৬। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় গ্রাহক-ভিত্তি বিপুল। আমানতকারীর সংখ্যা ১২.৫৮ কোটি — যা সমগ্র ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার গ্রাহকভিত্তির (Customer base) ৩০.৪ শতাংশ। এই শাখাগুলি গ্রামীণ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করছে। গ্রামীণ সঞ্চয়কৃত আমানত পরিমাণ হল সমগ্র ব্যাঙ্ক আমানতের ১৪ শতাংশ। গ্রামীণ ক্ষেত্রে প্রদত্ত ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ সমগ্র ঋণের ১০.৬ শতাংশ। ঋণগ্রহীতাদের সংখ্যা ২.৫০ কোটি; এর মধ্যে ২.৪৮ কোটি ২৫০০০ টাকার কম ঋণ নিয়েছে।

নরসিংহম কমিটির (২য়) উদারীকরণ পথে তথাকথিত 'সংস্কার' ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষদের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবসা থেকে হাত গুটিয়ে ফেলার কাজ দ্রুততর হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির গ্রামীণ ব্যাঙ্কব্যবসায় ক্ষতির কারণ হিসাবে— ব্যাঙ্ক শাখার বিস্তারকে দায়ী করা হচ্ছে। পূর্বের শাখা প্রতি লাভ লোকসানের খতিয়ান করা হত না। বর্তমানে তা করা হচ্ছে কারণ মুনাফাই এখন একমাত্র মাপকাঠি— উন্নয়ন দারিদ্র্যদূরীকরণ ইত্যাদি সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা আই এম এফ / বিশ্বব্যাঙ্কের পছন্দ নয়। তাদের হুকুম এগুলি বন্ধ করতে হবে। এখন নগর ও শহরাঞ্চলে ব্যাঙ্ক-শাখা খোলার প্রবণতা প্রাধান্য পেয়েছে এতটাই যে মনে হয় এ ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গেছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কশাখার সংখ্যা ৩৫,৩৮৯ (মার্চ ১৯৯৩) থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩২,৭৯৮ (২০০০)।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমেছে ২৫৯১, শহরাঞ্চলে বেড়েছে ২৭৫০ গত ৭ বছরে। নিয়মানুসারে— মহানগরী ক্ষেত্রে একটি শাখা খুললে, গ্রামীণ এলাকায় ৪টি শাখা খুলতে হবে। এই নিয়ম কেউ মানছে না। মুনাফাতাড়িত ব্যাঙ্কব্যবসা গ্রাম থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এই ভয়ংকর প্রক্রিয়া প্রতিহত না হলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে সর্বনাশ নেমে আসবে। সুলভ ও সহজ ঋণ থেকে বঞ্চিত হবে গ্রামীণ মানুষ। পুরানো মহাজনী ব্যবসার খপ্পরে পড়বে তারা। যা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকে, পাঞ্জাবে ইত্যাদি রাজ্যে কৃষকদের আত্মহত্যা— কারণ উচ্চ সুদে ঋণ। লক্ষ্যণীয় যে বিদেশী ব্যাঙ্কের কোন শাখা গ্রামীণ ক্ষেত্রে নেই। নতুন ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাঙ্কগুলির গ্রামীণ এলাকায় ২৫ শতাংশ শাখা খোলার কথা। একটিও শাখা তারা খোলে নি। খুলবেও না। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণের সর্বনাশা প্রভাব পড়বে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে— যা গ্রামীণ অর্থনীতির মূলে আঘাত করবে।

'অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে' নির্দেশিত ঋণ দেওয়ার বর্তমান প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত আছে — যদিও নীতিগতভাবে — সিদ্ধান্ত হচ্ছে নির্দেশিত ঋণ নীতি Directed credit policy বাতিল করে দেওয়ার। এ ব্যাপারে প্রবল জনমতের চাপে সরকারও অগ্রসর হতে সাহস পাচ্ছে না। অবশ্য বহুজাতিক সংস্থাগুলি যাতে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে সুলভ ঋণের সুযো পায় তার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রভুদেরও তুষ্ট করা হয়েছে। কৃষি নির্ভরশীল শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে বহুজাতিক সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে। রপ্তানীযোগ্য উৎপাদনের জন্য সুলভ ঋণদান নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কৃষিভিত্তিক শিল্পকে। কোকোকোলা, পেপ্‌সি ইত্যাদি বহুজাতিক সংস্থাগুলি সুলভ ঋণনীতির সুযোগ নিয়ে আমাদের টাকায়-ফলাও ব্যবসা করবে, গড়বে মুনাফার পাহাড়। আর এই ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পপতিদের উঠবে নাভিশ্বাস। মনসান্টো প্রভৃতি দৈত্যাকৃতি শিল্প সংস্থাগুলি ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে কব্জা করতে শুরু করেছে— এই প্রক্রিয়া আরও জোরদার হয়ে উঠবে এই নীতির ফলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুসারে কৃষিভিত্তিক শিল্পের ক্ষেত্রে কৃষকদের কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস অর্থাৎ বীজ, সার ইত্যাদি জোগান দেবে মালিকরা। এর জন্য তারা সস্তায় ঋণ পাবে ব্যাঙ্ক থেকে।

বর্তমান নীতির ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির এখন একমাত্র লক্ষ্য হল মুনাফা বৃদ্ধি করা এবং অকার্যকরী সম্পদ (NPA) যাতে বৃদ্ধি না পায় তা দেখা। কেন্দ্রীয় সরকারও পুঁজির জন্য ব্যাঙ্কগুলোকে আর টাকা দেবে না; কিন্তু মুনাফা হলে নিয়ে নেবে— সেটা ব্যাঙ্কের সম্পদবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে না। এই চাপের ফলে ব্যাঙ্কগুলি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পগুলিতে ঋণ দেবার ব্যাপারে একেবারেই অনিচ্ছুক। ঋণ শোধ না হওয়ার কিছু সম্ভাবনা ব্যাঙ্কিং ব্যবসার স্বাভাবিক অঙ্গ। বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্কগুলি এই ঝুঁকি নিতে একেবারেই রাজি নয়। ফলে এই সব ঋণ না দিয়ে তারা নিরাপদ থাকতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন স্বনিযুক্তি কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলিতে (আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি) ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিতে তেমন ইচ্ছুক নয়। এর ফলে প্রকল্পগুলি পূর্ণ সাফল্য পাচ্ছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যাতে তাদের দায়বদ্ধতা পালন করেন, তার জন্য গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে আরও তীব্র করে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ঋণ-আমানত অনুপাতের (CDR) বিষয়টি এই প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের মোট আমানতের মাত্র ৪৪.১ শতাংশ ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তামিলনাড়ুতে ৯০.৬ শতাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬৩.৩ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ৮৫.৪ শতাংশ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের ঋণ পরিশোধের প্রশ্নটি তোলা হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এই ক্ষেত্রে জাতীয় গড়ের মধ্যেই পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে ঋণ আমানত অনুপাত (Credit Deposit Ratio) বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জনমত গঠন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের নীতি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে দুর্বল করার লক্ষ্যেই গৃহীত হয়েছে। নতুন এক হিসাবের পদ্ধতি— 'Prudential Norm'-এর নামে গত দশবছরে ব্যাঙ্কগুলির উপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং এই প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত। নীতি নির্ধারকদের উদ্দেশ্য অবশ্যই এই চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত কাঠামোটি ভেঙে ফেলা এবং ব্যাঙ্কিংক্ষেত্রটিকে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করা। এক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককাঠামো তার অবস্থান আরও মজবুত করতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্যই এর মূলে রয়েছে সংগ্রামী ব্যাঙ্ককর্মচারীদের সচেতনতা ও তাদের ধারাবাহিক

সংগ্রাম ও সর্বোপরি জনগণের ক্রমবর্ধমান আস্থা ও সমর্থন। রিজার্ভব্যাঙ্ক প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক অবস্থার চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ—

	মার্চ ৩১, ২০০১ (কোটি টাকায়)	মার্চ ৩১, ২০০০ (কোটি টাকায়)
মোট আমানত	৮,৫৯,৩৭৬.৩৩	৭,৩৭,২৮০.৫৩
মোট সম্পদ	১০,২৯,৭৬৯.৫৯	৮,৯০,০০০.০৫
লগ্নি (সরকারি ও অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটিস)	৩,৯৪,১০৭.৩৩	৩,৩৩,১৯২.০৯
পুঁজি	১৪,৫৪৭.০৮	১৪,২৩৩.৬৮
রিজার্ভ ও উদ্বৃত্ত	৩৫,৩৫৮.২৫	৩১,৮১৮.৭৩
আয়	১,০৩,৪৯৮.৯৩	৯০,৯১১.০১
কার্যকরী মুনাফা	১৩,৭৯২.৯৫	১৩,০৪২.২৯
প্রকৃত মুনাফা	৪,৩১৬.৯৪	৫,১১৬.১৮
প্রভিসনিং	৯,৪৭৬.০১	৭,৯২৬.১১
অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণ	১,৪৬,৫৪৬.০০	১,২৭,৮০৭.০০

উল্লেখ্য ঃ অকার্যকরী সম্পদের (NPA) জন্য প্রভিসনিং করে টাকা আলাদা করে রাখা হয়। যা মোট বা কার্যকরী মুনাফা থেকেই ব্যবস্থা করতে হয়। ২০০১ সালে নিট মুনাফা কমার কারণ হল এ খাতে বেশি টাকা রাখা হয়েছে।

NPA বা অকার্যকরী সম্পদের মোট পরিমাণ ৫৪,৭৭৩ কোটি টাকা। বৃহৎ পুঁজিপতি সংস্থাগুলি এই বকেয়া টাকার সিংহভাগই ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঋণ নিয়ে শোধ দেয়নি। এই টাকা উদ্ধার করার কোন আইনগত ব্যবস্থাই কেন্দ্রীয় সরকার করে নি। প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই 'সমঝোতার' মাধ্যমে এই 'ঋণ' মকুব করা হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার এইভাবে নয়ছয় করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারীকরণের জন্য প্রস্তাবিত বিল সংসদের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিল পাশ করাতে বদ্ধপরিকর। বেসরকারিকরণের এই জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত রুখতে সর্বশ্রেণীর ব্যাঙ্ককর্মচারীরাও বদ্ধপরিকর। অফিসার ও কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ ফোরাম—ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (UFBU) গড়ে উঠেছে এবং অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ব্যাঙ্ক শিল্পে কর্মচারী নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তথাকথিত স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প। ইতিমধ্যেই ১ লাখের বেশি কর্মচারীকে স্বেচ্ছাবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী সঙ্কোচন নীতির ফলে ব্যাপক ভাবে কর্মচারী সংখ্যা কমানো হচ্ছে। বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ব্যাঙ্কের শাখা। অত্যন্ত নিম্ন মজুরি দিয়ে Contract প্রথায় কর্মচারী বা অফিসার নিয়োগ করে চলেছে

বিদেশী ব্যাঙ্ক ও নূতন দেশীয় বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি। মডেল হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাছে এই নিয়োগপ্রথাকে। বিদেশী ও দেশীয় বেসরকারি মালিকরা কোন আইন কানুনই মানছে না। প্রসঙ্গত, এদের দিকে তাকিয়েই ভারত সরকার প্রচলিত শ্রম আইন সংশোধনের দিকে এগোতে চাইছে। বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ককর্মচারীদের আন্দোলন দেশব্যাপী বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ তথা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থবাহী নীতির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশপ্রেমিক মানুষের সমর্থনে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনকে শক্তিশালী করাই বর্তমান পরিস্থিতির জরুরি দাবি।

ব্যাঙ্কের শাখাগুলি বন্ধ করা হচ্ছে লোকসান কমানোর নাম করে। অথচ দেখা যাচ্ছে লাভজনক শাখাগুলিও বন্ধ হচ্ছে। প্রশাসনের স্তর কমিয়ে দেওয়ার অজুহাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিসও বন্ধ করা হচ্ছে। ব্যাপক যান্ত্রিকীকরণের ফলে কর্মচারী উদ্বৃত্ত হচ্ছে। এই উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের স্বেচ্ছাবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে এবং হচ্ছে। স্বেচ্ছাবসর না নিলে দূরবর্তী রাজ্যে বদলী করে দিয়ে হেনস্তা করছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। এদিকে, বেতন চুক্তি যা বহু লড়াই সংগ্রাম করে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা অর্জন করেছিলেন, তাকেও লঘু করার চক্রান্ত চলছে। 'রুগ্ন ব্যাঙ্ক' আখ্যা দিয়ে ৩টি ব্যাঙ্কের কর্মচারী-অফিসারদের বেতন বন্ধ করে রেখেছিল কর্তৃপক্ষ। বহু আন্দোলনের মাধ্যমে, বকেয়ার কিছু অংশ আদায় করা গিয়েছে। অন্যদিকে ব্যাপক দুর্নীতির শিকার হয়ে যে ব্যাঙ্কগুলিতে লোকসান হয়েছে, সেখানে এই লোকসানের দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ কর্মচারী-অফিসারদের উপর। কাজের ঘন্টা বাড়ানো হচ্ছে। এর জন্য কোন বাড়তি মজুরি নেই। অথচ, দুর্নীতির জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ স্তরের আমলা, বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের নেতা— শিল্পপতি এদের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগছে না। এরা বহাল তবিয়তেই আছে। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সনাক্ত করা গেলেও, তাদের কোন শাস্তি হয়নি।

এই ভয়ংকর অরাজকতা, কর্মচারীদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম হচ্ছে। ব্যাঙ্ক কর্মচারী-অফিসারদের নিয়ে আন্দোলনের যুক্ত মঞ্চ— ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস ব্যাঙ্ক শিল্পে ৯৯ শতাংশ কর্মচারী-অফিসারদের প্রতিনিধিত্বকারী ৯টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। এই মঞ্চের ডাকে লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ্ক কর্মচারী অফিসাররা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের শপথ নিয়েছেন। বিক্ষোভ, সমাবেশ, সংসদ অভিযান থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক শিল্পে দেশব্যাপী সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়েছে কয়েকবার। দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটগুলিতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা একশোভাগ স্তব্ধ হয়েছে। দেশের কোন প্রান্তে, গ্রামে, শহরে কোন ব্যাঙ্কের একটিও শাখা খোলেনি। এটা সম্ভব হয়েছে ইস্পাতদৃঢ় ঐক্যের জন্য। এই ঐক্য গড়ে তোলার পথে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (বি ই এফ আই) প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং ঐক্যকে আরও সংহত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বি ই এফ আই-এর এই ঐক্যের আকাঙ্ক্ষার ফলে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণকে মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পেরে অন্যান্য সংগঠনগুলিও এগিয়ে এসেছে। বর্তমানে ব্যাঙ্কশিল্পে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই ব্যাঙ্কের কর্মচারী-অফিসারদের কাছে আশার আলোকবর্তিকা। কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকারের হুমকিকে অগ্রাহ্য করার, আক্রমণের কাছে মাথা অবনত না করার সাহস সঞ্চারিত করেছে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম।

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগুলির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির প্রবল প্রতিবাদের ফলেই তীব্র জনমত গড়ে তোলা সম্ভব হয়। প্রধান বিরোধী দলগুলিও সংসদে সোচ্চার হয়। লাগাতার প্রতিবাদ - আন্দোলন - ধর্মঘট ইত্যাদির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে যে বিভিন্ন আইন সংশোধন করার প্রয়োজন, তার বেশির

ভাগই সংসদের বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য পড়ে আছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের এক সূত্র থেকে তাদের খেদের কথা জানা গেছে। অর্থমন্ত্রকসূত্র থেকে বলা হচ্ছে, বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও কর্মচারী বিরোধী আইন সংশোধনের বিষয়গুলি এখন প্রায় পুরোপুরি থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

কর্মচারীদের আন্দোলনের তীব্রতা এবং ধারাবাহিকতার ও জনগণের সমর্থনের মাধ্যমেই ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের চক্রান্তকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিতে হবে।